বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭

Institutional Fine Arts Education in Bangladesh : 1948–1987

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দুলাল চন্দ্র গাইন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১০১

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩–২০১৪

পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭১

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২২

ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭ [Institutional Fine Arts Education in Bangladesh : 1948–1987] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণা। এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

তারিখ :

দুলাল চন্দ্র গাইন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১০১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩–২০১৪
পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
DEPARTMENT OF DRAWING & PAINTING
Faculty of Fine Art, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : +8809666414299.
Extn. 8900, 8901. E-mail: drawing_painting@du.ac.bd

No. ... ...   Date ... ...

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের গবেষক জনাব দুলাল চন্দ্র গাইন (পিএইচ.ডি প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১০১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩–২০১৪; পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত *বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭ [Institutional Fine Arts Education in Bangladesh : 1948–1987]* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোনো যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়। গবেষণাকর্মটি গবেষকের স্বকীয় এবং মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং মৌলিকত্ব বিচার করে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

ড. ফরিদা জামান
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্‌কথন

'বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭ (Institutional Fine Arts Education in Bangladesh : 1948–1987)' শীর্ষক গবেষণাটি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে গড়া ওঠা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট, আর্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। এ দেশের শিল্পশিক্ষার উৎস অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ব শিল্পশিক্ষার ইতিহাস এবং ঔপনিবেশিক আমলে ভারত তথা অবিভক্ত বাংলার শিল্পশিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের বর্তমান সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. ফরিদা জামানকে, তিনি গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, নির্দেশনা এবং গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধান করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিষয় নির্বাচন এবং Synopsis (গবেষণা প্রস্তাব) তৈরিতে তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ফয়েজুল আজিম। গবেষণার পদ্ধতিগত শিক্ষা (Methodology) বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মলয় বালা এবং অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক ড. সৈয়দ রেজাউল করিম। সেমিনার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম (নাজমা খান মজলিশ)। সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধ্যাপক রফিকুন নবী এবং অধ্যাপক বুলবন ওসমান। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গবেষণার মূল ক্ষেত্র হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। এই অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক এমদাদুল হক মো. মতলুব আলী, অধ্যাপক আবুল বারক্‌ আল্‌ভী ও বর্তমান ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন ডিন অফিসে সংরক্ষিত পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, রেজিস্টার ইত্যাদি দেখার অনুমতি দিয়েছেন। চারুকলা অনুষদের সকল বিভাগের চেয়ারম্যান বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহে থাকা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী, শিল্পী আবুল বারক্‌ আল্‌ভী, ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সাবেক সহকারী

অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, চারুকলা অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক সুমন ওহায়িদ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. জসিমউদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক উত্তম কুমার বড়ুয়া ও ড. নিত্যানন্দ গাইন; রাজশাহী চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর তালুকদার, অধ্যাপক ড. এ কে এম জাহিদ হোসেন, অধ্যাপক ড. হাসান আশিক, রাজশাহী আর্ট কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী কিবরিয়া কাজী, আবুল আসিফ মার্শাল, মো. জাহিদুর রহমান খান, ফরিদা ইয়াসমীন চৌধুরী; খুলনা আর্ট কলেজের সাবেক শিক্ষক ফাউজুল কবির, বিমানেশ বিশ্বাস, চৈতন্য কুমার মল্লিক, তরিকত ইসলাম, সাবেক শিক্ষার্থী শেখর মণ্ডল প্রমুখ। সদ্যপ্রয়াত নিজামউদ্দিন খান বাদল তাঁর সত্তরের দশকে তোলা তৎকালীন আর্ট কলেজের দুর্লভ কিছু আলোকচিত্রের কপি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার সময় আমি অনেক শিক্ষক, শিল্পী, শিল্প সমালোচক ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার, মুঠোফোনালাপ এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না; তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তবে যাঁদের প্রদত্ত তথ্য এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী, অধ্যাপক হাশেম খান, অধ্যাপক রফিকুন নবী, অধ্যাপক আবুল বারক্ আল্‌ভী, অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান, অধ্যাপক নিসার হোসেন প্রমুখ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দদুলাল মুখোপধ্যায়, কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছত্রপতি দত্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মুর্তজা বশীর, অধ্যাপক মিজানুর রহিম, বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী, অধ্যাপক আবুল মনসুর, অধ্যাপক ফয়েজুল আজিম প্রমুখ। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভিসন্দর্ভ রচনার অক্ষর বিন্যাস ও প্রুফ সংশোধনের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন—হামিদা আক্তার, চঞ্চল কুমার শীল, মো. আরিফুল ইসলাম রিয়াজ, আবীর নজরুল প্রমুখ—তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকাজ করার সময় বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়েছি। যার মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শাখা, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পারিবারিক সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নিভৃতে গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছে আমার স্ত্রী মিনতি গাইন। গবেষণার প্রযুক্তিগত কাজে সহযোগিতা করেছে পুত্র সুদীপ্ত সূর্য গাইন এবং ভাতিজি সুপ্রিয়া গাইন—তাদের প্রতি আমার অসীম স্নেহ ও ভালোবাসা।

গবেষণাকাজটি করার মধ্যবর্তী সময়ে কভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় লকডাউনের কারণে গবেষণাকাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। এ সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও শিল্পীর সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরিবর্তে মুঠোফোনালাপ ও ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান* ও *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠান, স্থান, গ্রন্থ, শিল্পীদের ক্যাটালগে ব্যবহৃত নাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া চারুকলায় বহুল প্রচলিত বিদেশি শব্দ (যেমন : পেইন্টিং, ফিগার, মডেল, ফর্ম, ডাইমেনশন, টোন, গ্রেড, ইজম, টেকনিক, অবজেক্ট, ড্রইং, টেক্সচার, ডিজাইন প্রভৃতি) বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস-এর প্রথম পনেরো বছর কোনো তত্ত্বীয় বিষয় পাঠ্য ছিল না। সুতরাং ওই সময়ের সিলেবাসকে পাঠ্যক্রম বলা সমীচীন মনে করিনি। আবার ১৯৬৩ সালের পর থেকে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হলেও অঙ্কন ও নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিষয়ের প্রাধান্য ছিল। এই কারণে 'শিক্ষাক্রম' ও 'পাঠ্যক্রম'-এর অর্থগত পার্থক্যের ঝামেলা এড়াতে এ ক্ষেত্রে ইংরেজি 'সিলেবাস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস সংক্ষেপে আর্ট ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে চারুকলা ইনস্টিটিউট লেখা হয়েছে। গবেষণার সময়কালের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে এ দেশের নাম তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত এ দেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব বাংলা প্রদেশ এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধমে ২৬ মার্চ থেকে এ দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নাম ধারণ করে। এই সময়কাল অনুযায়ী, অভিসন্দর্ভে এই অঞ্চলের নাম পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ লিখিত হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার পর প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। আশা করি এই অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে শিল্পরসিক ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষার প্রথম চল্লিশ বছরের (১৯৪৮–১৯৮৭) তথ্যবহুল ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার ধারা অনুসারে। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশদের মাধ্যমে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দেশবিভাগের পর তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ ভাগের ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে গিয়ে শিল্পশিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুলনার আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে চলমান মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস দেশবিভাগের পর স্থানীয় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের একদল শিক্ষক জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় এসে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলেও তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে আর্ট ইনস্টিটিউট উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে আধুনিক শিল্পশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মূলত এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সত্তরের দশকের শুরুতে রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে খোলা হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ। সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার মাধ্যমে এ দেশে চারুকলা বিষয়ে প্রথম উচ্চশিক্ষার সূচনা হয়। এরপর আশির দশকের মধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে (২০২১ সালের মধ্যে) আরো ছয়টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অনুষদ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো সাতটি আর্ট কলেজ গড়ে উঠেছে।

'বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উল্লিখিত চল্লিশ বছরের ইতিহাস তথ্যভিত্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ উল্লিখিত চার দশকে দেশের শিল্পশিক্ষা উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস, শিক্ষাপদ্ধতি, প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের অবদান এবং যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে এ দেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিলেবাসভুক্ত শিক্ষণীয় ও পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম, যেমন—প্রদর্শনী, প্রকাশনা, কর্মশালা ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহার অংশ ব্যতীত অভিসন্দর্ভটি প্রধানত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে শিল্পশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত। এই অধ্যায়ে শিল্পশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ

এবং তার ধারাবাহিকতায় ভারত তথা বাংলায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলার শিল্পশিক্ষার প্রাচীন ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট। বাংলায় পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। পূর্ব বাংলার শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের সাথে এই স্কুলের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে ঢাকায় একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে এ দেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জয়নুল আবেদিন ও অন্যদের ভূমিকা এবং আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যায়ের পনেরো বছরের (১৯৪৮–১৯৬৩) শিক্ষা কার্যক্রম এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার ধারা চালু রাখতে ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি একটি সরকারি ইনস্টিটিউট হিসেবে জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে এখানে কার্যক্রম শুরু হলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যচিত্রকলা এবং ঐতিহ্যবাহী মৃৎ ও কারুশিল্পের বিষয়গুলোও এখানে শিক্ষণীয় হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা বিস্তারে একচ্ছত্র ভূমিকা রেখেছে। এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আধুনিক চিত্রকলার যুগান্তকারী উত্থান ঘটে। এ সকল বিষয় এই অধ্যায়ে তথ্যভিত্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আর্ট কলেজ পর্যায়ের শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি উপাদানকল্প আর্ট কলেজে পরিণত হওয়ার সময় থেকে (১৯৬৩) এই পর্যায়ের শুরু। দেশ স্বাধীনের পর আশির দশকের মধ্যে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই পর্যায়ের শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাসের ব্যাপক সংস্কার করে দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি ও তিন বছরের বিএফএ কোর্সসহ পাঁচ বছরের কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এ সময় ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি তত্ত্বীয় বিষয়ও পাঠ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষাকার্যক্রম আরো সুশৃঙ্খল ও উন্নত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার। সত্তরের দশকের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খুলে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মাধ্যমে এই পর্যায়ের শুরু এবং

ঢাকার আর্ট কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ইনস্টিটিউটে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিকাশ শুরু হয়। মাস্টার্স ডিগ্রির শিক্ষাকে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী করার ফলে এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং লোকজ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পধারা থেকে অনুষঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় অনুশীলনধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি নিরীক্ষাধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা উল্লিখিত চার দশকের মধ্যে একটি সরকারি ইনস্টিটিউট পর্যায় থেকে শুরু হয়ে কলেজ পর্যায় অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সর্বাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই শিল্পশিক্ষার প্রদর্শিত পথ ধরেই বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটেছে।

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা এ দেশে আধুনিক শিল্পচর্চা বিকাশে কীভাবে ভূমিকা রেখেছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বেসিক ও স্নাতক পর্যায়ের কোর্সগুলোতে শিক্ষণীয় বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব প্রচেষ্টায় অথবা বিদেশ থেকে অর্জিত উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা ও বিস্তার ঘটেছে। সত্তরের দশক থেকে এখানে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা শুরু হলে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটে।
উল্লিখিত চল্লিশ বছরের মধ্যে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি দক্ষ ও সৃজনশীল শিল্পী সমাজ গড়ে তুলেছিল—যাঁরা শিল্পশিক্ষা বিস্তার, বিভিন্ন ব্যবহারিক শিল্পের চাহিদা পূরণ, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চাহিদা মেটানোসহ আধুনিক শিল্পচর্চার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।
উপসংহার অংশে সমগ্র গবেষণার ফলাফল ও সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠার নিম্নাংশে প্রয়োজনীয় তথ্যনির্দেশ যুক্ত করা হয়েছে এবং সবশেষে তথ্যপঞ্জি অংশে যুক্ত করা হয়েছে সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, অফিস আদেশ ও দলিলপত্রের তালিকা।

চিত্রসূচি

চিত্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১ :	অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লক	৩৪
চিত্র-২ :	গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ভবন, কলকাতা (বর্তমানে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট)	৩৬
চিত্র-৩ :	গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের প্রবেশদ্বার	৩৬
চিত্র-৪ :	অধ্যক্ষ আরনেস্ট বেনফিল্ড হ্যাভেল	৩৭
চিত্র-৫ :	শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭
চিত্র-৬ :	অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে	৪৫
চিত্র-৭ :	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
চিত্র-৮ :	শিল্পী নন্দলাল বসু	৫০
চিত্র-৯ :	শিল্পী নন্দলাল বসুর স্টুডিও (বর্তমানে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ)	৫২
চিত্র-১০ :	কালো বাড়ি, কলাভবন, শান্তিনিকেতন, আলোকচিত্র : গবেষক	৫২
চিত্র-১১ :	শিল্পী শশিভূষণ পাল, উৎস : শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ	৫৮
চিত্র-১২ :	মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস, ১৯৩০ সাল, উৎস : মাসিক মোহাম্মদী	৬০
চিত্র-১৩ :	মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ভবনের উদ্বোধনী ফলক, আলোকচিত্র : গবেষক	৬০
চিত্র-১৪ :	অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা	১০৪
চিত্র-১৫ :	গভর্নমেন্ট ইনিস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী আনোয়ারুল হক, শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, শিল্পী শফিকুল আমীন, শিল্পী কামরুল হাসান, শিল্পী সৈয়দ আলী আহসান ও শিল্পী হবিবুর রহমান জমাদার	১০৫
চিত্র-১৬ :	ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, জনসন রোড, ঢাকা; এই ভবনের নিচতলার দুটি কক্ষে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়; আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	১০৮
চিত্র-১৭ :	গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষকবৃন্দের সাথে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীরা (আংশিক) ১৯৫১, উৎস : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত মবিনুল আজিমের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ	১২৩
চিত্র-১৮ :	ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীর ক্যাটালগের প্রচ্ছদ, উৎস : শিল্পী মুর্তজা বশীর	১২৬
চিত্র-১৯ :	‘এ স্টাডি’, শিল্পী আনোয়ারুল হক	১২৬
চিত্র-২০ :	ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করছেন লেডি ভিকারুননিসা নূন	১৩৬
চিত্র-২১ :	‘দে অলসো লাভ বিউটি’, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, উৎস : মাসিক দিলরুবা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ	১৩৬
চিত্র-২২ :	খান ম্যানশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা; এই ভবনে ১৯৫২ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের কার্যক্রম চলেছিল, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	১৪১

চিত্র-২৩ :	১৯৫৩ সালে বৃত্তি নিয়ে আমিনুল ইসলামের ইতালি যাওয়ার প্রাক্কালে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনসহ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, কয়েকজন শিল্পানুরাগী ও শিক্ষার্থীরা, উৎস : Art of Bangladesh Series-10; Aminul Islam	১৪৮
চিত্র-২৪ :	গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ভবনের নকশা, উৎস : মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদে আয়োজিত প্রদর্শনী, ২০১৬	১৬৮
চিত্র-২৫ :	গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রশাসনিক ভবন	১৬৮
চিত্র-২৬ :	গোল পুকুরসহ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ভবন, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	১৬৮
চিত্র-২৭ :	গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে পঞ্চাশের দশকে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী খাজা শফিক আহমেদ, শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত, শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, শিল্পী রশিদ চৌধুরী ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী	১৭১
চিত্র-২৮ :	'তিন আত্মা', শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, উৎস : পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ১৯৫৯	১৭৭
চিত্র-২৯ :	'মা ও শিশু', শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত	১৭৭
চিত্র-৩০ :	গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষক; শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার ও শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী	১৮২
চিত্র-৩১ :	মৃৎশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক; শিল্পী কোইচি তাকিতা ও শিল্পী মীর মোস্তফা আলী	১৮৬
চিত্র-৩২ :	নবগঠিত মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম, পায়ে চালিত হুইলে মৃৎপাত্র তৈরি করছেন মরণচাঁদ পাল, তাঁকে সহযোগিতা করছেন কোইচি তাকিতা; পেছনে কাজে মগ্ন গোপেশ মালাকার, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১	১৮৮
চিত্র-৩৩ :	সফিউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে ছাপচিত্র বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন জনৈক শিক্ষার্থী, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১	১৯৫
চিত্র-৩৪ :	গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	২১৩
চিত্র-৩৫ :	কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষক; শিল্পী হাশেম খান ও শিল্পী রফিকুন নবী	২৩৪
চিত্র-৩৬ :	অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১	২৩৫
চিত্র-৩৭ :	কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১	২৩৮
চিত্র-৩৮ :	মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন মীর মোস্তফা আলী, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	২৪৪
চিত্র-৩৯ :	মোহাম্মদ কিবরিয়ার তত্ত্বাবধানে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম, উৎস : বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবের স্মরণিকা, ১৯৭৩	২৪৮
চিত্র-৪০ :	আর্ট কলেজের লাইব্রেরি, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১	২৬১
চিত্র-৪১ :	শিল্পী জুনাবুল ইসলাম	২৭০
চিত্র-৪২ :	বাটিক ক্লাস, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	২৭০

চিত্র-৪৩ :	শিল্পী হাশেম খানের তত্ত্বাবধানে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম, উৎস : চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০০৪	২৭৪
চিত্র-৪৪ :	কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে ১৯৬৫–১৯৭০ সালের মধ্যে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ	২৮০
চিত্র-৪৫ :	অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন	২৮১
চিত্র-৪৬ :	বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্বা ধী ন তা' শীর্ষক মিছিল, ১৬ মার্চ ১৯৭১, উৎস : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত গ্রন্থ *সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা*	২৮৩
চিত্র-৪৭ :	মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা পোস্টার, উৎস : বীরেন সোম রচিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*	২৮৫
চিত্র-৪৮ :	১৯৭২ সালে আর্ট কলেজে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, শিল্পী মাহবুবুল আমিন ও শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দিন	২৯০
চিত্র-৪৯ :	গ্রাফিক ডিজাইন ও প্রাচ্যকলা বিভাগের ভবন	২৯২
চিত্র-৫০ :	মৃৎশিল্প বিভাগের ভবন, আলোকচিত্র : দিগন্ত সরকার	২৯২
চিত্র-৫১ :	মডেলিং ক্লাস, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল	২৯৪
চিত্র-৫২ :	মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী মরণচাঁদ পাল, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী ও শিল্পী গোপেশ মালাকার	২৯৬
চিত্র-৫৩ :	১৯৭৩ সালে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী এমদাদুল হক মো. মতলুব আলী, শিল্পী শহিদ কবির ও শিল্পী আব্দুস সাত্তার	২৯৭
চিত্র-৫৪ :	রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উৎস : স্মরণিকা, রজত জয়ন্তী উৎসব, ১৯৭৩	২৯৯
চিত্র-৫৫ :	আর্ট কলেজে নিযুক্ত কয়েকজন নারী শিক্ষক; ফরিদা জামান, শামীম আরা সিকদার ও নাজমা বেগম	৩২৭
চিত্র-৫৬ :	শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, প্রভাষক, কারুশিল্প বিভাগ	৩২৮
চিত্র-৫৭ :	চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম, উৎস : স্মরণিকা, সৃজন স্বজন সম্মিলন	৩৩৫
চিত্র-৫৮ :	সত্তর ও আশির দশকের চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ; শিল্পী সবিহ্-উল আলম ও শিল্পী হাসি চক্রবর্তী	৩৩৭
চিত্র-৫৯ :	জাতীয়করণের পর নির্মিত চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ ভবন, আলোকচিত্র : গবেষক	৩৩৮
চিত্র-৬০ :	রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান, উৎস : আবুল আসিফ মার্শাল	৩৫১
চিত্র-৬১ :	রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও প্রভাষকবৃন্দ; শিল্পী বনিজুল হক, শিল্পী তরুন ঘোষ ও শিল্পী কাজী রকিব	৩৫২
চিত্র-৬২ :	রাজশাহী বি.এড কলেজ ভবন; এই ভবনের নিচতলায় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়, উৎস : আবুল আসিফ মার্শাল	৩৫৩

চিত্র-৬৩ :	রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন (বর্তমান অবস্থা), আলোকচিত্র : অধ্যাপক আব্দুস সোবহান হীরা	৩৫৫
চিত্র-৬৪ :	খুলনা আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও প্রভাষক; ড. রফিকুল আলম ও ফাউজুল কবির	৩৬৩
চিত্র-৬৫ :	খুলনা রেডিও স্টেশনের পরিত্যক্ত ভবন, ১৯৮৩–১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানে খুলনা আর্ট কলেজের কার্যক্রম চলেছে, উৎস : শেখর মণ্ডল	৩৬৬
চিত্র-৬৬ :	শিল্পী রশিদ চৌধুরী; প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ	৩৭৯
চিত্র-৬৭ :	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ; শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী মিজানুর রহিম ও শিল্পী মুর্তজা বশীর	৩৭৯
চিত্র-৬৮ :	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, এই ভবনে চারুকলা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়, আলোকচিত্র : অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন	৩৮১
চিত্র-৬৯ :	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে সত্তর ও আশির দশকের নিযুক্ত কয়েকজন শিক্ষক; শিল্পী আবুল মনসুর, শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, শিল্পী মনসুর-উল করিম, শিল্পী শাহ মো. আনসার আলী, শিল্পী নাসিম বানু, শিল্পী ফয়েজুল আজিম ও শিল্পী অলক রায়	৩৮৫
চিত্র-৭০ :	চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, আলোকচিত্র : গবেষক	৩৮৭
চিত্র-৭১ :	১৯৮৭ সালে চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত কয়েকজন প্রভাষক; শিল্পী নাইমা হক, শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ, শিল্পী এফ এম কায়সার, শিল্পী আবু সাইদ তালুকদার, শিল্পী রোকেয়া সুলতানা, শিল্পী নিসার হোসেন ও সৈয়দ আজিজুল হক; আলোকচিত্র : রূপম চৌধুরী ও রবিউল ইসলাম	৪০৩
চিত্র-৭২ :	চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা	৪১৮

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
প্রাক্কথন	iii–v
সারসংক্ষেপ	vi–viii
চিত্রসূচি	ix–xii
ভূমিকা	১–১৯
প্রথম অধ্যায়	২০–৬৪
প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ এবং দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার শিল্পশিক্ষা	
প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ	২২–২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা	২৮–৬৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৬৫–২১১
পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ	
প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার পটভূমি	৬৬–৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তুতি পর্ব	৭৮–৯৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা	৯৪–২১১
তৃতীয় অধ্যায়	২১২–৩৭০
প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় : আর্ট কলেজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা	২১৪–২৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা	২৮৯–৩৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অন্যান্য আর্ট কলেজ	৩৩৩–৩৭০
চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম	
রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়	
খুলনা আর্ট কলেজ	
চতুর্থ অধ্যায়	৩৭১–৪২০
প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার তৃতীয় পর্যায় : বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষা	
প্রথম পরিচ্ছেদ : চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭৩–৩৯৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯৬–৪২০
পঞ্চম অধ্যায়	৪২১–৪৩৫
বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভূমিকা	
উপসংহার	৪৩৬–৪৪৮
তথ্যপঞ্জি	৪৪৯–৪৬০

ভূমিকা

প্রস্তাবনা : শিল্পশিক্ষার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচর্চা ও শিল্পশিক্ষার বিবর্তন ঘটেছে। আদিম যুগে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সংযোজনের ফলে জীবনযাত্রার পদ্ধতি ক্রমে জটিল হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে শিক্ষাও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার শুরু থেকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বৃহৎ অংশজুড়ে ছিল বর্তমান চারু ও কারুকলার বিষয়সমূহ। শিল্পশিক্ষার সূচনা থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন কাল থেকে ভারতে শিল্পশিক্ষা কৌলিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে গুরু অথবা বয়োজ্যেষ্ঠদের মাধ্যমে চলে এসেছে। বৌদ্ধ যুগে গড়ে ওঠা বিহার ও মহাবিহারগুলোতে ধর্মীয় ও অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে শিল্পচর্চারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অবসানের পর পরবর্তী শাসকদের দ্বারা বিহার ও মহাবিহারগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শক্তিশালী ধারাটি ভেঙে পড়ে। এরপর আঠারো শতক পর্যন্ত ভারতে শিল্পশিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল কিনা—সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাদ্রাজ, কলকাতা, মুম্বাই, জয়পুর ও লাহোরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে মূলত কারিগরি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় একাডেমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা প্রদান করা হতো—যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবধর্মী শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এখানে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পের প্রভাব ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যশিল্পের শিক্ষাও গুরুত্ব পায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রতি সর্বসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৪ সালে শিল্পী শশিভূষণের উদ্যোগে খুলনার দৌলতপুরে গ্রামীণ পরিবেশে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস এবং ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বোলপুরে শান্তিনিকেতন কলাভবন গড়ে ওঠে। বাংলায় সব থেকে প্রাচীন ও বৃহৎ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত কয়েকজন শিক্ষক দেশবিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ঢাকায় একটি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠা করেন।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে এবং একটি সৃজনশীল শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটে। যুগোপযোগী সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার শিল্পশিক্ষা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ১৯৬৩ সালে ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাদানকল্প (Constituent) সরকারি আর্ট কলেজে পরিণত হয়। এ সময় থেকে শিল্পের ব্যাবহারিক শিক্ষার সঙ্গে তত্ত্বীয় শিক্ষাও যুক্ত হয়। প্রচলিত ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্টের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে মৃৎশিল্প (১৯৬০–৬২ পর্যন্ত প্রকল্প ছিল), ভাস্কর্য, গ্রাফিক আর্ট (প্রিন্টমেকিং) ও কারুশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এখানে স্নাতকোত্তর এমএফএ কোর্স চালু হয়। ১৯৮৩ সালে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি চারুকলা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হওয়ার পর এখানে চারুকলায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। ২০০৮ সালে ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে উন্নীত হয়। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীরা আধুনিক সৃজনশীল শিল্পচর্চার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় আধুনিক শিল্পের সূচনা ও বিকাশ ঘটে। প্রথম পর্যায়ে এখানে দেশীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের সমন্বয়ে দেশীয় আধুনিক শিল্প ধারার সূচনা হয়।

পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষাটের দশক জুড়ে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের প্রভাবে দেশ-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পীদের বিমূর্ত ও আধা-বিমূর্ত শিল্পের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক আধুনিক শিল্পের যুগান্তকারী উত্থান ঘটেছিল। এ সকল আধুনিক শিল্পের প্রভাব শিক্ষার্থীদেরও প্রভাবিত করেছিল। আর্ট ইনস্টিটিউট চারুশিল্প সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ চারুকলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সব সময় প্রভাবিত করেছে। তাঁরা ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতাসংগ্রামের সপক্ষে জনমত সৃষ্টিকারী ছবি এঁকেছেন, প্রদর্শনী করেছেন এবং মিছিল-মিটিং ও রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আধুনিক শিল্পশিক্ষার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্যের ধারণ এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য লোকশিল্পের প্রদর্শনী, মেলা, পহেলা বৈশাখে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ইত্যাদির আয়োজন করেছেন। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা বিভাগীয় শহরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৭০ সালে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খুলে সেখানে প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি খোলা হয়। এখানে শিল্পশিক্ষাকে গবেষণাধর্মী শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম চারুকলা বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হয়। দেশ স্বাধীনের পর এখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশ-বিদেশে শিল্পীদের সাফল্য, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দেশে শিল্পশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে আর্ট কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৭৩ সালে সবিহ্-উল আলমকে অধ্যক্ষ করে চট্টগ্রাম শহরে চারুকলা কলেজ, ১৯৭৮ সালে শিল্পী বনিজুল হকের উদ্যোগে ও স্থানীয় শিল্পানুরাগীদের সহযোগিতায় রাজশাহীতে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। রায়বাহাদুর শিল্পী শশিভূষণ পালের স্মৃতিকে ধারণ করে ১৯৮৩ সালে খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'শশিভূষণ আর্ট কলেজ'—যার পরিবর্তিত নাম হয় খুলনা আর্ট কলেজ। এই আর্ট কলেজগুলো পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে (২০১০); রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে (১৯৯৪), অতঃপর চারুকলা অনুষদে (২০১৫); খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট (২০০৯), অতঃপর চারুকলা স্কুলে (২০১৮) উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (UODA, 2002) ও শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে চারুকলা বিভাগ (২০০৩) খোলা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে আরো কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (২০০৯), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (২০১২), ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (২০১৩) এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (২০১৯)। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান।

নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরে বেশ কয়েকটি আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। যেমন : নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ (১৯৯৪), বগুড়া আর্ট কলেজ (১৯৯৮), রাজশাহী আর্ট কলেজ-২ (১৯৯৮), যশোর এস.এম সুলতান ফাইন আর্ট কলেজ (২০০২), ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা ইনস্টিটিউট (২০০৪), ঢাকা আর্ট কলেজ (২০০৬) এবং নড়াইল এস.এম সুলতান বেঙ্গল চারুকলা মহাবিদ্যালয় (২০০৯)। এ সকল আর্ট কলেজের মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার সুযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

১৯৪৮ সালের ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক শিল্পশিক্ষার যে ধারাটি সূচিত হয়েছিল কালের প্রবাহে তা আরো বিকশিত হয়ে সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এদেশের শিল্পকলা একটি স্বতন্ত্র চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। চারুকলা বিষয়টি আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পেছনে এই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সিলেবাসভুক্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সহ-শিক্ষণ কার্যক্রম, যেমন : প্রদর্শনী, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি এদেশের শিল্পশিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাস প্রায় চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ। কিন্তু এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ওপর কোনো গবেষণা হয়নি। এদেশের সমকালীন চারুশিল্প, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে এবং প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। একক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে একাধিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমার জানামতে সারা বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা এখনো করা হয়নি। বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যও যথাযথভাবে কোথাও সংরক্ষিত হয়নি। সে কারণে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ওপর গবেষণামূলক একটি তথ্যবহুল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার একটি তথ্যবহুল ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ইতিহাস, কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে; শিল্পশিক্ষা বিস্তারে শিক্ষকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে আধুনিক শিল্পচর্চা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে তা-ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সকল প্রদর্শনী, প্রকাশনা, কর্মশালা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিল্পশিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে এই অভিসন্দর্ভে সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করা হয়েছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট; প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চারুকলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা, সর্বোপরি সুস্থ ও রুচিশীল সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবদান।

গবেষণার পরিধি : ১৯৪৮–১৯৮৭ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট, সরকারি-বেসরকারি আর্ট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ/ইনস্টিটিউট/অনুষদ নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য

ঔপনিবেশিক আমলে যুক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন : গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ক্যালকাটা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এবং খুলনার মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেশবিভাগের পর থেকে প্রথম চল্লিশ বছরের মধ্যে (১৯৪৮–১৯৮৭) বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষার মৌলিক ঘটনা ও পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৪৮), ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজে পরিণত হয় (১৯৬৩), অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি চারুকলা ইনস্টিটিউটে পরিণত হওয়ার (১৯৮৩) মধ্য দিয়ে সমকালীন আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। এই সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খুলে (১৯৭০) সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি ও বিএফএ সম্মান ডিগ্রি খোলার মাধ্যমে চারুকলা বিষয়ে প্রথমে উচ্চশিক্ষার সূচনা করা হয়। সত্তর ও আশির দশকের মধ্যে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় আরো তিনটি আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে; সেগুলো পরবর্তীকালে নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট বা বিভাগ হিসেবে যুক্ত হয়। এভাবে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে বিশ্বের সমকালীন শিল্পশিক্ষার সমকক্ষতা অর্জন করে। বিভাগীয় তিনটি শহরে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুযোগ পৌঁছে যায়। এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আর্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা বিভাগ বা ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের (যাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত) মাধ্যমে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের প্রভাবে বিমূর্ত ও আধা-বিমূর্ত শিল্পের যুগান্তকারী উত্থান ঘটেছিল। সত্তর ও আশির দশক জুড়ে দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক তরুণ শিল্পীর মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে আধুনিক শিল্প নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী শিল্পীর উত্থান ঘটে। আশির দশক থেকে ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী হতে থাকে। এই প্রদর্শনীতে আসা বিদেশি শিল্পীদের (বিশেষ করে জাপানি শিল্পীদের) কনসেপচুয়াল আর্ট, ইনস্টলেশন আর্টসহ উত্তর-আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কে তরুণ শিল্পীরা সরাসরি ধারণা লাভ করেন। এ ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকর্মে উত্তর আধুনিক শিল্পের প্রবণতা ফুটে ওঠে। নব্বয়ের দশক থেকে উত্তর-আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন চর্চা চারুকলার শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৪৮–১৯৮৭ সালের মধ্যে এদেশের শিল্পশিক্ষা ও শিল্পচর্চা বাস্তবানুগ একাডেমিক চর্চার মাধ্যমে শুরু হয়ে দ্রুত আধুনিক ধারায় প্রবেশ করেছিল এবং আধুনিক শিল্পশিক্ষা ও শিল্পচর্চা একটি

শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টির পর আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে উত্তর-আধুনিকতার দিকে ঝুঁকেছিল। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে গবেষণার সময়কাল ১৯৪৮–১৯৮৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শিল্পশিক্ষার ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতা এবং পরবর্তী গন্তব্য বোঝাতে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্যভিত্তিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এদেশের শিল্পশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত না হওয়ায় প্রাথমিক উৎস থেকে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে আছে সরকারি নথিপত্র, ব্যক্তিগত চিঠি, পাণ্ডুলিপি, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, অ্যালবাম, বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। বিগত কয়েক বছর করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম বলবৎ থাকার কারণে বেশ কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরিবর্তে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ও মুঠোফোনালাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে গ্রন্থ, সাময়িকী, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

গবেষণাকালে লক্ষ করা গেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিহাস যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। প্রথম পর্যায়ে যে সকল লেখকের (যাঁদের অধিকাংশই শিল্পী ছিলেন) লেখা থেকে এদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তা রচিত হয়েছে মূলত স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। তাঁদের লেখার সূত্র ধরে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা সম্প্রসারিত হয়েছে। এই গবেষণায় পূর্ববর্তী লেখক ও গবেষকদের তথ্যগুলো দাপ্তরিক নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে সতর্কতার সঙ্গে অভিসন্দর্ভে সংযোজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (রেকর্ড শাখা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চারুকলা অনুষদের গ্রন্থাগার, অনুষদ অফিস, বিভাগ ও গ্রন্থাগার; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ও গ্রন্থাগার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাসের কপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ডিনস্ কমিটির সভার কার্যবিবরণী, অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, ইনস্টিটিউটের বি জি (বোর্ড অব গভর্নরস) সভার ও কলেজের গভর্নিং বডির সভায় কার্যবিবরণী, সিলেবাস কমিটিসমূহের সুপারিশ, আর্ট কলেজ ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা এবং এ

সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, শিক্ষা বিভাগের চিঠিপত্র, শিক্ষকদের নিয়োগপত্র ইত্যাদি দাপ্তরিক নিদর্শন থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে MLA (Modern Language Association) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জগমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা' গ্রন্থটি অনুসরণ করা হয়েছে। পাদটীকায় তথ্য নির্দেশ করা হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ভিত্তিক ক্রমিকে পাদটীকা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয় সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র পাঠ মধ্যবর্তী স্থানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠ ও দেখার মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যায়।

সাহিত্য সমীক্ষা : ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় গড়ে ওঠা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টের আদলে। এ কারণে সাহিত্য সমীক্ষার প্রথমে ব্রিটিশ আমলে ভারতে তথা বাংলায় গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও সাময়িকীর উল্লেখ করা হলো।

কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে উল্লিখিত কলেজ থেকে Centenary শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যোগেশ চন্দ্র বাগল আর্ট কলেজের শতবর্ষের ইতিহাস লেখেন History of the Govt. College of Art & Craft শিরোনামে। এই লেখায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ভূমিকা ইত্যাদি তথ্যভিত্তিকভাবে বর্ণনা ও আলোচনা করা হয়েছে। এটি কলকাতা আর্ট স্কুল তথা আর্ট কলেজের ইতিহাসের একটি গবেষণা গ্রন্থ।

১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশ থেকে প্রকাশিত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত *চিত্রকথা* গ্রন্থে সংযোজিত '*আধুনিক শিল্পশিক্ষা*' অংশে (যা পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়) তিনি ভারতের শিল্পশিক্ষার ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন—১. ইংরেজ প্রবর্তিত আর্ট স্কুল, ২. ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং ৩. আধুনিক শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, শান্তিনিকেতন কলাভবন, বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের অবদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পশিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের উল্লিখিত অংশে।

১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত অশোক ভট্টাচার্য রচিত *বাংলার চিত্রকলা* গ্রন্থে ১০৭–২০৮ পৃষ্ঠার মধ্যে কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট এবং শান্তিনিকেতন কলাভবনকে কেন্দ্র করে বাংলার চিত্রকলা কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল তা বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লকের মাধ্যমে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য চিত্ররীতির বিস্তার, ই ভি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে নব্যবঙ্গীয় চিত্রের উত্থান, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের মাধ্যমে ভারতব্যাপী নব্যবঙ্গীয় চিত্রের প্রসার, পার্শি ব্রাউন ও যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে আর্ট স্কুলে আবার পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে; সৃজন শিল্পী ও অসাধারণ শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে নন্দলালের ভূমিকা এবং আধুনিক চিত্রকলা বিকাশে কলাভবনের অবদান সম্পর্কে।

১৯৯৪ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশিত পার্থ মিত্রের *Art and Nationalism in Colonial India : 1850–1922* গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (The Age of Optimism) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে দক্ষিণ লন্ডনের কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইনের শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস এবং এখান থেকে ভারতে আসা অধ্যক্ষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

> The uniform art Policy in India was not only based on South Kensington Precepts, that institution was also the recruting ground for teachers. The best-known among them, Henry Hover Locke, John Lockwood Kipling, John Griffiths and the most celebrated of them all, Ernest Binfield Havell, were trained there. A close network is further suggested in that locke, Kipling and Griffiths were at the school together, and the last two remained lifelong friends. Even Joseph Crowe, a relative outsider, was made to take a course at the School of Design before joining.[১]

কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা প্রথম পর্যায়ে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলগুলোতে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে ওই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাও এখানে এসেছিল। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে লন্ডনের শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে, যা ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল।

[১] Mitter Partha, *Art and Nationalism in Colonial, India, 1850–1922*, New York, Cambridge University press 1994, P. 34

১৯৯৮ সালে ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত শোভন সোমের *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায় 'কারখানা থেকে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান উদ্ভবের বৃত্তান্ত'-এ ইউরোপে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'উপমহাদেশে শিল্পবিদ্যালয় সূচনা ও বিকাশ (১৮৩৯–১৯৪৭)'-এ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বে, জয়পুর ও লাহোরে) প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতন কলাভবন, মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসসহ আরো কয়েকটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা ও শিল্পচর্চার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উল্লিখিত গবেষণার প্রথম অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের শিল্প সমালোচক জালাল উদ্দীন আহমেদ রচিত *Art in Pakistan* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৬১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে (Contemporary Art Education and Patronage) পাকিস্তানের উভয় অংশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়।

> In 1948, almost immediately after the establishment of Pakistan, an Art Institute was started at Dacca in the eastern wing of Pakistan, with teacher-painter Zainul Abedin as the Principal. The Institute has since grown to be the finest School of fine arts in the country, offering five-year diploma courses in Painting, Sculpture and Graphic Arts Recently it has also introduced Courses in Applied Arts, Ceramics and Design.[২]

এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় লেখক তৎকালীন ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রচলিত বিভাগগুলো এবং এখান থেকে প্রদত্ত ডিগ্রি সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত *Contemporary Arts in Pakistan* ম্যাগাজিনের ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় (ভ্যলুম ১১, নং ২) এম জে জাহেদী 'Dacca Art Institute' শিরোনামে ছয় পৃষ্ঠার (পৃষ্ঠা ২–৭) একটি সচিত্র প্রতিবেদন লেখেন। ওই প্রতিবেদনে আর্ট ইনস্টিটিউটের- প্রতিষ্ঠাকাল থেকে

---

[২] Ahmed Jalal Uddin , *Art in Pakistan* (2n Ed.) Karachi, Pakistan Publications, 1962 [F.E, 1954] P. 30

উন্নয়নের ধারাবাহিক বর্ণনা, তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, বিভাগভিত্তিক আলোচনা, শিক্ষকদের তালিকাসহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরেছেন। এখানে আর্ট ইনস্টিটিউটকে পাকিস্তানের সবচাইতে সুন্দর আর্ট স্কুল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ইনস্টিটিউটের কোর্স কারিকুলাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়—

> The students are offered a five-year course of studies: A basic elementry course during the first two years, after the completing of which an advanced course of three years can be taken in any one of the following subjects : (i) Fine arts, (ii) Commercial art including industrial art, and (iii) Oriental art. Now a separate section for Ceramics has been opened. But students in the advanced Classes also have to undergo a traning in Ceramics and Graphics.[৩]

আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।

আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে পরিণত হওয়ার পর কলেজের উদ্যোগে ১৯৬৫ সালে Prospectus প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকায় কলেজের তৎকালীন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস, শিক্ষার্থী ভর্তি, বৃত্তি, বিধিমালা, পাঠাগার, চিড়িয়াখানা, শিক্ষাভ্রমণ, প্রদর্শনী, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কলেজ হওয়ার পর প্রবর্তিত দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি ও তিন বছরের বিএফএসহ মোট পাঁচ বছরের কোর্সের বিষয়ে উল্লেখ করা হয় এবং নতুন আঙ্গিকে অনুমোদিত ছয়টি বিভাগের (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ভাস্কর্য, কমার্শিয়াল আর্ট, প্রাচ্যকলা, গ্রাফিক আর্ট এবং মৃৎ ও কারুশিল্প বিভাগ) উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছর পূর্তি হয় ১৯৭৩ সালে। কিন্তু এ উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয় ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এতে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তৎকালীন সময়ের সচিত্র ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই লেখা থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ক্লাস শুরুর তারিখ (১৫ নভেম্বর ১৯৪৮) এবং প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী সংখ্যা (১৮ জন) সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া তৎকালীন সাতটি বিভাগের বিবরণ, প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তি, ১৯৫৮ সালে ছোট চিড়িয়াখানা স্থাপন ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে এই লেখায়। এ ছাড়া 'অধ্যক্ষের কথা' শীর্ষক লেখায় কলেজের ইতিহাসসহ তৎকালীন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এই লেখায় চারুকলায় ভর্তি ইচ্ছুক ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৩] Zahedi M.J. "Dacca Art Institute", *Contemporary Arts in Pakistan*, Karachi, summer, 1961 : vol. 11, No-2, P. 4–5

আর্ট কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নজরুল ইসলাম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যা সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ১৯৭৪ সালের ১৫ মার্চ 'জয়নুল আবেদিন শিল্পভাবনা : একটি সাক্ষাৎকার' শিরোনামে ছাপা হয়। সাক্ষাৎকারটি পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী* গ্রন্থে সংযোজিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, আধুনিক শিল্পকলা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ছবি আঁকার সাফল্যের চেয়ে আমি তৃপ্তি পাই আরো অনেকে ছবি আঁকতে পারবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার প্রচেষ্টায়।'[৪]

আব্দুল মতিন সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *চারুকলা* সাময়িকী। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকায় শিল্পশিক্ষার বিশেষ সংখ্যা হিসেবে। এখানে আব্দুর রাজ্জাকের স্মৃতিচারণামূলক লেখা 'চারুকলা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছেচল্লিশ বছরের সংশ্লিষ্টির স্মৃতি' (পৃষ্ঠা ৩৫–৩৯)তে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিল্পশিক্ষাক্রম, শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভাস্কর্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় (পৃষ্ঠা : ১৫–৩৪) আব্দুল মতিন সরকারের লেখা 'ঢাকায় শিল্পচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস এবং এই ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে ঢাকার শিল্পচর্চার বিকাশ কীভাবে ঘটেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মতলুব আলীর সম্পাদনায় ১৯৯৮ সালে মানব প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত হয় *রূপবন্ধ*। গ্রন্থটিতে শফিকুল আমীন, সফিউদ্দীন আহমেদ, এ কে এম আবদুর রউফ, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইদ্রিস, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারুল হক, মতলুব আলী, রেজাউল করিম, আবুল মনসুর, আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ আজিজুল হক, জাহান আরা রউফ, কাজী মোজাম্মেল হোসেন, আয়েশা সিদ্দিকা প্রমুখ লেখকের প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণামূলক লেখা সংকলিত হয়। এ সকল লেখকের লেখায় চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছরের (১৯৪৮–১৯৯৮) অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উঠে এসেছে।

চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের ওপর লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক ইংরেজি সাময়িকী *Art*-এর প্রথম (অক্টোবর–ডিসেম্বর ১৯৯৮) এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি–মার্চ ১৯৯১) চারুকলা ইনস্টিটিউটের ওপর ধারাবাহিক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বিভাগগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (সিলেবাসসহ) তথ্যভিত্তিকভাবে তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া ইনস্টিটিউটের

---

[৪] নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা , বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১১৪

প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী শিল্পী আমিনুল ইসলামের সাক্ষৎকার এবং ইনস্টিটিউট ভবনের ডিজাইনার স্বনামধন্য স্থপতি মাযহারুল ইসলামের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়।

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ ও সাময়িকীতে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস রচিত হয়েছে মূলত শিল্পীদের স্মৃতিচরণামূলক লেখা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। এ কারণে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক ও বিভাগ সম্পর্কে পূণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। এই গবেষণায় পূর্ববর্তী গবেষক ও লেখকদের লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য দাপ্তরিক নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে অভিসন্দর্ভ রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত আরো কিছু গ্রন্থে চারুকলা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রকাশিত (২০০৩) আমিনুল ইসলামের লেখা *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* এবং প্রথমা প্রকাশন প্রকাশিত (২০১০) কামরুল হাসানের লেখা ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*—গ্রন্থ দুটিতে চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাসের উল্লেখ রয়েছে। লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত *চারু ও কারুকলা* (এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭) গ্রন্থে বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পের বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সৈয়দ আজিজুল হক রচিত গ্রন্থ *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবন সমগ্র* (প্রথমা, ২০১৫), *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম* (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবন কথা* (বেঙ্গল, ২০১৬), মুর্তজা বশীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *আমার জীবন ও অন্যান্য* (বেঙ্গল, ২০১৪), আবুল মনসুর রচিত গ্রন্থ *জয়নুল আবেদিন* (বেঙ্গল, ২০১৩) ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত *অনন্য আমিনুল ইসলাম* (বেঙ্গল, ২০১২) গ্রন্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা ক্ষেত্রে এ সকল শিল্পীর সম্পর্ক ও ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিল্পকলা একাডেমি ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের জীবনীগ্রন্থ ও ক্যাটালগে এ দেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ও চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ তথা চারুকলা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় গ্রন্থ, স্মরণিকা, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে। হাসি চক্রবর্তী রচিত গ্রন্থ *রেখায় ও লেখায়* (মুক্তধারা, ২০১৩), স্মারকগ্রন্থ *সৃজন স্বজন সম্মিলন*

(চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন ২০০৩), মাসিক *কালি ও কলম* পত্রিকায় প্রকাশিত (পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৮) 'চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা', চট্টগ্রাম চারুকলার চল্লিশ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা (২০১২) ইত্যাদি থেকে।

রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ও পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে আবুল আসিফ মার্শাল সম্পাদিত *প্রতিভাস* (শিল্পী বনিজুল হক স্মারক সংখ্যা, ২০১৮), অ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী আর্ট কলেজ এক্স স্টুডেন্টস প্রকাশিত (২০০১) *রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়* শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদ প্রকাশিত (২০১৯) স্মারকগ্রন্থ *চারুকলার চল্লিশ বছর*, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ ইত্যাদি থেকে।

খুলনার মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্টস সম্পর্কে তথ্যের উল্লেখ রয়েছে খগেন্দ্রনাথ বসু রচিত গ্রন্থ *মহেশ্বরপাশা পরিচয়* (সারদা মন্ডল, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), কমল সরকারের *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী* (যোগমায়া, ১৯৮৪) গ্রন্থে, *মাসিক মোহম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩৬) ডা. মোহাম্মদ আবুল কাসেমের লেখা 'খুলনা জেলার শিক্ষার অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস এবং খুলনা আর্ট কলেজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে টোকন ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *শূন্য পাতার সাজাই তরণী* শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ (বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, ২০০৫), মোহাম্মদ শেখ সাদী ভূঞা সম্পাদিত *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ* (ফাইন আর্ট স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১) এবং খুলনা আর্ট কলেজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা (১৯৮৩) থেকে। এ সকল প্রকাশনা এই গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। পূর্ববর্তী প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত যথাসম্ভব যাচাই-বাছাই করে অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস : অভিসন্দর্ভটি পরিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় : প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ এবং দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার শিল্পশিক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ, তৃতীয় অধ্যায় : প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় : আর্ট কলেজ, চতুর্থ অধ্যায় : প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার তৃতীয় পর্যায় : বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষা এবং পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে *প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ* সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা কী—তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আদিম যুগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত) বিশ্বশিল্পশিক্ষার গতি-প্রগতি

সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপীয় একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। এ কারণে ইউরোপের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাস এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তুলে ধরে তার ধারাবাহিকতায় কীভাবে ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে *দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা* প্রসঙ্গে। অবিভক্ত বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতাসহ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরে ব্রিটিশদের উদ্যোগে আর্ট স্কুল গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। আর্ট স্কুল গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিভিন্ন উন্নয়নকাজের জন্য নির্মাণ সহায়ক কারিগর তৈরি করা। উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন এ সকল আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার বীজ বপন করা হয়।

এই পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ আমলে বাংলায় গড়ে ওঠা আর্ট স্কুলগুলোর মধ্যে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন এবং খুলনার মহেরশ্বপাশা স্কুল অব আর্টস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট বাংলার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। অধ্যক্ষ হেনরি হোভার লকের (যোগদান : ১৯৬৪) উদ্যোগে এখানে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষাক্রম চালু হয় এবং অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের যোগদান (১৮৯৬) পূর্ব পর্যন্ত এখানে শুধু পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার শিক্ষা দেওয়া হতো। হ্যাভেল ও উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (যোগদান : ১৯০৫) উদ্যোগে বিশ শতকের প্রথম পর্যায় থেকে এখানে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পশিক্ষা গুরুত্ব পায়। অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দের সময়ে (১৯২৮–১৯৪৩) আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় শিল্পশিক্ষা উন্নতি লাভ করে। চল্লিশের দশকে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যশিল্পের শিক্ষার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে স্কুলটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এখানকার কয়েকজন তরুণ শিক্ষক দেশবিভাগের সময় পূর্ব বাংলায় এসে ঢাকায় একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করেন এবং দেশবিভাগের পরে তা বাস্তবায়ন করেন। কলকাতা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, শিল্পাদর্শ, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় এবং স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ভূমিকা এই পরিচ্ছেদে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে বিশ্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৯)। তাঁর এবং অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর প্রচেষ্টায় কলাভবন আধুনিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত

হয়, যা সমগ্র ভারতের আধুনিক শিল্পচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। এ কারণে এই পরিচ্ছেদে শান্তিনিকেতন কলাভবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

শিল্পী শশিভূষণ পালের ব্যক্তি উদ্যোগে খুলনার দৌলতপুরে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে। স্কুলটি বর্তমান বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে গড়ে ওঠা প্রথম আর্ট স্কুল। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে স্কুলটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই পরিচ্ছেদে স্কুলটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় *পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ*। এই অধ্যায়টি অভিসন্দর্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, চারুশিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুসলমান সমাজে শিল্পকে সহনীয় করার ক্ষেত্রে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা; পূর্ব বাংলার শিল্পীদের অবস্থা, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে মুসলমান শিল্পীদের কৃতিত্ব; দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের একদল শিল্পীর পূর্ব বাংলার ঢাকায় গিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তুতি পর্ব*। এই পরিচ্ছেদে দেশবিভাগের পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে মুসলমান শিল্পীদের ঢাকা আগমন, আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন, পূর্ব বাংলার ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার মাধ্যমে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তা অনুমোদন লাভ ইত্যাদি বিষয় তথ্যভিত্তিক উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দুর্লভ তথ্যের সমন্বয়ে পরিচ্ছেদটি রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে *গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকার* শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কোর্স-কারিকুলাম, সিলেবাস, বিভাগ এবং সরকারি ইনস্টিটিউট পর্যায়ের পনেরো বছরের (১৯৪৮–১৯৬৩) শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আর্ট ইনস্টিটিউটকে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন এবং তাঁর সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাফল্য, তাঁদের অংশগ্রহণে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী, কর্মশালা, শিক্ষামূলক ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সকল আয়োজনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চাশ ও

ষাটের দশকে ঢাকায় গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পান্দোলনে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এবং শিক্ষার্থীদের ওপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ওই সময়ের মধ্যে সংঘটিত ভাষা ও বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এবং শিল্পীদের মননে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় অধ্যায় হলো প্রাতিষ্ঠানিক *শিল্পশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় : আর্ট কলেজ*। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি উপাদানকল্প (Constituent) কলেজে উন্নীত হওয়ার ইতিহাস, এই পর্যায়ে নতুন আঙ্গিকে অনুমোদিত বিভাগসমূহ (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, বাণিজ্যিক শিল্প, প্রাচ্যকলা, ভাস্কর্য, প্রিন্টমেকিং এবং মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প), পরিবর্তিত কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ করার জন্য নতুন করে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠন করা হয় এবং সেখানে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনকে ডিন নিযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স ছিল, যা পরিবর্তন করে দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি (প্রিলিমিনারি ডিগ্রি) এবং তিন বছরের বিএফএ ডিগ্রি (ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অগ্রগতি হলো, অঙ্কন ও নির্মাণ শিক্ষার সঙ্গে তত্ত্বীয় বিষয়ও পাঠ্য করা। এ সকল বিষয় এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আর্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথা শিল্পীদের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হলো *বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়*। দেশ স্বাধীনের পর ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের পরিবর্তিত নাম হয় বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। দেশ স্বাধীনের পর আর্ট কলেজের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নতি হয়। এখানে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার পর নতুন করে বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রির সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। এ সকল বিষয় যথাযথ তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর বিশ্বের কিছু দেশ এখানকার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির সুযোগ দেয়। দেশ-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক তরুণ শিক্ষক-শিল্পীর উত্থান ঘটে এ সময়। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী শিল্পীও ছিলেন। এ সকল শিক্ষকের শিক্ষকতা এবং আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ভূমিকা এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ হলো *অন্যান্য আর্ট কলেজ;* দেশ স্বাধীনের পর সত্তর ও আশির দশকের মধ্যে গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ, রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং খুলনা আর্ট কলেজ সম্পর্কে এই

পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজগুলো প্রথমে নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিযোজিত অথবা অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, ইনস্টিটিউট বা অনুষদে রূপান্তরিত হয়েছে। আর্ট কলেজগুলোর সিলেবাসের বিষয় ও মানবণ্টনে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। এ সকল আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস আলোচনা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় হলো *প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার তৃতীয় পর্যায় : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চারুকলা শিক্ষা*। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে *চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়* প্রসঙ্গ। ১৯৭০ সালে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খুলে সেখানে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম চারুকলায় মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা হয়। চারুকলা বিষয়ে প্রথম বিএফএ সম্মান কোর্সও চালু করা হয়। শিল্পশিক্ষাকে গবেষণাধর্মী শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি উত্তীর্ণ একদল শিল্পী সত্তর ও আশির দশকে আধুনিক শিল্পচর্চার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে রশিদ চৌধুরী ও স্থানীয় অন্য শিক্ষকদের অবদান, চারুকলা বিষয়ে প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের গুরুত্ব; স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পে এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবদান এবং চট্টগ্রামকেন্দ্রিক একটি আধুনিক চারুকলা কেন্দ্র গড়ার ক্ষেত্রে শিল্পীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানকার মাস্টার্স ডিগ্রির কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাসের আলোচনা এবং এর উৎস অনুসন্ধানের জন্য উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হলো *চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। ১৯৮৩ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে পরিণত করা হয়। এরপর এখানে চারুকলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ এবং প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুযোগসহ সার্বিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এ সকল বিষয় এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে থেকে এখানে বিএফএ সম্মান কোর্স চালু হয় এবং কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাসে ব্যাপক সংস্কার করা হয়। এই সংস্কার গবেষণার নির্ধারিত সময়সীমার কয়েক বছর পরে ঘটেছিল; কিন্তু এখানকার শিক্ষার পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে অবগত করার জন্য বিষয়টি এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার পর অঙ্কন ও নির্মাণ

বিষয়ের পাশাপাশি তত্ত্বীয় শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীদের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এ সময় চারুকলার শিক্ষক ও শিল্প সমালোচকদের দ্বারা শিল্পকলার ইতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের জীবনী ও নন্দনতত্ত্বসহ চারুকলা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়। তত্ত্বীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিল্প সমালোচকদের এই ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া চারুকলা থেকে প্রকাশিত প্রকাশনা, আয়োজিত প্রদর্শনী, সেমিনার এবং দেশীয় ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পর্কেও এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল এবং ভারতীয় শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশবিভাগের পর ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষা ও চর্চার সূত্রপাত হয়। এরপর সত্তরের দশকের শুরুতে দ্বিতীয় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা বিভাগ গড়ে ওঠে। এ দেশে আধুনিক শিল্পচর্চার উন্মেষ ও বিকাশে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকার প্রথম প্রজন্মের শিক্ষক-শিল্পীদের মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক বাঙালি রীতি; পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষাটের দশকজুড়ে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের প্রভাবে দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের বিমূর্ত ও আধা-বিমূর্ত শিল্পের যুগান্তকারী উত্থান; স্বাধীনতা-উত্তর কালে বিচিত্র মাধ্যম ও শৈলীতে আধুনিক শিল্পের প্রসার এবং তরুণ শিল্পীদের উত্তর-আধুনিক শিল্পপ্রবণতার দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখানকার শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকগণ কীভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন তা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহারে গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ এবং দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার শিল্পশিক্ষা

শিল্পকলার সূচনা থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চা বিকশিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে চিত্রশালা, চিত্রঘর, শিল্পগোষ্ঠী ইত্যাদির নাম জানা যায়। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠান বা সংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। বৌদ্ধবিহারে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন। ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে শিল্পচর্চা কৌলিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে; এখানে শিল্পশিক্ষা পারিবারিক পরিমণ্ডলে গুরু বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ইউরোপে রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী সময়ে শিল্পকলা ছিল কারখানাকেন্দ্রিক। হাই রেনেসাঁসের সময়ে প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ফ্লোরেন্সে। এরপর ইউরোপজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা বিকাশ লাভ করতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ ধরে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয় মূলত কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য। ব্রিটিশদের উদ্যোগ এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারতের মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বে, জয়পুর, লাহোর প্রভৃতি শহরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অবিভক্ত বাংলার মধ্যে কলকাতায় প্রথম মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছর পর সেটি বন্ধ হয়ে গেলে দ্য ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, (১৮৫৪) গড়ে ওঠে। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের পর স্কুলটির নামকরণ হয় গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ক্যালকাটা। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরো কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্ট (১৮৯৩), দ্য জুবিলি আর্ট একাডেমি (১৮৯৭), মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস (১৯০৪) এবং শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন (১৯১৯)।

এই অধ্যায় দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ এবং দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার শিল্পশিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ 'প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ'-এ বিশ্বের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা'তে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে অবিভক্ত বাংলায় গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ছিল ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের সূতিকাগার। এ কারণে কলকাতার আর্ট স্কুলের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস এ দেশের শিল্পকলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া আধুনিক শিল্পকলা বিকাশে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কলাভবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ও বিশ্বভারতী কলাভবন সম্পর্কে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ

সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে যে সুন্দর ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেটিকে আমরা সাধারণ আর্ট বা শিল্প বলে অভিহিত করি।[১] আর সঠিক নির্দেশনা ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যকার সুপ্ত শিল্প প্রতিভাকে বিকশিত করা হলো শিল্পশিক্ষা। শিক্ষা মানবজীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক্ হচ্ছে জৈবিক দিক্ এবং সামাজিক বা সংস্কৃতিক দিক্।[২] সাংস্কৃতিক দিকের কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ স্বতন্ত্র। আর সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা।[৩] আদিম সমাজে শিক্ষা ছিল জ্ঞান আহরণের একটি কৌশল মাত্র। সে সময়ের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক। সেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ইত্যাদির কৌশল আয়ত্ত করা। এই পর্যায়ে চিত্রকলা শিক্ষার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল। মানবসমাজে অত্যধিক অভিজ্ঞতার সংযোজনের ফলে ক্রমেই জীবনযাত্রার পদ্ধতি জটিল হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে শিক্ষাও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তিকে এমন কতগুলো কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা, যার দ্বারা সে তার জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষাব্যবস্থার শুরুতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বৃহৎ অংশ জুড়ে শিক্ষণীয় ছিল বর্তমান চারু ও কারুকলার বিভিন্ন বিষয়। শিল্পচর্চার সূচনা থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চা বিকশিত হয়েছে। মিশর, মেসোপটেমীয়, গ্রিক, রোমানসহ প্রাচীন সভ্যতাসমূহের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শন থেকে ধারণা করা যায় সেখানে উন্নতমানের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলাসহ ব্যবহারিক শিক্ষার আভাস পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মুঘল আমলেও শিল্পচর্চা বিকাশ লাভ করে। রেনেসাঁস-পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপে শিল্পচর্চা ছিল কারখানাকেন্দ্রিক। মূলত রেনেসাঁসের সময় থেকে শিল্পকলাকে একটি মুক্তবিদ্যা হিসেবে চিন্তা করে শিল্পশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ফ্রান্সে

---

[১] সালাহউদ্দিন আহমেদ, *শিক্ষণে চারু ও কারুকলা*, আলপনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১

[২] সুশীল রায়, *শিক্ষা প্রসঙ্গে : শিক্ষাতত্ত্ব, কলকাতা,* সোমা বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

প্রথম শিল্পশিক্ষার জন্য একাডেমি খোলা হয়। এরপর সময়ের বিবর্তনে প্রয়োজনের তাগিদে মাধ্যম ও চরিত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। ফরাসি দেশ থেকে ধারণা নিয়ে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজরা স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজদের হাত ধরে অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষার মতো ভারতে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে। প্রাচীন যুগে এসেছে দ্রাবিড়, আর্য ও মধ্য এশিয়ার নানা জাতি। পরবর্তীকালে এসেছে পারসি, আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং সব শেষে এসেছে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি।[৪] এ সকল আগ্রাসী শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হয়েছে যুগের পর যুগ। শাসকদের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী অধিকাংশ সময়েই ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চার মূলধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহারিক শিল্পকলার লোকজ ধারা নিজস্ব গতিতে প্রবহমান থেকেছে। কিন্তু শিল্পকলার মূলধারার উত্থান-পতনে রাজকীয় ও ধর্মীয় প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মূল উপজীব্য ধর্মভিত্তিক বিষয় হলেও সেখান থেকে শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে গুরু সনৎকুমারের শিষ্য নারদ তাঁর অধীত বিদ্যার যে তালিকা পেশ করেছিলেন সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নৃত্য, গীত, কলা ও অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পের উল্লেখ রয়েছে।[৫] প্রাচীন ভারতে শিল্পীদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং শিল্পীদের শিল্পশিক্ষার জন্য পৃথক গ্রন্থ পাঠ করতে হতো। 'অথর্ব বেদ'-এ এ রকম বত্রিশটি শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ আছে।[৬] এ সময় মূলত পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে এবং শাস্ত্রে উল্লিখিত বিধি-বিধান মেনে শিল্পীদের মূর্তি নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি করতে হতো। এ সময় প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশ থেকে শিল্পশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ছিল। তবে সাধারণ শিল্পীদের সন্তানরা নিজ গৃহে থেকেই পৈতৃক বৃত্তিশিক্ষা লাভ করতেন।

প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনি ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় চিত্রশালা, শিল্পসংঘ এবং শিল্পগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'রামায়ণ'-এর কাহিনিতে চিত্রশালার এবং খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে রচিত 'বিনয় পিটক'-এ 'চিত্রঘর'-এর উল্লেখ রয়েছে।[৭] গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলায় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রায়

---

[৪] গৌরদাস হালদার, *শিক্ষণ প্রসঙ্গে : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯৩–৯৪, পৃ. ৬

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[৭] অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড)*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫, [প্র.প্র. ১৯৫৬] পৃ. ৬৫

৫০০ বছর পর্যন্ত যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল সেখানে চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি, হিসাবশাস্ত্র, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও জাহাজ নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, ভাস্কর্য, দারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্পসহ ব্যবহারিক বিভিন্ন শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান নালন্দা মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্রসহ শিল্পবিদ্যারও শিক্ষা দেওয়া হতো।[৯] সেন যুগে বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায়, বরেন্দ্রভূমিতে শিল্পীদের একটা শিল্পগোষ্ঠী ছিল, যার প্রধান ছিলেন শূলপাণি। তারানাথের লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে পালযুগের দুজন বিখ্যাত শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপালের নাম পাওয়া যায়।[১০]

বৌদ্ধ যুগে ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধরা শিল্পকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এ সময় কৌলিক বৃত্তিগত শিল্পীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও শিল্পচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কারণ শিল্পচর্চা তাঁদের কাছে ছিল নিষ্কাম ধর্মসেবা।[১১] এসব কারণে ধারণা করা হয়, বৌদ্ধ যুগে গড়ে ওঠা বিহার, মহাবিহারগুলো ছিল জ্ঞান ও শিল্পচর্চার কেন্দ্রস্থল।[১২] এর অনেক পরে মুঘল সম্রাট আকবর (শাসনকাল : ১৫৫৬–১৬০৫ সাল) ফতেহপুর সিক্রিতে পারস্যের শিল্পী আব্দুস সামাদ ও সৈয়দ আলীর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় শতাধিক চিত্রকর নিযুক্ত করে সুরতখানা বা চিত্রশালা তৈরি করেন।[১৩] সেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শিল্পীরা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন পেশাগত শ্রেণি, গণ বা নিগমভুক্ত। তাঁদের পেশা ও বৃত্তি সাধারণত নিম্নস্তরের বলে পরিগণিত হতো। 'প্রায়শ্চিত প্রকরণ' গ্রন্থে ভবদেব ভট্ট একটি উক্তি উদ্ধৃত করে যেসব নিম্নবর্ণ ও শ্রেণির স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং যাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই তালিকায় অন্যদের মধ্যে নট, নর্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের নাম উল্লিখিত আছে।[১৪] ভারতীয় চিত্রশালা, চিত্রঘর, বৌদ্ধবিহার, শিল্পগোষ্ঠী, সুরতখানা এসবের পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র। চিত্রশালা ও চিত্রঘরের চরিত্র কেমন

[৮] গৌরদাস হালদার, *শিক্ষণ প্রসঙ্গে : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
[১০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশার্স, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, [প্র.প্র. ১৩৫৬] পৃ. ৬৫৭
[১১] শোভন সোম, *চিত্রভাবন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৭
[১২] লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), "ভূমিকা", *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. xvi
[১৩] শোভন সোম, *চিত্রভাবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
[১৪] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৭

ছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। মহাবিহারগুলো ছিল বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়। নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ধর্ম ও জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। সেন আমলের শিল্পগোষ্ঠীর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে ধারণা করা যায়, রাজা ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপনা ও শিল্পকর্ম সম্পাদনের জন্য এ ধরনের শিল্পগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। মুঘল সুরতখানায় চিত্রশিল্পী ও হস্তলিপিকারদের প্রাধান্য ছিল। এখানে শিল্পীদের কাজ ছিল মূলত সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনীগ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনি ও বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনি অবলম্বনে বহুচিত্র-সংবলিত মুরাক্কা রচনা করা। বংশ-পরম্পরায় শিল্পচর্চায় অভ্যস্ত পরিবারের দক্ষ শিল্পীরাই এখানে কাজ করতেন। শিল্পকলা চর্চার উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে সর্বজনীন শিল্পশিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায় না। এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার সূচনা হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজদের মাধ্যমে। সুতরাং ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের যোগসূত্র রয়েছে। এ কারণে ইউরোপের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপের শিল্পচর্চা ছিল কারখানাকেন্দ্রিক। এই কারখানাগুলো পরিচালিত হতো সমবায়ের ভিত্তিতে বা গিল্ড প্রথার মাধ্যমে।[১৫] ইউরোপের সমবায় কারখানাগুলোর কাজের পরিধি ছিল ব্যাপক। ভিত্তিচিত্র, ধর্মশাস্ত্র নকল ও অলংকরণ, মূর্তি গড়া, ইমারত নির্মাণ, স্বর্ণশিল্প, মিনা করা, গালিচা বোনা, বই বাঁধাই, কাচ ও চীনামাটির কাজসহ বিভিন্ন কাজ সেখানে করা হতো। রেনেসাঁস-পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপেও শিল্পচর্চা অপেক্ষাকৃত নীচু কাজ হিসেবে সমাজে বিবেচিত ছিল এবং শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না।[১৬] মূলত রেনেসাঁসের মাধ্যমে শিল্পীরা সামাজিক সম্মান লাভ করেন এবং সমাজে শিল্পকলা মানবিক-বিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সকল কাজে আগ্রহী যে কেউ এই কারখানাগুলোতে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিতে পারতেন। দক্ষতা অর্জনের একপর্যায়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে সেখানকার জ্যেষ্ঠ শিল্পীর অধীনে কাজ করতে পারতেন। জ্যেষ্ঠ শিল্পীর সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আজ্ঞাপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) নিয়ে কারখানা খুলতে পারতেন। এখানে শিল্পশিক্ষার একটা পর্যায়ক্রমিক ব্যাপার ছিল, যার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষানবিশ ধীরে ধীরে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারতেন। রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এই কারখানাগুলোই ছিল শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফ্লোরেন্স ও ইতালিতে অবস্থিত এ সকল কারখানাতে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন রেনেসাঁস যুগের বিখ্যাত সব শিল্পী। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

---

[১৫] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, নিউদিল্লি, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮, পৃ. ৫
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেলাঞ্জেলো প্রমুখ রেনেসাঁসের বিখ্যাত শিল্পীর লক্ষ্য ছিল চিত্রকলা, মূর্তিকলা ও বাস্তুকলাকে মুক্তবিদ্যার স্তরে উন্নীত করা। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত অর্জনগুলো এ ধরনের প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছিল। কারখানার আওতা থেকে শিল্পকলাকে মুক্ত করে প্লেটো প্রবর্তিত একাডেমির অনুষঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয় রেনেসাঁসের সময় থেকে। ১৫৬৩ সালে ফ্লোরেন্সের গ্র্যান্ড ডিউক, মেদিচি পরিবারের প্রথম কোসিমোর সহায়তায় জর্জিও ভাসারি (GiorgioVasari, 1511–1574) ‘আকাদেমিয়া দেল দিজাইঞো’ বা ডিজাইন একাডেমি স্থাপন করেন।[১৭] ওই সময় ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া ইত্যাদি কাজসমূহ ‘ডিজাইঞো’ নামে পরিচিত ছিল। সমবায় প্রথার বাধ্যবাধকতা থেকে শিল্পীর মুক্তি, কারখানার শ্রমজীবীর সামাজিক হীনতা থেকে মুক্তি এবং শিল্পকলাকে মুক্তবিদ্যার স্তরে উন্নীত করার ঐকান্তিক আগ্রহের কারণে ইতালির রাজ্যগুলোতে এ সময় একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ দেখা যেতে থাকে। ১৫৯৮ সালে কারাচ্চি পরিবার (Annibale Carracci, 1560–1609; Agostino Carracci, 1557–1602; Ludovico Carraci, 1555–1619) বোলোনিয়া শহরে শিল্পশিক্ষার একাডেমি খোলেন। ফরাসির পরাক্রমশালী রাজা চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে ১৬৪৮ সালে স্থাপিত হয় রাজকীয় চিত্রকলা ও মূর্তিকলা একাডেমি। রাজতন্ত্রের গরিমা প্রচারে শিল্পকলাকে ব্যবহার করা ছিল এই একাডেমির মূল উদ্দেশ্য। এই একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্পীদের প্রদর্শনী বা সালোঁ আয়োজন করা হতো। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পচর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা সম্মানিত হতে থাকেন।[১৮] ১৭৬৮ সালে ফরাসি একাডেমির আদর্শে ইংল্যান্ডে রয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] ফ্লরেন্সের ডিজাইন একাডেমি, বোলোনিয়া একাডেমি এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্পকলা একাডেমিতে চিত্রকলা, মূর্তিকলা ও স্থাপত্যকলা শিক্ষণীয় ছিল। ডিজাইন একাডেমিতে শিল্পকলাসংক্রান্ত তত্ত্বীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আঠারো শতকের শেষ পর্যায়ে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লব ও ইউরোপের যন্ত্রশিল্প-বিপ্লব শিল্পকলাকেও প্রভাবিত করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের পরে ফরাসির রাজকীয় শিল্পকলা একাডেমি ভেঙে দেওয়া হয়। এর পর সর্বসাধারণের উপযোগিতার ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে চারুকলার পাশাপাশি কারিগরি বিষয় শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৭৯৫ সালে যন্ত্রোৎপাদন-নির্ভর কারিগরি শিক্ষার জন্য প্যারিসে স্থাপিত হয় ‘একোল্ পলিতেক্‌নিক্’। এরই আদলে ব্রিটেনে ১৮২০ সালে প্রথমে স্কটল্যান্ডে মেকানিক্‌স্ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। এ সময় যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন-সহায়ক শিল্পের নামকরণ হয় ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট’ বা

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২, ২৩
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

‘বাণিজ্যিক শিল্প’। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর নাগরিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে ফরাসি দেশে এ সময় ‘বোজ্-আর্টস’ (Beaux-Arts) শব্দটির প্রচলন শুরু হয়; যার ইংরেজি ভাষান্তর করা হয় ‘ফাইন আর্ট’।[২০] এভাবে উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে চারুকলা ও বাণিজ্যিক শিল্পকলা এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় শিল্পশিক্ষা। সামগ্রিক শিল্পচর্চায় এর প্রভাব পড়ে। সমাজে দুই শ্রেণির শিল্পীর উদ্ভব হয়। এক দল শহরের অভিজাত বিত্তবানদের নান্দনিক রুচির পরিতৃপ্তির জন্য শিল্প সৃষ্টি করে; আরেক দল ব্যবহারিক প্রয়োজনে যন্ত্রের সমকক্ষ নকশা/শিল্প তৈরি করে।

উনিশ শতকের শুরুতে ফাইন আর্ট শব্দটির মাধ্যমে অভিজাত, নাগরিক, উচ্চমানের চারুশিল্পকে বোঝানো হতো। ইংরেজরা মেকানিকস ইনস্টিটিউটের ধারণা পেয়েছিল ফরাসি একোল্ পলিতেক্নিক্ থেকে এবং একাডেমি ও আর্ট স্কুলের ধারণা পেয়েছিল ফরাসি একাডেমি ও আর্ট স্কুল থেকে। একাডেমির রীতি ও পদ্ধতিও ইংরেজরা পেয়েছিল ইতালি ও ফরাসি দেশ থেকে। ইতালি ও ফরাসি দেশ থেকে ইংল্যান্ড হয়েই মেকানিক্যাল আর্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ফাইন আর্ট, কারিগরি বিদ্যালয় ও আর্ট স্কুলের ধারণা ভারতে আসে উনিশ শতকে।[২১] ইংল্যান্ডের মেকানিকস ইনস্টিটিউটের আদলে ১৮৩৯ সালে ফ্রেডরিক কোরবিনের উদ্যোগে প্রথমে কলকাতায় মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ভারতের মাদ্রাজ (১৮৫০), কলকাতা (১৮৫৪), বোম্বে (১৮৫৭), জয়পুর (১৮৬৭) ও লাহোরে (১৮৭৫) স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট গড়ে ওঠে, যেগুলো পরবর্তীকালে আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে ওঠা এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম গঠনের ক্ষেত্রে লন্ডনের কেন্সিংটন গভর্নমেন্ট স্কুল অব ডিজাইন (১৮৩৭)-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। আর এ সকল আর্ট স্কুলের আদলে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশবিভাগ পূর্ববর্তী বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা

বাংলা তথা ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের উদ্যোগে, মূলত কারিগরি প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথমে পুনাতে, এরপর বেসরকারি উদ্যোগে মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বে, জয়পুর ও লাহোরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি আর্ট স্কুলে পরিণত হয়।

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে আঠারো ও উনিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। ১৭৫৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির পলাশি বিজয়ের পর বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয়। প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে ঔপনিবেশিক তথা পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা ও শিল্পশিক্ষা ভারতের শিল্পকলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক-পূর্ব ভারতে মুঘল আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা 'সুরতখানা'র মতো শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বসাধারণের শিল্পশিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় না। এই সুরতখানার চিত্র আদর্শ ছিল পারস্য ও ভারতীয় শিল্প আদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্ট মিনিয়েচার চিত্র; যা মুঘল মিনিয়েচার নামে খ্যাত। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে মুঘল মিনিয়েচারের রয়েছে এক বিশেষ অবদান। ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে এখানে দিল্লির শিল্পশৈলীর আগমনের পটভূমি তৈরি হয়। ১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে সমগ্র পূর্ব ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। এ সময় দিল্লির দরবারের কয়েকজন শিল্পী মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শিল্প আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়, যা মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতি হিসেবে পরিচিতি পায়।[২২] ১৭৭৪ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানীর মর্যাদা লাভের পর সকলেই কলকাতামুখী হয়ে ওঠে। কয়েক দশকের মধ্যে কলকাতার অভাবনীয় রূপান্তর ঘটে আর জৌলুস হারাতে থাকে মুর্শিদাবাদ। নবাবি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে মুর্শিদাবাদশৈলীর চিত্ররীতিরও অবক্ষয় শুরু হয়। এ সময় মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতির শিল্পীরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি দল দরবারবহির্ভূত স্থানীয় চিত্রকলার সাহচর্যে পাণ্ডুলিপি ও জড়ানো পটচিত্র চর্চায় মনোনিবেশ করে এবং

---

[২২] ফয়েজুল আজিম ও আবুল মনসুর, "কোম্পানী শৈলী ও ভারতে আগত বিদেশী চিত্রকর", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ পৃ.

অন্য দলটি ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ইংরেজ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ফরমায়েশি চিত্রচর্চা শুরু করে।[২৩] এভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারাটি ঔপনিবেশিক শাসনামলে ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে থাকে।

অন্যদিকে নগর হিসেবে কলকাতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজদের আগমন ঘটে মূলত প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারণে। বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত বাঙালিরও সমাবেশ হতে থাকে কলকাতায়। ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক ও আবাসিক প্রয়োজনে গড়ে উঠতে থাকে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। এ সকল অট্টালিকা তৈরিতে যেমন প্রয়োজন ছিল নির্মাণ সহায়ক দক্ষ কারিগরের তেমনি এর ভেতরের দেয়াল শোভিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল শিল্পকর্মের। সুতরাং চারু ও কারুশিল্পের চাহিদা মেটাতে শিল্পীর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রয়োজন পড়ে দক্ষ নির্মাণ সহায়ক কারিগরের। রুচিশীল ইংরেজদের চাহিদা মেটাতে ইউরোপ থেকে এ সময় কলকাতায় পাড়ি জমাতে থাকেন শিল্পীরা। ১৭৬৯ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন ইউরোপীয় শিল্পী কলকাতায় এসেছিলেন।[২৪] তাঁরা এ দেশে এসে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ধারায় প্রতিকৃতি, দৃশ্যচিত্র, মানুষের বিচিত্র জীবনাচারভিত্তিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। এসব ছবি ও ছবির অ্যালবাম বিক্রি করে তাঁরা ব্যাপক অর্থ উপার্জন করেছেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা এসব শিল্পকর্ম এ দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণিকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির শিল্পবোধ ও ভাবনার অনেকটাই গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য শিল্পকলার আদর্শে।[২৫] শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য এই শিল্পীরা পর্যাপ্ত ছিলেন না। তাঁদের অধিক পারিশ্রমিকের কারণে নিম্ন পর্যায়ের কারিগরি কাজ ও সর্বসাধারণের শিল্পের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

সারা ভারতবর্ষকে এ সময় ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে আনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তাঘাট তৈরি, রেললাইন স্থাপন, প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিল্ডিং নির্মাণ ব্যাপকভাবে শুরু করে। একই সঙ্গে সমস্ত অঞ্চলে ভৌগোলিক, আকরিক, জনবিন্যাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের প্রয়োজনে দপ্তর গড়ে তোলে। এসব কাজের জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। এসব তৎপরতায় নিম্নস্তরের কারিগরি কাজে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষ কর্মী আনানো ছিল ব্যয়সাধ্য। এ দেশে সেই দক্ষতা গড়ে তুলে চাকরির চাহিদার জোগান তৈরি করা সহজ মনে

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
[২৪] প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানী আমলে বিদেশী চিত্রকর*, কলকাতা, অয়ন প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃ. ১০
[২৫] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৬৬-৬৭

হয়েছিল।[২৬] কলকাতায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার এটি ছিল অন্যতম কারণ। এ ছাড়া আর একটি কারণ হলো, কলকাতায় অবস্থিত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কৌলিক বৃত্তি নির্বাহ করত এবং তাদের বংশগত বৃত্তিগত ঐতিহ্য ও পরিচয় ছিল। কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব ঐতিহ্য বা কৌলিক বৃত্তি না থাকায় তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।[২৭]

১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের কাউন্সিলের আইন সদস্য টমাস ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষা প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।[২৮] এই শিক্ষা প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ থেকে কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকার মুক্ত করা। এই শিক্ষা প্রস্তাব ভারতে সর্বজনীন শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতায় মেকানিকস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। কয়েক বছর চলার পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতায় দ্বিতীয় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'দ্য ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে স্কুলটি সরকারের অধীনস্থ হয়ে পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ক্যালকাটা'। এই আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষাক্রম ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাক্রমের অনুসারে প্রণীত। আর্ট স্কুলটি বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানত কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী এবং শিল্পরসিক দেশি-বিদেশি ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে পরবর্তীকালে আরো কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে গিরীন্দ্রকুমার দত্তের উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি আলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স অ্যান্ড স্কুল অব টেকনিক্যাল আর্ট' (১৮৭৬), মন্মথনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'দি ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্ট' (১৮৯৩), রণদা প্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে 'দ্য জুবিলি আর্ট একাডেমি (১৮৯৭)। বিশ শতকের শুরুতে কলকাতার বাইরে খুলনার মহেশ্বরপাশার গ্রামীণ পরিবেশে শশিভূষণ পালের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস' (১৯০৪)। এ সকল আর্ট স্কুলের চিত্রকলা বিকাশের কার্যক্রম ছিল মূলত কলকাতা আর্ট স্কুলের আদলে, তথা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষাক্রম অনুসারে প্রণীত।

---

[২৬] শোভন সোম, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৩
[২৭] প্রাগুক্ত পৃ. ৭২
[২৮] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এ সকল আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের। ত্রিশের দশক থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেদ করে শিল্পশিক্ষা নিতে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ছাত্রের আগমন ঘটতে থাকে আর্ট স্কুলে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরবর্তীকালে এঁদেরই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলার ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সরাসরি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অনুকরণে। এ কারণে ঢাকার শিল্পশিক্ষার ইতিহাস শুরু করার পূর্বে কলকাতার আর্ট স্কুলের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কলাভবনে ঔপনিবেশিকতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা বাংলা তথা ভারতে আধুনিক শিল্পশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে কলাভবনের বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পশিক্ষা আধুনিক পর্যায়ে উত্তরণের পথে কলাভবনেরও প্রভাব পড়েছিল। এ জন্য শান্তিনিকেতন কলাভবন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক কারণে কলকাতার প্রথম আর্ট স্কুল মেকানিকস ইনস্টিটিউট ও পূর্ব বাংলার প্রথম আর্ট স্কুল মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেকানিকস ইনস্টিটিউট, কলকাতা

কলকাতায় প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়া রিভিউ'-এর সম্পাদক ড. ফ্রেদেরিক করবিন (Dr. Frederik Corbyn)। তাঁর উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে মেকানিকস ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৩৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি।[২৯] ইংল্যান্ডের মেকানিকস ইনস্টিটিউটের আদলে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। মেকানিকস ইনস্টিটিউট ছিল কারিগরি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়। কিন্তু অঙ্কন শিক্ষাকে বিদ্যালয়ে যাবতীয় শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার দরুন এই প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার অঙ্কুর।[৩০] এই বিদ্যালয়ে কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে অনুকৃতি ও নকশা আঁকা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ভারতীয় উভয়ের শিল্পশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল।[৩১] কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি খুব বেশি দিন চলেনি। এর প্রধান কারণ হতে পারে আর্থিক অনটন। আর একটি কারণ হতে পারে কৌলিকবৃত্তির বাইরে এসে কারিগরি শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি তখনো এ দেশের মানুষের কাছে গুরুত্ব পায়নি।

---

[২৯] শোভন সোম, প্রাগুক্ত পৃ. ৭২–৭৩

[৩০] শোভন সোম, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৪

[৩১] Bagal Jogesh Chandra, "History of the Govt. College of Art & Craft", *Centenary,* Goverment College of Art & Craft Calcatta, 1966, Page 01

‘উনিশ শতক পর্যন্ত এ দেশের মানুষের ধারণা ছিল ছবি আঁকা হয় পটুয়াবৃত্তি, নয় দরবারি বিনোদন। তাঁদের চোখে পটুয়া গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন কিংবা দরবারি ফন্‌কার হিসেবে ছবি আঁকবেন, তাঁরা উভয়ই ছিলেন ইতর শ্রেণিভুক্ত এবং এই বৃত্তি তাঁদের চোখে সম্মানজনক ভদ্রলোকের বৃত্তি ছিল না।’[৩২] ফলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া শেখার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি তখন গুরুত্ব পায়নি। মেকানিকস ইনস্টিটিউটের মধ্য দিয়ে ভারতে কৌলিক প্রথায় আবদ্ধ শিল্পচর্চার বলয় ভেদ করে সর্বজনীন শিল্পশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কলকাতায় মেকানিকস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ১১ বছর পর মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫০) হয় স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। এরপর পর্যায়ক্রমে কলকাতা, বোম্বে, জয়পুর ও লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট; যেগুলো পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়ে সরকারি আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, কলকাতা

কলকাতার মেকানিকস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পনেরো বছর পর দ্বিতীয় আর্ট স্কুল হিসেবে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে। সরকার অধিগ্রহণের পর স্কুলটির নামকরণ হয় গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ক্যালকাটা। মেকানিকস ইনস্টিটিউট বন্ধ হওয়ার পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত কলকাতায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। ১৮৫১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘গ্রেট এক্সিবিশন’-এ প্রদর্শিত ভারতীয় কারুকলার নিদর্শন ইউরোপীয় কলাশিল্প জগতে সাড়া জাগালে এবং লন্ডনের ‘ডিজাইন স্কুল’-এ ভারতীয় আলংকারিক কারুশিল্প অনুশীলনের ব্যবস্থা করায় এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিল্পকলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে। এরপর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার।

১৮৫৪ সালে ২ মার্চ কলকাতায় বেথুন সোসাইটির বিশেষ সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রকৌশলী ই. গুডউইন (E. Goodwyn) ‘Union of Science, Industry and Arts’ শীর্ষক বক্তৃতা করেন; যেখানে বৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রস্তাব করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘The Society for the Promotion of Industrial Art’ বা ‘ব্যবহারিক শিল্প বিবর্ধন সমিতি’ গঠিত হয়।[৩৩]

---

[৩২] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
[৩৩] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 01–02

এই সমিতির উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট দ্য ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট কার্যক্রম শুরু করে পাইকপাড়া রাজাদের গরান হাটার বাড়িতে। এ বছরের নভেম্বরের মধ্যে স্কুলটি কলুটোলার শীলস বিল্ডিংয়ে স্থানান্তর করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন মিশেল মার্সিও রিগো (ক্লে-মডেলিং), এম অ্যাগার (পেইন্টিং) এবং টি এফ ফাওলার (এনগ্রেভিং, এচিং ও লিথোগ্রাফ)।

এই স্কুলে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল : ১. মডেল, ২. প্রাকৃতিক বিষয়াবলি অঙ্কন, ৩. স্থাপত্যিক অঙ্কন, ৪. এচিং, ৫. কাঠ খোদাই। এ ছাড়া মৃত্তিকা, মোম প্রভৃতি মাধ্যমে বিবিধ বস্তু নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ সময় দুটি বিভাগে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ড্রইং এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্লে-মডেলিং ও কাস্টিং, এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফি এবং অ্যাডভান্সড পেইন্টিং করানো হতো।[৩৪]

প্রথম দিকে সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের এককালীন দান, চাঁদা আর ছাত্রদের সামান্য বেতনে সমিতির ব্যবস্থাপনায় স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৮৫৬ সালে সরকার স্কুল পরিচালনার জন্য বার্ষিক ৬০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করে। শুরু থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত স্কুলের প্রধান ছিলেন এম রিগো। এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন মি. গ্যারিক। তাঁর সময়ে শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আসে। ১৮৬২–৬৩ নাগাদ এখানে যে সাতটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো তা হলো : ১. আলংকারিক অঙ্কন ও অবয়ব অঙ্কন, ২. কাঠ খোদাই, ৩. পাথর ছাপ, ৪. তেলরঙে অঙ্কন, ৫. মূর্তিকলা ও ছাঁচ তোলা, ৬. মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং ৭. আলোকচিত্র বিদ্যা। এ সময় শিক্ষাকাল ছিল চার বছর।[৩৫]

১৮৬৪ সালের ২৯ জুলাই ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের সুপারিনটেনডেন্ট পদে সরকার কর্তৃক নিয়োপ্রাপ্ত হন লন্ডনের সাউথ কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হেনরি হোবার লক (Henry Hover Locke, 1837–85)। এরপর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (ডিপিআই)-এর অধীনে সরকার এই স্কুল অধিগ্রহণ করে। এই স্কুলের নতুন নামকরণ হয় 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ক্যালকাটা'।[৩৬] ডিপিআইয়ের তত্ত্বাবধানে আর্ট স্কুল পরিচালিত হলেও শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের ব্যাপক স্বাধীনতা ছিল। লকের যোগদানের পরই স্কুলটি বউবাজার স্ট্রিটের ১৬৬ নম্বর বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়।

[৩৪] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 02–03
[৩৫] Ibid. p. 03–04
[৩৬] Ibid. p. 04-05

আর্ট স্কুলের প্রথম পর্যায় : এইচ এইচ লক কার্যভার গ্রহণের পর থেকে নতুন উদ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র উপস্থিতি ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে নজর দেন। সুষ্ঠুভাবে ছাত্রদের শেখার লক্ষ্যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে তিনি কয়েকটি ক্রমিক পর্বে পুনর্বিন্যস্ত করেন।

> 1. Elementary Linear drawing, 2. Higher freehand drawing, 3. Freehand drawing in light and Shade, 4. Geometrical drawing by aid of instrument, 5. Painting (elementary course), 6. Painting (higher course), 7. Modelling, 8. Elementary design, 9. Technical design, 10. Lithography, 11. Wood engravingand, 12. Photography[৩৭]

এই শিক্ষাক্রম থেকে বোঝা যায়, আর্ট স্কুলের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ করা ও ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকায় ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলা। শিক্ষার্থীর চিন্তা বা কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তাঁকে মননশীল শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা এই পাঠ্যক্রমে ছিল না।[৩৮] এই শিক্ষাক্রমে কোনো তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হয়নি।

চিত্র-১ : অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লক

লক ছিলেন লন্ডনের সাউথ কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইনের চিত্রকলার ছাত্র। এই স্কুল থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে ভারতের সব কটি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এসেছিলেন। লক ও অন্যান্য আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরা স্বাভাবিকভাবেই ভিক্টোরীয় আমলের ইংল্যান্ডে অনুসৃত সাউথ কেন্সিংটনের শিল্পদর্শন ও করণ-কৌশল এ দেশে বহন করে আনেন। সাউথ কেন্সিংটনের শিক্ষাক্রম ব্রিটেনের আর্ট স্কুলের জন্য চালু করেছিলেন এই স্কুলের সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট এবং লন্ডনের বিজ্ঞান ও শিল্পকলা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল শিল্পী রিচার্ড রেডগ্রেভ (Richard Redgrave: 1804–1888), যা

---

[৩৭] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 05
[৩৮] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

পরবর্তী পর্যায়ে এসে ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পশিক্ষায় যুক্ত হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্ত হাতে আঁকা, স্মৃতি থেকে আঁকা, জ্যামিতিক ও মডেল আঁকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এলিমেন্টারি পর্যায়ে পারস্পেকটিভ ও আর্কিটেকচারাল ড্রইং ছিল, যেগুলো জ্যামিতিক উপকরণের সাহায্যে আঁকা হতো। এ ছাড়া উন্মুক্ত হাতে আঁকা, বই থেকে অলংকরণ এবং চারপাশের বিষয়বস্তু থেকে আঁকতে হতো। অ্যাডভান্সড পর্বে আলো-ছায়া প্রয়োগ করে প্রকৃত বস্তু থেকে আঁকতে হতো। ফিগার ড্রইং পর্যায়ে অ্যানাটমি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং এন্টিক ন্যুড মডেল দেখে আঁকার প্রাধান্য ছিল। ১৮৯৩ সালে এলিমেন্টারি পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার যে টেক্সট বুক প্রণয়ন করা হয় সেখানে আদর্শ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে সঠিক দৃশ্যপট, সঠিক পরিমাপ ও সূক্ষ্ম বিবরণ চিত্রের মানদণ্ডের মূল বিষয় ছিল। রেডগ্রেভ পাঠ্যসূচির যে সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেছিলেন তা ছিল ইংলিশ স্কুল অব ডিজাইনের অগ্রগণ্য সংস্কারক ইউলিয়াম ডায়েস (William Dyce, 1806–1864) ও হেথ উইলসন (Heath Wilson) দ্বারা প্রভাবিত। ডায়াস ব্রিটেনের শিল্পশিক্ষার নতুন ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির শিল্পধারা অনুসরণ করেছিলেন। ফরাসি শিল্পীরা ছিলেন শিল্পের প্রতি অনুরক্ত এবং তাঁরা মানুষের শরীর আঁকার মাধ্যমে শিল্পসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মানরা চারুশিল্পের কোনো বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছাড়া হুবহু ডিজাইনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ডায়াস ভিক্টোরীয় আদর্শকে উপস্থাপন করতে জার্মানির আদলকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[৩৯]

লকের লক্ষ্য ছিল এ দেশের তরুণদের ভিক্টোরীয় শিল্পরীতিতে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা। লক গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে অধ্যক্ষ ছিলেন একটানা ১৮ বছর (১৮৬৪–১৮৮২)। স্বাস্থ্যগত কারণে দুই বছর ছুটিতে থাকার পর আরো প্রায় আড়াই বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লন্ডনের সাউথ কেন্সিংটন স্কুলের মডেলটিকে অনুসরণ করেছিলেন। যদিও সেই সময় ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের শিল্পধারা স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করছে। সেই সব নতুন আন্দোলন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে লকের কোনো আগ্রহ ছিল না।[৪০] তা ছাড়া কলকাতায় আর্ট স্কুলে শিল্পশিক্ষায় এগুলোকে তিনি আদৌ বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করেননি। স্বাভাবিকতাই ছিল একমাত্র শিক্ষণ পদ্ধতি। সাধারণের মধ্যে কলাশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি এবং আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কলাশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের নিদর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ সালে তিনি স্কুলসংলগ্ন একটি গ্যালারি

---

[৩৯] Mitter Partha, *Art and nationalism in colonial India; 1850-1922,* Great Britian, Cambriagn University Press, 1994, Page 34–36

[৪০] মৃণাল ঘোষ, *বাংলার আধুনিক চিত্রকলা : নানা দিগন্ত*, প্রাগুক্ত, ২০১৪, পৃ. ১৩

প্রতিষ্ঠা করেন ।[৪১] ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য লক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তন করেন এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে বহু পুরস্কার আদায় করেন ।

১৮৬৯ সালে প্রধান শিক্ষক ডেভিট গ্যারিক (David Garrick) বিদ্যালয় ছেড়ে গেলে তাঁর স্থলে প্রথম বাঙালি শিক্ষক হিসেবে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯–১৯০৫), শ্যামচরণ শ্রীমানী (?–১৮৭৫) এবং গোপাল চন্দ্র পালকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত করেন ।[৪২] পরবর্তী সময়ে অন্নদাপ্রসাদ বাগচীকে হেডমাস্টার পদে নিয়োগ দেওয়া হয় । ১৮৮৫ সালে লক হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্থলে স্বল্প সময়ের জন্য যথাক্রমে শমবার্গ ১৮৮৫–৮৬ পর্যন্ত এবং ওলিন্তো গিলার্দি ১৮৮৬–৮৭ পর্যন্ত অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন । গিলার্দি ছিলেন ইতালির নাগরিক । তাঁরই প্রেরণায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহিণীকান্ত নাগ, শশী কুমার হেশ, ফণীন্দ্রনাথ বসু ইতালিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যান ।

চিত্র-২ : গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ভবন, কলকাতা
(বর্তমানে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট)

চিত্র-৩ : গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের প্রবেশদ্বার

১৮৮৭ সালে উইলিয়াম হেনরি জবিনস (William Henry Jobbins, 1850–95) অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন । তাঁর যোগদানের আগে প্রিন্সিপাল পদটি সুপারিনটেনডেন্ট করা হয় । প্রায় ৯ বছর (১৮৮৭–১৮৯৫) সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে হেনরি হোবার লকের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার তিনি পরিবর্তন

[৪১] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
[৪২] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

করেননি। তাঁর অধ্যক্ষতাকালে ১৮৯৩ সালে বউবাজার থেকে চৌরঙ্গীর ভারতীয় জাদুঘরের দক্ষিণ পাশে স্কুল স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে (১৮৯৫) আর্ট গ্যালারিটিও চৌরঙ্গীর স্কুল ভবনে স্থানান্তরিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে ১৮৮৮ সালে তিনি বিদ্যালয়ে টিচারশিপ ট্রেনিং বা শিক্ষক শিক্ষণে সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। ১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি শারীরিক কারণে ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ড ফেরার পথে জাহাজে জবিনসের মৃত্যু হয়।[৪৩]

আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৮৯৬ সালের ৬ জুলাই আরনেস্ট বেনফিল্ড হ্যাভেল (Earnest Benfield Havell, 1861–1934) সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি লন্ডনের সাউথ কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইন থেকে ভাস্কর্য ও চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতায় আসার পূর্বে তিনি মাদ্রাজে সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

চিত্র-৪ : অধ্যক্ষ আরনেস্ট বেনফিল্ড হ্যাভেল

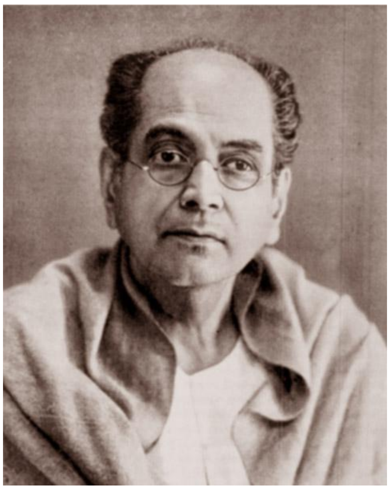

চিত্র-৫ : শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে হ্যাভেলের যোগদানের সময় পর্যন্ত (১৮৫৪–১৮৯৬) দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে ইউরোপীয় শিল্পাদর্শে এ দেশে শিল্প শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। আর্ট স্কুলের শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতে ইউরোপীয় একাডেমিক বাস্তববাদী ধারার বিস্তার ঘটেছে এ সময়। এই সময় দক্ষিণ ভারতের শিল্পী রাজা রবি ভার্মা (১৮৪৮–১৯০৬) পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারায় পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে ছবি এঁকে সারা ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় জীবনচর্চার প্রতি আগ্রহী বাংলার প্রায় সকল শিক্ষিত মানুষই ইউরোপীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ছিলেন নিঃসন্দেহ।

---

[৪৩] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 6

'স্বদেশে চিত্রকলার বিকাশ যে ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুবর্তনের মধ্য দিয়েই হবে—এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস।'[৪৪] হ্যাভেল যোগদানের পর স্কুলের শিল্পশিক্ষার গতিমুখ পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পরিবর্তে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করতেন, ভারতে ইংরেজ আগমনের আগে যে শিল্প-ঐতিহ্য ছিল, আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের সেই ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে। ভারতীয় শিল্পীদের কাজে ঐতিহ্যগত শিল্পের বিষয়বস্তু, শৈলী ও চেতনা পরিস্ফুটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ধারণাকে সামনে রেখে তিনি আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেন। হ্যাভেলের এই পদক্ষেপের পেছনে ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পভাবনা ও ভারতীয় শিল্পকলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।[৪৫] তিনি সাউথ কেন্সিংটন স্কুলে একাডেমিক রীতিতে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে এই রীতিতে আবদ্ধ থাকেননি।

> তাঁর নিজস্ব অন্বেষণাতেই তিনি একাডেমিক প্রকৃতি অনুকারী বাস্তবতার অতিরিক্ত ভাব ও ভাবনার জগতের কলা শিল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ভিক্টোরীয় একাডেমিক চিত্ররীতিতে তৃপ্ত না হয়ে, বরং তার আত্মিক দৈন্য লক্ষ করে তিনি শিল্পবিপ্লবপূর্ব কলাশিল্পের আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই মনোভাবই সমর্থন খুঁজে পেয়েছিল ভারতীয় মূর্তিকলা ও কারুশিল্পে।[৪৬]

হ্যাভেলের এই মনোভাব ফুটে উঠেছিল আর্ট স্কুলের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে (১৮৯২–৯৩ থেকে ১৯৯৬–৯৭):

> 'The study of design, the foundation of all art, was entirely ignored and throughout, the general drawing and painting classes, the worst traditions of the English provincial art school forty year's ago, were followed. There were no general classes for practical, geometry, mechanical drawing and perspective. Oriental art was more or less ignored, thereby taking the Indian art students in a wrong direction.'[৪৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হ্যাভেল নতুন রেগুলেশনের সাহায্যে আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজান। তিনি সকল শিক্ষাক্রম দুই ভাগে ভাগ করেন—ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এবং ফাইন আর্ট। প্রথম বিভাগে নকশা বা ডিজাইনের অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার সঙ্গে এই বিভাগেই প্রাচ্যশিল্প বা ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ফাইন আর্ট বিভাগে ইউরোপীয় চিত্রকলার শিক্ষাক্রমকেও হ্যাভেল অনুকরণের মধ্য দিয়ে উন্নত করতে প্রয়াসী হন।[৪৮] এ সময় পুরামূর্তি বা মডেল অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মূর্তির

[৪৪] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
[৪৬] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
[৪৭] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 12
[৪৮] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

পরিবর্তে প্রাচ্যদেশীয় মূর্তি আর চিত্রকলার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পরিবর্তে প্রাচ্যদেশীয়; বিশেষ করে অজন্তা গুহাচিত্র ও মুঘল মিনিয়েচারকে আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের পর তিনি আর্ট গ্যালারি পুনর্বিন্যাসের দিকে নজর দেন। গ্যালারিতে সংরক্ষিত ইউরোপীয় শিল্পের প্রতিলিপি বা অনুকৃতি সরিয়ে তিনি ভারতীয় বাণিজ্যিক অলংকরণ শিল্প ও চারুকলার বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। হ্যাভেলের এই দৃষ্টিভঙ্গি সরকারি নীতিনির্ধারক ও স্বদেশি ভাবনায় উদ্বুদ্ধ সুধীজনদের সমর্থন পেলেও ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় শিল্পী ও আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বিশেষত তিনি যখন চারুকলা বিভাগ অপেক্ষা কারু ও প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষা বিভাগের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করেন তখন অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু আন্দোলনে কোনো কাজ না হওয়ায় আর্ট স্কুলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের হীরক জয়ন্তী বছরে (১৮৯৭) দ্য জুবিলি আর্ট একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলনকারী ছাত্ররা এই আর্ট স্কুলে ভর্তি হন।[৪৯] এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি কলকাতার কিছু বিত্তবান মানুষের সহায়তা ও কলকাতা পৌরসভার মঞ্জুরি পেয়েছিলেন। তিনি একাডেমিতে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র পেয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র বসু (১৮৯৮–১৯৭৭), বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩–১৯২৬) ও প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার (?–১৯৪৬) পরবর্তীকালে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন। রণদাপ্রসাদের জুবিলি একাডেমি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্কুল। প্রায় আড়াই দশক এই স্কুল সক্রিয় ছিল।[৫০]

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় আরো তিনটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলার উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা তত দিনে সমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা আর্ট স্কুল সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। ১৮৭৬ সালে গিরীন্দ্র কুমার দত্তের (১৮৪১–১৯০৯) উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'দি আলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স অ্যান্ড স্কুল অব টেকনিক্যাল আর্ট' এবং ১৮৯৩ সালে মন্মথনাথ চক্রবর্তীর (১৮৬৬–১৯৬২) উদ্যোগে 'দি ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্ট'।[৫১] এ ছাড়া মন্মথনাথের ছাত্র শশিভূষণ পাল (১৮৭৮–১৯৪৬) খুলনার মহেশ্বরপাশায় ১৯০৪ সালে 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্টস' নামে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
[৫০] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

করেন।[৫২] গিরীন্দ্র কুমার দত্ত, রণদাপ্রসাদ, মন্মথনাথ ও শশিভূষণ ছিলেন লক ও জবিনসের অনুসারী। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন।

হ্যাভেল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্পচর্চাকে প্রাচ্যধারায় সমৃদ্ধ করার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সে ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় যোগ্য একজন সহযোগীর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ সময় তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সদস্য উদীয়মান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর সহযোগী হিসেবে বেছে নেন। আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ গিলার্দির অবসর গ্রহণের পর উক্ত পদে হ্যাভেলের প্রচেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট যোগদান করেন।[৫৩]

অবীনন্দ্রনাথ ইতালিয়ান শিল্পী গিলার্দি ও ব্রিটিশ শিল্পী চার্লস পামারের কাছে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতিতে তেলরং ও জলরং শিখলেও পরবর্তীকালে মুঘল মিনিয়েচারের প্রাচ্যদেশীয় ধারার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করে প্রাচ্যদেশীয় ধারায় শিল্পচর্চা করেছিলেন। ১৯০২–০৩ সালে অনুষ্ঠিত ‘দিল্লির দরবার’ উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ‘অন্তিম শয্যায় শাহজাহান’ ছবিটি পুরস্কৃত হলে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি সরকারি ও বেসরকারি মহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল আকৃতি ও প্রকৃতিতে নতুন যুগের ভারতীয় কলাশিল্পকে প্রাচ্যমুখী করে তোলা এবং তার ভিত্তিতে, স্বকীয় চরিত্রে সেই চিত্রকলার নানামুখী বিকাশ সাধন। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ এবং তাঁর প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির বিবর্তনে বিশ শতকের সূচনাকালে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছিল। একটি বাংলার স্বদেশি আন্দোলন; দ্বিতীয়টি জাপানি পরম্পরাগত চিত্রকলার মহান প্রবক্তা ওকাকুরা কাকুজোর সংস্পর্শ লাভ। ঠাকুরবাড়ির সন্তান হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশি ভাবনার মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সর্বব্যাপী প্রভাবে ব্রতী হয়ে স্বদেশি ভাব-ভাবনা ও রীতিতে এক নতুন চিত্রশৈলী উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট হন।

দ্বিতীয়ত, ‘এশিয়া এক, এশিয়ার আত্মিক স্বরূপ অভিন্ন’—জাপানি দার্শনিক শিল্পী ওকাকুরা কাকুজোর (Okakura Kakuzo, 1862–1913) এই ভাবনা তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এ ভাবনারই সূত্র ধরে

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় আগত জাপানি শিল্পী ওয়াকোয়ামা টাইকান (Yokoyama Taikan, 1868–1958) ও হিসিদা সুনসোর (Hishida Shunso, 1878–1911) কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ জাপানি কালি-তুলি আর ওয়াশ পদ্ধতির কাজ শেখেন। এভাবে প্রাচ্য চিত্ররীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হন অবনীন্দ্রনাথ। ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙের শিক্ষা, জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি, মুঘল মিনিয়াচের সূক্ষ্মতা আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি তাঁর 'ওয়াশ টেকনিক' বা 'ধৌত চিত্ররীতি' প্রবর্তন করেন।[৫৪]

অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান আর্ট স্কুলে ভর্তি হন, যাঁরা পরবর্তীতে কৃতী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬), যতীন্দ্রকুমার সেন (১৮৮২–১৯৬৬), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯০৬), প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯৭৯), সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭–১৯৬৪), শৈলেন্দ্রনাথ দে (?–১৯৭৯), কে ভেঙ্কটআপ্পা (১৮৮৭–১৯৬৫), অসিতকুমার হালদার (১৮৯০–১৯৭২) প্রমুখ।[৫৫] অবনীন্দ্রনাথের প্রণীত নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারা এ সকল শিল্পীর কাজের মাধ্যমে পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করে।

হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ একসঙ্গে খুব বেশি সময় আর্ট স্কুলে কাজ করতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে যোগদানের মাত্র পাঁচ মাস পরে (জানুয়ারি ১৯০৬) হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে যান। পরবর্তীকালে তিনি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর অবনীন্দ্রনাথ প্রায় দুই বৎসর অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যক্ষতাকালে তিনি ছাত্রদের সামনে নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থাপন করেননি। 'অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীমন নিয়ে শিল্পশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। ...এই কারণে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চিত্র রচনার স্বাধীনতা ছাত্ররা প্রথম থেকে পেয়েছিলেন।'[৫৬] শিল্পশিক্ষার এই স্বাধীন পরিবেশ থেকেই সূচনা হয় আর্ট স্কুলে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা। তিনি নিজে যেমন বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্প সৃষ্টির একটা পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর ছাত্ররাও নিজের নিজের প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্টির পথ অনুসরণ করুন—অবনীন্দ্রনাথ সেটিই চেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের জানুয়ারিতে পার্সি ব্রাউন (Percy Brown, ১৮৭১–১৯৫৫) আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণের পর অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব পদে যোগদান করেন। অবনীন্দ্রনাথ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে স্কুলে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ছাত্রদের অধিক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু পার্সি ব্রাউন যোগদানের পর স্কুলে কঠোর

---

[৫৪] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১–১২৪

[৫৫] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

[৫৬] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, কাঞ্চন চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৪ পৃ. ১২১

নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেন। এ নিয়ে ব্রাউনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য দেখা দিলে ১৯১৫ সালে তিনি উপাধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি আর্ট স্কুলে মোট দশ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন।

> তিনি এই দশ বছর তাঁর কার্যধারাকে তিন দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। প্রথমত, এই সময়ের মধ্যেই তাঁর যে নিজস্ব চিত্ররীতি তাকে তিনি এক নির্দিষ্ট চরিত্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই দশ বছরেই তিনি তাঁর প্রথম সারির ছাত্রদের তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তৃতীয়ত, সংগঠকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর নব-প্রবর্তিত শিল্পধারাকে দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সে সময়ের সব থেকে প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় শৈলীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।[৫৭]

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলা আন্দোলনকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে তাঁর উদ্যোগে গঠিত (১৯০৭ সালের ৬ এপ্রিল) ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিল্পবিষয়ক আলোচনা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নব্য-ভারতীয় চিত্রশৈলীর কথা সর্বস্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এই সোসাইটি। কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি নতুন উদ্যমে সোসাইটির কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯১৯ সালে ধর্মতলায় সমবায় ম্যানসনে সোসাইটির দপ্তর ও শিল্প বিদ্যালয় খোলা হয়। নন্দলাল বসু ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ এখানে প্রথমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে গেলে এখানে প্রধান শিক্ষক হন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরবর্তী ১৮ বছর ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নব্য-ভারতীয় চিত্র ধারায় ছাত্ররা এখানে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছেন। সোসাইটির এই বিদ্যালয় থেকে শিল্পশিক্ষা নিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মুকুল দে, বীরেশ্বর সেন, প্রমথ কুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি কর প্রমুখ শিল্পী। ১৯১৯ সালে সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'রূপম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৫৮]

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলার চারুশিল্প চর্চায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। কলকাতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনাকাল থেকে চলে আসা ইউরোপীয় একাডেমিক ধারার পাশাপাশি স্বদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নিও-বেঙ্গল ধারা এ সময় বিকাশ লাভ করে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। ১৯০৭ সালে গড়ে ওঠা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী, প্রকাশনাসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিও-বেঙ্গল চিত্রধারা এ সময় দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার পায়। এই দুটি ধারার মাঝ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নতুন শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থা সন্ধান করতে থাকেন, যেখানে ইউরোপীয় একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর নিয়ম-কানুন থাকবে না, শুধু অনুকরণনির্ভরতা থাকবে না, আবার নিও-

---

[৫৭] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[৫৮] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭–৪১

বেঙ্গল ধারার দেব-দেবী, পুরাণ, ইতিহাসের কল্পনাশ্রিত আতিশয্যও থাকবে না; প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে থেকে স্বদেশি ঐতিহ্য ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে যেখানে বিশ্বমানের শিল্পচর্চা হবে—এমন একটি শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ তিনি এ সময় নিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক পদক্ষেপে তিনি ১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রা স্টুডিও স্থাপন করেন। কিন্তু বিচিত্রা স্টুডিও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর এই শিল্পশিক্ষা ভাবনার সফল প্রয়োগ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষা ভাবনা নন্দলাল বসু সফলভাবে প্রয়োগ করেন শান্তিনিকতনে, তাঁর যোগ্য সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ছাত্র (পরবর্তীকালে শিক্ষক) রাম কিঙ্কর বেজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ প্রমুখের মাধ্যমে। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উল্লিখিত শিল্পীরা বাংলায় আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা করেন; যা পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরিদের মাধ্যমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কলাভবনের আধুনিকতার প্রভাব পরবর্তীকালে কলকাতা আর্ট স্কুলকেও প্রভাবিত করেছিল।

আর্ট স্কুলের তৃতীয় পর্যায় : ১৯১৬ সালে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্ট স্কুলে যোগদানের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে এই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। চারুকলা বিভাগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুটি ধারাতেই গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। এ সময় শিল্পশিক্ষায় ইউরোপীয় একাডেমিক ধারা আবারও প্রাধান্য পায়। এ পর্যায়ে বাঙালি অধ্যক্ষ স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং হিন্দু ছাত্রদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন মেধাবী মুসলিম ছাত্র এখানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন। সহশিক্ষাও এ সময় শুরু হয়।

পার্সি ব্রাউন আর্ট স্কুলে একাধারে আঠারো বছর (১৯০৯–১৯২৭) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। আর্ট স্কুলে যোগদানের পূর্বে তিনি লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ এবং লাহোর সেন্ট্রাল মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রাউন যোগদানের অব্যবহিত পরেই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। স্কুলের সমগ্র শিক্ষাকে তিনি পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেন।

১. প্রাথমিক (Elementary), ২. বাণিজ্যিক (Industrial), ৩. সর্বেক্ষণ কলা (Drafting), ৪. শিক্ষক শিক্ষণ (Teaching), ও ৫. চারুকলা (Fine Art)। বাণিজ্যিক কলায় চারটি উপবিভাগ ছিল। এগুলো যথাক্রমে : ক. পাথর ছাপ (Lithography), খ. কাঠ খোদাই (Wood Engraving), গ. ভাস্কর্য (Modelling), ঘ. কাঠ তক্ষণ (Wood Carving)। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে দুই বছরের এলিমেন্টারি পাঠ

আবশ্যিকভাবে নিতে হতো; তারপর চারটি বিভাগের যেকোনো একটিতে তিন বছরের বিশেষ শিক্ষা নিতে পারতেন ।[৫৯]

অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুল থেকে পদত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত পার্সি ব্রাউন হ্যাভেল ও অবনীন্দ্র প্রবর্তিত প্রাচ্যধারার শিক্ষণ ব্যবস্থাকে খাটো করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তবে ১৯১৬ সালে অবনীন্দ্রনাথের স্থলে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় উপাধ্যক্ষ নিয়োগের পর পার্সি ব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশের উদ্যোগে স্কুলে ইউরোপীয় একাডেমিক শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি চারুকলা বিভাগকে 'চারুকলা' বা 'ফাইন আর্টস' ও 'ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা' নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করেন। চারুকলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যামিনীপ্রকাশ এবং ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলার দায়িত্ব দেওয়া হয় লালা ঈশ্বরী প্রসাদের ওপর। চারুকলা বিভাগে প্রধানত ব্রিটিশ পরম্পরায় স্বচ্ছ জলরঙে এবং একাডেমিক পদ্ধতিতে তেলরঙে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হতো। সাদৃশ্য সাপেক্ষ প্রকৃতির অনুবর্তনমূলক চিত্রাঙ্কনের এই বিভাগটি তখন ওয়েস্টার্ন আর্ট বা পশ্চিমা শিল্পকলা বিভাগ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আর ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা বিভাগে জলরঙের টেম্পারা ও ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হতো। যেহেতু প্রাচ্যকলা নামে এই বিদ্যালয়ে আগে থেকে অনচ্ছ জলরং ও ওয়াশে ছবি আঁকা শেখানো হতো, এ কারণে মাধ্যমগত পদ্ধতি পরিচিতি পায় 'প্রাচ্যদেশীয়' নামে।[৬০] ইতিপূর্বে বিভাগ বিভাজনের ক্ষেত্রে শিল্পকলার 'মাধ্যম' প্রাধান্য পেলেও ফাইন আর্ট বিভাগকে আঞ্চলিক শিল্পশৈলীর ভিত্তিতে ভাগ করা হয়, যা ছিল ব্যতিক্রম। ১৯২০-এর মাঝামাঝি সময়ে ব্রাউন আর্ট স্কুলের শিক্ষার সময়কালকে পাঁচ বছরের স্থলে এক বছর বাড়িয়ে ছয় বছর করেন এবং এলিমেন্টারি পর্বের শিক্ষাকাল দুই বছরের স্থলে তিন বছর করেন।[৬১] ১৯২৭ সালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সেক্রেটারি কিউরেটর হিসেবে যোগদানের জন্য ব্রাউন অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করলে যামিনীপ্রকাশ অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এরপর ১৯২৮ সালের ১১ জুলাই মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫–১৯৯২) অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ, যাঁকে স্থায়ীভাবে সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে নিয়োগ করা হয়। তাঁর নিয়োগের পরেই যামিনীপ্রকাশ ছুটি নিয়ে এবং বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রায় তিন বছর বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার পর ১৯৩১ সালের নভেম্বরে পদত্যাগ করেন।[৬২]

---

[৫৯] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 35
[৬০] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
[৬১] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 42-43
[৬২] Ibid. p. 44

চিত্র-৬ : অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে

এ-যাবৎ নিযুক্ত অধ্যক্ষদের মধ্যে মুকুল দে (১৮৯৫–১৯৯২) ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র মুকুল দে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে জাপান ও আমেরিকা যান। শিকাগোতে তিনি জে ব্লেডিং স্নোর কাছে এচিং শেখেন এবং শিকাগো সোসাইটি অব এচার্সের সদস্য মনোনীত হন। তাঁর ছবির প্রদর্শনী শিকাগো ও সানফ্রান্সিসকোতে আয়োজিত হয়। ১৯২০ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লেড স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি রয়াল কলেজ অব আর্টে ভর্তি হন। সেখানে টেম্পারা ও এনগ্রেভিংয়ে প্রথম হয়ে তিনি এআরসি বা অ্যাসোসিয়েট অব রয়াল কলেজ হন। চিত্রকলা ও ছাপচিত্র দুই মাধ্যমেই তাঁর দখল ছিল সন্দেহাতীত। তিনি একাধারে পনেরো বছর (১৯২৮–১৯৪৩) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।[৬৩] আর্ট স্কুলে যোগদানের পর মুকুল দে প্রশাসনিক ও একাডেমিক উভয় ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাউন প্রবর্তিত সরকারের অনুমোদনহীন মনিটর প্রথা বাতিল করেন। ছাত্রদের আউটডোর স্টাডির জন্য স্কুলের বোর্ডের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ছাড়া কঠোর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করেন। এ সকল নিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করলেও তিনি এগুলো বাস্তবায়ন করেন।[৬৪]

তিনি পার্সি ব্রাউনের সময়ের মতো আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে এলিমেন্টারি এবং অ্যাডভান্সড এই দুটি পর্বে ভাগ করে প্রতি পর্ব তিন বছর করে মোট ছয় বছরের শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু পূর্বের পাঁচটি বিভাগের স্থলে আটটি বিভাগ চালু করেন। ১৯২৭–২৮ থেকে ১৯৩১–৩২ সময়ের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'Indian painting, Fine Art (Art taught on European models),

[৬৩] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
[৬৪] Bagal Jogesh Chandra, Ibid. p. 44

Commercial art, Wood engraving, Lithography, Draftsmanship, Clay-modelling and Teachership'[৬৫] এই আটটি বিভাগ সেখানে চালু করেন।

মুকুল দে আর্ট স্কুলের সকল বিভাগের প্রতিটি বিষয়ের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেন। চারুকলা বিভাগের পাশাপাশি তিনি ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শিল্প পদ্ধতির উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পূর্বে ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলাতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনি ও সাহিত্য থেকে বিষয় নিয়ে ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখানো হতো। কিন্তু অধ্যক্ষ মুকুল দের সময়ে সমকালীন মানুষের জীবন নিয়ে ছাত্রদের ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। চারুকলা বিভাগের পাশ্চাত্য রীতির পুরনো একাডেমিক ধারার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের নতুনতর ইউরোপীয় করণ-কৌশল গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। তিনি কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের গুরুত্ব ও উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে এই বিভাগকে স্থায়ী বিভাগ করেন। ইতিপূর্বে মূর্তিকলা বিভাগ ছিল ব্যবসাভিত্তিক কারিগরি বিভাগ। তিনি সেই ব্যবস্থা রদ করে সৃজনধর্মী মূর্তিকলা শেখার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব মেশিনে ছাত্রদের ধাতুপাতে এচিং করে ছাপাই ছবি করার সুযোগ করে দেন।[৬৬]

তাঁর যোগদানের পর আর্ট স্কুলে শিল্পশিক্ষার যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে তা সম্ভব হয়েছিল বেশ কয়েকজন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ফলে। স্কুলের পুরাতন শিক্ষকরা একে একে অবসর নিলে তাঁদের স্থলে নিয়োগ দেওয়া হয় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২–৫৫), সতীশচন্দ্র সিংহ (১৮৯৩–১৯৬৫), মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৫–১৯৫৮), অতুল চন্দ্র বসু (১৮৯৮–১৯৭৬), বসন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩–১৯৬৮), সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬–১৯৭৭) প্রমুখকে—যাঁরা কেবল শিক্ষক হিসেবে নন, শিল্পী হিসেবেও বিখ্যাত। তাঁদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে, অতুল বসু জুবিলি আর্ট একাডেমি ও গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এবং বসন্ত কুমার জুবিলি আর্ট একাডেমিতে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর রমেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রভূষণ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র—তাঁরা প্রধানত নন্দলালের হাতে গড়া শিল্পী। তাঁদের নিয়োগের ফলে আর্ট স্কুলে বহুমুখী মেধার সমাবেশ ঘটে। মুকুল দে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হলেও দীর্ঘদিনের ইউরোপ ও আমেরিকায় চিত্রশিক্ষা তাঁকে যথেষ্ট উদার মনোভাবাপন্ন

---

[৬৫] Ibid. p. 45

[৬৬] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭–২৫৮

করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় রীতির চিত্রশিক্ষাকে যোগ্য শিক্ষকদের সাহায্যে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৭]

মুকুল দের সময়ে ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা ও চারুকলা বিভাগ থেকে অনেক কৃতী ছাত্র পাস করে বের হন, যাঁরা পরবর্তী সময়ে এই উপমহাদেশের চিত্রকলার নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা বিভাগের সুশীলচন্দ্র সেন, অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত, ইন্দুভূষণ রক্ষিত, জ্যোতিরিন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন, বীরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর মুন্‌শী, মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য চিত্ররীতির ক্ষেত্রে শৈলজ মুখোপাধ্যায়, জয়নুল আবেদিন, রথীন মৈত্র, কিশোরী রায়, সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ অন্যতম।[৬৮]

হাতে-কলমে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস, তথ্য, তত্ত্ব ও সাহিত্যচর্চায় ছাত্রদের মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৩১ সালে বিদ্যালয় থেকে 'আওয়ারা ম্যাগাজিন' প্রকাশ করা হয়। এ সময় মুকুল দে ছবিসহ বক্তৃতাও প্রবর্তন করেন। তিনি স্কুলে নিয়মিত বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর উদ্যোগে আর্ট স্কুলে সর্বপ্রথম সহশিক্ষা চালু হয়।[৬৯]

মুকুল দের সময়ে হিন্দু শিক্ষার্থীর পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক ছাত্র এখানে ভর্তি হতে থাকেন। কয়েকজন মুসলমান ছাত্র এ সময় কৃতিত্বের সঙ্গে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করে এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল মঈন (১৯১০–৩৯), জয়নুল আবেদিন (১৯১৪–৭৬) ও সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২–২০১২)। আব্দুল মঈন ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম মুসলমান শিক্ষক হিসেবে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে যোগদান করেন। জয়নুল আবেদিন ১৯৩২ সালে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৩৮ সালে চারুকলা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। তিনি আর্ট স্কুলে শিক্ষাকালে সকল বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৩৭ সালে তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আব্দুল মঈনের মৃত্যুর কারণে শূন্য পদে ১৯৩৯ সালের ১৬ মার্চ জয়নুল আবেদিন স্থায়ীভাবে নিয়োগ পান।[৭০] ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় গভর্নরের গোল্ড মেডেল অর্জন এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সিরিজের অসাধারণ ড্রইং তাঁকে দ্রুত ভারতীয়

[৬৭] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২–২১৩
[৬৯] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
[৭০] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৩০

উপমহাদেশে একজন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী হিসেবে পরিচিত করে তোলে। এ পর্যায়ে আর এক মেধাবী ছাত্র ছিলেন সফিউদ্দীন আহমেদ। তিনি ১৯৩৬ সালে আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং চারুকলা বিভাগ থেকে ১৯৪২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ছাপচিত্র বিষয়ে দুই বছর মেয়াদি শিক্ষা সম্পন্ন করেন (১৯৪৪–১৯৪৬)। ১৯৪৬ সালে ছাপচিত্রের শিক্ষক সুনীল সেন আর্ট স্কুল ছেড়ে দিল্লি চলে যাওয়ায় তাঁর শূন্যপদে সফিউদ্দীন আহমেদ লিথোগ্রাফ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[৭১] তিনিও একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে একাডেমিক প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ ছাড়া এ পর্যায়ে আরো কয়েকজন মুসলমান ছাত্র আর্ট স্কুল থেকে পাস করে সেখানে শিক্ষক ও অন্যান্য পদে নিয়োগ লাভ করেন। আর্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে উত্তীর্ণ হয়ে হবিবুর রহমান (১৯১২–৭৩) উডকাট শিক্ষক হিসেবে ১৯৩৭ সালে, ১৯৪০ সালে উত্তীর্ণ হয়ে আনোয়ারুল হক (১৯১৮–১৯৮১) ডিজাইনার হিসেবে ১৯৪৫ সালে,[৭২] ১৯৩৮ সালে উত্তীর্ণ হয়ে শফিকুল আমীন শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়ে ১৯৪৬ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে যোগদান করেন।[৭৩] এ ছাড়াও এ সময় সৈয়দ আলী আহসান ড্রাফটসম্যান পদে এবং শেখ আনোয়ার প্রেসম্যান পদে নিয়োগ লাভ করেন। এ পর্যায়ে আরো দুজন মুসলমান ছাত্র এ সময় ভর্তি হন, যাঁরা পরবর্তীকালে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে কামরুল হাসান (১৯২১–৮৮) ১৯৩৮ সালে এবং মোহাম্মদ কিবরিয়া (১৯২৯–২০১১) ১৯৪৩ সালে ভর্তি হন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ—এই অস্থির সময় কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ সকল ঘটনার ফলে স্কুলের সরকারি অনুদান পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। এই সমস্যাসংকুল পরিবেশে ১৯৪৩ সালে মুকুল দে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অধ্যক্ষ হন।[৭৪] ১৯৫১ সালের ২ জুলাই আর্ট স্কুল উন্নীত হয় কলেজে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় নির্মাণ সহায়ক কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ একাডেমিক পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, সময়ের বিবর্তনে সেখান শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে একটি আদর্শ ও আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। আর্ট স্কুলের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সূচনা পর্ব থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে (হেনরি হোবার লক ও ইউলিয়াম হেনরি জবিনসের অধ্যক্ষতাকালে) সেখানে ব্রিটিশ একাডেমিক পদ্ধতিতে বাস্তবানুগ

[৭১] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৩, পৃ. ১০৯

[৭২] *'১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনী ১৯৬৫' ক্যাটালগ*, ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস, ঢাকা

[৭৩] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, ঢাকা, প্রকাশক : নূরজাহান বকশি, ২০১০, পৃ. ২৬

[৭৪] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

অনুকরণনির্ভর শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (ই বি হ্যাভেলের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের সময় থেকে ১৯১৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় পর্যন্ত) আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার আদর্শে প্রণীত শিক্ষা প্রাধান্য পায়। এ শিক্ষাধারা প্রবর্তনে অধ্যক্ষ হ্যাভেল ও উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৃতীয় পর্যায়ে (পার্সি ব্রাউনের অধ্যক্ষতাকালে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপাধ্যক্ষ পদে যোগদানের সময় থেকে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত) আবারও ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতি প্রাধান্য পায়। এ পর্যায়ে মুকুল দে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে আর্ট স্কুলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারার চিত্রশিক্ষা গুরুত্ব পায়। তাঁর প্রচেষ্টায় শিল্পশিক্ষা সৃজনশীল আধুনিক শিক্ষার পর্যায়ে উন্নীত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলাভবনে নন্দলালের অধ্যক্ষতায় শিল্পচর্চায় যে মুক্ত পরিবেশের সূচনা হয়েছিল, মুকুল দের সময়ে তা আর্ট স্কুলেও প্রভাব ফেলে।

কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনে আবদ্ধ না থেকে মুক্ত পরিবেশে একটি সর্বজনীন প্রগতিবাদী বিশ্বমানের শিক্ষা আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কলাভবন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে শিল্পচর্চা ও শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শিল্প-সাহিত্য-সংগীত আর নাট্যকলার এক দুর্লভ মিলন ক্ষেত্র হিসেবে বিচিত্রা ক্লাব বা স্টুডিও গড়ে তোলেন। এই বিচিত্রা স্টুডিওকে বলা যায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মহড়া। এ কারণে কলাভবন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে বিচিত্রা স্টুডিও সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করলে কলাভবন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে ও ভাস্কর কাশিনাথ দেবল বিচিত্রায় যোগ দেন। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর সঙ্গে যুক্ত হন। বিচিত্রা ক্লাবকে কেন্দ্র করে 'দ্য বিচিত্রা স্টুডিও ফর দি আর্টিস্ট অব দ্য নিও-বেঙ্গল' গড়ে ওঠে। যেখানে অবনীন্দ্রনাথ নিও-বেঙ্গল ধারায় শিল্পচর্চা করতেন। এ ছাড়া উল্লিখিত শিল্পীরা স্টুডিওতে শিল্পচর্চা করতেন, যা দেখে শিক্ষার্থীরা শিখতেন। এখানে চিত্রকলার পাশাপাশি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিথো পদ্ধতিতে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন এবং কাশিনাথ দেবল মাটি দিয়ে ভাস্কর্য চর্চা করতেন।

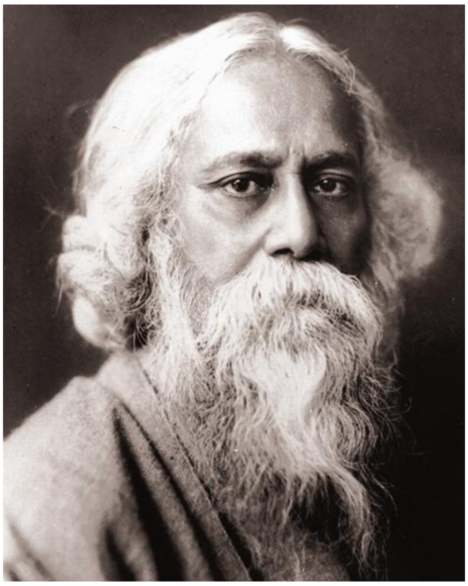

চিত্র-৭ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র-৮ : শিল্পী নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হতো। ক্ষণস্থায়ী এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার শিল্পচর্চার একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কয়েক বছর চলার পর বিচিত্রা স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়। অশোক ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার চিত্রকলা* গ্রন্থে লিখেছেন, 'জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ক্লাবের কাজকর্ম চলেছিল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।'[৭৫] কিন্তু শোভন সোম তাঁর 'শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শ সতেরোতে জাপান ও আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে কলাভবন (বিচিত্রা) বন্ধ করে দেন।'[৭৬] বিচিত্রা স্টুডিও স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সম্ভবত কিছুদিন আগে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে 'বিচিত্রা'র স্টুডিওভিত্তিক শিল্পকলা শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। ...নিছক কারিগরি দক্ষতা শেখানোর কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ...রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'বিচিত্রা' হবে শিল্প সংস্কৃতির কর্মশালা।"[৭৭] কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্রার বিদ্যালয়ে যুক্ত হওয়ার পর সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে নিও-বেঙ্গল ধারায় দেব-দেবীর ছবি, পুরাণ ও ইতিহাসভিত্তিক কল্পনাশ্রিত চিত্রচর্চা প্রাধান্য পায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা বোঝা যায় জাপান ভ্রমণকালে লেখা একটা চিঠি থেকে। ১৯১৬ সালে তারিখবিহীন এ চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তোমার দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে কত দরকার সে তোমার দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনই বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয়নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোন নাড়ির যোগ নেই।'[৭৮] এই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন, 'এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে আমাদের আর্ট ষোল আনা সত্য হতে পারেনি। ... তোমাদের বিচিত্রা কীভাবে চলচে কি জানি।'[৭৯] চিঠির প্রথম অংশ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিচিত্রাতে এমন শিল্পচর্চা হবে যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল থাকবে, সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে। পত্রের পরবর্তী অংশে তিনি হতাশা প্রকাশ করছেন বিচিত্রার চিত্রশিক্ষা সম্পর্কে। এই চিঠি থেকে বোঝা যায় তিনি বিদেশ থেকে ফিরে কেন বিচিত্রা স্টুডিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিচিত্রা হবে সম্পূর্ণ নতুন ধারার একটি শিল্পচর্চা কেন্দ্র। যেখানে কোনো পুনরাবৃত্তি থাকবে না। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পের এমন একটি জাগরণ, যা সমস্ত দেশের চিত্তকে আপ্লুত করবে, যা দেশের অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দেবে। ভারতশিল্পকে নতুন পরিবেশে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার আশা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে শিল্পীদের আর্থিক লাভ হতে পারে কিন্তু শিল্পধারা

[৭৫] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
[৭৬] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩–৩১৪
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৮০] বিচিত্রা বন্ধের পর রবীন্দ্রনাথের শিল্পের জাগরণের এই স্বপ্ন থেমে থাকেনি। তিনি এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেন ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কলাভবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

চিত্র-৯ : শিল্পী নন্দলাল বসুর স্টুডিও (বর্তমানে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ)

চিত্র-১০ : কালো বাড়ি, কলাভবন, শান্তিনিকেতন
আলোকচিত্র : গবেষক

১৯১৯ সালে সেখানে স্থাপন করেন বিশ্বভারতী কলাভবন। শহরের কোলাহলবর্জিত নির্জন পরিবেশে প্রাকৃতিক তপোবনের আদর্শে কলাভবনের কার্যক্রম শুরু করলেও প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাবিধি তিনি গ্রহণ করেননি। প্রাচীন ভারতে তপোবনে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রচর্চা আর ক্ষত্রিয়ের নীতিচর্চার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও কলাভবনে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল।[৮১] ১৯১৬ সালের অক্টোবরে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতে শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্ব্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চ্চা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে...।'[৮২]

কলাভবন প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক পেয়েছিলেন, যাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ অন্যতম। বিচিত্রা বন্ধ হওয়ার পর এখানকার অন্যতম শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ কর ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চলে আসেন। অবনীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় নন্দলাল বসু 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষক

[৮০] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ", *কলা-বিদ্যা শান্তিনিকেতন পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, পৃ. ৬–৭
[৮১] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১
[৮২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* : দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০

হিসেবে নিযুক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯২০ সালে শান্তিনিকতনে যোগদান করেন। এ বছরের জানুয়ারিতে শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন অসিতকুমার হালদার। কিন্তু ১৯২৩ সালে অসিতকুমার কলাভবনের কাজ ছেড়ে জয়পুরের মহারাজের আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে নন্দলালই হন তার শিক্ষাধারার নিয়ন্ত্রক। ১৯২৩ থেকে ১৯৫১-তে তাঁর অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত কলাভবনের শিক্ষামূলক সকল কার্যক্রম তাঁর নির্দেশ ও আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালিত হয়েছে।[৮৩] বিশ্বভারতী কলাভবনে ক্লাস শুরু হয় ১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রম, শিক্ষাবর্ষে নির্ধারণ করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক আমলের কারখানাধর্মী শিক্ষায় আস্থাবান ছিলেন না। শিক্ষাকে তিনি জ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন, আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ। এই স্বাধীনতার আনন্দ ও সৃষ্টির আনন্দকে বাধাহীন করার লক্ষ্যে কোনো পাঠ্যসূচি, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাবর্ষ বন্ধনে কলাভবনকে আবদ্ধ করেননি। ১৯১৯-এ বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত প্রসপেক্টাসে লেখা হয় :

> ১. বিশ্বভারতী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান; ২. বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না, সেখানে ডিগ্রি ইত্যাদি দেওয়া হবে না; ৩. ছাত্রদের একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হবে কিন্তু তা পালন করার জন্য চাপিয়ে দেওয়া হবে না।[৮৪]

বিশ্বভারতী চারটি বিভাগ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১. উত্তর বিভাগ, ২. পূর্ব বিভাগ, ৩. কলাভবন এবং ৪. নারী বিভাগ। উত্তর বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, তুলনামূলক সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা ছিল; বিদ্যালয় পরিচিত হয় পূর্ব বিভাগ নামে; কলাভবন হয় কলা ও সংগীতচর্চা কেন্দ্র এবং নারী বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কলাভবনে দুটি সেশন চালু করা হয়, একটি জানুয়ারি থেকে, অন্যটি জুলাই থেকে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই দুটি সেশনের ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৪৯-এ দুটি সেশন একত্রে করে জুলাই থেকে সেশনের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।[৮৫] ১৯২০ সালের বিশ্বভারতীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কলাভবনে ছয়জন ছাত্র ও ছয়জন ছাত্রী এ সময় ছবি আঁকা শিখেছেন।[৮৬] এ থেকে জানা যায় যে, কলাভবনে ১৯২০ সাল থেকে সহশিক্ষা শুরু হয়েছিল। কলাভবনের ছাত্রদের কাজের মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল ব্যতিক্রম। প্রত্যেক ছাত্রের কাছে একটা করে খাতা থাকত, যেখানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ছাত্রের কাজ সম্পর্কিত মন্তব্য লিখে দিতেন। সেই মন্তব্যের ভিত্তি এবং প্রদর্শনীতে প্রদত্ত কাজ ছিল ছাত্রদের মূল্যায়নের উপায়। এখানে শিক্ষার নির্দিষ্ট

---

[৮৩] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
[৮৪] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
[৮৫] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণ না থাকলেও সাধারণত ছয় বছর শিখতে হতো। তবে উপযুক্ত মনে হলে তিন বা চার বছরেও শিক্ষা সমাপনের প্রশংসাপত্র দেওয়া হতো। কলাভবনের সূচনা পর্বে এখানে শিক্ষার মূল বিভাগ ছিল চিত্রকলা। ১৯৫২–৫৩ থেকে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। নন্দলাল বসু ১৯২৩ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত কলাভবনের পরিচালক ছিলেন। বাইরের চাপ, পরিষদীয় সিদ্ধান্ত, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতো কোনো অনুদানকারী সংস্থার শর্ত ইত্যাদির বাধ্যবাধকতায় বশীভূত তিনি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের ব্যাপারে তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নন্দলাল অবসর নেওয়ার অব্যবহিত পরেই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অধিগৃহীত হয়। আর তখন থেকে বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পরিকাঠামো গ্রহণ করে।[৮৭] নন্দলালের কলাভবনে যোগদানের সময় এখানকার ছাত্র ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুল ছেড়ে আসা অর্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরকচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মণ প্রমুখ। এরপর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং ক্রমে অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ এসে যোগ দেন। এই প্রথম পর্বের ছাত্রদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েই নন্দলাল নিজস্ব শিল্পশিক্ষা পদ্ধতিটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতোই শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা এবং নিয়মমাফিক শিক্ষাক্রম অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ যতখানি ভাব ও কল্পনাশ্রয়ী ছিলেন, নন্দলাল ততখানি ছিলেন না। শিল্পী হিসেবে যেমন শিক্ষক হিসেবেও তেমনই নন্দলাল নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতিকে সজীব প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।[৮৮] নন্দলাল মৌলিক রচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা–এই তিনের মিলে তাঁর শিল্পনীতিকে পরিচালিত করেছিলেন।[৮৯] কলাভবনের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন এই শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন কালের বিচিত্র শিল্পীমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী শিল্প-পরম্পরার সমষ্টিগত রূপ ছাত্র ও শিক্ষকরা লক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯০]

চিত্রের বিষয় নির্বাচনে নন্দলাল মহাকাব্য ও ইতিহাসনির্ভর ছিলেন এ সময়েও। কিন্তু এসব ছবির পাশাপাশি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণমূলক ছবিও প্রাধান্য পেতে শুরু করে তাঁর হাতে। শান্তিনিকেতনে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, মাঠে বিচরণরত মোষ, সাঁওতাল নারী-পুরুষ-শিশু, তালগাছের সারি, হাটযাত্রী পথিক ও

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭–৩৩৮
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
[৮৯] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকথা*, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৭
[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

মালবোঝাই গরুর গাড়ি; আর গাছপালা-ফুল-পাখি সবকিছুই অঙ্কিত হতে থাকল নন্দলাল আর তাঁর ছাত্রদের কলমে-তুলিতে।[৯১] প্রচলিত শিল্পমাধ্যমগুলোর পাশাপাশি নন্দলাল শান্তিনিকেতনে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত ধারা ছাপাই ছবি ও ভিত্তিচিত্রকেও গুরুত্বের সঙ্গে চর্চার উদ্যোগ নেন।

কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪–৮০) ১৯২৯ সালে এবং রামকিঙ্কর বেজ (১৯০৬–৮০) ১৯৩২ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর কলাভবনে শিল্পচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর বেজ এই তিনজন লিথোগ্রাফ, উডকাট, উড-এনগ্রেভিং, লিনোকাট, এচিং, ড্রাই পয়েন্ট ও অন্যান্য রীতিবহির্ভূত পদ্ধতিতে ছাপাই ছবি করে এমন সব উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, যার তুলনা ভারতের ছাপাই ছবির ইতিহাসে বিরল। তবে রামকিঙ্করের অবদান এ ক্ষেত্রে আরো বিশিষ্ট। ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে যেমন, ছাপাই ছবির কাজে, বিশেষত উডকাটে তিনি এমন এক বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন, যার তুলনা অন্য কোনো শিল্পীর কাজে মেলে না।[৯২]

ভারতীয় কলাশিল্পের এক মহত্তম নিদর্শন ভিত্তিচিত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নন্দলাল ভিত্তিচিত্রকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এর চর্চা শুরু করেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯২৭ সালে জয়পুর থেকে নরসিং লাল নামক একজন ফ্রেসকো শিল্পী আনা হয় শান্তিনিকেতনে। তিনি জয়পুর ফ্রেসকো পদ্ধতিতে পুরনো লাইব্রেরি ভবনের ওপরতলায় কিছু পরম্পরাগত রূপকল্প এবং কয়েকটি নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ছবি আঁকেন। এই ছবি আঁকার সময় ছাত্রদের সঙ্গে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথও গভীর নিষ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে জয়পুর রীতির বার্নিশ পদ্ধতির ফ্রেসকোর করণ-কৌশল শিখেছিলেন। সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করেই পরের বছর নন্দলাল আঁকেন শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ' দেয়াল চিত্রটি। নন্দলাল স্বীয় প্রচেষ্টায় ভিত্তিচিত্রে আধুনিকতা আনেন। তাঁর প্রবর্তিত আধুনিক ভিত্তিচিত্রের ধারা তাঁর দুই অগ্রগণ্য ছাত্র ধীরেন কৃষ্ণ ও বিনোদবিহারীর হাতে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।[৯৩]

কলাভবনে রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছিলেন পূর্ব-পশ্চিমের রূপ কলাচর্চার মিলন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি নন্দলালকে তাঁর চীন-জাপান (১৯২৪) ও সিংহল (১৯৩৪) ভ্রমণে সঙ্গী করেছিলেন। নন্দলালও তাঁর প্রাচ্যদেশগুলো ভ্রমণের অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন কলাভবনকে কেন্দ্র করেই। আবার ইউরোপ থেকেও আধুনিক কলাশিক্ষার শিল্পী ও শিল্প ঐতিহাসিকদের

[৯১] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

আহ্বান করে আনেন রবীন্দ্রনাথ। বিশের দশকের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে আসেন শিল্প ঐতিহাসিক স্টেলা ক্রামরিস (Stella Kramrisch,1896-1993), চিত্রকর আন্দ্রে কার্পেল এবং ভাস্কর লিজা ফন পট ও মাদাম মিলওয়াড। তাঁদের কাছ থেকেই কলাভবনের ছাত্ররা সরাসরি আধুনিক ইউরোপীয় কলাশিল্পের পাঠ নেন। স্টেলা ক্রামরিস তাঁদের ইউরোপীয় শিল্প ইতিহাসের সূত্রে জানালেন কিউবিজমসহ আধুনিককালের বিভিন্ন শিক্ষা আন্দোলনের কথা, তাঁদের নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা; কিছু তাঁরা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পেলেন আন্দ্রে কার্পেলের কাছে তেলরং আর গ্রাফিকসের মাধ্যমে। মাদাম মিলওয়াডের কাছ থেকে রামকিঙ্কর, সুধীর খস্তগীর প্রমুখ নিলেন আধুনিক ভাস্কর্যের শিক্ষা। এভাবেই নন্দলালের চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানেই অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় কলারীতির পরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র ধারায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুললেন কলাভবনের কোনো কোনো ছাত্র তার প্রথম যুগ থেকেই।[৯৪]

১৯৫১ সালে নন্দলাল অবসরে যাওয়ার পর ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। কলাভবন শুরু হয়েছিল স্টুডিওভিত্তিক শিল্পচর্চার কেন্দ্র হিসেবে, প্রবল প্রতিপক্ষ ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার দেশীয় প্রত্যুত্তর হিসেবে।[৯৫] বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নন্দলাল কলাভবনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রসূত শিল্পচর্চার একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে বাংলার আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে।

[৯৪] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
[৯৫] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস

খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা গ্রামে শিল্পী শশিভূষণ পাল ১৯০৪ সালে 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস'[৯৬] প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে এই বিদ্যালয়টি বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্কুলটি শশিভূষণের একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। শশিভূষণ যখন এখানে আর্ট স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমি, মহসীন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, গুরু ট্রেনিং স্কুল, মক্তব, আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল।[৯৭]

শশিভূষণ পাল ১৮৭৮ সালে (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) খুলনা জেলার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৌলতপুর এন্ট্রান্স স্কুলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন।[৯৮] তাঁর শিল্পশিক্ষার বিষয়ে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। ডা. খগেন্দ্রনাথ বসু 'মহেশ্বরপাশা পরিচয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> ...তাঁহার [শশিভূষণ] পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইতে হয়, কিন্তু অনেককাল হইতেই চিত্রাঙ্কনে শশিভূষণের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত, এই সময়ে তিনি কলিকাতা আর্ট স্কুল হইতে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়মাবলী আনয়ন এবং জনৈক বিখ্যাত চিত্রকরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া বাটীতে বসিয়াই চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।[৯৯]

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা মতে শশিভূষণ পাল আর্ট স্কুলে ভর্তি না হয়ে নিজ চেষ্টায় এবং জনৈক শিল্পীর উপদেশে চিত্রাঙ্কনের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু কমল সরকার 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর অধ্যক্ষতাকালে কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে তিনি চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করেন।'[১০০] শোভন সোম 'শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত' গ্রন্থে অনুরূপ তথ্যের উল্লেখ

---

[৯৬] স্কুলটির নাম বিভিন্ন গ্রন্থ ও ও নথিপত্রে দু'ভাবে লিখিত হয়েছে। কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্টস' (পৃ. ১৯৬); সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস-১ম খণ্ড*, কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশনস, প্রথম সংস্কার, ২০০১-এ দৌলতপুর পরিচিতিতে স্কুলটির নাম উল্লেখ করেছেন, 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস'; আর্ট স্কুলের সনদপত্র ও প্যাডে স্কুলটির নাম 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস' লিখিত হয়েছে।

[৯৭] সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১ [প্র.প্র. ১৯১৪], পৃ. ৯৯

[৯৮] কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৬

[৯৯] খগেন্দ্রনাথ বসু, *মহেশ্বরপাশা পরিচয়*, কলিকাতা, প্রকাশক : সারদাপ্রসাদ মণ্ডল, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৪

[১০০] কমল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

করেছেন।[১০১] তবে খগেন্দ্রনাথ বসু শশিভূষণের শৈশবের যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন সে ক্ষেত্রে কলকাতায় থেকে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে ছবি আঁকা শেখা তাঁর কাছে খুবই কঠিন ছিল বলে মনে হয়।

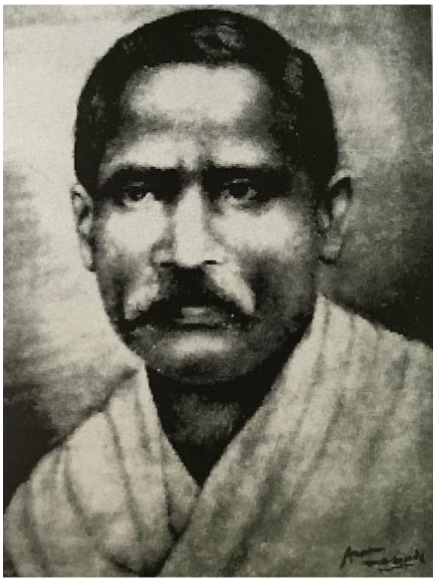

চিত্র-১১ : শিল্পী শশিভূষণ পাল, উৎস : শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ

তাঁর লেখা এই গ্রন্থটি শশিভূষণের জীবদ্দশায় ১৯২৯ সালে (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত। সুতরাং শশিভূষণের শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত খগেন্দ্রনাথের মতামতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর ছিলেন। তিনি পশ্চিমা ধারায় প্রভাবিত হয়ে তৈলচিত্রের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি শিল্পশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লক ও জবিনসের অনুসারী ছিলেন।[১০২] মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় একাডেমিক ধারাকেই বেছে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল পরগনার পাকুড় রাজ হাই স্কুলে ড্রইং শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এখানে দুই বছর শিক্ষকতার পর তিনি দৌলতপুর ও সেনহাটিতে দুটি স্কুলে ড্রইং শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। গ্লাসগো এবং প্যারিস প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয় এবং তিনি পুরস্কৃত হন। এ ছাড়া তাঁর আঁকা অনেক ছবি ভারত ও ইংল্যান্ডে বহু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার অর্জন করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর আঁকা ছবি সংগৃহীত আছে।[১০৩]

---

[১০১] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
[১০২] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
[১০৩] কমল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ১৪ বছর ছাত্রদের সামান্য বেতন ও বিভিন্নজনের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে। ১৯১৭ সাল থেকে আর্ট স্কুলের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী হওয়া শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি পাঠানো শুরু হয় এই সময় থেকে। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয় জেলা বোর্ড ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান লাভ করে। ১৯২০ সালে বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মহাতাব এবং তদানীন্তন বাংলার ডিপিআই (Director of Public Instruction) মি. ডাব্লিউ ডাব্লিউ হর্নেল (Mr. W W Hornell) এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন। শশিভূষণ তাঁর শিল্পদক্ষতা ও বিনয়ী চরিত্রের কারণে ব্রিটিশ সরকারের ভারতস্থ উচ্চপদস্থদের আনুকূল্য লাভ করেন। ১৯২২ সালের জুলাই মাসে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড লিটন শশিভূষণের বাড়িতে আসেন এবং আর্ট স্কুল পরিদর্শন করেন। এ বছরে লন্ডনের ওয়ামশি পার্কে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা অংশ নেন এবং একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। শিল্পচর্চা ও শিল্পশিক্ষায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ১৯২৫ সালে সরকার তাঁকে রায় সাহেব খেতাবে সম্মানিত করে।[১০৪] ১৯২৮ সালে খুলনার মহেশ্বরপাশায় যশোর রোডের পশ্চিম পাশে আর্ট স্কুলের একতলা পাকা ভবন নির্মিত হয়। উদ্বোধনী ফলক থেকে জানা যায়, ভবনটি বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। তবে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৭ সংখ্যায় আর্ট স্কুলের এই ভবন মহসিন ফান্ডের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[১০৫] ১৯২৯ সালে এই ভবনে আর্ট স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন ভবনে আসার পর আর্ট স্কুলের কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়। এ সময়ে আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং শিক্ষকদের আয় সম্পর্কিত কিছু শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'খুলনা জেলার শিক্ষার অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেমের লেখা এই প্রবন্ধ মোহাম্মদী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে খুলনা জেলার ওই সময়ের সামগ্রিক শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসকে এখানে শুধু 'শিল্প বিদ্যালয়' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় ৮১১ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে এটি ছিল একমাত্র শিল্প বিদ্যালয়। ওই সময়ে এই আর্ট স্কুলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ছিয়াশি জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল পঞ্চান্ন জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিল একত্রিশ জন। মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগারো জন। এখানে শিল্পশিক্ষার খরচ ছিল অন্যান্য

---

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[১০৫] মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের ভবনের উদ্বোধনী ফলক; এখানে লেখা আছে 'THIS BUILDING HAS BEEN ERECTED BY GOVERNMENT UNDER THE KIND PATRNAGE OF H.H. THE MAHARAJADHIRAJ BAHADUR OF BURDWAN.' "চিত্রে মোহছেন কীর্তি", *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩৩৭, এখানে মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের একটি আলোকচিত্র ছেপে তার নিচে ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে 'মোহছেন ফান্ড পৃষ্ঠপোষিত দৌলতপুর চিত্রশিল্প বিদ্যালয়'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার খরচের তুলনায় অনেক বেশি। এই প্রবন্ধে দেখা যায়, যেখানে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়তে একজন ছাত্রের মাসিক ব্যয় হয় গড়ে চার টাকা সেখানে শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য একজন ছাত্রের মাসিক গড়ে পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়। এই আর্ট স্কুলের শিক্ষকের মাসিক আয় খুলনার অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় ছিল বেশি। ওই সময়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক গড় আয় ছিল চল্লিশ টাকা, মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিশ টাকা, মাদ্রাসা শিক্ষকের পঁচিশ টাকা, টোলের পণ্ডিতের বিশ টাকা, ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকের আটচল্লিশ টাকা এবং শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পঞ্চাশ টাকা।[১০৬] এই প্রবন্ধে উল্লিখিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ও শিক্ষকদের মাসিক অধিক আয় থেকে ধারণা করা যায় ওই সময়ে আর্ট স্কুলটি বেশ প্রতাপের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে। এই স্কুলে অধিক সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হওয়ার তথ্যটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র-১২ : মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস, ১৯৩০ সাল, উৎস : মাসিক মোহাম্মদী

চিত্র-১৩ : মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ভবনের উদ্বোধনী ফলক আলোকচিত্র : গবেষক

কারণ প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলায় প্রথম দিকে গড়ে ওঠা আর্ট স্কুলগুলোর মধ্যে ছাত্রী ভর্তি হয় শান্তিনিকেতনে ১৯২০ সালে; এর অনেক পরে ১৯৩৯ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে। কিন্তু মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলে ১৯২৯ সালে একত্রিশ জন ছাত্রী (হিন্দু ও মুসলমান) শিক্ষারত ছিল। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায়, বেশ আগে থেকে এখানে ছাত্রী ভর্তি হতে শুরু করেছিল। কারণ এখানে নারীশিক্ষার উপযোগী বিষয় এমব্রয়ডারি ও নিডল ওয়ার্ক শেখানো হতো। এ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একজন নারী শিক্ষক (কামিনী সুন্দরী দেবী) এখানে নিয়োজিত ছিলেন।

---

[১০৬] ডা. মোহাম্মদ আবুল কাসেম, "খুলনা জেলায় শিক্ষার অবস্থা", *মাসিক মোহাম্মদী*, কোলকাতা, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০০–৬০১

শশিভূষণ পাল আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধ্যক্ষতাকালই ছিল আর্ট স্কুলের সুবর্ণ সময়। তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৪৬) আর্ট স্কুলটি জৌলুস হারাতে থাকে। এখানে বিভিন্ন সময় শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন পুত্র সুধাংশুভূষণ পাল, তাঁর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ পাল, প্রমথনাথ পাল প্রমুখ। শশিভূষণ পাল অবসরে যাওয়ার পর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন সুধাংশুভূষণ পাল (১৯৪৫–১৯৪৯)। ১৯৪৯ সালে তিনি ভারত চলে গেলে তাঁর স্থলে অধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ পাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনিও ভারতে চলে যেতে বাধ্য হলে ১৯৬৫ সালে এ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলাউদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে শিল্প বিদ্যালয়টি কলেজে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই এ বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন।[১০৭]

১৯৫৩–৫৭ সময়কালে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব ফাইন আর্টস থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীকালে এই স্কুলের অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ ও ১৯৫৫–৫৬ সময়কালে এই আর্ট স্কুল থেকে শিল্পশিক্ষা নেওয়া খুলনার বাইতিপাড়া নিবাসী কালীপদ দাসের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এখানে চার বৎসরের কোর্সে ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস দেওয়া হতো।'[১০৮] শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ও বিষয়ের ওপর এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। জলরং, সস পেইন্টিং, অয়েল পেইন্টিং, ক্লে-মডেলিং, মোল্ডিং ও এমব্রয়ডারি বা নিডল ওয়ার্ক এখানে শেখানো হতো। ফিগার ড্রইং, ফিগার পেইন্টিং, পোর্ট্রেট ড্রইং, কপি ওয়ার্ক, স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ, ফিগার কম্পোজিশন ইত্যাদি বিষয় পাশ্চাত্য ধারায় শেখানো হতো।[১০৯] শশিভূষণের পত্নী কামিনী সুন্দরী পাল (১৮৮৩–১৯৩৭) নিডল ওয়ার্কে পারদর্শী ছিলেন এবং তিনিই বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এই গুণী শিল্পী সম্বন্ধে ১৯১৫ সালের ১৬ আগস্ট 'দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ লেখা হয়।

> Mrs. Kamaini Sundari Pal, the famous needle work artist, whose portrait as will as her needle work picture of Milton are published in this number has recived medals and commedation from various parts of the world. Her needle work pictures of 'Battle of plassey' and of 'Gladstone' have found a place of honour in the London Art Gallery.[১১০]

---

[১০৭] (১৯৫৬–১৯৮৩) মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের সাবেক অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, তারিখ : ২৩-৩-২০১৫

[১০৮] মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের সাবেক অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত; মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের সাবেক শিক্ষার্থী কালীপদ দাসের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, বাইতিপাড়া, খুলনা, তারিখ : ২৩-৩-২০১৫

[১০৯] মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অগ্রাণী, "মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট (১৯০৪–১৯৮৩)", টোকন ঠাকুর (সম্পা.), *ছিন্ন পাতার সাজই তরণী*, খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. অনুল্লেখ

[১১০] শংকর কুমার মল্লিক, "শিল্পী শশিভূষণ পাল ও মহেশ্বরপাশা স্কুল অফ আর্ট" মো. শেখ সাদী ভূঁঞা (সম্পা.), শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ, চারুকলা স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ৪৭

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শশিভূষণের পত্নী কামিনী সুন্দরী পাল সুচিশিল্পের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শশিভূষণের মৃত্যুর পর আর্ট স্কুলটির কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে একটি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে শিল্পরসিক সকলের মনোযোগ সেদিকে পড়ে। দেশবিভাগের ফলে আর্ট স্কুলটি পাকিস্তান সরকারের যাবতীয় সহায়তা হারাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে শশিভূষণের পরিবারের সদস্যরা ভারতে চলে যাওয়া এবং ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ পালও দেশ ত্যাগ করার ফলে আর্ট স্কুলটির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আলাউদ্দিন আহমেদের প্রচেষ্টায় স্কুলটি কোনো রকমে চালু থাকে। অতঃপর ১৯৮৩ সালে স্কুলটি শশিভূষণ আর্ট কলেজে উন্নীত হয়। অবশ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'খুলনা আর্ট কলেজ'।[১১১]

মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ছিল শশিভূষণ পালের একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা একটি শিল্প বিদ্যালয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মফস্বলে থেকে শিল্পচর্চা ও শিল্পের শিক্ষকতা করে তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বাংলার বড় লাটের স্নেহভাজন হওয়া, বর্ধমানের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ, একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং রায় সাহেব খেতাব প্রাপ্তি তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা ও সাংগঠনিক গুণাবলির কারণে সম্ভব হয়েছিল। আর্ট স্কুলটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী একচল্লিশ বছর (১৯০৪–৪৫) পর্যন্ত তিনি পরিচালনা করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি স্কুলটি পরিচালনা করেছিলেন পশ্চিমা সাদৃশ্যবাদী এবং ব্যক্তিগত শিল্প ধারণাকে প্রাধ্যন্য দিয়ে।[১১২] তাঁর অধ্যক্ষতাকালে অন্য কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীকে এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত করা হয়নি। এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরাই শুধু এখানে শিক্ষকতা করেছেন। ফলে সর্বভারতীয় পর্যায়ের শিল্পের সমকালীন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম একটি আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এসব কারণে শশিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি গড়ে ওঠেনি। এরপর দেশবিভাগের পর স্কুলটির যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তা সামাল দেওয়ার মতো নেতৃত্ব বা শিক্ষক সেখানে ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ছিল বর্তমান বাংলা ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্পশিক্ষা দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে

[১১১] মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অঘ্রাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১১২] আবুল মনসুর, "ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ২৬

প্রতিষ্ঠানটি।[১১৩] পূর্ব বাংলার সর্বপ্রথম শিল্পবিদ্যালয় হিসেবে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের এবং এর প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে শশিভূষণের গুরুত্ব বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে অপরিসীম।

কারখানার আওতা থেকে মুক্ত করে ষোলো শতকে ইউরোপে চারুশিল্পের যে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল, অনেক বিবর্তনের পর উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মাধ্যমে তা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উনিশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, লাহোর এবং জয়পুরে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এবং আর্ট স্কুল নামে। মূলত নির্মাণ সহায়ক কারিগরি প্রয়োজনে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কৈলিক বৃত্তিমূলক শিল্পচর্চার বলয় ভেঙে সর্বজনীন শিল্পশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এ সকল শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ধারায় শিক্ষা দেওয়ার ফলে দ্রুত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিল্পচর্চার বিস্তার ঘটে এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে ও পাশ্চাত্য শিল্পধারার আগ্রাসনে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারাগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। এই ম্রিয়মাণ শিল্পধারাকে সজীব করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট স্কুলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করে। এরপর ফাইন আর্ট বিভাগকে বিভক্ত করে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারা চিত্রচর্চার জন্য আলাদা বিভাগ করা হয়। এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রাচ্যধারার চিত্রচর্চা বিকাশের জন্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের স্কুল গড়ে ওঠে (১৯১৯)।

কলকাতা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে ইউরোপিয়ান তথা ইংরেজদের আধিপত্য ছিল। ১৮৬৯ সালে এখানে প্রথম তিনজন বাঙালি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এরপর বিশ শতকের শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান এবং যোগদানের অব্যবহিত পরে তিন বছরের জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৮ সালে মুকুল দের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে আর্ট স্কুলে বাঙালিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলালের অধ্যক্ষতায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়ে বিশ্বজনীন শিল্পচর্চার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। যেখানে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যয় আর রামকিঙ্করের মতো শিল্পীরা বিভিন্ন মাধ্যমে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল

[১১৩] আবুল মনসুর, "ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

চর্চার মাধ্যমে আধুনিক শিল্পচর্চার সূত্রপাত ঘটান। কলাভবনের এই আধুনিকতার প্রভাব কলকাতা আর্ট স্কুলকেও স্পর্শ করেছিল মুকুল দের সময়ে।

কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শুরু হলেও বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ে এসে এটি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। অধ্যক্ষ লক ও জবিনস এখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাক্রম কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। অধ্যক্ষ হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ধারার পাশাপাশি ভারতীয় শিল্পঐতিহ্য আশ্রিত প্রাচ্যশিল্প শিক্ষাকে এখানকার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত এবং গুরুত্ব সহকারে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। অধ্যক্ষ মুকুল দের সময়ে এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ধারায় শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এসে বাংলায় শিল্পশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। কলকাতায় দি আলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স অ্যান্ড স্কুল অব টেকনিক্যাল আর্ট (১৮৭৬), দি ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্ট (১৮৯৩), খুলনায় মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস (১৯০৪), কলকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট পরিচালিত আর্ট স্কুল ইত্যাদি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের স্কুল ব্যতীত অন্যান্য আর্ট স্কুল ছিল পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত।

বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা সারা ভারতের চারুশিল্প আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন যুগ যুগ ধরে। দেশবিভাগের পর এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল শিল্পী ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার বীজ বপন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার পটভূমি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। ভারত ভাগ হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অনেকেই 'অপশন'-এর সুযোগ নিয়ে ভারতে চলে যায় এবং ভারত থেকে অনেক মুসলমান পূর্ব বাংলায় চলে আসে। দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতার দরজা পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক পার্থক্য ও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের যুক্ত হওয়া ছিল কঠিন। এমন পরিস্থিতিতে দেশভাগের পরে পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে ঢাকার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ঢাকাকে ঘিরে এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব উদ্দীপনা শুরু হয়। দেশভাগের ফলে কলকাতা থেকে আসা ও ফেরা শিল্পীরা পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকায় একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা শুরু করেন।

ঢাকা প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ নগর হওয়া সত্ত্বেও বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে সামাজিকভাবে শিল্পচর্চার কোনো পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠেনি। অথচ কলকাতা যখন ছিল কয়েকটি বাণিজ্যিক গ্রাম মাত্র, ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী।[১] ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, রাজা বল্লাল সেনের আমলে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। ঢাকেশ্বরী মন্দির ঘিরে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল তাই আদি ঢাকা। ১৬১০ সালে (মতান্তরে ১৬০৮) মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁ বাংলায় এসে ঢাকাতে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে তিনি শহরের নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। ধারণা করা হয়, নগর হিসেবে ঢাকার বিকাশ শুরু হয় তখন থেকেই। ১৭১৩/১৪ সালে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। তখন ঢাকা শাসিত হতে থাকে প্রথমে নায়েবে নাজিম এবং এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পর থেকে ক্ষয় শুরু হয়েছিল ঢাকার।

---

[১] ফয়েজুল আজিম, "সাম্প্রতিক শিল্পকলা : পাকিস্তান পর্ব ও বাংলাদেশ", স্বপন ধর (সম্পা.), *পত্রপুট*, ময়মনসিংহ, ব্রহ্মশৈলী, ২০১৪, পৃ. ১৮২

কোম্পানি আমলে তা হয়ে ওঠে দ্রুততর। শহর হয়ে ওঠে জঙ্গলময়, বায়ু হয় দূষিত, হ্রাস পায় জনসংখ্যা, প্রায় লুপ্ত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য। ১৮৩০ সালে ঢাকা একটি বিভাগীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর পর থেকে আবার পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন চোখে পড়ে শহরের। তখন পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ছিল নেহাতই একটি মফস্বল শহর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা পরিণত হয় নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানীতে। তখন শহরের অবকাঠামোগত কিছু পরিবর্তন হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে রাজধানীর মর্যাদা হারায় ঢাকা এবং শহরের উন্নয়নও স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়।[২]

মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে কেন্দ্রীয় শিল্পকলার প্রভাব বিস্তার ও চর্চা দেখা যায়। কিন্তু ঢাকা অনেককাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও শিল্পপ্রেমী মুঘল শাসকশ্রেণি এখানে শিল্পচর্চার কোনো কেন্দ্র গড়ে তোলেননি। 'পূর্ববঙ্গের বৈরী প্রকৃতি এবং মুঘল সুবেদারদের অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহে লেগে থাকতে হতো বলে সম্ভবত এ ব্যাপারে তারা বিশেষ নজর দিতে পারেনি।'[৩]

ঢাকায় শিল্পচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে এখানে শিল্পচর্চা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে আলম মুসাব্বির নামে একজন শিল্পী ঢাকায় অনুষ্ঠিত মহররম ও ঈদের মিছিলের ৩৯টি জলরং চিত্র এঁকেছিলেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ধারণা করা হয়, ঢাকার নিমতলী প্রাসাদের নায়েব নাজিম নুসরত জংয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মিছিলের ছবিগুলো আঁকা হয়।[৪] মুর্শিদাবাদ নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহররম ও খাজা খিজির উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হতো এবং মিছিলকে সজ্জিত করার জন্য শিল্পী নিয়োজিত করার রেওয়াজ ছিল। মিছিল সজ্জিত করার জন্য তাঁরা দিল্লি থেকেও শিল্পী নিয়ে আসতেন। ঢাকার মহররম মিছিলের চিত্রের বিষয় ও শৈলী দেখে তাঁকে মুর্শিদাবাদ শিল্পীদের কোনো বংশধর বলে অনুমিত হয়। আলম মুসাব্বিরের আঁকা এই ছবিগুলো ঢাকার শিল্প ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি এখানে কোনো শিল্পধারা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না।

কলকাতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন শহর হওয়া সত্ত্বেও বহিরাগত কোনো শিল্পশৈলীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঔপনিবেশিক আমলে অনেক ইউরোপীয় চিত্রকর কলকাতায় এসেছিলেন

---

[২] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১*, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০১৩,পৃ. ৯৪–৯৯

[৩] ফয়েজুল আজিম ও আবুল মনসুর, "কোম্পানী শৈলী ও ভারতে আগত চিত্রকর", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ১১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

এবং তাঁদের শিল্পচর্চা ও শিল্পশৈলী স্থানীয় শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের মধ্যে চার্লস ডয়েলি (১৭৮১–১৮৪৫) এবং জর্জ চিনেরি ঢাকায় অবস্থান করে চিত্রচর্চা করলেও তাঁদের প্রভাব স্থানীয় শিল্পীদের ওপর পড়েনি। অন্যদিকে কলকাতার কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আদি বাঙালি চিত্রকরদের যে সমাবেশ ঘটে, ঢাকার প্রাচীন মন্দির ঢাকেশ্বরীকে কেন্দ্র করে সে রকম কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়নি। এ ছাড়া কলকাতার বটতলায় পুস্তক অলংকরণের মাধ্যমে একটি শিল্পীগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলেও ঢাকায় গড়ে ওঠা (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু) চকবাজার কেতাবপট্টিকে ঘিরে কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ ছিল সম্ভবত ঢাকার কেতাবপট্টির প্রকাশকদের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব এবং ঢাকায় দক্ষ চিত্রকর বা খোদাইকারের অভাব।[৫]

উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের শিক্ষাসংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। সেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লর্ড মেকলের অভিমত এবং আরো কিছুকাল পরে ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের ডেচপাস ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ ক্ষেত্রে মেকলের অভিমত ছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণির লোক তৈরি করা, যাঁরা রক্ত-বর্ণে হবেন ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবেন ইংরেজদের মতো। আর চার্লস উড সুপারিশ করেছিলেন ইংরেজি ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের।[৬] তাঁর সুপারিশে শিল্পশিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গড়ে তোলার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ভারতে শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতির বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। তা হলো, ব্রিটিশদের দাপ্তরিকসহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতার জন্য এ দেশীয় জনশক্তি তৈরি করা। তবে উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, ব্রিটিশদের এই উদ্যোগের ফলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়। ভারতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য সরকার প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রধান প্রধান শহরে স্কুল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কলেজিয়েট স্কুল (১৮৩৫)।[৭] সরকার ১৮৪০ সালে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের জন্য জনশিক্ষা সমিতির রেগুলেশনের মাধ্যমে সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড ক্লাসে অঙ্কন, বাস্তরূপ অঙ্কন (ড্রাফটসম্যানশিপ) ও জরিপ শিক্ষণীয় বিষয় করে।[৮] স্কুল-কলেজে শিক্ষকের চাহিদা

---

[৫] ফয়েজুল আজিম, "সাম্প্রতিক শিল্পকলা : পাকিস্তান পর্ব ও বাংলাদেশ", প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৭–৮৮

[৬] মোহাম্মদ ইলিয়াস ও সন্তোষ কুমার ইন্দু, *শিক্ষার ইতিহাস*-৩, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৫৭, ৬৭, ৭০ ও ৮২

[৭] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৮] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

পূরণের জন্য কলকাতা আর্ট স্কুলে ১৮৮৮–৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে টিচারশিপ ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করে। সেখান থেকে প্রথমবারে পাস করা চারজনের মধ্যে একজনকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৯] ১৮৫৫ সাল থেকে শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় হিসেবে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে[১০] এবং সেখানে অঙ্কনবিদ্যা গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে সরকার এন্ট্রান্স পরীক্ষার বিষয় হিসেবে গণ্য না করেও অঙ্কনবিদ্যাকে স্কুলে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যায়।[১১] এরপর বিভিন্ন জেলা শহরে গড়ে ওঠা জেলা স্কুলগুলোতেও অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। এসব স্কুল-কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে থাকেন প্রধানত আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছিল। ড্রইং টিচারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য একাডেমিক শিক্ষার বাইরে স্বশিক্ষিত শিল্পীদেরও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতার আর্ট স্কুলের মেধাবী ছাত্র ও বিখ্যাত শিল্পী পরেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৯১–১৯৭৭), মাখন দত্ত গুপ্ত (১৯৬৬–?) যথাক্রমে সৈয়দপুর রেল স্কুলে, নোয়াখালী সরকারি স্কুলে এবং কৃষ্ণ লাল দাশ চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলে ও নর্মাল স্কুলে ড্রইং শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[১২] শশিভূষণ পাল মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষতার পাশাপাশি দৌলতপুর ও সেনহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। স্কুল পর্যায়ের এ সকল শিক্ষকের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে। তাঁদের কাছ থেকে চিত্রকলার বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষার জন্য কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্ট স্কুলে পাড়ি জমাতেন।

পূর্ব বাংলার দুই-তিনজন শিল্পরসিক মহারাজা ও জমিদার এ অঞ্চলের শিল্পের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। এ ছাড়া কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার ও স্কুল উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন। মুক্তাগাছার জমিদারের আর্থিক সহযোগিতায় কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়তে যান প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার (?–১৯৪৬)। শশী কুমার হেশ (১৮৬৯–?) সন্তোষের জমিদার জাহ্নবী দেবী চৌধুরাণী ও মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপে চিত্রশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সন্তান শিল্পী সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[১০] গৌরদাস হালদার, *শিক্ষা প্রসঙ্গে : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, আধুনিক যুগ*, কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৭০

[১১] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[১২] কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৭, ১০১ ও ১৬৩

বর্মা (১৮৬২–১৯৩৫) কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্রদের স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ১৮৮৮–৯১ সাল পর্যন্ত ।[১৩]

উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলে কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু তাতে এ অঞ্চলের ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা থেমে থাকেনি । তখন শিল্পচর্চা বা শিল্পশিক্ষায় উৎসাহী সকলেই ছিল কলকাতামুখী । শিল্পশিক্ষার জন্য তাঁরা কলকাতায় পাড়ি জমাতেন । সেখানে গিয়ে প্রধানত ভর্তি হতেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে । বিশ শতকের শুরুতে খুলনায় একটি আর্ট স্কুল গড়ে উঠলেও এ অঞ্চলের শিল্পশিক্ষার্থীদের মধ্যে কলকাতা আর্ট স্কুলের আবেদনকে ম্লান করতে পারেনি । কলকাতা আর্ট স্কুল ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান । বিখ্যাত শিল্পী ও শিক্ষকদের সমাবেশ ছিল সেখানে । এ ছাড়া কলকাতা রাজধানী শহর হওয়ায় শিক্ষানবিশ শিল্পীদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ছিল সেখানে । শিল্পের বাজারও কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ায় সেখানে শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠারও সুযোগ ছিল । এ সকল কারণে পূর্ব বাংলার সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা শিল্পশিক্ষা ও শিল্পসংক্রান্ত কাজের জন্য কলকাতায় যেতেন । পূর্ব বাংলায় কয়েকটি স্কুল শিক্ষকের পদ ছাড়া কর্মসংস্থানের বিশেষ সুযোগ ছিল না । ফলে আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্ররা আর এ দেশে ফিরে না এসে জীবিকার তাগিদে কলকাতা অথবা ভারতের অন্যান্য শহরে চলে যেতেন । যাঁরা ফিরতেন তাঁরা স্বল্প বেতনের স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত হতেন অথবা জীবিকার তাগিদে ব্যবহারিক শিল্প অথবা কারুশিল্পে মনোনিবেশ করতেন ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী শিল্পশিক্ষার জন্য কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলসহ অন্যান্য আর্ট স্কুলে শিল্পশিক্ষা নিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন । কমল সরকার রচিত 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় ও ইউরোপীয় তিনশ বিয়াল্লিশ জন শিল্পীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন । যাঁদের মধ্যে তিয়াত্তর জনের জন্মস্থান ছিল পূর্ব বাংলায় । তাঁদের জন্মস্থান পূর্ব বাংলায় হলেও অধিকাংশের কর্মস্থল ছিল কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন শহরে । কেউ কেউ ইউরোপেও অবস্থান করেছিলেন । তাঁদের অধিকাংশের বাল্য ও শৈশবকাল কেটেছে পূর্ব বাংলায় । তাঁদের শিল্পমানস গঠনে বিশেষভাবে প্রভাব পড়েছিল এই বাংলার আলো-হাওয়া, জলা-জঙ্গল আর নদীবিধৌত পলল ভূমি ।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বৃহত্তর ঢাকা জেলার ধরনী সেনগুপ্ত (১৯৯০–৮২), প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (১৯০০–৭৫), মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫–১৯৮৯), রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮–৯৫),

[১৩] কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯, ১৯৭ ও ২১০

প্রদোষদাস গুপ্ত (১৯১২–৯১), প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার (?–১৯৪৬), ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮–১৯৯৬), বরদাচরণ উকিল (১৮৯৫–১৯৬৭), সারদাচরণ উকিল (১৮৯০–১৯৪০) মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রমুখের নাম। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অতুল বসু (১৮৯৮–১৯৭৭), উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩–১৯১৫), ইন্দুসুধা ঘোষ, শশী কুমার হেশ (১৮৬৯–?), হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৪–১৯৪৮), ফণীভূষণ গুপ্ত (১৯০০–৫৬), প্রমুখ রংপুরের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৯–১৯৭৫), ফরিদপুরের গগেন মহারাজ (১৮৮৪–১৯৪১) ও অর্দ্ধেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২–৬৪), রাজশাহীর সুরেন্দ্রনাথ বাগচী (১৮৮৩–১৯৪৯), নাটোরের সত্যেন্দ্রনাথ বিশি (১৯০৮–৮০), যশোরের নরেন্দ্র কিশোরী রায়, মনোজমোহন বসু (১৯০২–৭৬), খুলনার শশিভূষণ পাল (১৮৭৮–১৯৪৬), বরিশালের ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় (১৯০১–৬৫), দুর্গানাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৫–১৯৪৭) ও হরিপদ রায় (১৮৯৫–১৯৭১), চাঁদপুরের রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২–৫৫), চট্টগ্রামের দীনেশ রঞ্জন দাস গুপ্ত (১৮৮৮–১৯৪১) প্রমুখ শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেন।[১৪]

এ সকল শিল্পীর অধিকাংশ পূর্ব বাংলার বাইরে অবস্থান করলেও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বাংলায় অবস্থান করত। ফলে পূর্ব বাংলায় তাঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাঁদের মাধ্যমে এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এ অঞ্চলের শিল্পরসিক ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের ওই সময়ের সমকালীন শিল্পের প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারতেন। শিল্পী হিসেবে তাঁদের খ্যাতি এ অঞ্চলের তরুণদের শিল্পশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

কলকাতাবাসী শিল্পীদের নিজ অঞ্চলে এসে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন শেখানোর দু-একটি উদ্যোগ সম্পর্কে জানা যায়। কমল সরকারের 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শান্তিনিকেতন কলাভবনের কারুসঙ্গের সদস্য ইন্দুসুধা ঘোষ শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে ময়মনসিংহের জনৈক শিল্পীর কাছে চিত্রকলা অনুশীলন করেছিলেন।[১৫] ঔপনিবেশিক আমলে ময়মনসিংহ অঞ্চল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মহারাজা ও জমিদারদের সহযোগিতা ছিল। শশী কুমার হেশ, অতুল বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ফণীভূষণ গুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীর প্রভাবে এ অঞ্চলে শিল্পানুরাগী একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

---

[১৪] কমল সরকার, *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী*, প্রাগুক্ত
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলার মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর হওয়া সত্ত্বেও এখানে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। এ অঞ্চলে তাঁতশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে তার অবনতি ঘটে। পূর্ব বাংলায় যে কয়েকটি বিত্তশালী পরিবার ছিল ঢাকার নবাব পরিবার ছিল তার মধ্যে অন্যতম। প্রচণ্ড প্রতাপশালী ঢাকার নবাবরা ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুগত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ধারার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতেন ঢাকায়। নবাব পরিবারের সদস্য মেহের বানু খানম (১৮৮৫–১৯২৫) শিল্পচর্চা করতেন।[১৬] কিন্তু শিল্পচর্চার বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের অবদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ঢাকায় মুসলমান বিত্তশালীদের মধ্যে নিমতলী প্রাসাদের নায়েব নাজিম শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নুসরত জংয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রচর্চার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রায় দুইশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার কোনো খ্যাতিমান শিল্পী, জমিদার বা রাজা এই অঞ্চলে কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের মধ্যে প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন জলা জঙ্গলে ভরা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ জেলা খুলনার দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা গ্রামের শিল্পী শশিভূষণ পাল। ১৯০৪ সালে মহেশ্বরপাশা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস নামের একটি শিল্প বিদ্যালয়।[১৭] তিনি ছিলেন দি ইন্ডিয়ান স্কুল অব আর্টের প্রতিষ্ঠাতা মন্মথনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ধারায় শিল্পশিক্ষা দেওয়া হতো। পাশ্চাত্য ধারায় চিত্র ও ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষাদানের পাশাপাশি এখানে এমব্রয়ডারি ও নিডল ওয়ার্কের ওপর শিক্ষা দেওয়া হতো। ফলে শুরু থেকে এখানে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'খুলনা জেলার শিক্ষার অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ওই সময়ে আর্ট স্কুলে একত্রিশ জন ছাত্রী এবং পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র ছিল।[১৮] শিক্ষকদের মাসিক আয় খুলনার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অপেক্ষা ছিল বেশি। স্কুলটি দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই চলেছিল। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব ছিলেন আর্ট স্কুলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। মফস্বলে শিল্পশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য শশিভূষণ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রায় সাহেব খেতাবে (১৯২৫) ভূষিত হন। স্কুলের জন্য সরকারি অনুদান প্রাপ্তি (১৯১৮), বর্ধমানের মহারাজা ও বাংলার ডিপিআই (১৯২০) এবং বাংলার বড় লাট লর্ড লিটনের মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুল পরিদর্শন (১৯২২), স্কুলের পাকা ভবন নির্মাণ (১৯২৮)[১৯] ইত্যাদি বিষয় মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের শক্তিশালী অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শশিভূষণ বিনয়ী স্বভাব ও কর্মদক্ষতা

---

[১৬] লালা রুখ সেলিম, "নারী শিল্পী", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

[১৭] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

[১৮] ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাশেম, "খুলনা জেলায় শিক্ষার অবস্থা", *মাসিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত

[১৯] খগেন্দ্র নাথ বসু, *মহেশ্বরপাশা পরিচয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

দিয়ে বাংলার বড় লাটসহ শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় মহারাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই ছিলেন এই আর্ট স্কুলের মূল চালিকাশক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর আর্ট স্কুলের অগ্রযাত্রা ঝিমিয়ে পড়ে। শশিভূষণ প্রতিষ্ঠিত এই আর্ট স্কুলটি ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে এই আর্ট স্কুলটি সরকারি আর্থিক সহযোগিতা হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। শশিভূষণের এই প্রচেষ্টা ছিল পূর্ব বাংলায় একটি ব্যতিক্রম উদ্যোগ। পল্লী পরিবেশে আর্ট স্কুল গড়ে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছিল তাঁর অনন্য কীর্তি। এই আর্ট স্কুল পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি দক্ষিণ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। তবে তারা ছিল বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক ভেদনীতির ফলে বাংলার আবহমানকালের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল। ইংরেজদের কাছে পরাজিত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সন্দেহের চোখে দেখত বলে ঔপনিবেশিক আমলে শুরু থেকে তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিল। ফলে উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত হিসেবে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়নি।[২০]

বিশ শতকে এসেও বাঙালি মুসলমান সমাজ শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাধা-নিষেধের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে জীবজন্তু ও মানুষের আলোকচিত্র ধারণ এবং তা পত্রিকায় ছাপাকেও এক শ্রেণির মুসলমান চিন্তাবিদ পাপ কাজ হিসেবে গণ্য করতেন। বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে এবং প্রচ্ছদপটে মানুষের ছবি ও ইলাস্ট্রেশন ছাপানোর বিষয়ে মুসলমান ধারার সম্পাদকরা ছিলেন দ্বিধান্বিত। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁদের পত্রিকায় মানুষের ছবি ও ইলাস্ট্রেশন ছাপার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলমান সম্পাদকদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর পত্রিকা 'আল হেলাল'-এ ভারতের বিখ্যাত আলেম, মুফতি ও ইসলামি চিন্তাবিদদের ছবি ছাপাতে শুরু করেন এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। বিষয়টি সারা বাংলার রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং রক্ষণশীলদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কিন্তু তিনি মানুষের ছবি ছাপানো অব্যাহত রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের 'মা-আরেফ' পত্রিকায় মাওলানা সৈয়দ ছোলাইমান নদভী চিত্রকলা বিষয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছবি আঁকা ও

[২০] ফয়েজুল আজিম, "সাম্প্রতিক চিত্রকলা : পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

আলোকচিত্র তোলার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।’[২১] এরপর ১৯৩০ সালে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ‘চিত্রকলা ও এছলাম’ শীর্ষক দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে মোহাম্মদ আকরম খাঁ ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করে চিত্র ও ভাস্কর্য চর্চা এবং তা ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি এই প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পৌত্তলিক উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেকোনো চিত্র আঁকা, মুদ্রণ করা এবং ভাস্কর্য তৈরি করা যেতে পারে।[২২] এ সকল রচনা মুসলমান সমাজে চিত্রকলার চর্চাকে কিছুটা সহনীয় করেছিল। এ সময় থেকে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মুসলমান পরিবার থেকে উৎসাহী অনেকেই শিল্পকলা জগতে প্রবেশ করতে থাকেন।

পূর্ব বাংলার স্বশিক্ষিত শিল্পী কাজী আবুল কাশেমের (১৯১৩) আঁকা চিত্র ত্রিশের দশক থেকে সওগাত, মোহাম্মদী, হানাফী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন।[২৩] ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান ছাত্রের আগমন ঘটে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আব্দুল মঈন (শিক্ষার সময়কাল : ১৯২৮–৩৪, ইন্ডিয়ান পেইন্টিং), হবিবুর রহমান জমাদার (ছাপচিত্র), জয়নুল আবেদিন (১৯৩২–৩৮, ফাইন আর্ট), শফিকুল আমীন (১৯৩২–৩৮, ফাইন আর্ট ১৯৪৫–৪৬, ছাপচিত্র বিষয়ে টিচার্স কোর্স), আনোয়ারুল হক (১৯৩৪–৪০, ফাইন আর্ট), সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯৩৩–৪২, ফাইন আর্ট), সৈয়দ আলী আহসান (১৯৩৭–৪৩, ড্রাফটসম্যানশিপ) এবং কামরুল হাসান (১৯৩৮–৪৬, ফাইন আর্ট) প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের অধিকাংশই কৃতিত্বের সঙ্গে আর্ট স্কুল থেকে পাস করে শিক্ষক হিসেবে সেখানে যোগদান করেন। প্রথম মুসলমান শিক্ষক হিসেবে কলকাতা আর্ট স্কুলে যোগদান করেন আব্দুল মঈন। তাঁর অকালমৃত্যুতে শূন্যপদে আর এক কৃতী ছাত্র জয়নুল আবেদিন যোগদান করেন ১৯৩৮ সালে। এ ছাড়া লিথোগ্রাফ শিক্ষক হিসেবে হবিবুর রহমান জমাদার ১৯৩৭ সালে, ড্রাফটসম্যান হিসেবে সৈয়দ আলী আহসান ১৯৪৩ সালে এবং লিথোগ্রাফ শিক্ষক হিসেবে সফিউদ্দীন আহমেদ ১৯৪৬ সালে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক ও শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন আব্দুল মঈন, জয়নুল আবেদিন ও সফিউদ্দীন আহমেদ। স্বল্পায়ু আব্দুল মঈন ছিলেন পাটনা কলামের বংশগত চিত্রকর এবং ইন্ডিয়ান পেইন্টিং বিভাগের প্রধান ঈশ্বরী প্রসাদ বর্মার শিষ্য; মুঘল শৈলীতে ছবি এঁকে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। জয়নুল আবেদিন ছিলেন মুকুলচন্দ্র দে, বসন্ত কুমার

---

[২১] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, “চিত্রকলা ও এছলাম”, *মাসিক মোহাম্মদী*, কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৭, *চিত্রকলা ও এছলাম* লেখাটি মাসিক মোহাম্মদীতে ৮ পর্বে ছাপা হয়, প্রথম পর্বের লেখার ভূমিকায় তিনি মাওলানা সৈয়দ ছোলাইমান নদভীর এই লেখার উদ্ধৃতির উল্লেখ করেন

[২২] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, “চিত্রকলা ও এছলাম”, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম এবং ১২তম সংখ্যা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ প্রাগুক্ত

[২৩] *ক্যাটালগ*, কাজী আবুল কাশেমের একক চিত্র প্রদর্শনী ১৯৮৯, জয়নুল গ্যালারি, চারুকলা ইনস্টিটিউট

গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর স্পর্শে গড়ে ওঠা। পাশ্চাত্য ধারার ড্রইং ও জলরঙে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৩৮ সালে জলরং চিত্রের জন্য গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা এঁকে তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেন। সফিউদ্দীন আহমেদের পাশ্চাত্য ধারার তেলরং ও উড এনগ্রেভিং এবং এচিংয়ে ছিল অসাধারণ দক্ষতা। তিনি ১৯৪৫ সালে গভর্নরের স্বর্ণপদকসহ বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেন। শিল্পী হিসেবে তাঁদের এই কৃতিত্ব সারা ভারতের শিল্পরসিক ও শিল্প সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁদের এই অর্জন উদার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত করে। উৎসাহী তরুণদের শিল্পশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

বিশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিকীগুলোতে প্রায় নিয়মিত শিল্পীদের আঁকা ছবি ছাপানো হতো। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ গুটিকয়েক মুসলমান শিল্পী সেখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে উদার মুসলামন সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকায় এ সকল শিল্পীর আঁকা ছবি, ইলাস্ট্রেশন ও ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হতে থাকে। এ ছাড়া পত্রিকাগুলো এই শিল্পীদের কৃতিত্বের কথা এবং ইসলামি শিল্প-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছেপে চিত্রকলা বিষয়ে মুসলমান সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সকল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—দৈনিক আজাদ, মাসিক সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, শিশু সওগাত, বুলবুল পত্রিকা প্রভৃতি।[২৪]

কলকাতায় অবস্থিত এ সকল শিল্পী মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হলেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মানসিকতার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন ছিলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং কামরুল হাসান ছিলেন গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। তাঁরা ধর্ম-ঐতিহ্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।[২৫] তাঁদের চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। গ্রামবাংলার প্রকৃতি, শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্য আর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট লাঞ্ছিত-নিপীড়িত-অনাহারী মানুষদের হাহাকার বিধৃত হয়েছিল তাঁদের চিত্রে। সুশিক্ষক ও প্রগতিশীল শিল্পী হিসেবে কলকাতায় টিকে থাকার সংগ্রামে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন সর্বদা।

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক বিভাজন নীতির ফলে শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল তা ব্যাপক আকার ধারণ করে ত্রিশের দশক থেকে। এ সময় থেকে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। চল্লিশের দশকে এসে

[২৪] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
[২৫] আবুল মনসুর, *জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ২১

সেই দাবি আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ঘটে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার ফলে হিন্দু ও মুসলমান তাদের ধর্মীয় সত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে পরস্পর দূরে সরে যায়। কোনো অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ধারা এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

> এই পরিস্থিতিতে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন অবধারিত হয়ে পড়েছিল। তাই সবকিছুকে হিন্দু আর মুসলমান—এই দ্বৈত মানসিকতা নিয়ে বিচার করা তখন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গণ্য করা হতো। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এই মানসিকতার চরম প্রতিফলন ঘটল কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম আর্ট এক্সিবিশনের ভেতর দিয়ে। তখন ১৯৪৬ সালের শেষের দিক। কেবল মুসলমান শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী হয়েছিল। তখনকার সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক পটভূমিতে এ প্রদর্শনী মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।[২৬]

মুসলিম আর্ট এক্সিবিশনে জয়নুল আবেদিন, হবিবুর রহমান, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ শিল্পীর শিল্পকর্ম স্থান পায়।[২৭] এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কলকাতায় অবস্থানরত মুসলমান শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মুসলমান শিল্পীদের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার আলোচনার সূচনা হয় মূলত এ সময় থেকে। পরিকল্পিত পাকিস্তান রাষ্ট্র এ অঞ্চলের মুসলমান শিল্পীদের আন্দোলিত করেছিল। আত্মস্বার্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বজাত্যবোধে জাগ্রত হয়ে তাঁরা শিল্প-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা পূর্ব বাংলা অঞ্চলের মানুষের স্বার্থে ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন, যার নেতৃত্ব দেন পূর্ব বাংলার সন্তান জয়নুল আবেদিন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা কলকাতায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা চেয়ে আলোচনা করেছিলেন। ড. কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০–৭৭), সলিমুল্লাহ ফাহমি, আবুল কাশেম প্রমুখ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন।'[২৮]

দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ফিরে দ্রুত একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জয়নুল আবেদিন যে শতভাগ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তা শিল্পী আমিনুল ইসলামের বিবরণ থেকে জানা যায়। তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তির জন্য কলকাতায় গিয়ে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি (জয়নুল আবেদিন) জানান, 'পাকিস্তান হলে আমরা ঢাকায় গিয়েই আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করব। তোমরা ঢাকার ছাত্ররা কলকাতায় ভর্তি হলে প্রথম দিকে হয়তো ছাত্রই পাব না তেমন। এখানে ভর্তি না হয়ে দিন পনেরো অপেক্ষা করো, তত দিনে সঠিক খবর

---

[২৬] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[২৭] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২৮] কামরুল হাসান, "পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প আন্দোলন ও সরকারি কলাভবন প্রতিষ্ঠা", *ভোরের কাগজ*, ঢাকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৮

পেয়ে যাব।[২৯] আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি ভর্তির জন্য কলকাতায় গিয়ে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন **১৯৪৭** সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। সুতরাং এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, দেশবিভাগের পূর্বেই ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তাঁরা চূড়ান্ত করেছিলেন।

[২৯] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তুতি পর্ব

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ; পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। দেশবিভাগের আগেই কলকাতা আর্ট স্কুলে কর্মরত মুসলমান শিক্ষকগণ জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন তাঁদের পরিকল্পিত আর্ট স্কুল গড়ে তোলার জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়নুল আবেদিন (১৯১৪–৭৬, আনোয়ারুল হক (১৯১৮–৮১), সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২–২০১২), শফিকুল আমীন (১৯১২–২০১১, সৈয়দ আলী আহসান (১৯১৮–৯৪), হবিবুর রহমান জমাদার (১৯১২–৭৩) ও শেখ আনোয়ার। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসেছিলেন জয়নুল আবেদিন। অন্যরা ঢাকায় এসেছিলেন আগস্ট মাসের ১৪ তারিখের মধ্যে। আর জয়নুল আবেদিনের আহ্বানে আর্ট স্কুল গড়ার সংগ্রামে অংশ নিতে কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে সদ্য পাস করা কামরুল হাসান ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এসেছিলেন।[৩০]

ঢাকায় আসা এই শিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। শুধু জয়নুল আবেদিন ছিলেন পূর্ব বাংলার। তাঁর বাল্যকাল ও শৈশব কেটেছে ময়মনসিংহ অঞ্চলে। ঢাকার সঙ্গে অধিকাংশ শিল্পীর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের কাছে ঢাকা ছিল অনেকটা অপরিচিত শহর। ঢাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ফলে শিল্পীদের স্বাগত জানানোর মতো পরিবেশ এখানে ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে শিল্পীদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। দেশভাগের স্বল্প সময়ের মধ্যে কলকাতায় অবস্থিত অধিকাংশ মুসলমান কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ঢাকায় চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ এই শিল্পীদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ঢাকায় আসা ও ফেরা এ সকল কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁদের দ্রুত যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের প্রয়োজনে তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার

---

[৩০] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিনি জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে ময়মনসিংহে ফিরে আসেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ও সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত মাহমুদ আল জামালের লেখা গ্রন্থ 'সফিউদ্দীন আহমেদ'-এর ৬০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, '১৯৪৭ সালের আগস্টে সফিউদ্দীন ঢাকায় চলে আসেন'; শফিকুল আমীনের লেখা 'নানা রঙের দিনগুলি'তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, জয়নুল আবেদিন, সৈয়দ আলী আহসান, সফিউদ্দীন, শেখ আনোয়ার (প্রেসম্যান) এবং আনোয়ারুল হকসহ আমরা সবাই ১৪ আগস্ট রাতের বেলা গাড়িতে রওনা হলাম (ঢাকার উদ্দেশে); কামরুল হাসান, 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা' গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, '১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাশাপাশিভাবে ঢাকায় চলে এলাম।'

উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১–৫৯), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩–৭৬), সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯–৭৬), সৈয়দ আলী আহসান (পরবর্তীকালে অধ্যাপক) (১৯২২–২০০১) প্রমুখ।

দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকার সার্বিক পরিবেশ শিল্পচর্চার জন্য অনুকূল ছিল না। প্রাদেশিক রাজধানীকে পুনর্গঠন, অফিস-আদালতের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, রাস্তাঘাটসহ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারত থেকে বিনিময় করে আসা মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাসহ জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করাটা ছিল নবগঠিত পূর্ব বাংলা সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এ ছাড়া আধুনিক চারুশিল্পের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে শিল্পশিক্ষার বিষয়ে এ অঞ্চলের স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এ রকম বৈরী পরিবেশের মধ্যে জয়নুল আবেদিন তাঁর অনুগামী শিল্পীদের নিয়ে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মূল কারণ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে পূর্ব বাংলা অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যে সকল শিল্পী ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা সকলেই কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ও পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁরা কলকাতায় অবস্থানকে নিরাপদ মনে করেননি। সকল খ্যাতি আর চাকরির মায়া ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত একটি নিরাপদ স্থানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জীবনযাপনের জন্য তাঁরা পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকায় শিল্পীদের জন্য সম্মানজনক কোনো কর্মক্ষেত্র ছিল না। ফলে এ সকল শিল্পীর সম্মানজনক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল অপরিহার্য।

দেশবিভাগের ফলে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল, শান্তিনিকেতন কলাভবনসহ বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিম বাংলার মধ্যে পড়ে যায়। দেশবিভাগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীদের সেখানে গিয়ে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে পূর্ব বাংলার খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস দেশবিভাগের পর সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু থাকায় দক্ষ অঙ্কন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। দেশবিভাগের পূর্বে অধিকাংশ অঙ্কন শিক্ষক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। দেশবিভাগের কারণে তাঁদের অধিকাংশ ভারতে চলে যাওয়ায় এ ক্ষেত্রে

শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা পূরণ করতে প্রশিক্ষিত শিল্পী তৈরির জন্য একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল।

দেশবিভাগের পরেও অনেক মুসলমান শিল্পী, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। সেই সময় জয়নুল আবেদিন ও সফিউদ্দীনের মতো উদীয়মান শিল্পীদের কলকাতায় অবস্থান করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কলকাতা ছেড়ে তাঁরা পশ্চাৎপদ ঢাকায় এসেছিলেন এ অঞ্চলে শিল্পশিক্ষার প্রসার ঘটাতে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন জয়নুল আবেদিন। সামাজিক দায়বদ্ধতা আর মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে তিনি কলকাতার সচ্ছল শিল্পীজীবন ছেড়ে ঢাকায় এসে একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল এ দেশে এমন একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, যেখানে থেকে জন্ম নেবে সুন্দরের নির্মাতারা। তিনি পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, ‘আমি নিজে শিল্পকর্ম করে যতটা আনন্দ পাই তার চেয়ে বেশি আনন্দ পাই শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে।’[৩১] এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শিল্পকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে তিনি ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

পূর্ব বাংলায় মুসলমান শিল্পীদের দ্বারা একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত জনবল তত দিনে (১৯৪৭) তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দেশবিভাগের সময় জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান, হবিবুর রহমান, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক প্রমুখ শিক্ষক হিসেবে এবং শেখ আনোয়ার প্রেসম্যান হিসেবে কলকাতা আর্ট স্কুলে কর্মরত ছিলেন। খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫–৭২), হবিবুল্লাহ খান ও কামরুল হাসান (১৯২৯–৮৮) আর্ট স্কুল থেকে সদ্য পাস করেছিলেন আর মোহাম্মদ কিবরিয়া ছিলেন শেষ বর্ষের ছাত্র। এই অভিজ্ঞ জনবল জয়নুল আবেদিনকে নতুন আর্ট স্কুল গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহস জুগিয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকে পূর্ব বাংলা সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হওয়ার প্রচেষ্টায় ছিল। সে সময় পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পকলার অবস্থা ও পরিবেশ ছিল অনেক বেশি অগ্রবর্তী। পাকিস্তান সৃষ্টির বহু যুগ আগেই ১৮৭৫ সালে লাহোরে মেয়ো আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ চালু হয়। এ ছাড়া ভারত বিভক্ত হওয়ার আগে সেখানে ভবেশ সান্যাল ও অমৃতা শেগিলের মতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রকররা নিয়মিত চিত্রচর্চা করায়

[৩১] নজরুল ইসলাম, “জয়নুল আবেদিনের শিল্প ভাবনা : একটি সাক্ষাৎকার”, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১১৪, সাক্ষাৎকারটি সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’য় ১৯৭৪ সালের ১৫ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়

ওই অঞ্চলের তরুণ শিল্পী, শিল্পরসিক ও কলাতাত্ত্বিকদের মধ্যেও সমকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। উপমহাদেশ খ্যাত কলাতাত্ত্বিক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী কর্মসূত্রে করাচিতে অবস্থান করায় সেখানেও শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।[৩২] লাহোর ও করাচিকে কেন্দ্র করে দেশবিভাগের পূর্বেই শিল্পকলার একটি শক্ত অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলা পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্পীরা ঢাকায় যখন একটা আর্ট স্কুলের দাবি উত্থাপন করেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। এই দাবির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের সহানুভূতি থাকাটাও স্বাভাবিক ছিল। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিল্পীদের আশ্বস্ত করেছিলেন দ্রুত আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে।

কলকাতায় অবস্থানকালে শিল্পীরা ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন। সুতরাং ঢাকায় ফিরে তাঁরা জোর তৎপরতা চালিয়ে সরকারের উঁচু মহলের কাছ থেকে ঢাকায় একটি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত আদায় করতে সমর্থ হন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে কলকাতা আর্ট স্কুলের মতো কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলায় না থাকায় এ সকল শিল্পীকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত নর্মাল স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। অনন্যোপায় হয়ে ড্রইং শিক্ষক হিসেবে জয়নুল আবেদিন যোগ দেন ঢাকা নর্মাল টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে, সফিউদ্দীন আহমেদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে, আনোয়ারুল হক চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুলে এবং শফিকুল আমীন আরমানিটোলা স্কুলে।[৩৩] সৈয়দ আলী আহসান, হবিবুর রহমান ও শেখ আনোয়ার ড্রাফটসম্যান ও ড্রইং শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।[৩৪]

---

[৩২] নিসার হোসেন, "সমকালীন শিল্পকলায় প্রথম প্রজন্মের শিল্পী : ক. জয়নুল আবেদিন", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

[৩৩] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, পৃ. ২৮

[৩৪] কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'সৈয়দ আলী আহসান, শেখ আনোয়ার এঁরা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে চাকরি নিলেন।' কিন্তু আমিনুল ইসলাম তাঁর *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'আলী আহসান এবং হবিবুর রহমান যোগ দেন তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে।' ডিন অফিসে সংরক্ষিত হবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথিতে দেখা যায়, আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ হবিবুর রহমান জমাদার ও শেখ আনোয়ারের সার্ভিস বুক চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পত্র লিখেছেন (পত্র নং-৫, তারিখ : ৪ জানুয়ারি ১৯৪৯)।

জয়নুল আবেদিন নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেও তাঁর প্রধান লক্ষ্য আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিতে থাকেন। সরকারি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তদারকি করা, উচ্চ মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা প্রভৃতি অব্যাহত রাখেন। ঢাকাতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণকারী ডিপিআই (ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন) অফিস তখন চট্টগ্রামে। এ সময় আনোয়ারুল হক চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামে অবস্থান করায় জয়নুল আবেদিনের পরামর্শ অনুযায়ী ডিপিআই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন।

আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর দ্বারা যেমন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি মুক্তবুদ্ধির ধারকদের কাছ থেকে সহযোগিতাও লাভ করেছে। মুসলিম লীগারদের কেউ কেউ বলেছেন, আর্ট স্কুলের দরকার নেই। নতুন দেশ, অনেক সমস্যা আছে, সেগুলো আগে সমাধান করতে হবে।[৩৫] বিরোধিতা করেছিলেন ডিপিআই অফিসের জনৈক কর্মকর্তা। একজন এডিপিআই আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই মর্মে আপত্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তান যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র, সেহেতু এ দেশে ছবি আঁকা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো স্কুল হতে পারে না।[৩৬] ডিপিআই ড. কুদরাত-এ-খুদা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে থাকায় এই যুক্তি টেকেনি। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়েছিল।[৩৭]

আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের উচ্চপদস্থ আরো কয়েকজনের সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার দুজন অন্যতম সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার ও শিক্ষামন্ত্রী নূরুল আমিন (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী) আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের সমঝদার হবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন জয়নুল আবেদিনের পূর্বপরিচিত ও ঘনিষ্ঠজন। তিনি ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারি উঁচু মহলে অন্যতম উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। আর নূরুল আমিন ছিলেন ময়মনসিংহের মানুষ, সেই সুবাদে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আগে থেকেই। প্রশাসনের বাইরে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরও সমর্থন ছিল এমন উদ্যোগের প্রতি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ (১৯১৪–৬৯), সরদার জয়েনউদদীন (১৯১৮–৮৬) আব্দুল গনি হাজারী (১৯২৭–৭৬) প্রমুখ।[৩৮] ছবি আঁকা যে বিলাসিতা নয়, বরং তা জীবনেরই অন্যতম

---

[৩৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[৩৬] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৮, তবে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত নথিতে এ ধরনের কোনো আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৩৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

অংশ সেটা বোঝানোর জন্য পত্রপত্রিকায় লেখা, সুধীসমাজে আর্ট স্কুল তথা চিত্রকলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রভৃতি কাজ তাঁদের মাধ্যমে করতে হয়েছে।

পূর্ব বাংলায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ বিষয়ে জোর তৎপরতা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা (স্কিম) প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ সময় জয়নুল আবেদিন তাঁকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। আর্ট স্কুল ছিল পূর্ব বাংলায় সম্পূর্ণ নতুন এবং ব্যতিক্রম একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; এর কোর্স পরিকল্পনা, প্রশাসনিক কাঠামো, জনবলের পদমর্যাদা ও পদবিন্যাস কেমন হতে পারে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানতে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও পত্র বিনিময় হয়েছিল।

সৈয়দ আজিজুল হক *'জয়নুল আবেদিন : সৃজনশীল জীবন সমগ্র'* গ্রন্থে ১৯৪৭ সালের ৯ অক্টোবর জয়নুল আবেদিনকে লেখা কুদরাত-এ-খুদার একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান নকশাবিদ ও অন্য সহকারী শিক্ষকদের বেতন কাঠামো কীরূপ হওয়া উচিত সেটা তিনি জয়নুল আবেদিনের কাছে জানতে চান। এই পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ড. খুদা মনে করতেন আর্ট স্কুলটি পরিচালনার জন্য কোনো অধ্যক্ষের জরুরি প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, একজন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকই সন্তোষজনকভাবে এ ধরনের স্কুল পরিচালনা করতে সক্ষম। এ ছাড়া এই পত্রে ইতিপূর্বে জয়নুল আবেদিন ও আনোয়ারুল হকের পেশকৃত সম্ভাব্য শিক্ষক ও অফিস স্টাফদের নামের তালিকা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়। তালিকার প্রথম ভাগে ছিল জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমীন, সফিউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান, হবিবুর রহমান, শেখ আনোয়ার ও জয়নাল আবেদিনের (পরবর্তীকালে অফিস স্টাফ) নাম। এর সঙ্গে যুক্ত অন্য আর একটি তালিকায় ছিল কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, হবিবুল্লাহ খান ও ওয়াহেদ আলীর নাম। প্রথম ভাগে ছিল কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক শিক্ষক ও স্টাফদের নাম এবং দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা আর্ট স্কুল থেকে সদ্য পাস করেছেন এবং নতুন আর্ট স্কুলে নিয়োগে ইচ্ছুক তাঁদের নাম। এই পত্র থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসেই সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা আর্ট স্কুলের কাঠামো নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবছেন এবং এ ব্যাপারে জয়নুল আবেদিনের পরামর্শ চাইছেন।[৩৯]

---

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫–৫৬

ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা নভেম্বর মাসের শুরুতে পূর্ব বাংলায় একটি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ব বাংলা শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে ১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর সেটি পেশ করেন। প্রস্তাবনাটি ১১ নভেম্বর শিক্ষা বিভাগে গৃহীত হয়। চার পৃষ্ঠার এই প্রস্তাবনার প্রথম দুই পৃষ্ঠায় পূর্ব বাংলায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশে মূল পরিকল্পনা; যেখানে আর্ট ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য, স্থান, কোর্স পরিকল্পনা; জনবল (স্টাফ), প্রাথমিক ব্যয়, ব্যয়ের উৎস, ছাত্রদের আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রের শুরুতে তিনি উল্লেখ করেন, সরকার পূর্ব বাংলায় একটি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় এই পরিকল্পনাটি পেশ করা হলো। পূর্ব বাংলায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন—

> There is at present no School of Art in East Bengal; but, the need for such a school (or Institute) cannot be too much emphasised. There is at the moment a very great demand for qualified drawing masters in High schools as most of the drawing masters being non-moslems, opted out for West Bengal. There is also bound to be an increasingly great demand from Trade and Industry for people specially trained in Industrial and Commercial Art and Draftsmanship. It is also desirable to have a school of Art with a view to encouraging home and cottage industries for which a knowledge of Arts is very necessary Moreover, in the undivided Bengal, We had one school for imparting education in Arts, which was situated in Calcutta. With the partition it has gone out, and our students have been deprived of its facilities. It is, therefore, a moral obligation on our part to provide similar facilities in East Bangal for these students. Thus, cultural, economic and moral reasons seem fully to justify the immediate establishment of a school of Art.[৪০]

পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে মুসলমান স্টাফরা (শিক্ষক ও কর্মচারী) 'অপটেড' হয়ে পূর্ব বাংলায় চলে এসেছেন। তাঁদের উপযুক্ত কোনো পদ না থাকায় পূর্ব বাংলায় কোনো সম্মানজনক পদে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী ভিত্তিতে সংখ্যাতিরিক্ত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিশেষায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তাঁদের অন্য কোথাও নিয়োগেরও সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক স্টাফদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের শুরুতে পূর্ব বাংলায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হলো। বর্তমানে আর্ট স্কুল

---

[৪০] পূর্ব বাংলার ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা কর্তৃক শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে পেশকৃত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, পত্র নং ১২৮, তারিখ : চট্টগ্রাম, ৫ নভেম্বর ১৯৪৭, নথি Govt. Institute of Arts, Dacca opening of East Pakistan, শিক্ষা বিভাগ ১৯৪৭. পৃ. ২ ও ৩

প্রতিষ্ঠার মতো প্রাথমিক প্রস্তুতি আছে সুতরাং আগামী শিক্ষাবর্ষ (১৯৪৮–১৯৪৯) থেকে এর কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনার শিরোনাম ছিল Scheme for Opening a Goverment Institute of Art in East Bengal. পরিকল্পনায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয় প্রতিষ্ঠানটি চারুকলা, অলংকরণ ও কারুশিল্প, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ এবং বাণিজ্যিক শিল্প বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং স্কুল-কলেজের অঙ্কন শিক্ষকদের চারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ঢাকা শহরের যেকোনো স্থানে ভাড়া বাসায় আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব করা হয় এবং বাসা ভাড়া বাবদ বার্ষিক ১৮০০ টাকার উল্লেখ করা হয়। ইনস্টিটিউটের কোর্স অব স্টাডিজ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে—

(ক) প্রথম দুই বছরের বেসিক এলিমেন্টারি কোর্স; এবং

(খ) এলিমেন্টারি কোর্স উত্তীর্ণের পর নিম্নলিখিত বিষয়ে পরবর্তী তিন বছরের অ্যাডভান্সড কোর্স।

১. ফাইন আর্ট

২. কমার্শিয়াল আর্ট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসহ)

৩. গ্রাফিক আর্ট

৪. মডেলিং

৫. ড্রাফটসম্যানশিপ

৬. ড্রইং মাস্টার কোর্স এবং

৭. ক্রাফটস্

ছাত্র ভর্তির সাধারণ যোগ্যতা উল্লেখ করা হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাস বা সমমানের শিক্ষা; তবে যথোপযুক্ত উচ্চশিক্ষার যোগ্যতার ভিত্তিতে ড্রইং মাস্টাস কোর্স ও ক্রাফটসের তিন বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। নন-ম্যাট্রিকুলেশন কেউ যদি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে তাহলে তাকে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তি করা যাবে।

প্রস্তাবনায় এলিমেন্টারি কোর্সের জন্য চার টাকা এবং অ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য ছয় টাকা হারে মাসিক টিউশন ফি উল্লেখ করা হয়। এক মাসের টিউশন ফির সমপরিমাণ টাকা ভর্তি ফি এবং ভর্তির সময় জামানত হিসেবে পনেরো টাকা প্রতিজনের কাছ থেকে জমা রাখার উল্লেখ করা হয়। মোট ভর্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ১২ শতাংশ মেধাবী ছাত্রের বিনা বেতনে (ফুল ফ্রি) এবং একই সংখ্যক ছাত্রের অর্ধ বেতনে (হাফ ফ্রি) শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখা হবে। জনশিক্ষা বিভাগের জেনারেল স্কিম থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্রের বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউটের বার্ষিক নিট আয় ধরা হয় ২০০০ টাকা এবং প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয় ৪০,৩৩৭ টাকা। প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে রেকারিং খাতে ধরা হয় স্টাফদের বেতন ৩৭,৩৩৭ টাকা, ইনস্টিটিউটের ঘর ভাড়া ১৮০০ টাকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ১২০০ টাকা। এ ছাড়া নন-রেকারিং খাত থেকে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৫০০ টাকার প্রস্তাব করা হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য অধ্যক্ষ, লেকচারার, হেড ডিজাইনার, শিক্ষক এবং অফিস স্টাফের মোট বাইশটি পদের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ :

1. One Principal B.E.S (Bengal Education's Service)	(150–700)	175
2. Four Lecturers (Including Head Designer)		
S.E.S (Subordinate Educational Service)	(125–350) 500	(125x4)
3. Four Demonstrators (Including Modeling Teacher)	300	(75x4)
4. Two Teachers (Wood-engraver & Pressman)	100	(50x2)
5. One Carpenter (30–50)		
6. One Head Clerk (35–80)		
7. One Store-Keeper (35–60)		
8. Five Estt. Menials (13–17)		
9. Three Cont. Menials (12 Fixed)[৪১]		

উল্লিখিত বেতন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় বয়স ও কারিগরি কাজে অভিজ্ঞতার কারণে নিয়োগের সময় উল্লিখিত বেতন হারের চেয়ে আরো বেশি বেতন প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে।

ছাত্রদের আবাসন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, প্রথম বর্ষে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। তবে বাসা খোঁজার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের স্টাফরা সাধ্যমতো সাহায্য করবেন। সুবিধামতো সময়ে থাকার জন্য বাসা ভাড়া করে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সে ক্ষেত্রে সেখানে থাকার জন্য অন্যান্য কলেজ হোস্টেলের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হবে।[৪২]

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের কোর্স পরিকল্পনা, টিউশন ফি, শিক্ষক পদবিন্যাস ও বেতন স্কেলের প্রস্তাব করা হয়েছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অনুকরণে। কারণ ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল শিল্পী উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক ছাত্র ও শিক্ষক। এ কারণে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পদর্শন তাঁদের কাছে ছিল কাঙ্ক্ষিত। এ ছাড়া

[৪১] পূর্ব বাংলার ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা কর্তৃক শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে পেশকৃত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, প্রাগুক্ত

[৪২] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পত্র, প্রাগুক্ত

পূর্ব বাংলার ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা কলকাতায় অবস্থানকালে শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন এবং শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তিনিও কলকাতা আর্ট স্কুলের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের আদলে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হলেও প্রস্তাবের কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

যেমন কোর্সের সময়কালের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওই সময়ে কলকাতা আর্ট স্কুলের তিন বছর মেয়াদি এলিমেন্টারি ও তিন বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড কোর্সসহ মোট ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল। কিন্তু ঢাকাতে দুই বছর মেয়াদি এলিমেন্টারি ও তিন বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড কোর্সসহ মোট পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রস্তাব করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা আর্ট স্কুলে ছয় বছর মেয়াদি কোর্স চালু হয় ১৯২০–২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সময়কালে। কলকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লক অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের (১৮৬৮ সাল) পর পাঁচ বছরের কোর্স চালু করেন। অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন যোগদানের (১৯০৯ সাল) পর এই পাঁচ বছরের শিক্ষাকালকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম দুই বছর এলিমেন্টারি কোর্স এবং পরবর্তী তিন বছর অ্যাডভান্সড কোর্স হিসেবে বিভক্ত করা হয়। এ সময় স্কুলের সমগ্র শিক্ষাকে ১. এলিমেন্টারি, ২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ৩. ড্রাফটিং, ৪. টিচার্স টিচিং ও ৫. ফাইন আর্ট—এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এ সময় থেকে প্রত্যেক ছাত্রকে এলিমেন্টারি পাঠ আবশ্যিক করা হয়। এলিমেন্টারি শিক্ষা শেষে অ্যাডভান্সড পর্বে উল্লিখিত চারটি বিভাগের যেকোনো একটিতে তিন বছরের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৯–২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত আর্ট স্কুলে শিক্ষার এই সময়কাল প্রচলিত ছিল। ১৯২০–২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পার্সি ব্রাউন এলিমেন্টারি কোর্সের সময়কাল এক বছর বাড়িয়ে মোট ছয় বছরের কোর্সের প্রচলন করেন।[৪৩]

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ে কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রচলিত শিক্ষার সময়কাল গ্রহণ না করে পার্সি ব্রাউনের অধ্যক্ষতাকালের ১৯০৯–১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত শিক্ষার সময়কাল গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকার শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। ওই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল সরকারি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তার সবগুলোর নামের সঙ্গে ‘স্কুল’ শব্দটি যুক্ত ছিল। যেমন গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস, ক্যালকাটা; জে জে স্কুল অব আর্টস, বোম্বে; মেয়ো

[৪৩] Bagal Jogesh Chandra, “History of the Govt. College of Art & Craft”, Ibid. p. 35

স্কুল অব আর্টস, লাহোর ইত্যাদি। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয় ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’। ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে ইনস্টিটিউট শব্দটি ছিল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ওই সময়ে টিউশন ফি ছিল এলিমেন্টারি পর্বে মাসিক তিন টাকা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগে তিন টাকা এবং ড্রাফটসম্যানস, ফাইন আর্টস, কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ ও টিচার্স কোর্সের জন্য পাঁচ টাকা। ১৯৩১ সালে সরকার এই টিউশন ফি নির্ধারণ করে।[৪৪] আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয় এলিমেন্টারি কোর্সের জন্য মাসিক চার টাকা এবং অ্যাডভান্সড পর্বের জন্য ছয় টাকা হারে।

আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদার চেয়ে কমিয়ে প্রস্তাব করা হয়। ১৮৩৬ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদটি ছিল ব্রিটিশ সিনিয়র এডুকেশনাল সার্ভিসের পদ। তখন এই পদের নিয়োগ ও বদলি নিয়ন্ত্রিত হতো ইংল্যান্ড থেকে। ১৯৩৪ সালে অধ্যক্ষ পদটি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের পদে পরিণত হয়।[৪৫] কিন্তু আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদটি প্রস্তাব করা হয় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের এডুকেশনাল সার্ভিসের পদ হিসেবে, যার বেতন স্কেল ছিল মাত্র ১৫০–৭০০ টাকা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা আর্ট ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে জয়নুল আবেদিনের কাছে লেখা (১৯৪৭ সালে ৯ অক্টোবর) পত্রে উল্লেখ করেছিলেন তিনি (ড. খুদা) মনে করেন, আর্ট স্কুল পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ পদের প্রয়োজন নেই, একজন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক সন্তোষজনকভাবে এ ধরনের স্কুল পরিচালনা করতে সক্ষম। প্রস্তাবে তাঁর এই মনোভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পদটির নাম অধ্যক্ষ রাখা হলেও তার মর্যাদা কমিয়ে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মর্যাদায় নামানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত আর্ট ইনস্টিটিউটে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষণীয় অধিকাংশ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালের অব্যবহিত পর থেকে কলকাতা আর্ট স্কুলে এলিমেন্টারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ড্রাফটিং, টিচার্স টিচিং ও ফাইন আর্ট—এই পাঁচটি বিভাগ ছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগের আবার চারটি উপবিভাগ ছিল—(ক) লিথোগ্রাফ, (খ) উড-এনগ্রেভিং, (গ) মডেলিং এবং (ঘ) উড কার্ভিং। এ ছাড়া ফাইন আর্ট

---

[৪৪] Bengal Education code, VI, 136, 1931, p. 132
[৪৫] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫ ও ২৬৬

বিভাগ ফাইন আর্ট এবং ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং—এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল।[৪৬] পরবর্তীকালে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগও সেখানে খোলা হয়। অধ্যক্ষ মুকুল দের সময়ে এখানে আটটি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। বিভাগগুলো হলো : ১. ইন্ডিয়ান পেইন্টিং, ২. ফাইন আর্ট, ৩. কমার্শিয়াল আর্ট, ৪. উড এনগ্রেভিং, ৫. লিথোগ্রাফ, ৬. ড্রাফটসম্যানশিপ, ৭. ক্লে-মডেলিং ও ৮. টিচার্সশিপ।

আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসহ), গ্রাফিক আর্ট, মডেলিং, ড্রাফটসম্যানশিপ, ড্রইং মাস্টার কোর্স এবং ক্রাফ্‌ট—এই সাতটি বিভাগের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় যে কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রচলিত ইন্ডিয়ান পেইন্টিং ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য গ্রহণ করা হয়নি; উড এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফকে একত্র করে গ্রাফিক আর্ট এবং নতুন করে ক্রাফ্‌টস বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। সৃজনশীলতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার সমন্বয় করে বিভাগগুলোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টের জন্য বিভাগগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে চারুকলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এই সাতটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টের এই প্রস্তাবনা নথিতে উপস্থাপন করা হয় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে।[৪৭] শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরীক্ষণের পর মতামতসহ প্রস্তাবনার আর্থিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি অর্থ বিভাগে পাঠানো হয় ১৯৪৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে।[৪৮] শিক্ষা বিভাগের উপসচিব এম নবী ইনস্টিটিউটের লেকচারার, হেড ডিজাইনার, ডেমোনেস্ট্রেটর এবং কর্মচারী পদের বেতন স্কেল এবং সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তার ব্যাখ্যা চেয়ে শিক্ষা বিভাগে নথি ফেরত পাঠান। এ প্রসঙ্গে ২৫ ফেব্রুয়ারিতে ফাইল নোটে তিনি লেখেন—

> For the Calcutta school of Arts we had one Principal in the B.S.E.S two Lecturers in S.E.S and one teacher of Life and Antique in the S.E.S. of course we have no objection to a Principal in the B.E.S but it has to be explained why they require 3 Lecturers and one Head Designer in the S.E.S. The Head Designer in the Calcutta school a lower scale was sanctioned. In the Calcutta school there were one teacher and one assistant teacher in the scales 90/- to 175/- and Rs. 75/- to 175/-. Against this the proposal now is to create 4 posts of Demonstrator (including Modeling teacher) on the same scale. This requires also explanation. We have no objection to a Pressman on Rs. 50/- to Rs.

[৪৬] Bagal Jogesh Chandra, “History of the Govt. College of Art & Craft”, Ibid. p. 35

[৪৭] শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিবের ২৪.১২.১৯৪৭ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোটের পৃ. ২

[৪৮] শিক্ষা বিভাগের সচিবের ১৭.০২.১৯৪৮ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোটের পৃ. ২

100/- as in Calcutta. But we do not understand why the wood engraving teacher in Dacca should be on Rs. 50/- to Rs. 100/- instead of Rs. 40/- to Rs. 60/- as in other school.[49]

এই নোটে স্পষ্ট যে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদবিন্যাস ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রেও কলকাতা আর্ট স্কুলের জনবল কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। আর্ট স্কুলের পদের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা ও বেতন স্কেলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে অসংগতিগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা আহ্বান করা হয়েছে। যেমন আর্ট স্কুলে দুজন লেকচারার ছিলেন কিন্তু আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য কেন তিনজন লেকচারার এবং সমমর্যাদার একজন হেড ডিজাইনার পদের প্রস্তাব করা হলো; কেন হেড ডিজাইনারের পদের বেতন স্কেল কলকাতা অপেক্ষা বেশি দেখানো হলো ইত্যাদি। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদমর্যাদা অপেক্ষা আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের বেতন স্কেল ও মর্যাদা কমিয়ে বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসের পদ করা হলেও সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি।

শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব খান বাহাদুর ফজলুল হক অর্থ বিভাগের এম নবীর উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন ২৭ ফেব্রুয়ারিতে। দীর্ঘ দুই পৃষ্ঠার ফাইল নোটে তিনি বিস্তারিতভাবে পদগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং নোটের শেষ পর্যায়ে কিছু পদ সংশোধন করে ও কমিয়ে একটি সংশোধিত তালিকা উপস্থাপন করেন।

তিনি লেকচারারের সংখ্যা কমিয়ে দুটি পদ (লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস ও লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট), একটি হেড ডিজাইনার পদ ও ডেমোনেস্ট্রেটর পদের বিকল্প হিসেবে একটি হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদ (বেতন স্কেল : ৭৫–১৭৫), একটি উডকাট টিচার এবং একটি প্রেসম্যান পদ (বেতন স্কেল ৫০–১০০); কর্মচারী পদের মধ্যে একটি ক্লার্ক (বেতন স্কেল ৪৫–১০০), একটি স্টোরকিপার (বেতন স্কেল ৩৫–৬০), পাঁচটি স্টাবলিশমেন্ট খাতের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং তিনটি কনটিনজেন্সি খাতের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী পদ অনুমোদনের জন্য ফাইল পুনরায় অর্থ বিভাগে পেশ করেন।

অর্থ বিভাগের উপসচিব এম নবী ১৯৪৮ সালের ৮ মার্চ স্বাক্ষরিত ফাইল নোটে একটি অধ্যক্ষ (বি.ই.এস), দুটি লেকচারার, একটি হেড ডিজাইনার, একটি টিচার, একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, একটি উডকাট টিচার, একটি প্রেসম্যান, একটি ক্লার্ক, একটি স্টোরকিপার, দুটি স্টাবলিশমেন্ট মিনাইলস্ এবং

[৪৯] অর্থ বিভাগের উপসচিব এম নবীর ২৫.২.৪৮ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোটের ৪ নং পৃ. প্রাগুক্ত

দুটি কনটিনজেন্সি মিনাইলস্ পদের অনুমোদনের সুপারিশ করেন। নোটে তিনি আরো উল্লেখ করেন, তাঁর মতে শিক্ষা বিভাগ তাদের আগামী অর্থবছরের বাজেট থেকে এই ব্যয় বহন করতে পারবে। যেহেতু এটি বড় কোনো ব্যয় নয় এ কারণে তারা (অর্থ বিভাগ) কোনো শিডিউলভুক্ত করছে না। যদি কোনো কারণে তারা (শিক্ষা বিভাগ) তাদের বাজেট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে স্কিমটি স্থগিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ বিভাগ এই ফান্ডের ব্যাপারে পুনর্মূল্যায়ন বা অন্য কোনোভাবে সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে পারে। এরপর নথিটি আবার শিক্ষা বিভাগে ফেরত পাঠানো হয়।

অর্থ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী আগে আর্থিক বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গেলে অধিক সময় ক্ষেপণের সম্ভাবনা ছিল। সে ক্ষেত্রে পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে যেত; এমনকি আর্থিক সমস্যার কারণে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারত। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিভাগ বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। শিক্ষা বিভাগ ইনস্টিটিউটের আর্থিক বিষয় নিয়ে আর কোনো বিতর্কে না গিয়ে ওই অবস্থায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসংক্রান্ত অফিস আদেশের খসড়া তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের জুলাই থেকে আর্ট স্কুল চালু করার স্বার্থে শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব ফজলুল হক ১০ মার্চের অফিস নোটে অফিস অর্ডারের খসড়া প্রস্তুতের জন্য ডিপিআইয়ের কাছে নথি পাঠান। তিনি নোটে আশা প্রকাশ করেন, আগামী বাজেট বরাদ্দ পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব হবে। ডিপিআই ১১ মার্চে স্বাক্ষরিত অফিস নোটে সহকারী সচিবের সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং বিষয়টি বিলম্বিত না করে দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করে নথিটি আবার শিক্ষা বিভাগে পাঠানো হয়।

সম্ভবত এই নথি শিক্ষা বিভাগে পাঠানোর সময় ডিপিআই গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অফিস আদেশের খসড়াও পাঠিয়েছিলেন। নথির নোটের ধারাবাহিকতায় সে রকমই মনে হয়। ১৭ মার্চ স্বাক্ষরিত অফিস নোটে শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব খসড়া অফিস আদেশটি নথিতে উপস্থাপনার নির্দেশ দেন। আগামী বাজেট অধিবেশনের আগে অফিস আদেশটি অনুমোদনের জন্য জোর তৎপরতা শুরু করে। ২৫ মার্চ অফিস আদেশটি Voted & Powred-এর জন্য পার্লামেন্টে এবং পূর্ব বাংলার গভর্নরের Authenticated-এর জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক কত তারিখে অফিস আদেশটি পার্লামেন্টে পাস হয়েছিল তা নথির নোট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে ২৫ থেকে ২৮ মার্চের মধ্যে পার্লামেন্টে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পাস হয়। অফিস আদেশটি পূর্ব বাংলার গভর্নরের দ্বারা Authenticated করার জন্য শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিব গভর্নরের কাছে নথি পাঠান ২৯ মার্চে। গভর্নর কর্তৃক অফিস আদেশ অথেন্টিকেটেড হয় এপ্রিল মাসের ১ তারিখে। এরপর

শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব ফজলুল হকের স্বাক্ষরে ৮ এপ্রিল একটি অফিস আদেশ ইস্যু করা হয়।[৫০] অফিস আদেশের শিরোনাম ছিল Esteblishment of a Government Institute of Arts in East Bangal.

ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বরে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাবনা শিক্ষা বিভাগে পেশ করেছিলেন সেই প্রস্তাবের কোর্স কারিকুলাম ও টিউশন ফি অপরিবর্তিত রেখে শিক্ষক ও অফিস স্টাফদের পদের সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের কিছুটা কাটছাঁট করে প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। দুই বছরের এলিমেন্টারি কোর্স এবং তিন বছরের অ্যাডভান্সড কোর্সসহ পাঁচ বছরের কোর্স এবং অ্যাডভান্সড পর্বের প্রস্তাবিত সাতটি বিভাগই অনুমোদিত হয়। টিউশন ফি নির্ধারিত হয় এলিমেন্টারি কোর্সে চার টাকা এবং অ্যাডভান্সড পর্বে ছয় টাকা। অধ্যক্ষসহ সাতটি শিক্ষক পদ, একটি টেকনিক্যাল পদ এবং ছয়টি কর্মচারী পদ অনুমোদিত হয়। পদগুলো হলো :

i. One Principal in the East Pakistan Educational service in the scale of Rs. 150–700/-
ii. Two Lecturers in the Subordinate Educational Service one for the ‘Life class’ and the other for ‘Graphic Art’ in the scale of Rs. 125–350/-
iii. One Head Designer in the sanctioned rate of pay for corresponding post.
iv. Two Teachers in the scale of Rs. 75–175/-
v. One Wood-cut Teacher on the sanctioned rates of pay for corresponding posts
vi. One Pressman
vii. One Clerk Rs. 35–70/-
viii. One Store-Keeper Rs. 35–60/-
ix. Two Establishment Menials Rs. 13–17/-
x. Two Contingency Menials on the fixed pay of Rs. 12/ PM each[৫১]

ইনস্টিটিউটের ঘর ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ রেকারিং বাজেট থেকে (১৮০০+১২০০) মোট ৩০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নন-রেকারিং বাজেট থেকে ৫০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়।

জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোগীদের অব্যাহত প্রচেষ্টা আর ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ও মোঃ ফজলুল হকের মতো শিল্পবান্ধব কর্মকর্তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কারণে দেশবিভাগের মাত্র নয় মাসের মধ্যে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অনুমোদিত হয়।

[৫০] Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোটের ৭ ও ৮ নং পৃ. প্রাগুক্ত

[৫১] শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব খান বাহাদুর মো. ফজলুল হক স্বাক্ষরিত, Establisment of a Govt. Institute of Arts in East Bengal শীর্ষক অফিস আদেশ, অফিস আদেশ নং 1170/Edn. Dated: Dacca, the 8th April, 1948, নথি : Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan, প্রাগুক্ত

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার এমন পর্যায়ে জয়নুল আবেদিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তথ্য ও বেতার বিভাগের প্রচার শাখায় আর্ট ডিজাইনার পদে চাকরি পেয়ে যান। এই চাকরিতে যোগদানের বিষয়ে তিনি বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। কারণ একদিকে তাঁর স্বপ্নের আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিপ্রাপ্তি, যেখানে যোগদানের জন্য সরকারের উঁচু মহলের পক্ষ থেকে চাপ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের মে মাসের শেষ দিকে অথবা জুন মাসের একেবারে শুরুর দিকে চাকরিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে করাচি চলে যান।[৫২] তবে যাওয়ার আগে আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবে দ্রুত ফিরে আসার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুমোদিত আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও কর্মচারী পদে কাদের নিয়োগ করা হবে, অধ্যক্ষের দায়িত্ব কে পালন করবেন ইত্যাদি বিষয় জয়নুল আবেদিন করাচি যাওয়ার আগে ডিপিআইসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে যান। জয়নুল আবেদিনের করাচি যাওয়ার পর সদ্য অনুমোদিত আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে আনোয়ারুল হকের ওপর।

[৫২] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা

১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ, স্থানপ্রাপ্তি ও ছাত্র ভর্তির পর ইনস্টিটিউটের বাস্তবিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে। শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষকদের প্রচেষ্টা ছিল এ বছরের জুলাই থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ এবং জায়গা পেতে দেরি হওয়ায় যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় ঢাকার জনসন রোডে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুটি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়ার পর সেখানে জয়নুল আবেদিনের অনুপস্থিতিতে আনোয়ারুল হকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষতায় সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান, হবিবুর রহমান, শেখ আনোয়ারসহ কয়েকজন অফিস স্টাফ আর আঠারো জন ছাত্র নিয়ে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রিত হতো পূর্ব বাংলার জনশিক্ষা বিভাগ দ্বারা, তবে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয় ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের হাতে। সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ন, ফলাফল তৈরি, সনদপত্র ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অধ্যক্ষের হাতে ছিল। এ সময় হাই স্কুল ও কলেজগুলোর শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে করার নিয়ম থাকলেও আর্ট ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। আর্ট ইনস্টিটিউট কোনো শিক্ষা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল না।

শিক্ষক নিয়োগ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অনুমোদনের পর শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্ভবত ১১ জন প্রার্থী অধ্যক্ষসহ শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। পূর্ব বাংলার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নথিতে সংরক্ষিত নতুন ইনস্টিটিউটে নিয়োগ ইচ্ছুকদের নামের তালিকা দেখে সে রকমই মনে হয়।[৫৩] তালিকায় নামের পাশে তাঁদের শিক্ষাগত

[৫৩] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস নিয়োগ ইচ্ছুক কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক শিক্ষক এবং নতুন প্রার্থীদের তালিকা, নথি : Govt. Institute of Arts, Dacca, Opening of East pakistan, P. 5. তালিকায় কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। তবে নথিতে রাখা পত্রের ধারাবাহিকতায় ধারণা করা যায়, তালিকাটি এপ্রিল মাসে তৈরি করা হয়েছে। ৮ এপ্রিলের আর্ট ইনস্টিটিউট সংক্রান্ত অফিস আদেশের পরেই তালিকাটি রাখা।

যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় প্রথম থেকে জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, হবিবুল্লাহ খান, খাজা শফিক আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান, হবিবুর রহমান, হাসান আলী মিয়া এবং শেখ আনোয়ারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক, সৈয়দ আলী আহসান ও হবিবুর রহমান ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক শিক্ষক এবং শেখ আনোয়ার ছিলেন প্রেসম্যান। সাবেক শিক্ষক ও নতুন প্রার্থীদের মধ্যে হাসান আলী মিয়া ছাড়া অন্যরা ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে পাস করা। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে প্রথম শ্রেণিতে পাস করা এবং ভাস্কর্য, প্রাচ্যকলা চিত্র ও ডেকোরেটিভ ডিজাইনে অভিজ্ঞ। টাইপকৃত এই তালিকায় কলম দিয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক শিক্ষকদের নামের পাশে গোলাকার চিহ্ন এবং নতুনদের নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া সাবেক শিক্ষকদের নামের পাশে সম্ভাব্য বেতন স্কেল কলম দিয়ে লেখা হয়েছে।

নবগঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটে লেকচারার ও শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৪৮ সালের মে মাসে। এ সময় শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ঢাকায় কমিশনার বিল্ডিংয়ের নিচতলায় অবস্থিত ডিপিআই অফিসে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন ডিপিআই মোহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ প্রার্থীরাই প্রধানত সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন। কামরুল হাসানই ছিলেন একমাত্র নতুন পদপ্রার্থী।[৫৪]

পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৯৪৮ সালো জুন মাস থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিয়োগের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। জয়নুল আবেদিন তখন করাচিতে অবস্থান করছেন। এ বছরের ১৭ জুন শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব ফজলুল হক জয়নুল আবেদিনকে একটি চিঠিতে জানান, পূর্ব বাংলার সরকার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য একজন অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা বিবেচনায় নিয়েছে এবং ওই পদে জয়নুল আবেদিনকেই নিয়োগের কথা বিবেচনা করছে। ন্যূনতম কত বেতনে জয়নুল আবেদিন এই পদে নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক, সেটা দ্রুত জানানোর জন্য ওই চিঠিতে তাগিদ দেওয়া হয়।[৫৫] জয়নুল আবেদিন করাচি থেকে এই চিঠির উত্তর দেন ১৯৪৮ সালের ২৪ জুন; যা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছায় ৩ জুলাই।

---

[৫৪] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮, পৃ. ৬১

[৫৫] Akand Shawon, Partition, folk Art and Shilpacharya Zainul Abedin, "Depart", Dhaka, 16th Issue, Volume 5. January-June, 2014, p. 21

চিঠিতে তিনি বেতন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

> I believe you are aware that I am in receipt of Rs. 700- pm. in the scale of Rs.700--50-1000-Inaturally expect that the Government of East Bengal will give me that pay which I am in receipt under the central Government, if not the scale if the Government does not see their way to agreeing to this I am prepared to accept even Rs 500- pm only in consideration of the fact that I shell have the opportunity of serving the educational interest of my province in the sphere of art. I am sure that government will appreciate the sacrifice.[৫৬]

এই চিঠির মধ্য দিয়ে জয়নুলের দেশপ্রেম ও দেশের শিল্পশিক্ষার প্রসারে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

জয়নুল আবেদিনের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে (২৪ জুন ১৯৪৮ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে) সরকারের শিক্ষা বিভাগ অধ্যক্ষ পদে জয়নুল আবেদিনের নিয়োগপত্র প্রেরণ করে সম্ভবত অক্টোবর মাসে। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে করাচি থেকে আনোয়ারুল হককে চিঠি লেখেন ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর। অধ্যক্ষ পদে স্বল্প বেতন স্কেল (১৫০–৭০০) দেখে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে আনোয়ারুল হককে লেখা আরো একটি পত্র সম্পর্কে জানা যায়, সেখানে আর্ট ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ থাকলেও অধ্যক্ষ নিয়োগ সম্পর্কে কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই। ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও চারুকলা অনুষদের অফিসে অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত বা অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত কোনো নথি বা চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুতরাং ৪ নভেম্বর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায়, ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষার্ধে জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপত্র পান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে করাচি অবস্থান করায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে তাঁর বিলম্ব হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিয়োগের আগেই লেকচারারসহ অন্যান্য শিক্ষক পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়। এ বছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস, লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট, হেড ডিজাইনার, শিক্ষক, ড্রাফটসম্যান শিক্ষক এবং উডকাট শিক্ষক পদে যথাক্রমে আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, শফিকুল আমীন, আবু শারাফ মোহাম্মদ কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান এবং হবিবুর রহমান জমাদার যোগদান করেন। প্রেসম্যান পদে শেখ আনোয়ার ও অফিস সহকারী পদে জয়নাল আবেদিনও সেই সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

---

[৫৬] Akand Shawon, Ibid, p. 22

১৯৪৮ সালের ৩ আগস্ট প্রথমে আনোয়ারুল হক 'লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস' পদে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ২৬ জুন কলকাতায় (মতান্তরে উগান্ডায়)। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে তিনি ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৫ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে তিনি ডিজাইনার হিসেবে নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের সময় তিনি আর্ট স্কুলের চাকরিতে 'অপশন' দিয়ে পূর্ব বাংলায় চলে এসে চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুলে ড্রইং টিচার হিসেবে নিযুক্ত হন। লেকচারার পদে নিয়োগের পরই তাঁকে আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ করা হয়।[৫৭] ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আনোয়ারুল হক ছিলেন জয়নুল আবেদিনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জুন মাসের শুরুতেই জয়নুল আবেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে করাচি চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আনোয়ারুল হকের ব্যক্তিগত কোনো নথি পাওয়া যায়নি, তবে চারুকলা অনুষদে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি নথি পাওয়া গিয়েছে যেখানে অফিস-ইন-চার্জ হিসেবে আনোয়ারুল হকের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যেমন উডকাট শিক্ষক হবিবুর রহমান জমাদারের ব্যক্তিগত নথিতে প্রাপ্ত তাঁর যোগদান পত্রে দেখা যায় তিনি (হবিবুর রহমান) ১৯৪৮ সালো ১ সেপ্টেম্বর আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ বরাবর যোগদান পত্র দিয়েছেন এবং আনোয়ারুল হক উক্ত তারিখে অফিস-ইন-চার্জ হিসেবে সেই পত্র গ্রহণ করেছেন।[৫৮] এই তথ্য থেকে বলা যায়, আনোয়ারুল হক লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে নিয়োগের পরই তাঁকে অফিস-ইন-চার্জ করে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

---

[৫৭] Particulars required in connection with the Civil list শীর্ষক শিক্ষক তালিকা। তালিকায় শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, যোগদানের সময়, চাকরি স্থায়ী হওয়ার সময়, পদোন্নতির সময়, বেতন স্কেল ইত্যাদি তথ্যের উল্লেখ আছে। তালিকাটি ১৮.৬.১৯৬৫ সালে করা। উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তাঁর জন্মস্থান লেখা হয়েছে কলকাতা। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্‌, ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত ১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তাঁর জন্মস্থান লেখা হয়েছে উগান্ডা।

[৫৮] হবিবুর রহমান জমাদারের উডকাট শিক্ষক পদে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে যোগদান পত্র। তারিখ-১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮। নথি নং-এ-৭, হবিবুর রহমান জমাদারের ব্যক্তিগত নথি। উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর যোগদান পত্রটি আনোয়ারুল হক অফিস-ইন-চার্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, আনোয়ারুল হক যোগদানের পর থেকে অফিস-ইন-চার্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

সফিউদ্দীন আহমেদ লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট পদে ইনস্টিটিউটে নিযুক্ত হন ১৯৪৮ সালের ১২ আগস্ট।[৫৯] তাঁর জন্ম ১৯২২ সালের ২২ জুন।[৬০] ১৯৪২ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে তিনি ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স এবং একই স্কুল থেকে ১৯৪৬ সালে দুই বছর মেয়াদি টিচারশিপ কোর্স (ছাপচিত্র বিষয়ে) সম্পন্ন করেন। তিনি লিথোগ্রাফ শিক্ষক হিসেবে কলকাতা আর্ট স্কুলে যোগদান করেন। দেশবিভাগের পর তিনি আর্ট স্কুলের চাকরিতে অপশন দিয়ে ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ড্রইং টিচার হিসেবে নিযুক্ত হন। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়নুল আবেদিন ও আনোয়ারুল হকের সঙ্গে তিনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশবিভাগের পূর্বেই সফিউদ্দীন মেধাবী তরুণ শিল্পী হিসেবে সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সর্বভারতীয় নবম বার্ষিক প্রদর্শনীতে তেলচিত্রের জন্য 'একাডেমিক প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক', ১৯৪৬ সালে পাটনা শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে 'বিহার হেরল্ড স্বর্ণপদক', একই বছর দি অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্স সোসাইটির উদ্যোগে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমকালীন চারুকলা প্রদর্শনীতে সাদাকালো বিভাগে প্রথম পুরস্কার, ১৯৪৭ সালে বিহারে পাটনা শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে তেলচিত্রের জন্য 'দ্বার ভাঙ্গা মহারাজার স্বর্ণপদক' এবং একই প্রদর্শনীতে কাষ্ঠ তক্ষণ চিত্রের জন্য 'শিল্পকলা পরিষদের স্বর্ণপদক' লাভ করেন।[৬১]

হেড ডিজাইনার পদে শফিকুল আমীন ইনস্টিটিউটে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ১৯৪৮ সালের সম্ভবত আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে। স্বল্প সময় চাকরি করার পর ইনস্টিটিউট ছেড়ে ময়মনসিংহের প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি যে হেড ডিজাইনার পদে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অফিসে সংরক্ষিত হেড ডিজাইনার নিয়োগ (Appointment of Head Designer) সংক্রান্ত নথি থেকে। এই নথি থেকে কয়েকটি বিষয়ে জানা যায়—প্রথমত, আর্ট ইনস্টিটিউটের সূচনালগ্নে শফিকুল আমীনের হেড ডিজাইনার পদে যোগদান, দ্বিতীয়ত, ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইনার

---

[৫৯] ১৮ জুন ১৯৬৫ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত আর্ট কলেজের শিক্ষকদের তালিকা। Particulars required in connection with the Civil list শীর্ষক এই তালিকায় শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা যোগদানের তারিখ, স্থায়ী হওয়ার তারিখ, বেতন স্কেল ইত্যাদি তথ্য লিখিত আছে। উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ,ঢা.বি.।

[৬০] সফিউদ্দীন আহমেদের জন্ম তারিখ আর্ট ইনস্টিটিউটের নথিপত্রে ১৭ জুন ১৯২২ লিখিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'Art of Bangladesh Series-2 সফিউদ্দীন আহমেদ' গ্রন্থে মাহমুদ আল জামান ১৯২২ সালের ২২ জুন লিখেছেন; সৈয়দ আজিজুল হক বেঙ্গল পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত সফিউদ্দীন আহমেদ গ্রন্থে সফিউদ্দীনের জন্মদিন সম্পর্কে লিখেছেন ২২ জুন দিবাগত রাতের শেষ প্রহরে অর্থাৎ ২৩ জুনের কথা।

[৬১] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৩, পৃ. ১০৭–১০

পদ ছেড়ে তাঁর ময়মসিংহ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চলে যাওয়া, তৃতীয়ত, তাঁকে বদলি করে আর্ট ইনস্টিটিউটে ফেরত আনতে অধ্যক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ এবং চতুর্থত, তাঁকে বদলি করে আনতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হেড ডিজাইনার পদে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত কামরুল হাসানকে নিয়োগ দান।

শফিকুল আমীন ও কামরুল হাসানের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পূর্ব বাংলার ডিপিআই ১৯৪৮ সালের ৩ আগস্ট কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে পত্র দেন।[৬২] পত্রটি যেহেতু হেড ডিজাইনার নিয়োগ সংক্রান্ত নথিতে সংরক্ষিত হয়েছে সেহেতু পত্রটি যে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ ছিল, তা বলা যায়।

আর্ট ইনস্টিটিউটে শফিকুল আমীনের যোগদানের সময়কাল সম্পর্কে আর একটি তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর লেখা আত্মজীবনী 'নানা রঙের দিনগুলি' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, হেড ডিজাইনার হিসেবে তিনি ইনস্টিটিউটে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং নিয়োগের দুই মাস পরে নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে আর্ট ইনস্টিটিউটের চাকরি ছেড়ে ময়মনসিংহ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন।[৬৩] এই তথ্য সঠিক ধরলে তিনি ইনস্টিটিউটে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।

জয়নুল আবেদিন অধ্যক্ষ হিসেবে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদানের পর শফিকুল আমীনকে আর্ট ইনস্টিটিউটে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি ডিপিআইকে ১৯৪৯ সালের ১ জুন একটি পত্র দেন। পত্রে জয়নুল আবেদিন ইনস্টিটিউটে শিক্ষকস্বল্পতার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চতর ক্লাসে নতুন বিভাগ খোলার প্রয়োজনে হেড ডিজাইনার পদে শফিকুল আমীনকে বদলি করে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিপিআইকে অনুরোধ করেন। এই পত্রে তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'The post of Head Designer of this Institute is vacant consequent on transfer of Moulvi Safiqul Ameen to Govt. Primary Teachers Training College, Mymensingh.[64]

[৬২] কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে লেখক পূর্ব বাংলার ডিপিআইয়ের পত্র, পত্র নং ১৬২২-এ তারিখ-৩.৮.৪৮, প্রাপ্তস্থান : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[৬৩] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৪] পূর্ব বাংলার ডিপিআইকে লেখা আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের পত্র, পত্র নং-২২৮, তারিখ-১ জুন ১৯৪৯, পত্রটি হাতে লেখা, প্রাপ্তিস্থান, প্রাগুক্ত

পত্রের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে শুরু থেকে হেড ডিজাইনার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ময়মনসিংহে বদলি হওয়ার কারণে ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইনারের পদটি খালি হয়ে যায়।

শফিকুল আমীনের জন্ম ১৯১২ সালের ১৬ জুলাই শিলংয়ে। তিনি ছিলেন জয়নুল আবেদিনের সহপাঠী। ১৯৩৮ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে তিনি ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৩৮ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলের ড্রইং শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর বদলি হয়ে রংপুর নর্মাল স্কুলে, কলকাতা ডেভিড হেয়ার স্কুলে চাকরি করার পর ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা আর্ট স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনার পদে নিযুক্ত হন।[৬৫] দেশবিভাগের সময় তিনি অন্যান্য বাঙালি মুসলমান শিল্পীর ন্যায় অপশনের সুযোগ নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ার আন্দোলনে তিনি শুরু থেকে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে ছিলেন।

আবু শারাফ মোহাম্মদ কামরুল হাসান আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক পদে যোগদান করেন সম্ভবত শফিকুল আমীনের যোগদানের সময়ে। তাঁর ব্যক্তিগত কোনো নথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে পাওয়া যায়নি। তবে হেড ডিজাইনার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি নথি থেকে তাঁর প্রথম দিকের চাকরিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে যে শিক্ষক পদে প্রথমে যোগদান করেছিলেন সে বিষয়ে এই নথিতে সংরক্ষিত পত্র থেকে জানা যায়।

শফিকুল আমীন ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইনার পদের চাকরি ছেড়ে যাওয়ার পর উক্ত পদে ডিপিআই থেকে কামরুল হাসানকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি, যা আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে পৌঁছয় ১ ফেব্রুয়ারিতে। এই নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হয় :

> 'Moulvi Abu Sharf Mohammad Quamrul Hassan, Officieting Teacher, Government Institute of Arts, Dacca in the Scale of Rs. 75-175 is appointed to act as Head Designer, Government Institute of Arts, Dacca in the Scale of Rs. 130-10/2-140-20/2-220 against the post created in terms of Government Order No 1170-Edn. dated 8-4-48 with effect from the date on which he assumes the responsibility of the higher post.[৬৬]

---

[৬৫] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৬] ডিপিআই অফিস থেকে ইস্যুকৃত হেড ডিজাইনার পদে কামরুল হাসানের নিয়োগপত্র, অফিস আদেশ নং-২৮৫(২)-এ তারিখ ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগপত্রের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, কামরুল হাসান আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথমে শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরপর ১৯৫০ সালে ১৪ জানুয়ারি তাঁকে হেড ডিজাইনার পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় এবং উক্ত পদে তিনি যোগদান করেন ১ ফেব্রুয়ারি।[৬৭]

কামরুল হাসান ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে তিনি ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। ছাত্র অবস্থায় তিনি 'আজাদ' ও সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকায় মাঝে মাঝে ইলাস্ট্রেশন ও কার্টুন আঁকতেন। জয়নুল আবেদিনের আহ্বানে ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সংগ্রামে যোগ দিতে তিনি ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় চলে আসেন।[৬৮]

সৈয়দ আলী আহসান শিক্ষক (ড্রাফটসম্যান) পদে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন ১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ৩ জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায়। তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ছয় বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন এবং ১৯৪৩ সালের ৩০ জুলাই সেখানে ড্রাফটসম্যান শিক্ষক পদে যোগদান করেন।[৬৯] কলকাতা আর্ট স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় তিনিও ঢাকায় চলে আসেন একটি আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার প্রত্যাশায়। আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রাফটসম্যান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[৭০]

হবিবুর রহমান জমাদার আর্ট ইনস্টিটিউটে উডকাট শিক্ষক পদে ১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর যোগদান করেন।[৭১] তিনি ১৯১২ সালের ১৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে ছয় বছরের কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর সেখানে উডকাট শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[৭২] দেশবিভাগের সময় ঢাকায় আসা শিক্ষক-শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সিনিয়র। ঢাকায় এসে তিনি প্রথমে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিযুক্ত হন। আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদানের

---

[৬৭] হেড ডিজাইনার পদে কামরুল হাসানের যোগদান পত্র, তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৫০, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৬৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৯–৩০.

[৬৯] ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের সাবোর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের শিক্ষকদের তালিকা, ১৮.৬.১৯৬৫ তারিখে অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৭০] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৭১] আর্ট ইনস্টিটিউট হবিবুর রহমান জমাদারের যোগদান পত্র, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, যোগদান পত্রটি ইনস্টিটিউটের অফিসার- ইন-চার্জ আনোয়ারুল হক কর্তৃক সেদিনই গৃহীত হয়, হবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৭২] ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের সাবোর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের শিক্ষকদের তালিকা, প্রাগুক্ত

পর ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ ১৯৪৯ সালের ৪ জানুয়ারি হবিবুর রহমান ও শেখ আনোয়ারের সার্ভিস বুক চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।[৭৩] এ থেকে প্রমাণিত হয় ইনস্টিটিউটে যোগদানের আগে তিনি এবং প্রেসম্যান শেখ আনোয়ার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রেসম্যান শেখ আনোয়ারের ব্যক্তিগত কোনো নথির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে উল্লিখিত পত্রের ভিত্তিতে বলা যায়, তিনিও হবিবুর রহমানের সঙ্গে বা কাছাকাছি সময়ে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

ইনস্টিটিউটের শুরুতে অফিস স্টাফদের মধ্যে জয়নাল আবেদিন নামে একজন অফিস সহকারী নিয়োগের তথ্য জানা যায় কামরুল হাসানের লেখা 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা' বই থেকে। এ সময় কর্মচারীদের নিয়োগপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে তিনি দারোয়ান হানিফ মিয়া, পিয়ন আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ ও রহমানের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭৪]

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে প্রথম পর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল জয়নুল আবেদিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী। ১৯৪৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। অধ্যক্ষ পদে জয়নুল আবেদিনের নিয়োগ তখনো প্রক্রিয়াধীন ছিল।

অফিসার-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হক : নবগঠিত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অধ্যক্ষ হবেন জয়নুল আবেদিন সে বিষয়টি ছিল পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে জয়নুল আবেদিনের পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের প্রচার শাখায় আর্ট ডিজাইনারের চাকরিপ্রাপ্তি এবং সেখানে যোগদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি চলে যাওয়ায় (১৯৪৮ সালের জুন মাসের শুরুতে) আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার চলমান কার্যক্রমের যাবতীয় দায়িত্ব এসে বর্তায় জয়নুল আবেদিনের বিশ্বস্ত সহযোগী আনোয়ারুল হকের ওপর।

১৯৪৮ সালের এপ্রিলে সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিশিয়াল অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বাস্তবভাবে কার্যক্রম শুরুর উপযোগী করতে তখনো অনেক কিছু বাকি ছিল। ইনস্টিটিউটের জন্য জায়গা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা, ছাত্র ভর্তি, বরাদ্দকৃত বাজেট ছাড় করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হককে অনেক পরিশ্রম করতে

---

[৭৩] ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকার অধ্যক্ষকে লিখিত আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হকের পত্র, তারিখ ৪ জানুয়ারি ১৯৪৯, হবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ

[৭৪] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

হয়েছে। অবশ্য জয়নুল আবেদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর এ সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে আনোয়ারুল হককে লিখিত এক পত্রে 'ইনস্টিটিউটের ফাইল শিক্ষা বিভাগ থেকে অর্থ বিভাগে গেল কি না, সেই খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি কাকে কোথায় কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, কার কাছ থেকে হাতে হাতে ফাইল সই করাতে হবে, সে ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দেন। চিঠিতে যাঁদের সাহায্য নেওয়ার কথা বলা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন : আবুল কাশেম, হামিদুল হক ও জনৈক বিক্রমপুরী।[৭৫] জয়নুল আবেদিন শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মানসিকভাবে তিনি এর সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

[৭৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

চিত্র-১৪ : অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা

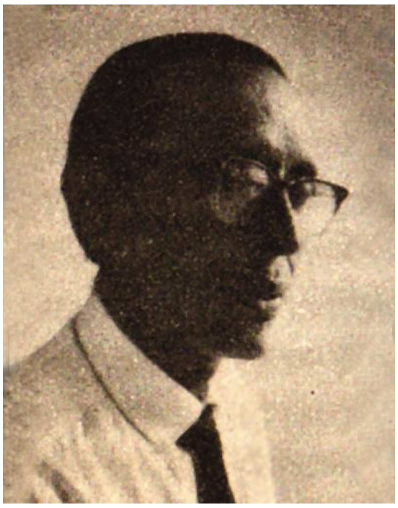

শিল্পী আনোয়ারুল হক

লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ

লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট

শিল্পী শফিকুল আমীন

হেড ডিজাইনার

শিল্পী কামরুল হাসান

শিক্ষক

শিল্পী সৈয়দ আলী আহসান

শিক্ষক

শিল্পী হবিবুর রহমান জমাদার

উডকাট শিক্ষক

চিত্র-১৫ : গভর্নমেন্ট ইনিস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকবৃন্দ

জায়গাপ্রাপ্তি : আনোয়ারুল হকের কাছে এ সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ওই সময়ের বাস্তবতায় ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট পরিচালনার উপযোগী ভবন পাওয়া সত্যি কঠিন ছিল। কারণ ক্ষুদ্র মফস্বল শহর ঢাকা দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক রাজধানী হওয়াতে বিভিন্ন অফিস-আদালতের জন্য স্থান সংকুলান করা নতুন সরকারের কাছে ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। যে কারণে কিছু কিছু অফিস চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে খোঁজা হচ্ছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য জায়গা।

এদিকে শিক্ষক নিয়োগের পর তাঁদের নিয়মিত দাপ্তরিক কাজকর্ম করার প্রয়োজন ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব কোনো জায়গা না থাকায় রমনার ইডেন ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ডিপিআই অফিসে গিয়ে নবনিযুক্ত শিক্ষকগণ হাজিরা দিতেন এবং দাপ্তরিক কাজ করতেন। এ প্রসঙ্গে শফিকুল আমীন *'নানা রঙের দিনগুলি'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তখন আর্ট কলেজের নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। ডি.পি.আই-এর অফিস তখন ঢাকায় চলে এসেছে। এই অফিসের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আমি আর আনোয়ার সাহেব অফিসের বিভিন্ন কাজকর্ম করতাম।'[৭৬]

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আর্ট ইনস্টিটিউটের স্থান বরাদ্দ নিশ্চিত হয়। ডিপিআই ৬ সেপ্টেম্বর লেখা একটি পত্রে আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য জায়গা পাওয়ার বিষয়টি শিক্ষা বিভাগের সচিবকে অবগত করেন। পত্রে তিনি শিক্ষা বিভাগের সচিবকে অবগত করেন যে, গণস্বাস্থ্য বিভাগ আর্ট ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য জায়গা প্রদানে সম্মত হয়েছে; ফলে প্রতিষ্ঠানটির জায়গাসংক্রান্ত যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান হলো।[৭৭]

স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সলিমউল্লাহ ফাহমী এবং একই বিভাগের কর্মকর্তা আবুল কাশেমের আন্তরিক সহযোগিতায় জনসন রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের (১৯২৫) দ্বিতল ভবনের নিচতলায় দুটি কক্ষ অস্থায়ী ভিত্তিতে পাওয়া যায়। কলতাবাজারে ঢোকার যে গলি সেই দিকে অবস্থিত ছিল কক্ষ দুটি। এই কক্ষ দুটি শিক্ষা বিভাগের পুরাতন ফাইলে ঠাসা ছিল। দুটি কক্ষ পরিচ্ছন্ন করে সেখানেই আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু করা হয়।[৭৮] এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসান লিখেছেন, 'মাত্র দুটি কামরা। তাতে ক্লাসরুম, টিচার্স রুম, অফিস, স্টোর, ছাত্রদের বিশ্রামাগার ইত্যাদি তার ব্যবস্থা

[৭৬] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৭৭] শিক্ষা বিভাগের সচিবকে ডিপিআইয়ের লেখা পত্র; পত্র নং ৯০৩, তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, নথি নং ৫৭-২/৪৮, পৃ. ৫, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভসস
[৭৮] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

ওইটুকু জায়গার মধ্যেই করে নিতে হলো। হাসপাতাল, মড়া-কাটা ঘর, পাবলিক হেলথ অফিস ও আর্টস ইনস্টিটিউট—একই ভবনে এসব একসঙ্গে চলেছে।'[৭৯] ওই সময় আর্ট ইনস্টিটিউটের ঠিকানা ছিল ৫৩/১, জনসন রোড, ঢাকা। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট অবস্থিত ছিল জনসন রোডের উত্তর পাশে। ইনস্টিটিউটের উত্তরে ছিল ওকে রেস্টুরেন্ট (বর্তমানে নেই, সেখানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের গেট নির্মাণ করা হয়েছে) ও মুকুল সিনেমা হল (বর্তমানে আজাদ সিনেমা), দক্ষিণে কলতাবাজার ঢোকার গলি, তারপর সাধু হোমার ক্যাথিড্রাল (গির্জা) এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক, পূর্বে ছিল গাড়ির গ্যারেজ (বর্তমানে খান প্লাজা), পশ্চিমে জনসন রোড, তারপর ডিসি অফিস ও জজকোর্ট ভবন। বর্তমানে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের পুরাতন ভবন ভেঙে সেখানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।[৮০]

প্রথম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি : আর্ট ইনস্টিটিউটের জায়গার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ছাত্র ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ছাত্র ভর্তি করার বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রচারিত হয়। ওই মাসের শেষের দিকে ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষায় ষোলো-সতেরো জন অংশগ্রহণ করেন, যাঁদের সবাই কৃতকার্য হন এবং তাঁরা ১৯৪৮–৪৯ শিক্ষাবর্ষে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ভর্তি পরীক্ষার দু-এক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শুরু হওয়ার পরও দু-তিনজন নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন।[৮১] সব মিলিয়ে প্রথম ব্যাচে মোট আঠারো জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, ইমদাদ হোসেন, খালেদ চৌধুরী, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, আফজাল উদ্দিন খন্দকার, আবুল কাশেম, আমানুল্লাহ খান, আলী আকবর, জুলফিকার আলী, সামসুল আলম, আবদুল কাদের, মোহাম্মদ ইসমাইল, এ এস এম নূরুল ইসলাম, নুরুল আলম, প্রভাস সেন, লোকনাথ ধর প্রমুখ।[৮২]

[৭৯] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৮০] গবেষক সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত বায়োজ্যেষ্ঠ কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ বুলবুল মিয়া ও আজাদ সিনেমা হলের কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ চাঁন মিয়ার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ওই সময়ের মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে, তারিখ : ২১.০৭.২০১৮

[৮১] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২–৩৩

[৮২] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

চিত্র-১৬ : ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, জনসন রোড, ঢাকা; এই ভবনের নিচতলার দুটি কক্ষে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

ক্লাস শুরু : আর্ট ইনস্টিটিউট অনুমোদনের সময় সরকারের নির্দেশনা ছিল ১৯৪৮ সালের জুলাই সেশন থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার, কিন্তু জায়গা পেতে বিলম্ব হওয়ায় এবং আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে যথাসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জায়গাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পর ছাত্র ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ১৯৪৮ সালের জুলাই নাকি নভেম্বর থেকে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত চেয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হক ২০ অক্টোবর পূর্ব বাংলার ডিপিআইয়ের কাছে পত্র দেন।[৮৩] এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিআই নভেম্বরের ৩ তারিখে শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে পত্র দেন। তিনি আনোয়ারুল হকের পত্রের সূত্র ধরে উল্লেখ করেন, 'The Institute cannot be opened before November, 1948. As the current session actually begins from Novermber, 1948, fees should be realised from the students from that month this year.' এই পত্রে তিনি

[৮৩] পূর্ব বাংলার ডিপিআইকে লেখা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিসার-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হকের পত্র, পত্র নং ১১-এফ, তারিখ ২০ অক্টোবর ১৯৪৮, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

নভেম্বর মাস থেকে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন ।[৮৪] এ সকল তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলা যায়, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল নভেম্বর মাস থেকে ।

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত স্মরণিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় ১৫ নভেম্বরে ।[৮৫] ক্লাস যখন শুরু হয় তখনো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি । তখনো বারান্দায় চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি তৈরির কাজ চলছিল । তাই শুরু থেকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও পাশে অবস্থিত 'ওকে রেস্টুরেন্ট' থেকে ধার করা চেয়ার-টেবিল দিয়ে প্রথম দিকে ইনস্টিটিউট চলেছে ।[৮৬]

এভাবেই যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পশিক্ষার পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস । যার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশবিভাগের অম্লমধুর স্মৃতি আর একদল তরুণ শিল্পীর অসীম সাহসিকতার কাহিনি । দেশবিভাগের অস্থির সময়ে শিল্প-সংস্কৃতির বৈরী পরিবেশে নতুন একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে জয়নুল, আনোয়ারুল, সফিউদ্দীন, কামরুলরা যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশবিভাগের মাত্র ৯ মাসের মধ্যে সে ক্ষেত্রে সফলতা পান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অনুমোদনের মাধ্যমে । রাষ্ট্রীয় ও সমাজের বিরুদ্ধ স্রোতের মাঝে তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন উদার মানসিকতার অধিকারী ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদাসহ সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির আন্তরিক সহযোগিতার কারণে । আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ার এই সংগ্রামে তাঁরা সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন । শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সচ্ছল জীবন ও চাকরি ছেড়ে মফস্বল শহর ঢাকায় এসে, অধিক বেতনের চাকরি ছেড়ে প্রাদেশিক সরকারের স্বল্প বেতনের চাকরি গ্রহণ ছিল সাহসিকতাপূর্ণ । অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন নতুন ভর্তি হওয়া আঠারো জন শিক্ষার্থীও । তাঁদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয়নুল আবেদিনের নির্দেশনায় আনোয়ারুল হকের অধ্যক্ষতায় (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ১৯৪৮ সালের শেষ পর্যায়ে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস যাত্রা শুরু করে । গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় ।

---

[৮৪] পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবকে লেখা ডিপিআইয়ের পত্র, পত্র নং ১১০৯, তারিখ : ৩ নভেম্বর ১৯৪৮, উৎস : প্রাগুক্ত

[৮৫] *স্মরণিকা*, রজত জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩, ঢাকা বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. অনুল্লেখ

[৮৬] মোহাম্মদ মালিক, "হামিদুর রহমানের সাক্ষাৎকার", সাঈদ আহমেদ (সম্পা.), *হামিদুর রহমান*, ঢাকা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮

সিলেবাস : আর্ট ইনস্টিটিউট অনুমোদনের পর ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিল্পশিক্ষাক্রম নির্ধারণ করে দেয় পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ সালে ইনস্টিটিউটটি কলেজে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সিলেবাসের মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের সিলেবাসের কোনো কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের লেখা বই, প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার থেকে এলিমেন্টারি পর্বের সিলেবাস সম্পর্কে জানা যায় এবং অ্যাডভান্সড পর্বে সিলেবাস সম্পর্কে জানা যায় ওই সময়ের ছাত্রদের পরীক্ষার নম্বরপত্র থেকে। এলিমেন্টারি পর্ব পাসের পর ছাত্রদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাসের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হলেও নম্বরপত্র প্রদান করা হতো না; এ কারণে এই পর্বের কোনো নম্বরপত্র পাওয়া যায়নি। ফলে এ সময়ে সিলেবাস সম্পর্কে জানতে বই, প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের ছাত্র এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষক আমিনুল ইসলামের *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থে ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্যায়ের সিলেবাস সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

> প্রথম থেকেই আনোয়ার সাহেব আমাদের পেন্সিল ও কালি কলমে স্টিল লাইফ অর্থাৎ একটা সুরাই কিংবা কলসি, পারস্পেকটিভ ক্লাসে একটি টুল কিংবা টিউব ও পিরামিড ইত্যাদি আঁকতে দিতেন। প্রথম দিকে লাইন ড্রইংই শুধু হতো। কামরুল ভাই প্রধানত আমাদের আউটডোরে নিয়ে যেতেন। রমনার বিভিন্ন গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, আর ক্লাসে টবে লাগানো পাতাবাহার ইত্যাদি আঁকাই ছিল প্রধান কাজ। সফিউদ্দীন সাহেব উডকাটই শুধু করতেন। বিষয় ছিল প্রধানত পাতা অথবা সুরাই ইত্যাদি কালো ও সাদায়। ...প্রথম বছর উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু বড় ড্রইং করতে দিতেন। অজান্তার ছবির লাইনের কাজের কপি, যা নাকি কলকাতার আর্ট স্কুলেও করানো হতো।[৮৭]

উল্লিখিত বিবরণে দেখা যায়, এলিমেন্টারি প্রথম বর্ষে পেনসিল ও কালি-কলমে স্টিল লাইফ, পারস্পেকটিভ, আউটডোর স্টাডি (স্কেচ), উডকাট, কপি ড্রইং, ব্ল্যাকবোর্ড ড্রইং ইত্যাদি শেখানো হতো। আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্যায়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য দিয়েছেন—

> কলকাতা আর্ট কলেজের [স্কুলের] মডেলেই এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। বিষয় ও কাজের পদ্ধতি শিক্ষকগণ বুঝিয়ে বলে দিতেন। আমরা অনুরূপভাবে কাজ করে যেতাম। তখন কোন বিভাগ ছিল না। একই ক্লাশে বিভিন্ন বিষয় অনুশীলন করতাম। তার মধ্যে ছিল ড্রইং, স্কেচ, স্টিল লাইফ, পার্সপেক্টিভ, কপি ড্রইং, জলরং, কাঠ খোদাই প্রভৃতি। পরবর্তীতে তেল রং চালু হয়। ঐ সময়ে কোন ইতিহাস কিম্বা থিওরি ক্লাশ ছিল না।[৮৮]

---

[৮৭] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৮৮] আবদুর রাজ্জাক, "চারুকলা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছেচল্লিশ বছরের সংশ্লিষ্টর স্মৃতি", আবদুল মতিন সরকার (সম্পা.), *চারুকলা*, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৩৬-৩৭

আবদুর রাজ্জাক আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আমিনুল ইসলামের মতো একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি এখানে চালু হয়। শিক্ষণীয় সকল বিষয় ছিল ব্যবহারিক, হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো। কোনো তত্ত্বীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো না।

আর্ট ইনস্টিটিউটের অষ্টম ব্যাচের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, সে সময় এলিমেন্টারি পর্বে প্রতি শিক্ষা বছর শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা হতো। তখন শিক্ষা বছর ছিল জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দুই বছর শেষে এলিমেন্টারি পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ফাইনাল পরীক্ষায় ১০০ নম্বর মানের পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। বিষয়গুলো হলো :

১. চার্ট ড্রইং (ব্রাশ লাইন) ২. পারস্পেকটিভ (সাদা কালো/জলরং)

৩. স্টিল লাইফ (জলরং) ৪. স্কেচ (পেনসিল অথবা কালি ও কলম)

৫. গ্রাফিক আর্ট (উডকাট)

তিনি আরো জানান, পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও নিয়মিত স্কেচ খাতা অনুশীলনসহ আরো কিছু বিষয়ে ছাত্ররা অনুশীলন করত। চার্ট ড্রইং বিষয়টির স্থলে পূর্বে ব্ল্যাকবোর্ড ড্রইং করানো হতো। আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হওয়ার পর চার্ট ড্রইং বাদ দিয়ে সে স্থলে অ্যানিমাল অ্যান্ড বার্ডস স্টাডি বিষয়টি যুক্ত করা হয়।[৮৯]

তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রম থেকে। এ পর্যায়ে প্রিলিমিনারি (পূর্বে যেটি এলিমেন্টারি পর্ব ছিল) কোর্স পরীক্ষায় যে ছয়টি ব্যবহারিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হলো : ১. মডেলিং অথবা সিরামিক, ২. স্টিল লাইফ, ৩. পশু ও পাখির কম্পোজিশন, ৪. গ্রাফিক আর্ট, ৫. পারস্পেকটিভ এবং ৬. স্কেচ।[৯০] এখানে লক্ষণীয় যে, কলেজ হওয়ার পর প্রণীত শিক্ষাক্রমে ব্ল্যাকবোর্ড ও চার্ট ড্রইং বাদ দিয়ে পশু ও পাখির কম্পোজিশন যুক্ত করা হয়েছে এবং মডেলিং ও সিরামিক বিষয়টি নতুন সংযোজন করা হয়েছে।

---

[৮৯] অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২২.৭.২০১৬

[৯০] *Prospective of the East Pakistan College of Arts and Crafts,* Approved in DPI order no. 5254-c, dated 28-6-1965, Published by East Pakistan Government Press Dacca-. 1965, p-03.97

আর্ট ইনস্টিটিউটের নবম ব্যাচের ছাত্র এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক হাশেম খান (আবুল হাশেম খান) আর্ট ইনস্টিটিউটের এলিমেন্টারি পর্বের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য দিয়েছেন।[৯১]

শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের লেখা, অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও অধ্যাপক হাশেম খানের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে জানা যায়, গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সময়ে এলিমেন্টারি পর্বের দুই বছরের কোর্সে কপি ড্রইং (ব্ল্যাকবোর্ড ও চার্ট ড্রইং), স্টিল লাইফ, পারস্পেকটিভ, স্কেচ এবং গ্রাফিক আর্ট বিষয়গুলো শিক্ষণীয় ছিল।

কপি ড্রইং ক্লাসে অজান্তার গুহাচিত্র থেকে আঁকা নন্দলালের রেখাচিত্র দেখে অনুকরণ করে আঁকতে হতো। প্রথম বর্ষে আঁকতে হতো ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় করে। দ্বিতীয় বর্ষে এগুলো আঁকতে হতো তুলির সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে কাগজের ওপর। এ ছাড়া কপি ড্রইং ক্লাসে কালি ও তুলিতে ফুল, লতাপাতা ও পাখির ছবি দিয়ে চার্ট ড্রইংও করানো হতো।

পারস্পেকটিভ ক্লাসে আয়তাকার, মোচক, বৃত্তাকারসহ জ্যামিতিক আকৃতির বিভিন্ন উপকরণ ও স্থাপনা দেখে পারস্পেকটিভ অনুশীলন করানো হতো। প্রথম বর্ষে পেনসিলে এবং দ্বিতীয় বর্ষে জলরং মাধ্যমে সাদা-কালো ওয়াশে আঁকানো হতো।

স্কেচ ক্লাস সাধারণত আউটডোরে হতো। প্রথম পর্যায়ে পেনসিল মাধ্যমে গাছের ডাল, শিকড়, পাতার গ্রুপসহ গাছপালা, ঘরবাড়িসহ আশপাশের বিভিন্ন জিনিসের অনুশীলন করানো হতো। তারপর পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য আঁকা শেখানো হতো। পেনসিল ছিল স্কেচ ক্লাসের প্রধান মাধ্যম। তবে কালি-কলম ও কালি-তুলিতেও স্কেচ করানো হতো। স্টিল লাইফ ক্লাসে পাত্র, বোতল, ফলমূল ইত্যাদি জিনিস সাজিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা শেখানো হতো। স্টিল লাইফ ক্লাসের বিষয় বিভিন্ন মডেল উপকরণ দিয়ে সাজানো হতো বলে তখন এই ক্লাস মডেলিং ক্লাস নামেও পরিচিত ছিল। স্টিল লাইফ ক্লাস প্রথম বর্ষে পেনসিলে এবং দ্বিতীয় বর্ষে জলরং মাধ্যমে করানো হতো।

গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে এলিমেন্টারি পর্বে সাধারণত উডকাট মাধ্যমে ছবি আঁকা শেখানো হতো। বিষয় ছিল বিভিন্ন আকৃতির পাত্র, বোতল, ফুল, লতাপাতাসহ বিভিন্ন জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন।

ছাত্রদের প্রমোশন দেওয়ার জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে এই বিষয়গুলোর ওপর পরীক্ষা দিতে হতো। দুই বছর পর এলিমেন্টারি পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো; সেখানে প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণমান থাকত

---

[৯১] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, তারিখ : ২৩.১১.২০১৬

১০০ নম্বর। প্রথম বর্ষের পরীক্ষার কোনো নম্বর বা ক্লাস নম্বর ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হতো না। শুধু ফাইনাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এলিমেন্টারি পর্বের ফলাফল নির্ধারিত হতো। এলিমেন্টারি পর্ব উত্তীর্ণ ছাত্ররাই কেবল অ্যাডভান্সড পর্বে ভর্তির সুযোগ পেতেন।

ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য যে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অনুকরণে প্রণীত। যার উদ্দেশ্য ছিল বস্তু বা দৃশ্যের বাস্তবানুগ অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৪ সালে অধ্যক্ষ হেনরি হোবার লক কলকাতা আর্ট স্কুলে যোগদানের পর সেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কারিকুলাম ও সিলেবাস চালু করেছিলেন। লক-এর যোগদানের সময় থেকে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত প্রায় তিরাশি বছরের মধ্যে এই কারিকুলাম ও সিলেবাসে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার মেয়াদকাল বেড়েছে, পাশ্চাত্য ধারার শিল্পশিক্ষার পাশাপাশি প্রাচ্যধারার ভারতীয় শিল্পশিক্ষা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সকল পরিবর্তনের মাধ্যমে চল্লিশের দশকে এসে কলকাতা আর্ট স্কুলের সিলেবাস একটি স্বতন্ত্র সিলেবাসে পরিণত হয়েছিল। যাকে ঔপনিবেশিক সিলেবাস না বলে 'কলকাতার সিলেবাস' বলা সমীচীন হবে। তবে সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সমুন্নত ছিল। এই সময়ের কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের সিলেবাস ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের রূপকার—জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র। তাঁরা সেখানে শিক্ষকতাও করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাছে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষাক্রম ছিল অনুকরণীয় আদর্শ। আর সেটিই তাঁরা বহন করে এনেছিলেন ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য।

অধ্যক্ষ পদে জয়নুল আবেদিনের যোগদান : জয়নুল আবেদিন ১৯৪৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে ঢাকা ফেরেন এবং ১ মার্চ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি করাচি অবস্থানকালে ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে অথবা নভেম্বর মাসের শুরুতে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন।[৯২] নিয়োগপত্র পাওয়ার প্রায় চার মাস পরে তিনি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পরও ইনস্টিটিউটে যোগদানে এত বিলম্বের অন্যতম কারণ হিসেবে তাঁর কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় অধ্যক্ষ পদটি অনুমোদন না হওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জয়নুল আবেদিন

[৯২] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের প্রচার শাখার আর্ট ডিজাইন পদে যে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেখানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৭০০ টাকা। ১৯৪৮ সালের ১৭ জুন পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিবের এক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জয়নুল আবেদিন জানান, ন্যূনতম ৫০০ টাকা বেতনেও তিনি অধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে সম্মত আছেন। কিন্তু নিয়োগপত্র পেয়ে তিনি দেখেন সরকার তাকে ৫০০ টাকা বেতন দিতেও সম্মত হয়নি। এই নিয়োগপত্রে ১৭৫ টাকা বেতন দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদমর্যাদা কলকাতা আর্ট স্কুলের অপেক্ষা কমিয়ে এডুকেশনাল সার্ভিস পদ হিসেবে পাস করা হয়, যার বেতন স্কেল ছিল ১৫০-৭০০ টাকা। এই পদের শুরুতে অধ্যক্ষের ভাতাসহ ১৭৫ টাকা বেতন ছিল। এই নিয়োগপত্র দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিছুটা দ্বিধান্বিতও হয়েছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদানের বিষয়ে। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর করাচি থেকে আনোয়ারুল হকের কাছে লেখা জয়নুল আবেদিনের এক পত্রে তিনি অনুরূপ হতাশার কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৯৩] তবে তাঁর এই হতাশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নিজের জন্মভূমিতে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার যে মহান সংকল্প নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরেছিলেন সেই সংকল্প বাস্তবায়নে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এ কারণে অধ্যক্ষ পদটি অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার ও স্বল্প বেতনের হওয়া সত্ত্বেও অধিক বেতনের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি ছেড়ে নবপ্রতিষ্ঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। যোগদানের আগে তিনি চেষ্টা করেছিলেন অধ্যক্ষের নির্ধারিত পদমর্যাদা ও বেতন বাড়াতে। শিক্ষা বিভাগ থেকে বেতন বাড়ানোর বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল।[৯৪] কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগে তাঁর বেতন বাড়ানো হয়েছিল কি না সে বিষয়ে জানা যায় না। ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির প্রথম সভায় অধ্যক্ষের পদমর্যাদা বাড়িয়ে ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশনাল পদ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।[৯৫]

আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে জয়নুল আবেদিনের যোগদানের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণার সঞ্চার হয়। তিনি যোগদানের পরেই ইনস্টিটিউট সার্বিক বিষয়ের উন্নতির মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন।

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
[৯৪] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
[৯৫] ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে ঢাকাস্থ পূর্ব বাংলার গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, সভায় সভাপতিত্ব করেন লেডি ভিকারুননিসা নূন, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদের শৈল্পিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনকে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ জন্য তিনি ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুশীলনের ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। কর্মজীবী মানুষ, জীবজন্তু, নদী-নৌকা, হাট-বাজার, বৃক্ষ, ফসলের মাঠ, গ্রাম ও শহরের দৃশ্যসহ বিচিত্র বিষয় এ সময়ে ছাত্ররা অনুশীলন করতেন। এ সকল বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্ররা শাশ্বত বাঙালি জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য অনুভব করতেন। জয়নুল আবেদিন নিজেও ছাত্রজীবনে আউটডোর স্টাডিতে গিয়ে অনুরূপ বিষয়াবলির অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে আঁকা দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার মধ্য দিয়ে তিনি মানবতাবাদী শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীকালেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন তাঁর চিত্রকর্মে। তিনি ইনস্টিটিউট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে খুব বেশি ক্লাস নিতে পারতেন না। তবে মাঝে মাঝে ছাত্রদের ড্রইং ও জলরং দেখিয়ে দিতেন। আনোয়ারুল হক প্রধানত ড্রইং, স্টিল লাইফ, জলরং ক্লাস; কামরুল হাসান স্কেচ ও ড্রইং ক্লাস; সফিউদ্দীন আহমেদ ও হবিবুর রহমান উডকাট ক্লাস এবং সৈয়দ আলী আহসান পারস্পেকটিভ ক্লাস নিতেন।

দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তি : ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে আর্ট ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় ব্যাচে (১৯৪৯–৫০ শিক্ষাবর্ষ) চৌদ্দ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবদুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর (১৯৩২–২০২০), হুমায়ুন কাদির, আলী রেজা, আনোয়ার জগলুল, একরামুল হক, আক্তার জামান, আমিনুর রহমান, ইমদাদ হোসেন, জুনাবুল ইসলাম, আনোয়ারুল হাকিম ও সালাউদ্দীন আকবর চৌধুরী।[৯৬] ইমদাদ হোসেন ছিলেন প্রথম ব্যাচের ছাত্র। প্রথম ব্যাচের সঙ্গে দুই-তিন মাস ক্লাস করার পর তিনি আর্থিক অনটনের কারণে ইনস্টিটিউটে আসা বন্ধ করে দেন। দ্বিতীয় ব্যাচের সঙ্গে তিনি পুনরায় ভর্তি হন।[৯৭] আর্ট ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তির পর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ত্রিশ জনের অধিক হয়। স্থানাভাবে দুটি ব্যাচের ছাত্ররা একই রুমে ক্লাস করতেন। একই রুমে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে পরস্পরের মধ্যে অচিরেই সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রথম ব্যাচের ছাত্ররাও দ্বিতীয়

---

[৯৬] সৈয়দ আজিজুল হক, *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫. পৃ. ২৯–৩০; কাইয়ুম চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৯৪৯ সালের ভর্তি পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, হুমায়ুন কাদির, আলী রেজা, আনোয়ার জগলুল—এই সাতজন ভর্তি পরীক্ষার্থীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা সকলেই ভর্তি হয়েছিলেন; মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ. ২৭ এবং শিল্পী মুর্তজা বশীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার (২৩ জুলাই ২০১৭) থেকে দ্বিতীয় ব্যাচের আরো সাতজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন একরামুল হক, আক্তার জামান, আমিনুর রহমান, ইমদাদ হোসেন, জুনাবুল ইসলাম, আনোয়ারুল হাকিম এবং সালাউদ্দিন আকবর চৌধুরী।

[৯৭] মামুন কায়সার, *ইমদাদ হোসেন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ. ১৬

ব্যাচের ছাত্রদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন ছবি আঁকা শেখার ক্ষেত্রে। শুরুতে আর্ট ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের জন্য লাইব্রেরির সুবিধা ছিল না বললেই চলে। শিক্ষকদের রুমের এক পাশে একটি আলমারিতে কিছু শিল্পকলা বিষয়ক বই রাখা ছিল। লাইব্রেরি বলতে ওই আলমারিটাই বোঝাত। বইগুলো থাকত উডকাট শিক্ষক হবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে।[৯৮] সুতরাং এ সময়ে শিল্পকলার ইতিহাস জানতে ও সমকালীন শিল্পকলার বিষয়ে খোঁজখবর জানতে শিক্ষক, সিনিয়র ছাত্র এবং নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত পত্রপত্রিকা ও বইপত্রের ওপর নির্ভর করতে হতো।

ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের অগ্রযাত্রায় পূর্ব বাংলার উদার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল তাদের সন্তানদের এখানে ভর্তি করার মধ্য দিয়ে। ওই সময় আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। এ ছাড়া সমাজে একটি শ্রেণির মধ্যে শিল্পীদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এমন পরিবেশে ইনস্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র এসেছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। যাঁদের আগমনে শুরুতেই আর্ট ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সমাজে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল। প্রথম ব্যাচের আমিনুল ইসলাম ছিলেন উদার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুল পরিদর্শক। একই ব্যাচের হামিদুর রহমানের পরিবার ছিল শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা। দ্বিতীয় ব্যাচের মুর্তজা বশীরের পিতা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। একই ব্যাচের রশিদ চৌধুরী ছিলেন ফরিদপুরের একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান; তাঁর পিতা ছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের নেতা। কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন শিক্ষিত ও উদার মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যাংকের অ্যাসিসট্যান্ট রেজিস্ট্রার।

উল্লিখিত শিক্ষার্থীসহ অন্যরা শিল্পের প্রতি একধরনের আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল শিল্পী হওয়া। এ ক্ষেত্রে তাঁদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদের মতো উদীয়মান শিল্পীরা। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের অধিকাংশ ছাত্র ছিলেন মুসলমান পরিবার থেকে আসা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান পরিবার ধর্মীয় সংস্কার সত্ত্বেও শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারাটি যে সযত্নে লালন করেছিল, তা এই ছাত্রদের আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়। এই প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতায় পূর্ব বাংলায় শিল্পচর্চা স্বমহিমায় বিকাশ লাভ করতে পেরেছে প্রথম থেকে।

---

[৯৮] শিল্পী মুর্তজা বশীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০১৬

অ্যাডভান্সড কোর্স : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে তিন বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড কোর্সে মোট সাতটি বিভাগ অনুমোদিত ছিল। বিভাগগুলো হলো ১. ফাইন আর্ট, ২. কমার্শিয়াল আর্ট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসহ), ৩. গ্রাফিক আর্ট, ৪. মডেলিং, ৫. ড্রাফটসম্যানশিপ, ৬. ড্রইং মাস্টার কোর্স এবং ৭. ক্রাফটস্। ১৯৫০ সালে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা এলিমেন্টারি কোর্স শেষ করার পর অনুমোদিত বিভাগগুলো চালু করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক ও জায়গার স্বল্পতার কারণে শুরু থেকে সবগুলো বিভাগ একত্রে চালু করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে সৃজনশীল ও ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে বিভাগের গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভাগগুলো চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের বিষয়গুলো—যেমন উডকাট, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট উভয় বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৯৯]

ফাইন আর্ট বিভাগ : আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষ থেকে অ্যাডভান্সড কোর্সে প্রথম বিভাগ হিসেবে ফাইন আর্ট বিভাগ চালু করা হয় আনোয়ারুল হককে বিভাগীয় প্রধান করে। শিল্পকলা শিক্ষার অন্যতম সেরা বিভাগ হলো ফাইন আর্ট। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে সকল কলার মধ্যে শিল্পকলাকেই প্রধান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'পর্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড় শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে যেমন রাজা প্রধান, তেমনই সকল কলার মধ্যে চিত্র প্রধান।'[১০০] ভারতবর্ষে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সংগীতের পাশাপাশি চিত্রকলাই শুধু দরবারি শিল্পের মর্যাদা পেতে সক্ষম হয়।[১০১] ইউরোপীয় শিল্পকলার ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাদের শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে রেনেসাঁ বা নবজাগারণ ঘটেছিল তার প্রধান বিষয়টি ছিল চিত্রকলা। পরিপ্রেক্ষিত, আলো-ছায়া এবং যথাযথ করণ-কৌশলের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক সমতল পরিসরে বাস্তবানুগ ত্রিমাত্রিক আভাস ফুটিয়ে তোলার জাদুকরী কৌশলের আবিষ্কার হয় এ সময়। রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত শিল্পশিক্ষা ছিল কারখানানির্ভর। তখন সেখানে চিত্রকলা, মূর্তি গড়া, ধর্ম পুস্তক নকল, ইমারত নির্মাণ, স্বর্ণশিল্প, মিনাকারি, গালিচা বোনা, বই বাঁধাইসহ শিল্প ও চারু ও কারুকলার যাবতীয় কাজ করা হতো। সেখানে শিল্পচর্চার চারু ও কারুকলার ভেদাভেদ ছিল না। শিক্ষানবিশ শিল্পীদের কম-বেশি সকল বিষয়ে কাজ করতে হতো। রেনেসাঁ শিল্পীদের

---

[৯৯] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩ প্রতিষ্ঠালগ্নে আর্ট ইনস্টিটিউটের বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের কোর্সে প্রথম দুই বছর এলিমেন্টারি বিভাগ ও পরবর্তী তিন বছর, ড্রইং ও পেইন্টিং অথবা কমার্শিয়াল আর্ট। অর্থাৎ অ্যাডভান্সড কোর্সে প্রথম চালু হওয়া বিভাগ হিসেবে ড্রইং ও পেইন্টিং (ফাইন আর্ট) ও কমার্শিয়াল আর্টের কথা উল্লেখ করেছেন।

[১০০] নিসার হোসেন, "চিত্রকলা বিভাগের সেকাল একাল", *স্মরণিকা*, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ১৩

[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

জীবনীকারক জর্জিও ভাসারি প্রথম উপলব্ধি করেন শিল্পকলার এই ব্যাপক বিষয়ের মধ্যে থেকে চিত্রকলা, মূর্তিকলা ও স্থাপত্যকলা বিষয়ে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি ১৫৬৩ সালে ফ্লোরেন্সে প্রতিষ্ঠা করেন ডিজাইনো একাডেমি।[১০২] তখন ডিজাইন অর্থে চিত্রকলা, ভাস্কর্যসহ চারুকলা ও কারুকলার সকল বিষয় বোঝাত। সুতরাং দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার শুরুতে চিত্রকলা ছিল অন্যতম প্রধান বিষয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নাগরিক চিত্রকলা ও মূর্তিকলা বোঝাতে ফরাসিতে Beaux Arts শব্দ দুটির ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজরা এই জোড়া শব্দের অনুবাদ করে ফাইন আর্টরূপে। এর কিছুকাল পূর্বে ইউরোপে মেকানিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন সহায়ক শিল্পের নামকরণ হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্প।[১০৩] এভাবে শিল্পশিক্ষার বিষয় ফাইন আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সময় থেকে সমাজে দুই শ্রেণির শিল্পীর উদ্ভব হতে থাকে—যাদের মধ্যে একদল শহরের অভিজাত বিত্তবানদের নান্দনিক রুচিমাফিক শিল্প সৃষ্টি করতে থাকে; আর একদল ব্যবহারিক প্রয়োজনে যন্ত্রের সমকক্ষ নকশা/শিল্প তৈরি করতে থাকে। ফাইন আর্টের শিল্পীরাই এ সময় সমাজের অভিজাত বিত্তবানদের দ্বারা অধিক সমাদৃত হয়েছেন।

ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিল্পশিক্ষাক্রমের আলোকে; যার ভিত্তি ছিল লন্ডনের সাউথ কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইন। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের প্রথম পর্যায়ে যে বারোটি বিষয় শিক্ষণীয় ছিল তার মধ্যে লাইন ড্রইং, ফ্রিহ্যান্ড ড্রইং, আলো-ছায়াসহ ড্রইং, জ্যামিতিক ড্রইং, প্রাথমিক পেইন্টিং এবং উচ্চতর পেইন্টিং—এই ছয়টি বিষয় ছিল, যা বর্তমান ফাইন আর্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সময় (১৮৯৬–১৯০৬ পর্যন্ত) আর্ট স্কুলের সামগ্রিক বিষয়কে ফাইন আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ওই সময় ফাইন আর্ট বিভাগের মধ্যে মূর্তিকলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সময়ে (১৯০৯–২৭) ফাইন আর্ট বিভাগকে সম্পূর্ণ চিত্রকলানির্ভর বিভাগ করা হয়।[১০৪] ওই সময় ফাইন আর্ট বিভাগকে দ্বিখণ্ডিত করে ফাইন আর্ট বা চারুকলা এবং ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং বা ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা নামে দুটি বিভাগ করা হয়। ওই সময়ে গঠিত ফাইন আর্ট বিভাগের অনুকরণেই ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ গঠিত হয়।

পাশ্চাত্য ধারার বাস্তবানুগ অনুকরণনির্ভর চিত্রশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এই বিভাগে। ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পধারায় আলো-ছায়া ও পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োগে পেনসিল, চারকোল, কালি-কলম, কালি-তুলি, জলরং,

---

[১০২] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮ ও ২২৮

তেলরং ইত্যাদি মাধ্যমে গাছপালা, ফলমূল-ফুল, মানুষ, পশু-পাখি, ঘরবাড়ির দৃশ্যচিত্রসহ পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়কে বাস্তবানুগভাবে ফুটিয়ে তুলতে শিক্ষা দেওয়া হয় এই বিভাগে। এ সকল বিষয়ে ধারাবাহিক চর্চার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীল চেতনার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এই বিভাগ। ফাইন আর্ট বিভাগে গ্রাফিক আর্টের উডকাট ও লিথোগ্রাফ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুরুতে এই বিভাগের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন আনোয়ারুল হক। অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমেদ ফাইন আর্ট বিভাগে ক্লাস নিতেন। তবে সফিউদ্দীন আহমেদ ও হবিবুর রহমান সাধারণত উডকাট ও লিথোগ্রাফ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।[১০৫] আমিনুল ইসলাম, বজলে মাওলা, আবদুস সাত্তার, শামসুল কাদেরসহ সাতজন ছাত্র ফাইন আর্ট বিভাগের প্রথম ব্যাচে ভর্তি হন।[১০৬]

ফাইন আর্ট বিভাগের সিলেবাস : আর্ট ইনস্টিটিউটে অ্যাডভান্সড পর্বে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের জন্য কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অনুকরণে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। শিল্পকলা বিষয়ে শুধু ব্যবহারিক শিক্ষা এই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো তত্ত্বীয় বিষয় তখন পাঠ্য ছিল না। অনেক অনুসন্ধান করেও অ্যাডভান্সড পর্যায়ের সিলেবাসের কোনো কপি পাওয়া যায়নি। প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের সাক্ষাৎকার ও নম্বরপত্র থেকে ওই সময়ের সিলেবাস সম্পর্কে জানা যায়।

অ্যাডভান্সড পর্বের ফাইন আর্ট বিভাগের সিলেবাস সম্পর্কে আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগের বারোতম ব্যাচের ছাত্র (শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৯–৬০) এবং চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধ্যাপক রফিকুন নবী সাক্ষাৎকারে জানান যে, তাঁদের সময়ে অ্যাডভান্সড পর্বে ফাইন আর্ট বিভাগে স্টিল লাইফ, ফিগার ড্রইং, ফিগার পেইন্টিং, হেড স্টাডি, কম্পোজিশন, ল্যান্ডস্কেপ এবং স্কেচ অনুশীলন করানো হতো। এ ছাড়া ঐচ্ছিক দুটি বিষয় ছিল : ১. গ্রাফিক আর্ট ও ২. কমার্শিয়াল আর্ট।[১০৭] আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগের নবম ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৯–৫৭) ছাত্র এবং চারুকলা অনুষদের সাবেক অধ্যাপক হাশেম খানের সাক্ষাৎকার থেকে ফাইন আর্ট বিভাগের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তিনিও শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে রফিকুন নবীর অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, অ্যাডভান্সড প্রথম বর্ষের ড্রইং ক্লাসে মানুষ আঁকা প্রাধান্য দেওয়া হতো। সরাসরি মডেল দেখে দাঁড়ানো, বসাসহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে মানুষের অবয়ব আঁকতে হতো। মানুষের অস্থির সঠিক অবস্থান শেখানোর জন্য ক্লাসে মানুষের কঙ্কাল আঁকতে দেওয়া হতো। এই পর্বে জলরং মাধ্যমে ক্লোজ-আপ

---

[১০৫] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[১০৬] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী ১৯৫৩
[১০৭] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

স্টাডি, স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ আঁকাও গুরুত্ব দেওয়া হতো। তেলরং আঁকা শুরু হতো অ্যাডভান্সড প্রথম বর্ষ থেকে। হার্ড বোর্ডের ওপর সাদা-কালো বা মনোক্রম রং দিয়ে স্টিল লাইফ আঁকার মাধ্যমে তেলরঙে ছবি আঁকা শুরু হতো। এই পর্যায়ে সাদা-কালোয় হেড স্টাডিও করানো হতো।

অ্যাডভান্সড দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষ থেকে তেলরং মাধ্যমে বহু রঙের ব্যবহারে স্টিল লাইফ, হেড স্টাডি, ফিগার পেইন্টিং ও ল্যান্ডস্কেপ শুরু হতো। অ্যাডভান্সড শেষ বর্ষ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে গিয়ে কম্পোজিশন ক্লাস শুরু হতো। আউটডোরে বা ইনডোরে স্টাডি করা বিভিন্ন বিষয় নিজের মতো করে কম্পোজ করে একটি চিত্র আঁকতে হতো। কম্পোজিশনের বিষয়বস্তু ছিল টি-স্টল, ফুটপাতের হোটেল, স্টেশনের অংশবিশেষ, ইট ভাঙারত শ্রমিক, মাছ বাজার, কাঁচাবাজার, খেয়াঘাটের দৃশ্য, কর্মরত মানুষ প্রভৃতি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও ঘটনাপ্রবাহ এই কম্পোজিশনে বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেত। কম্পোজিশন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেমন চিত্রকলা বিষয়ে সামগ্রিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ছিল, তেমনি সুযোগ ছিল তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রকাশ করার। অ্যাডভান্সড পর্যায়ের প্রতিটি বর্ষে নিয়মিত স্কেচ করতে হতো। বুড়িগঙ্গার তীর, সদরঘাট, ফুলবাড়িয়া ট্রেন স্টেশন, বাহাদুর শাহ পার্ক, রমনা পার্কসহ ঢাকা শহরের অলিগলি, ঘরবাড়ি, শহরতলির বিভিন্ন দৃশ্য ছিল এ পর্যায়ের স্কেচের প্রধান বিষয়।[১০৮]

হাশেম খান ও রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার থেকে আরো জানা যায়, ছাত্রদের প্রমোশন দেওয়ার জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তবে অ্যাডভান্সড পর্বের তিন বছর শেষে অর্থাৎ প্রথম ভর্তি হওয়ার পঞ্চম বর্ষে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। যেখানে কৃতকার্য হলে ইনস্টিটিউট থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স সম্পন্নের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হতো। ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগের তেরোতম ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ১৯৬০–৬১) ছাত্র ও ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (মহিলা) সাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামের কাছ থেকে প্রাপ্ত ১৯৬৫ সালের ফাইন আর্ট বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষার একটি নম্বরপত্রে দেখা যায়, ছয়টি বিষয়ে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি বিষয়ের মান ছিল ১০০ নম্বর অর্থাৎ মোট ৬০০ নম্বর। বিষয়গুলো হলো :

১. কম্পোজিশন	২. হেড স্টাডি	৩. স্টিল লাইফ
৪. ড্রইং	৫. স্কেচ	৬. গ্রাফিক আর্ট[১০৯]

---

[১০৮] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০১৬

[১০৯] ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত অ্যাডভান্সড পর্বের ফাইনাল পরীক্ষার সনদপত্র। সনদপত্রটি ১৯.৮.৬৫ তারিখে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিশিয়াল প্যাডে আমিরুল ইসলামের নামে ইস্যু করা হয়। নম্বরের সনদপত্রটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহের সাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামের কাছ থেকে সংগৃহীত

শুধু ফাইনাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হতো। শ্রেণি নম্বর অথবা বার্ষিক পরীক্ষার কোনো নম্বর ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হতো না।

কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে প্রথম যে দুটি বিভাগ নিয়ে অ্যাডভান্সড কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তার মধ্যে একটি ছিল কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ। হেড ডিজাইনার কামরুল হাসানকে বিভাগীয় প্রধান করে ১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।[১১০] এ বছরে এই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন খাজা সফিক আহমেদ।[১১১] বাণিজ্যনির্ভর ব্যবহারিক চিত্রকলা ও নকশা, বাণিজ্যিক পণ্যের মোড়কের নকশা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভাগটি প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রেনেসাঁ-পূর্ববর্তী কারখানাকেন্দ্রিক শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাণিজ্যিক। তখন সমগ্র শিল্পকলার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। রেনেসাঁর শেষ পর্যায়ে জর্জিও ভাসারি প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পকলা একাডেমিগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে চিত্রকলা, মূর্তিকলা ও স্থাপত্যকলা শিক্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে সমবায় প্রথার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কারখানাগুলো তখনো টিকে ছিল প্রধানত দৈনন্দিন ব্যবহারিক শিল্পবস্তু উৎপাদনের স্বার্থে।[১১২] কিন্তু ইউরোপে যন্ত্রশিল্প বিপ্লবের ফলে বিকশিত বাজার অর্থনীতিতেও পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় টিকতে না পারায় সমবায় প্রথার কারখানাগুলো বন্ধ হতে থাকে। ফরাসিতে আঠারো শতকের শেষ পর্যায়ে সমবায় প্রথা রোধ করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজকীয় চিত্রকলা ও মূর্তিকলা একাডেমিও ভেঙে দেওয়া হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে নতুন ধারার শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে, যেখানে চারুকলার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্পকলা গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এ সময় থেকে শিল্পশিক্ষায় চারুকলা ও বাণিজ্যিক শিল্প অভিধায় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আঠারো শতকের দ্বিতীয় শতকে স্কটল্যান্ডে ও ইংল্যান্ডে মেকানিকস ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়; যেখানে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনে সহায়ক শিল্পের নামকরণ হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্প।[১১৩]

ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পশিক্ষার প্রথম পর্যায়ে ব্যবহারিক বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সময় কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এবং ফাইন

---

[১১০] হেড ডিজাইনার পদে কামরুল হাসানের নিয়োগপত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[১১১] Particulars Requiered in connection with the civil list শীর্ষক আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক তালিকা, ১৯৬৫

[১১২] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১১৩] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩২

আর্ট—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের মধ্যে অ্যাডভান্সড ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্রইং, লিথোগ্রাফি, উড এনগ্রেভিং ও মডেলিং বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২৫ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে বাণিজ্যিক শিল্পের চিত্রকলা বিষয় নিয়ে দুই বছর মেয়াদি কমার্শিয়াল আর্ট শাখা খোলা হয়। সেখানে নতুন সংযোজিত হেড ডিজাইনার পদে নিযুক্ত হন কুশল মুখার্জি।[১১৪] অধ্যক্ষ মুকুল দের সময় কমার্শিয়াল আর্ট শাখাটি পুনর্গঠিত করে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ করা হয়। সমাজে কমার্শিয়াল আর্টের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে নয়জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আফজাল উদ্দীন খন্দকার, আবুল কাশেম, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, আমানুল্লাহ খান, আলী আকবর, এ এম এম নূরুল ইসলাম প্রমুখের নাম জানা যায়।[১১৫]

কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের সিলেবাস : কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ের কোনো মুদ্রিত সিলেবাস পাওয়া যায় না। সাবেক ছাত্রদের সাক্ষাৎকার এবং নম্বরপত্র থেকে এই বিভাগের সিলেবাস সম্পর্কে জানা যায়। আর্ট ইনস্টিটিউটের অষ্টম ব্যাচের ছাত্র (শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৫–৫৬) এবং চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অ্যাডভান্সড পর্বে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে ইলাস্ট্রেশন, পোস্টার ডিজাইন, টাইপোগ্রাফি, স্কেচ, লিথোগ্রাফিতে বুক কভার ডিজাইন ইত্যাদি বিষয় শেখানো হতো। তিনি আরো জানান, ওই সময় ক্লাসে ফিগার ড্রইং শেখানো হতো, কিন্তু পরীক্ষা হতো বুক ইলাস্ট্রেশনের ওপর।[১১৬]

সমরজিৎ রায় চৌধুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত গ্রাফিক আর্ট বিভাগের ১৯৬০ সালের ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরপত্র থেকে জানা যায়, এ সময় এই বিভাগে পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি বিষয়ের মান ছিল ১০০ নম্বর অর্থাৎ মোট ৫০০ নম্বর। বিষয়গুলো হলো : ১. স্কেচ, ২. ক্যালেন্ডার ডিজাইন, ৩. প্রেস লে-আউট, ৪. পোস্টার এবং ৫. লিথোগ্রাফে কভার ডিজাইন।[১১৭]

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের আর্ট ইনস্টিটিউটের শেষ ব্যাচ পর্যন্ত অ্যাডভান্সড পর্বে এই সিলেবাস চালু ছিল। ১৯৬৩ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ হিসেবে উন্নীত

[১১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩২

[১১৫] *ক্যাটালগ*, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী, ১৯৫৩

[১১৬] অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২২ জুলাই ২০১৬

[১১৭] ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের সনদপত্র, অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন স্বাক্ষরিত, নম্বরপত্রটি সমরজিৎ রায় চৌধুরীর নামে ইস্যু করা হয় ১৯৬৫ সালের ২০ নভেম্বর, অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর কাছ থেকে সংগৃহীত।

হলে এই সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত সিলেবাস ডিগ্রি পর্যায়ে চালু হয় ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে।

চিত্র-১৭ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষকবৃন্দের সাথে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীরা (আংশিক) ১৯৫১, উৎস : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত মবিনুল আজিমের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ

শ্রেণিকক্ষসহ সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর আন্দোলন : ১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় ব্যাচে ছাত্র ভর্তি হওয়ার পরে ইনস্টিটিউটের শ্রেণিকক্ষের চরম সংকট দেখা দেয়। সৈয়দ জাহাঙ্গীর (১৯৫৩), মবিনুল আজিম (১৯৩৪–৭৫), নিজামুল হক, মীর মুস্তফা আলী (১৯৩২–২০১৭), আব্দুস সবুর, শওকত কামাল, মোহাম্মদ ইদ্রিস, আনোয়ারুল করিমসহ প্রায় বিশ জন ছাত্র এ সময় ভর্তি হন।[১১৮] এ সময় প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ অ্যাডভান্সড পর্বে ওঠার ফলে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে ভর্তি হন। তাঁদের ক্লাস করার জন্য আলাদা জায়গার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একটিমাত্র ক্লাসরুমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের বসানোর পর তৃতীয় বর্ষের দুটি বিভাগের ছাত্রদের বসানোর উপযোগী কোনো জায়গা ছিল না। বাধ্য হয়ে এ সময় তাঁদের বারান্দায় ও আউটডোরে ক্লাস নেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। শ্রেণিকক্ষসহ সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিতে অচিরেই ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে তাঁরা আর্ট ইনস্টিটিউটের সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধান চেয়ে দেয়ালে দেয়ালে

[১১৮] সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্ম প্রতিকৃতি : স্মৃতির মানচিত্র*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৫, পৃ. ৩৪. ছাত্র ভর্তি হয় মীর মুস্তফা আলী; মোহাম্মদ ইদ্রিস, "আলোর পথের যাত্রী", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ*, ঢাকা, মানব প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৭

পোস্টার লাগান। কিন্তু এই পদক্ষেপে কোনো কাজ না হওয়ায় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে অধিকাংশ ছাত্রের সমর্থনে ধর্মঘট ডাকা হয়।[১১৯] কিন্তু এই সামান্য কয়েকজন ছাত্রের ধর্মঘট সরকারের কর্ণকুহরে পৌঁছায়নি। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষক, সিনিয়র ছাত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা মিলে একটি আর্ট গ্রুপ গঠন এবং চিত্র প্রদর্শনী করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পীরা সর্বসাধারণের কাছাকাছি যাবেন এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের সমস্যা ও চাহিদাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি আর্ট গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঢাকা আর্ট গ্রুপ গঠন : 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর অনুকরণে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হয় 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'। ঢাকা আর্ট গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক করা হয় পূর্ব বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনকে এবং সহকারী পৃষ্ঠপোষক করা হয় ড. হোসেইন, লেডি ই ভি নূন, নাজির আহমেদ, নাসির আহমেদ, কাজী মোহাম্মদ বশীর এবং এ এম সলিমুল্লাহকে। জয়নুল আবেদিনকে সভাপতি, কামরুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক, আনোয়ারুল হককে কোষাধ্যক্ষ এবং হামিদুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন আমিনুল ইসলাম, খাজা শফিক আহমেদ, আকতারুজ্জামান, অজিত গুহ, মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, জুনাবুল ইসলাম, মোঃ জয়নুল আবেদিন, সৈয়দ আলী আহসান, আমিনুর রহমান, আব্দুল গণি হাজারী ও মিস রাবেয়া ইসলাম।[১২০]

জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, এর সমস্যা সমাধান এবং শিল্পীদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিবর্গকে কৌশলে কাজে লাগাতেন। দেশভাগের পরে তিনি পূর্ব বাংলার আর্ট ইনস্টিটিউটের উপযোগিতা বোঝাতে একটি পোস্টার প্রদর্শনী করেছিলেন (মার্চ ১৯৪৮), যা ঢাকাতে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করেছিল।[১২১] আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর শ্রেণিকক্ষের অভাবে যখন প্রতিষ্ঠানটি সংকটের মুখে পড়ে তখন সেখান থেকে উত্তরণের জন্য তিনি আবারও একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্যোগের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন, গভর্নর ফিরোজ খান নূনের পত্নী লেডি ভিকারুননিসা নূনসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যুক্ত করেন।

ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী : ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় ১৯৫১ সালের ১৬ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের (বর্তমান ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল) লিটন

---

[১১৯] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[১২০] *Catalogue*, First Annual Art Exhibition of Dacca Art Group, Lytton hall, University of Dacca, January 16^{th}–24^{th}, 1951, p. 6

[১২১] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯, ৬০

হলে। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল ঢাকার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী।[১২২] এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউকে কেন্দ্র করে ঢাকায় গড়ে ওঠা শিল্পচর্চার সঙ্গে সর্বসাধারণের প্রথম সরাসরি পরিচয় ঘটে। ঢাকা আর্ট গ্রুপের নামে হলেও এই প্রদর্শনী ছিল মূলত আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী পূর্ব বাংলার শিল্পী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।

এই প্রদর্শনীতে চৌত্রিশ জন শিল্পীর মোট ২৭৪টি চিত্রকর্ম ছিল, যার অধিকাংশ ছিল বাস্তববাদী ধারায় আঁকা পেনসিল স্কেচ, জলরং ও কয়েকটি তেলরং চিত্র। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন।

প্রদর্শনীতে প্রবেশের জন্য দুই আনা মূল্যের প্রবেশ টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। তার পরও প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনী ছয় দিন ধরে চলার কথা থাকলেও দর্শকদের আগ্রহের কারণে আরো পাঁচ দিন বাড়ানো হয়। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে একটি ক্যাটালগ ছাপা হয়। যার প্রচ্ছদ করা হয় পারস্যের বিখ্যাত চিত্রকর বিহযাদের ড্রইংয়ের কপি দিয়ে। ড্রইংটির কপি করেছিলেন কামরুল হাসান। মুসলিম শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে জয়নুল আবেদিন বিহযাদের ড্রইং দিয়ে ক্যাটালগের প্রচ্ছদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১২৩]

ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের পনেরোটি, শিক্ষক সফিউদ্দীন আহমেদের চৌদ্দটি, খাজা শফিক আহমেদের এগারোটি, কামরুল হাসানের তেত্রিশটি, আনোয়ারুল হকের বিশটি এবং হবিবুর রহমানের চারটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল। জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্মের মধ্যে আটটি ছিল 'বেঙ্গল ১৯৪৩' শিরোনামের দুর্ভিক্ষের চিত্র। এ ছাড়া অন্যান্য চিত্রের শিরোনাম ছিল 'শালবনে গরু', 'দুমকার বাঁক', 'একটি স্বচ্ছ ছায়া', 'স্টুডিও কর্নার', 'রাতের অনুশীলন', 'আমার জানালা থেকে' এবং 'স্টিল লাইফ'। সফিউদ্দীন আহমেদের চিত্রকর্মের শিরোনাম ছিল 'মেলার পথে', 'সাঁওতাল বালিকা', 'বাড়ী ফেরা', 'যাত্রার শেষে', 'শান্তিনিকেতন', 'ময়ূরাক্ষী নদী', 'আমার স্টুডিও', 'সায়াহ্নের আলো', 'বৃক্ষরাজি', 'শীতল ছায়া', 'ডার্ক শ্যাডো' প্রভৃতি।

---

[১২২] জয়নুল আবেদিন, "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, ভূমিকায় জয়নুল আবেদিন এই প্রদর্শনীকে পূর্ব বাংলার প্রথম শিল্পকর্ম প্রদর্শনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

[১২৩] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

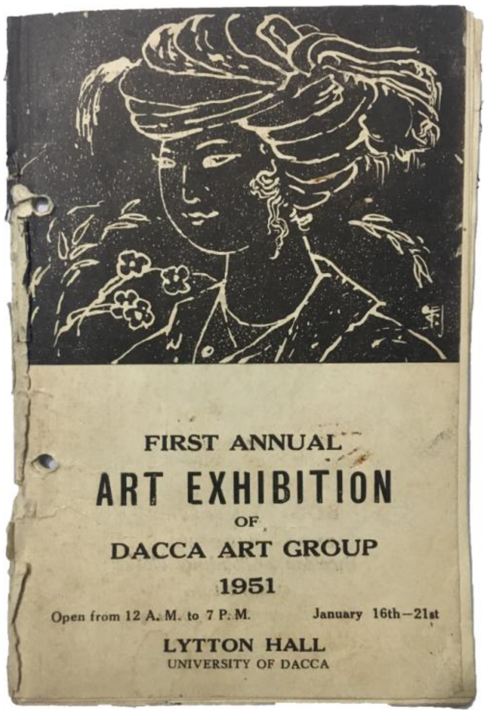

চিত্র-১৮ : ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীর ক্যাটালগের প্রচ্ছদ, উৎস : শিল্পী মুর্তজা বশীর

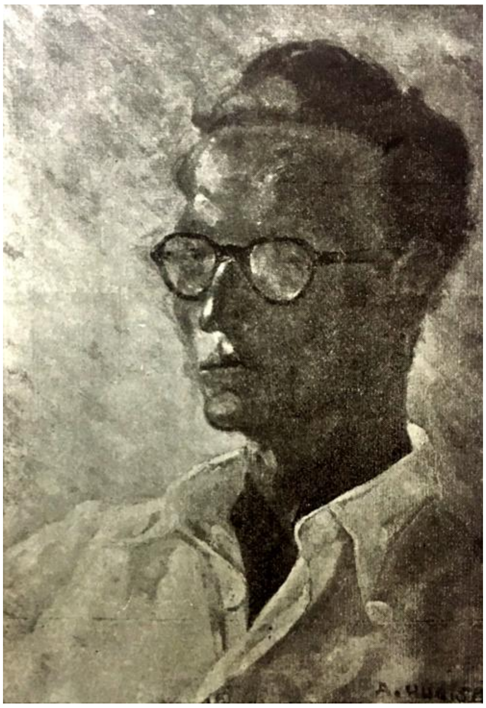

চিত্র-১৯ : 'এ স্টাডি', শিল্পী আনোয়ারুল হক

আনোয়ারুল হকের চিত্রকর্মের শিরোনাম ছিল 'মাছ ধরা নৌকা', 'অবসরে', 'চট্টগ্রামের দৃশ্য', 'মুন্সীগঞ্জের নদীর তীর', 'ফসল তোলা', 'সাপ্তাহিক হাট', 'যাত্রা', 'ফকির', 'অনুশীলন', 'ব্রহ্মপুত্রের বাঁক', 'গারো বালক' ইত্যাদি। কামরুল হাসানের চিত্রকর্মের শিরোনাম ছিল, 'বাজার থেকে ফেরা', 'নারী', 'মুক্তাগাছা থানা', 'দুধের জন্য অপেক্ষা', 'ফোর্থ রাউন্ড', 'অপেক্ষা', 'মেঘলা নদী', 'যাত্রার প্রস্তুতি', 'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ' ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতি চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। যার মধ্যে ছিল শামসুল আলম, খালেক চৌধুরী, কে এল বসাক, আমিনুল ইসলাম, যোগেশ, রাজ্জাক, প্রেসম্যান ও আলী আকবরের প্রতিকৃতি। খাজা শফিক আহমেদের চিত্রকর্মের মধ্যে অন্যতম ছিল 'মাছ ধরা', 'একটি আলোকিত দিন', 'নির্জনতা', 'নদীর তীর', 'লোয়ার চিৎপুর রোড', 'কচুরীপানা' প্রভৃতি। হবিবুর রহমানের চিত্রের শিরোনাম ছিল 'ভিক্ষুক', 'বিচরণরত ছাগল', 'আশীর্বাদ' ইত্যাদি।

ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ব্যাচের আমিনুল ইসলামের একুশটি, হামিদুর রহমানের সতেরোটি, আবদুর রহমান ভূঁইয়ার সাতটি, আফজাল উদ্দীন খন্দকারের আটটি, নূরুল ইসলামের নয়টি, শামসুল আলমের দুটি, শামসুল কাদেরের একটি এবং জুলফিকার আলীর একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

দ্বিতীয় ব্যাচের আবদুর রাজ্জাকের সতেরোটি, কাইয়ুম চৌধুরীর ষোলোটি, রশিদ হোসেন চৌধুরীর চৌদ্দটি, আক্তার জামানের বারোটি, আমিনুর রহমানের এগারোটি, জুনাবুল ইসলামের নয়টি, আব্দুস

সবুরের তিনটি, মুর্তজা বশীরের দুটি, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর তিনটি, ইকরামুল হকের চারটি, ইমদাদ হোসেনের দুটি এবং হুমায়ুন কাদেরের একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায় । এ ছাড়া তৃতীয় ব্যাচের মোঃ ইসমাইল শহিদুল্লাহর তিনটি, আব্দুস সবুরের তিনটি, সোলাইমানের একটি, গোলাম সারোয়ারের একটি, আশরাফ জামানের পাঁচটি এবং আই এ গাজীর একটি চিত্রকর্ম স্থান পায় ।

এই প্রদর্শনীর একমাত্র নারী শিল্পী ছিলেন রাবেয়া ইসলাম । তাঁর চারটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল । এ ছাড়া শিল্পী মোস্তফা আজিজের পাঁচটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল ।

ক্যাটালগে আনোয়ারুল হকের তেলরঙে আঁকা একটি প্রতিকৃতি (এ স্টাডি) আবদুর রাজ্জাকের জলরঙে আঁকা স্কেচ 'পুরান ঢাকা' (বুড়িগঙ্গার দৃশ্য), হামিদুর রহমানের 'লাইট মোর লাইট' শিরোনামের উডকাট চিত্র এবং আমিনুল ইসলামের 'ক্রস শ্যাডো' শিরোনামের একটি উডকাট চিত্র ছাপা হয় ।

ছাত্রদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, আবদুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী প্রমুখের চিত্রকর্ম দর্শকদের দ্বারা প্রশংসিত হয় । আমিনুল ইসলাম ও কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্র এই প্রদর্শনী থেকে বিক্রি হয় ।

জয়নুল আবেদিন এই ক্যাটালগের ভূমিকায় লেখেন—

> Art is a reflection of mankind. It is a mirror in which we see ourselves. ... Art is a culture. It is a truth and full of beauty. A nation should value properly their culture. We have a bright culture behind and it is our duty to create new for the present and future. I am glad today, my Dacca Art Group is going to exhibit the first art exhibition of painting for the first time on our land.[১২৪]

এই ভূমিকায় তিনি ঢাকা আর্ট গ্রুপের বৈশিষ্ট্যও ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, ঢাকা আর্ট গ্রুপ কোনো নির্দিষ্ট ঘরানা বা চিত্রকলার আদর্শ অনুসরণ করে না, এটি কেবল শিল্পীদের একটি সংগঠন; যেখানে সকল ঘরানার এবং সকল আদর্শের শিল্পীরা চিত্রচর্চা করবে শিল্পের তাগিদে ।[১২৫]

এই ক্যাটালগে পূর্ব বাংলার শিল্পীদের জন্য আর্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল । দাবিগুলো হলো : একটি জাতীয় চিত্রশালা স্থাপন, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক মান উন্নয়ন, চিত্রকরদের জন্য স্টুডিও সুবিধা প্রদান এবং চারুকলা বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা ।

---

[১২৪] *Catalogue,* First Annual Art Exhibition of Dacca Art Group, Lytton hall, University of Dacca, January 16th-24th, 1951, p. 6

[১২৫] *Catalogue,* First Annual Art Exhibition of Dacca Art Group, Ibid. p.7

পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ চারুশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ঢাকা আর্ট গ্রুপের এই দাবি ছিল যৌক্তিক। তখন ঢাকায় কোনো আর্ট গ্যালারি ছিল না। আধুনিক শিল্পের কোনো চিত্র প্রদর্শনীও এর পূর্বে কখনো হয়নি। এ ছাড়া শিল্পীদের জন্য স্টুডিও, আর্ট জার্নাল কিছুই ছিল না। এ কারণে ঢাকার শিল্পচর্চা বিকাশের জন্য এই সুযোগ-সুবিধাগুলো আবশ্যক ছিল। এই দাবিগুলোর সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটের সমস্যাগুলোও তুলে ধরা হয়েছিল প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে আসা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

ঢাকা আর্ট গ্রুপের এই চিত্র প্রদর্শনীর খবর রেডিও ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয়। ১৯৫১ সালের আগস্টে প্রকাশিত মাসিক *মাহেনও* পত্রিকায় জালাল উদ্দিন আহমেদের লেখা 'আধুনিক পাকিস্তানী শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি' শীর্ষক একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে ঢাকা আর্ট গ্রুপের চিত্র প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'সম্প্রতি ঢাকা আর্ট গ্রুপ একটা স্মরণীয় চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। এখানে ওয়াটার কালার, অয়েল, টেম্পারা, ড্রাই পয়েন্ট এবং অ্যাকুয়াটিন্ট চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও লিথোগ্রাফ, উডকাট, চারকোল, ব্রাশ, স্কেচ, লাইন ড্রইং এবং উড এনগ্রেভিং পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছিল।'[১২৬] প্রতিবেদনে পূর্ব বাংলার শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। জয়নুল আবেদিনের চিত্রের বর্ণবিন্যাস, রেখার ছন্দ আর জলরঙের সাবলীলতার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া সফিউদ্দীন আহমেদের উডকাট ও এচিং মাধ্যমে আঁকা চিত্রকর্মের, আনোয়ারুল হক ও খাজা শফিক আহমেদের জলরং ও চারকোলে আঁকা চিত্রকর্মের প্রশংসা করা হয়।

এই প্রতিবেদনে পাকিস্তানি শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ওই সময়ের শিল্পচর্চাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি উল্লেখ করেছেন ইরানি ও মোগল স্কুলের প্রতিনিধি হিসেবে আব্দুর রহমান চুঘতাই ও তাঁর অনুবর্তী ঐতিহ্যবাদী প্রধান শিল্পীদের। দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করেছেন পূর্ব বাংলার জয়নুল আবেদিন ও তাঁর অনুবর্তী শিল্পীদের। যাঁরা মর্মস্পর্শী স্কেচ, পল্লী দৃশ্য, স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্য অঙ্কনে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তৃতীয় পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন জুবেদা আগা, নাসির শামসী, এনায়েতুল্লা আজার প্রমুখ তরুণ শিল্পীর সম্পর্কে। সাধারণ থেকে অভিনব, সব রকমের পদ্ধতিই যাঁরা অবলম্বন করে থাকেন।[১২৭]

জালাল উদ্দিনের এই প্রতিবেদন থেকে ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রদর্শনী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন পাওয়া যায় তেমনি সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার শিল্পীদের একটি সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কেও জানা

[১২৬] জালালউদ্দিন আহমেদ, "আধুনিক পাকিস্তান শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি", *মাহেনও*, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫১, পৃ. ৮০–৯০

[১২৭] জালালউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

যায়। গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকায় আধুনিক চারুশিল্পের যে চর্চা শুরু হয়েছিল, তা মাত্র তিন বছরের মধ্যে সারা পাকিস্তানের শিল্পী ও শিল্পরসিক সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এই প্রদর্শনী ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। পত্রপত্রিকায় তাঁদের চিত্রকর্মের সমালোচনা, কয়েকজনের চিত্রকর্ম বিক্রি ও সুধীসমাজের প্রশংসা তাঁদের নতুন উদ্যমে চিত্রচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এর পর থেকে ক্লাসের রুটিনবদ্ধ কাজের পাশাপাশি প্রদর্শনীর জন্য ভালো কাজ করার, বিশেষ করে স্কেচ ও জলরং করার প্রবণতা ছাত্রদের মাঝে বেড়ে যায়। এ ছাড়া এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ঢাকায় কিছু চিত্র সংগ্রাহক ও শিল্প সমালোচকের সৃষ্টি হয়।

এই প্রদর্শনী শিল্পানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি সরকারের উর্ধ্বতনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর্ট ইনস্টিটিউটের শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানে তাঁরা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের উপরতলার আরো দুটি কক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু সরকারি আদেশ আসতে সময় নিচ্ছিল। অন্যদিকে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররাও ওই দুটি কক্ষ দখলে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা বরাদ্দের আদেশ আসার আগেই কক্ষ দুটি দখল করে নেন। এর মধ্যে একটি শ্রেণিকক্ষ করা হয়, যেখানে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং অন্য কক্ষটি ছাত্রদের অস্থায়ী ভিত্তিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[১২৮] ছাত্রদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং তাঁদের কাজের তদারকির জন্য কামরুল হাসানেরও থাকার ব্যবস্থা করা হয় ছাত্রদের কক্ষে। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য কক্ষ বরাদ্দের সরকারি আদেশ চলে আসে। এভাবে দুটি কক্ষ প্রাপ্তিতে ছাত্রদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। এ ছাড়া সদ্য শেষ হওয়া প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁরা নতুন উদ্যমে ক্লাস শুরু করেন।

১৯৫১ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে চতুর্থ ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ১৯৫১–৫২) শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন; যাঁদের মধ্যে কাজী আবদুল বাসেত (১৯৩৫–২০০২), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩–২০০৮), আবু তাহের (১৯৩৬–২০২০), আব্দুর রউফ, এহসানুল আমিন প্রমুখের নাম জানা যায়।[১২৯] দেবদাস চক্রবর্তী ও বিজন চৌধুরী ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র। দেবদাস সেখানে দ্বিতীয় বর্ষ এবং বিজন চৌধুরী তৃতীয় বর্ষ সম্পন্ন করেছিলেন। বামপন্থী ধারার রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী বিজন, দেবদাসসহ আরো কয়েকজন ছাত্রকে আর্ট স্কুলের শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন

[১২৮] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[১২৯] মাহমুদ আল জামান, *কাজী আবদুল বাসেত : আর্ট অব বাংলাদেশ সিরিজ-১২*, সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ. ২৬

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পূর্ব বাংলায় এসে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে তাঁদের ভর্তির আশ্বাস দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেবদাস ভর্তির সুযোগ পান ১৯৫১–৫২ শিক্ষাবর্ষে এবং বিজন চৌধুরী প্রথম ব্যাচের (১৯৪৮–৪৯ শিক্ষাবর্ষের) সঙ্গে।[১৩০]

প্রথম পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার পরিবেশ : ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চারটি ব্যাচে প্রায় সত্তর–পঁচাত্তর জন ছাত্রের উপস্থিতিতে আর্ট ইনস্টিটিউটে জমজমাট পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আর ছাত্রদের কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে। শিল্পশিক্ষায় শিক্ষকদের পাশাপাশি সিনিয়র ছাত্ররাও তাঁদের জুনিয়রদের বিশেষ সহযোগিতা করতেন। ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে আর্ট ইনস্টিটিউট ছিল একটি পরিবারের মতো। আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের দৈনন্দিন কার্যক্রম ছিল অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের থেকে ভিন্ন। তাঁরা সাধারণত সকাল নয়টার মধ্যে ইনস্টিটিউটে এসে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ক্লাসে কাজ করতেন। তারপর যেতেন বাইরে ছবি আঁকতে। ছবি আঁকা ও আড্ডা শেষে রাতে তাঁরা বাসা বা মেসে ফিরতেন। এ বিষয়ে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন : 'বাড়ী থেকে বের হতাম সকাল নয়টার মধ্যে। আর ক্লাশ করে বাইরে স্কেচ করে শিল্প-সাহিত্য ও রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরতাম রাত নয়টা-দশটার দিকে।'[১৩১] কাইয়ুম চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে সৈয়দ আজিজুল হক ওই সময়ের ছাত্রদের দৈনন্দির কার্যক্রম সম্পর্কে লিখেছেন : 'সতীর্থরা মিলে

---

[১৩০] বিজন চৌধুরী ও দেবদাস চক্রবর্তীর কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। বিজন চৌধুরীর 'আমার দেখা জয়নুল আবেদিন' প্রবন্ধে (জয়নুল আবেদিন : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিঃ ২০১৬, পৃ. ১২২) উল্লেখ করেছেন, '১৯৫০ সালে ঢাকায় সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ লাভ করি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *আর্ট অব বাংলাদেশ, সিরিজ-৮ : দেবদাস চক্রবর্তী*, সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), ২০০৩, পৃ. ৯৫-তে তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৫০ সালে ঢাকা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে ৫৬ সালে চিত্রকলায় স্নাতক সমমানের কোর্স সমাপন করেন। এই দুটি তথ্য সঠিক ধরলে বিজন চৌধুরী প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন এবং দেবদাস ৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মীর মোস্তফা প্রমুখের সঙ্গে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন (ফোনালাপ ১৮.২.১৮) দেবদাস তাঁর এক বছরের জুনিয়র ছিলেন। কিন্তু শিল্পকলা থেকে প্রকাশিত উল্লিখিত একই গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় তাঁর সহপাঠী হিসেবে কাজী আবদুল বাসেত ও আবু তাহেরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা চতুর্থ ব্যাচ অর্থাৎ ১৯৫১–৫২ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সিরিজ-১২, *আবু তাহের : হিজ পেইন্টিং* গ্রন্থেও তাঁদের সহপাঠী হিসেবে দেবদাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমিনুল ইসলাম *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* (প্রাগুক্ত) গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তাদের মধ্যে এ দুজন ঢাকায় ভর্তি হওয়া যায় কি না এই ভাবনায় ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে ঢাকায় চলে আসে।' সুতরাং কাজী আবদুল বাসেত ও আবু তাহের তাঁর সহপাঠী হয়ে থাকলে তিনি ১৯৫১ সালে এসে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে আমিনুল ইসলামের প্রদত্ত তথ্যটি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

[১৩১] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

একসঙ্গে ক্লাস, একসঙ্গে স্কেচ করতে যাওয়া। বুড়িগঙ্গার এপারে-ওপারে। রাত্রি-দিনে শুধু ছবি আর ছবি আঁকা, ছবির স্বপ্ন দেখা।'[১৩২]

সৈয়দ জাহাঙ্গীর ওই সময়ের স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে—

> 'আমি আর দেবদাস প্রায়ই একত্রে যেতাম আউটডোর স্কেচ করতে। কখনো রেলস্টেশনে যেতাম স্কেচ করতে। গভীর রাতে ঘুমন্ত মানুষজন জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকত। তারই ড্রইং করতাম। প্রায়ই সদরঘাট যেতাম। যেতাম ছোট কাটরা ও বড় কাটরায়। নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে ছিল তখনকার জনপ্রিয় ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্ট। আমরা প্রায়ই সেখানে আড্ডা দিতাম। আসতেন হাসান হাফিজুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, খালেদ চৌধুরী, সঞ্জীব দত্ত প্রমুখ। মুখর থাকত ক্যাপিটাল রেস্তোরাঁ।'[১৩৩]

তাঁদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ওই সময়ে ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে ছবি আঁকা যেমন শিখতেন, তেমনি সমকালীন প্রগতিশীল তরুণ কবি, সাহিত্যিক রাজনীতিকদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডার মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্য ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হতেন। পরস্পরের মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের আধুনিক ও প্রগতিশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন সমাজ সচেতন প্রগতিশীল শিল্পী। তিনিও চাইতেন তাঁর ছাত্ররা শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলুক। এ কারণে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের যেকোনো অনুষ্ঠান বা আয়োজনে সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পীসহ সৃজনশীল ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসতেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে ছাত্রদের আসার সুযোগ করে দিতেন। এভাবে শুরু থেকেই তাঁর ছাত্রদের মাঝে বিষয়টি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ছাত্ররা সহায়ক ভূমিকা পালন করতেন। সঙ্গে করে আউটডোরে ছবি আঁকতে নিয়ে যাওয়া, চিত্রকলার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়াসহ শিল্পকলাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন আমিনুল ইসলাম। 'কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবন কথা' গ্রন্থে সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন—

> সে সময় আমিনুল ইসলাম আর্ট স্কুলের একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর সঙ্গে বহুবার তিনি আউটডোর স্কেচে গিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্য-সংগীত এই তিনের স্পর্শে আমিনুল তখন টইটুম্বর।[১৩৪] এ প্রসঙ্গে মুর্তজা বশীর লিখেছেন, আমিনুল ইসলামের সঙ্গে আমি স্কেচ করতে বের হতাম, সে আমাকে শেখাতো। তৈলচিত্র আঁকার বিষয়ে ও আমাকে নানা রকম উপদেশ দিত। আমিনুলের বাসায় ছিল শিল্পকলার উপর নানা বই। আমাকে ভ্যানগঘ, মাতিস, পিকাসোর বই দিয়ে ছবি দেখিয়ে আলোচনা করত।[১৩৫]

---

[১৩২] সৈয়দ আজিজুল হক, *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[১৩৩] সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্মপ্রতিকৃতি : স্মৃতির মানচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[১৩৪] সৈয়দ আজিজুল হক, *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[১৩৫] মুর্তজা বশীর, "আমিনুল আমার বন্ধু আমার শিক্ষক", *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিঃ, ২০১৪, পৃ. ২৪৩

এভাবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সিনিয়র ছাত্রদের সহযোগিতায় ছাত্ররা শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারতেন।

দেশবিভাগের পূর্বে ঢাকায় শিল্প উপকরণ ছিল দুষ্প্রাপ্য। সে সময় রং, তুলি, ক্যানভাসের মূল বাজার ছিল কলকাতা। ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে দু-একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শিল্প উপকরণ বিক্রি শুরু করে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'ওয়ার্সি বুক হাউস' এবং জনসন রোডের 'রয়েল স্টেশনারি'। এ সময় শিল্প উপকরণ ছিল ঊর্ধ্বমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কার্টিজ পেপার, পেনসিল, বোর্ড, জলরং, তুলি, চাইনিজ ইংক ইত্যাদি সহজে পাওয়া গেলেও বিদেশি হ্যান্ডমেড পেপার, কেন্ট পেপার, ক্যানভাস, অয়েল কালার ইত্যাদি সহজলভ্য ছিল না। এগুলোর প্রয়োজনে কখনো অগ্রিম অর্ডার দেওয়া লাগত। শিল্প উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও ঊর্ধ্বমূল্যের কারণে অনেক সতর্কতার সঙ্গে ছোট আকারের কাগজ ও ক্যানভাসে ছাত্ররা ছবি আঁকতেন। ক্যানভাসের ঊর্ধ্বমূল্য ও ফ্রেম করার ঝামেলা এড়াতে ছাত্ররা ক্লাসে সাধারণত মেসোনাইড বোর্ডের ওপর তেলরঙে ছবি আঁকতেন।[১৩৬]

আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষা ছিল বেশ ব্যয়বহুল। শিল্পশিক্ষার জন্য শিল্প উপকরণ ক্রয়, ঢাকায় থাকা-খাওয়াসহ ছাত্রদের প্রতি মাসে অনেক টাকার প্রয়োজন পড়ত, যা নির্বাহ করার সামর্থ্য অধিকাংশ অভিভাবকের ছিল না। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকার চারুকলা শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের জন্য শুরু থেকে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ারও সুযোগ করে দেয়। ছাত্রদের আবাসিক ও অনাবাসিক এই দুইভাবে বৃত্তি দেওয়া হতো। আবাসিক ছাত্রদের বৃত্তির হার ছিল মাসিক বিশ টাকা (রুপি) এবং অনাবাসিক ছাত্রদের মাসিক দশ টাকা (রুপি)। ছাত্রের সংখ্যা ও মেধাক্রমের ভিত্তিতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ১২% ছাত্র বিনা বেতনে ও অর্ধ বেতনে শিক্ষার সুযোগ পেতেন।[১৩৭]

জয়নুল আবেদিনের ইউরোপ গমন এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হক : ১৯৫১ সালের ৩ আগস্ট সরকারি বৃত্তির অধীনে জয়নুল আবেদিন এক বছরের জন্য ব্রিটেন যান। তিনি লন্ডনে যাওয়ার পর আর্ট ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আনোয়ারুল হক। কিন্তু শিক্ষকদের একটা পক্ষ তাঁর অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়াটা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ওই পক্ষের বাধার কারণে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের দুই মাস পরে সরকারি আদেশপত্র আসে। বিরোধী পক্ষ এ সময় জয়নুল আবেদিনের বিশ্বস্ত

[১৩৬] মুর্তজা বশীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ ১০ জুলাই ২০১৭

[১৩৭] স্কলারশিপ/স্টাইপেন্ডের রেগুলেশন-১৯৫৮–৫৯ শিক্ষাবর্ষ, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারী জয়নাল আবেদিনকে ইনস্টিটিউট থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নবনিযুক্ত ডিপিআই আব্দুল হাকিমের হস্তক্ষেপে এ সকল সমস্যার সমাধান হয়। বিষয়গুলো জানিয়ে আনোয়ারুল হক জয়নুল আবেদিনকে চিঠি লিখলে তার জবাবে তিনি ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে এক পত্রে লেখেন, 'ক্লাস যাতে ঠিকমতো চলে সেদিকে লক্ষ রাখবেন। শত্রুতা বাইরে গিয়ে করুন।' এ ছাড়া আবদুর রাজ্জাক ও রশিদ চৌধুরীকে ভালোভাবে তৈরি করার পরামর্শ দেন। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানোর পরিকল্পনার কথাও জানান।[১৩৮] শিক্ষকদের মনোমালিন্যের কারণে ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে জয়নুল আবেদিন তাঁর সহকর্মীদের সতর্ক করতেন। এ ছাড়া তিনি ভবিষ্যতে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক নির্বাচনের জন্য ছাত্র অবস্থা থেকে মেধাবী ছাত্রদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন।

আনোয়ারুল হক অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর ফাইন আর্ট বিভাগে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। কারণ তিনি ছিলেন এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যতম শিক্ষক। তাঁর শূন্যতা পূরণ করার জন্য কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের প্রধান এবং হেড ডিজাইনার কামরুল হাসানকে অস্থায়ী ভিত্তিতে (জয়নুল আবেদিনের ছুটিকালীন সময় পর্যন্ত) লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে নিযুক্ত করে ফাইন আর্ট বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পদের জন্য তিনি নিয়োগপত্র পান ১৯৫১ সালের ১ ডিসেম্বর এবং যোগদান করেন ১৯৫২ সালের ৬ জানুয়ারি।[১৩৯] শিক্ষকশূন্যতা পূরণের এই ধারাবাহিকতায় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শিক্ষক খাজা শফিক আহমেদকে হেড ডিজাইনার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত করে উক্ত বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর শূন্য পদে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় মোহাম্মদ কিবরিয়াকে। তিনি ইনস্টিটিউটে অস্থায়ী শিক্ষক পদে যোগদান করেন ১৯৫২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারিতে।[১৪০] নিয়োগের পর তাঁকে এলিমেন্টারি পর্বে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এ সময় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে জয়নুল আবেদিনের দেশে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আট মাস ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। মোহাম্মদ কিবরিয়া ১৯৫০ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ছয় বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় এসে তিনি নওয়াবপুর স্কুলে ড্রইং টিচার

---

[১৩৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫–৭৬

[১৩৯] কামরুল হাসানের লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের অফিস আদেশ, অফিস আদেশ নং ৪৫৩৭/২-এ, তারিখ ৪ ডিসেম্বর ১৯৫১ এবং ডিপিআইকে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের লেখা কামরুল হাসানের লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে যোগদানের অবগত পত্র, পত্র নং ১০, তারিখ : ৭ জানুয়ারি, ১৯৫২, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১৪০] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে শিক্ষক পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে মোহাম্মদ কিবরিয়ার যোগদান পত্র, তারিখ ৩.২.১৯৫২, ডায়েরি নং-১০৩, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জয়নুল আবেদিন ইউরোপ থেকে ফিরে ইনস্টিটিউটে যোগদান করলে তিনি পূর্বের কর্মস্থলে ফিরে যান।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের সম্পৃক্ততা : ১৯৫২ সালের শুরুতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা শহরের রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দেশবিভাগের পূর্ব থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে বিষয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। দেশভাগের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের কতিপয় প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। অন্যদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল হক, অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রমুখ রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অবস্থান নেন। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে একই ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ করেন। মূলত এর পর থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় জিন্নাহর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে ভাষা আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আহ্বানে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এদের আহ্বানে ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় পতাকা দিবস। এই দুটি দিবসে ছাত্র-জনতার ব্যাপক জনসমাগম হয়। এই ব্যাপক জনসমাগম ও উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা জারির মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।[১৪১]

ঢাকা শহরের এই পরিস্থিতির মধ্যে চলছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনীর প্রস্তুতি। ২২ ফেব্রুয়ারি নিমতলীতে অবস্থিত ঢাকা জাদুঘরে এই প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল। সে কারণে প্রদর্শনীর প্রস্তুতি কাজের জন্য কামরুল হাসানের নেতৃত্বে মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেন, মোহাম্মদ ইদ্রিসসহ বেশ কিছু ছাত্র ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

[১৪১] ফিরোজ মাহমুদ, "ভাষা আন্দোলন : বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎস এবং আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের প্রেরণা", নূরে নাসরিন (সম্পা.), *একুশ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষ দিবসের বীরত্বগাথা*, ঢাকা, নিমফিয়া পাবলিকেশনস, ২০১০, পৃ. ৩০–৩৪

কলাভবনের কাছাকাছি অবস্থিত ঢাকা জাদুঘরের চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে কলাভবনের দক্ষিণ গেট ছিল মাত্র কয়েক শ গজ দূরে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছিল কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায়। বাড়ছিল পুলিশের সতর্ক উপস্থিতিও। সমাবেশে যোগ দিতে এবং পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখার জন্য চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের উৎসুক অনেকেই প্রদর্শনীর প্রস্তুতির কাজ ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ও আশপাশে হাজির হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসান লিখেছেন, 'বেলা ১০টার পর থেকে পুরো এলাকা যুদ্ধ-প্রস্তুতির রূপ নিয়ে নিয়েছে। আমাদের কাজ বন্ধ রেখে প্রতীক্ষা করছি। তরুণ শিল্পীরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের আশপাশে চলে গেছে।'[১৪২] ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে সকাল থেকে উপস্থিত থেকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন মুর্তজা বশীর ও ইমদাদ হোসেন। ইমদাদ হোসেন ছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য।[১৪৩] রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলকারীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে গুলিতে শহিদ হন বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বার ও সালাম। এই ঘটনা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মুর্তজা বশীর। বরকতকে ঘটনাস্থল থেকে মেডিক্যাল নিয়ে গিয়েছিল যে দলটি তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। মুর্তজা বশীরের লেখা থেকে জানা যায়, বরকতকে যখন মেডিক্যালে নেওয়া হয় সেখানে ইমদাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।[১৪৪]

মুর্তজা বশীর সম্পর্কে কামরুল হাসান লিখেছেন—

> 'তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি, শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল। সালাম, বরকতের সংবাদ আমি বশীরের কাছে থেকে প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত এবং মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত।'[১৪৫]

ভাষা আন্দোলনের এই রক্তাক্ত ঘটনার পর ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হন। তাঁরা ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আন্দোলনের জন্য পোস্টার, ব্যানার এবং ফেস্টুন লিখে ও আন্দোলনের সপক্ষে ছবি এঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষকদের মধ্যে কামরুল হাসান ছিলেন এ সকল কাজে সরাসরি যুক্ত।

---

[১৪২] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[১৪৩] মামুন কায়সার, *চিত্রশিল্পী ইমদাদ হোসেন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ. ৪২
[১৪৪] মুর্তজা বশীর, "একুশের চেতনা", *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস, পৃ. ৭৩–৭৫
[১৪৫] কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনী : ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনী উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। স্থান নির্ধারণ করা হয় নিমতলীতে অবস্থিত ঢাকা জাদুঘরের হলরুম। জাদুঘরের কিউরেটর প্রফেসর আহমদ হোসেন দানীর আন্তরিক সহযোগিতায় আর কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল ছাত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে জাদুঘরের হলরুম থেকে বড় বড় পাথরের মূর্তি সরিয়ে প্রদর্শনী উপযোগী করা হয়। ছবি ডিসপ্লেসহ প্রদর্শনীর চূড়ান্ত প্রস্তুতি যখন চলছিল তখনই ঘটে যায় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের সেই নৃশংস ঘটনা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শনী স্থগিত করা হয় এবং ১১ মার্চ প্রদর্শনী উদ্বোধনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ঢাকা আর্ট গ্রুপের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। জয়নুল আবেদিনের অনুপস্থিতিতে তাঁকে পুনরায় সভাপতি মনোনীত করা হয়। সহসভাপতি হন আনোয়ারুল হক, সৈয়দ আলী আহসান, সফিউদ্দীন আহমেদ ও আজিজুল হক। কোষাধ্যক্ষ খাজা শফিক আহমেদ, সম্পাদক কামরুল হাসান, যুগ্ম সম্পাদক আমিনুল ইসলাম এবং সদস্য মনোনীত হন অজিত কুমার গুহ, মুনীর চৌধুরী, আব্দুল গণি হাজারী, এ এন এম মাহমুদ, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, হুমায়ুন কাদের, আব্দুর রহমান, জুনাবুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, কাজী আবদুর রউফ ও মোহাম্মদ কিবরিয়া।

চিত্র-২০ : ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করছেন লেডি ভিকারুননিসা নূন

চিত্র-২১: 'দে অলসো লাভ বিউটি', শিল্পী আমিনুল ইসলাম, উৎস : মাসিক দিলরুবা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন গভর্নর মালিক মোহাম্মদ ফিরোজ খান নূনের পত্নী লেডি ভিকারুননিসা নূন। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে একটি ক্যাটালগ ছাপা হয়; যা থেকে প্রদর্শনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এই প্রদর্শনী ১১ মার্চ শুরু হয়ে ৩০ মার্চ পর্যন্ত চলেছিল। প্রদর্শনীতে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, ছাত্র ও কয়েকজন শৌখিন শিল্পীসহ মোট ছাপ্পান্ন জন শিল্পীর ২৪২টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছিল। প্রদর্শনীর চিত্রকর্ম

নির্বাচনের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়; যার সদস্য ছিলেন খাজা শফিক আহমেদ, ফণীভূষণ দাস গুপ্ত ও অজিত কুমার ঘোষ ।[১৪৬]

প্রদর্শনীতে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল । কারা পুরস্কার পেয়েছিলেন সে বিষয়ে ক্যাটালগে উল্লেখ নেই । তবে আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি 'দ্য কিউ' চিত্রের জন্য সকল মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং 'দে অলসো লাভ বিউটি' চিত্রের জন্য তেলরং মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন । অন্যান্য পুরস্কার পান বিজন চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ ।[১৪৭]

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক হলেন জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান ও মোহাম্মদ কিবরিয়া । এ ছাড়া ই ভি নূন, শফিকুল আমীন, বেটি স্কট (Betty Scott), ফণীভূষণ দাস গুপ্ত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন ।

আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ব্যাচের আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, শামসুল আলম, জুলফিকার আলী, আব্দুস সাত্তার, নূরুল ইসলাম, এ এস এম নূরুল ইসলাম, আলফাজ উদ্দিন খন্দকার, আমানুল্লাহ খান, হাবিবুল্লাহ খান (ইসমাইল) ও শামসুল কাদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন । সৈয়দ শফিকুল হোসেন ও বজলে মাওলা ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র । সেখান থেকে তাঁরা এলিমেন্টারি পর্ব শেষ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকায় এসে শেষ বর্ষে প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন । তাঁরাও প্রদর্শনীতে অংশ নেন ।

দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, ইকরামুল হক, সালাউদ্দীন আকবর চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন, জুনাবুল ইসলাম, হুমায়ুন কাদের, আমিনুর রহমান ও আনোয়ার জগলুল, তৃতীয় ব্যাচের মোহাম্মদ ইদ্রিস, নূরুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মোস্তফা শওকত কামাল, আব্দুস শুকুর, আক্তার জামান এবং চতুর্থ ব্যাচের দেবদাস চক্রবর্তী, এহসানুল আমীন প্রমুখের চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায় ।[১৪৮] এ ছাড়া আরো কয়েকজন শৌখিন শিল্পীর চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল । অধিকাংশ শিল্পীর একাধিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল । মাধ্যম ছিল প্রধানত পেনসিল, কালি-কলম, উডকাট, জলরং ও তেলরং ।

---

[১৪৬] *ক্যাটালগ*, ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর, ১১–৩০ মার্চ ১৯৫২, ঢাকা জাদুঘর

[১৪৭] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩–৪৪

[১৪৮] ১৯৫২ সালের ১১ মার্চ থেকে ঢাকা জাদুঘরে আয়োজিত ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ

এই চিত্র প্রদর্শনীর খবর ওই সময়ে পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করে। সাহিত্য পত্রিকা মাসিক দিলরুবার ১১ সংখ্যায় আরশাফ সিদ্দিকী এই প্রদর্শনী সম্পর্কে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সচিত্র প্রতিবেদন লেখেন। এই প্রতিবেদনে তিনি চিত্রকর্মের আধিক্যের বিষয়টি উল্লেখ করে লেখেন, 'আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীর তুলনায় অঙ্কের দিক থেকে শুধু বড় নয়—উৎকর্ষের দিক থেকেও।'[১৪৯]

প্রতিবেদনে আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখের চিত্রকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের আগামী দিনের পাকিস্তানের সম্ভাবনাময় শিল্পী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই প্রদর্শনীর মূল্যায়নের একপর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'এবারের চিত্র প্রদর্শনী আমাদের আশান্বিত করেছে। মনে হচ্ছে বেদনার মেঘ কেটে গেছে, সূর্য ওঠার আর বেশি দেরি নেই। আমাদের শিল্প অদূর ভবিষ্যতে প্রতিনিধিত্ব করবে আমাদের সভ্যতার।'[১৫০]

নবপ্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে কেন্দ্র করে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যে আধুনিক শিল্প আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন গতিশীল করেছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের আয়োজিত এই দুটি চিত্র প্রদর্শনী। এই চিত্র প্রদর্শনী দুটির মাধ্যমে তিনি ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং শিল্পীদের দাবিদাওয়া সরকারের সর্বোচ্চ মহলের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারও শিল্পীদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছিল এবং কিছু বিষয় দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্ররা।

এই প্রদর্শনী দুটির ফলে ঢাকায় চারুশিল্প চর্চার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম প্রদর্শনীতে চৌত্রিশ জন শিল্পীর ২৭৪টি চিত্রকর্ম এবং দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে ছাপ্পান্ন জন শিল্পীর ২৪২টি চিত্রকর্মের প্রদর্শন তারই সাক্ষ্য দেয়। প্রদর্শনীর মাধ্যমে ঢাকায় একদল শিক্ষানবিশ তরুণ শিল্পীর সৃষ্টি হয়। যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, হামিদুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ।

ঢাকা আর্ট গ্রুপের দুটি প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মাঝেও চিত্রচর্চার ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। দেশভাগের পর ঢাকায় এসে একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য এবং নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রথম দিকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছে, যে কারণে তাঁরা শিল্পচর্চায় মনোযোগী হতে পারেননি। ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রদর্শনীর উপলক্ষ্যে তাঁরা আবার শিল্পচর্চায় ফিরে আসেন।

---

[১৪৯] আশরাফ সিদ্দিকী, "চিত্র প্রদর্শনী", *মাসিক দিলরুবা*, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮ পৃ. ৭৫২–৭৫৭
[১৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৩

পূর্ব বাংলায় শিল্পচর্চার মূল সুরটি কী হবে তারও ইঙ্গিত এই প্রদর্শনী দুটির চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু থেকে পাওয়া যায়। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও পূর্ব বাংলার শিল্পীদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার প্রভাব পড়েনি। এ প্রসঙ্গে কামরুল হাসান সওগাত পত্রিকায় লেখেন—

> সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এখানকার শিল্পীদের চিন্তাধারা কোন বিষয়বস্তু বা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেটা আর যাই হোক ধর্মীয় আচ্ছন্নতার ছোঁয়াচ থেকে যে বাইরে তা জোর গলাতেই স্বীকার করা যায়। সেই জন্যই বোধ হয় গত দুটো প্রদর্শনীতে এইটাই প্রমাণ হয়েছে যে এখানকার শিল্পীরা প্রকৃতই পূর্ব বাংলার মাটির শিল্পী। এরা হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রিস্টানের নয়—এরা মানুষের শিল্পী। সবার উপরে মানুষ সত্য এই কথাই পূর্ব বাংলার শিল্পীদের ছবির কথা।[১৫১]

আর্ট ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচায় স্থানান্তর : এদিকে আর্ট ইনস্টিটিউটে চারটি ব্যাচ ভর্তি হওয়ার পর থেকে আবারও জায়গার সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শুরু থেকে এ অঞ্চলে পরিবেশগত কিছু সমস্যা ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটটি পুরান ঢাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রথম থেকে একাধিকবার স্থানীয় রক্ষণশীল ব্যক্তিদের আক্রমণের শিকার হয়। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দুভাবেই এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। ঢাকার আদি বাসিন্দারা তখনো বেশ প্রতাপশালী ছিল। মহল্লার সর্দাররাই ছিল সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাদের ওপরে ছিল ঢাকার নবাব পরিবার। এদের ভাষা ছিল উর্দু। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল আদি ঢাকার মুসলিম পরিবারগুলো। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে ঢাকার আদি বাসিন্দাদের প্রায় সবাই উর্দুর পক্ষ নিয়ে বাংলা ভাষার বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদের দৌরাত্ম্যের কারণে সাধারণত পুরান ঢাকায় প্রবেশ করতেন না। প্রবেশ করলে তাঁদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ সময় পুরান ঢাকায় কোনো বাড়িতে রবীন্দ্রসংগীতের আসর বসলে বাইরে যুবকরা পাহারায় থাকত রক্ষণশীলদের আক্রমণের ভয়ে। পুরান ঢাকায় কিছু গোঁড়া মৌলভি এবং পীর নামধারী ধর্মব্যবসায়ী ছিল; যাদের যেখানে-সেখানে ফতোয়া দেওয়ার অবাধ অধিকার ছিল। লালবাগের এমনই এক ধর্মব্যবসায়ীর ঘাঁটি থেকে কেবল ছবি আঁকার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়নি, রাস্তায় রাস্তায় ছবি আঁকার বিরুদ্ধে পোস্টারও ছাড়া হয়েছিল। এরপর ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলে বিহারিদের দৌরাত্ম্য এ অঞ্চলে বেড়ে যায়। এ ছাড়া মেডিক্যাল স্কুলের জায়গায় আর্ট ইনস্টিটিউটের উপস্থিতি একটি পক্ষ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এ কারণে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও কর্মচারীদের বিভিন্ন কৌশলে ভয় দেখাত।[১৫২] এ সকল কারণে ইনস্টিটিউটের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে একটি স্বতন্ত্র জায়গা শুরু থেকে খোঁজ করা

[১৫১] কামরুল হাসান, "শিল্প ও সংস্কৃতি : সমকালীন বিষয়ের আলোচনা", *সওগাত*, ঢাকা, ৩৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

[১৫২] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

হচ্ছিল। অবশেষ ১৯৫২ সালের সেগুনবাগিচায় একটি পুরাতন ভবনের সন্ধান পাওয়া যায়। খান ম্যানশন নামে এই বাড়িটি কম্পাউন্ডসমেত ইনস্টিটিউটের নামে সরকার অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ দিলে ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে আর্ট ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচায় স্থানান্তরিত হয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হকের তত্ত্বাবধানে।

তখন এই ভবনটির ঠিকানা ছিল 'খান ম্যানশন', ১১০, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।[১৫৩] প্রাচীর ঘেরা প্রায় দেড় বিঘা জায়গার ওপর সুদৃশ্য দোতলা ভবনটি অবস্থিত ছিল। সামনে ছিল বিশাল লন। দক্ষিণমুখী এই ভবনটির সামনে ছিল চওড়া টানা বারান্দা, দুই তলার ছাদে একটি চিলেকোঠা ছিল। সেখানে কামরুল হাসান এসে থাকা শুরু করেন। মূল ভবনের লাগোয়া একটি একতলা ভবন ছিল, যেখানে অফিস স্টাফদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। আর ছিল একটা টিনশেড, যেখানে দারোয়ান, পিয়নরা থাকতেন। এই টিনশেডে এসে উঠেছিলেন শিল্পী এস এম সুলতান। মূল ভবনের কক্ষগুলো টিচার্সরুম ও ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাউন্ডারি ওয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় ছিল একটি ভাঙাচোরা লোহার গেট। ভবনটি আর্ট ইনস্টিটিউটের ব্যবহারের আগে বেশ কয়েক বছর মেয়েদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৫৪] বর্তমান শিল্পকলা একাডেমির পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ভবনটির অবস্থান ছিল। বর্তমানে ভবনটি ভেঙে সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যার ঠিকানা ২৮/বি সেগুনবাগিচা। ওই সময় সেগুনবাগিচা অঞ্চল ছিল বেশ নির্জন। চারদিকে জঙ্গলে ঘেরা। ছবি আঁকার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল সেখানে। কিন্তু মূল শহরের বাইরে হওয়ায় আশপাশে কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্ট ছিল না। এ কারণে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্রদের দুপুরে খাওয়া নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হতো। ছাত্রদের এই সমস্যার কথা ভেবে আমিনুল ইসলাম ও রশিদ চৌধুরী মিলে শুধু দুপুরে খাওয়ার জন্য একটি সেলফ হেলফ রেস্টুরেন্ট চালু করেন। কিন্তু তিন-চার মাস চলার পর ছাত্রদের কাছে অনেক টাকা বাকি পড়া এবং তদারকিতে অধিক সময় ব্যয় হওয়ার কারণে ছবি আঁকায় বিঘ্ন ঘটায় রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৫৫] এ রকম সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে সেগুনবাগিচার নতুন ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম চলতে থাকে। এই ক্যাম্পাসে ১৯৫২–৫৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম ব্যাচে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে শাহতাব উদ্দিন, গোলাম সারোয়ার, জ্যোতির্ময় সুর, কে এম মান্নান, মোঃ হোসেন মোল্লা, মোঃ হাসনাল হায়দার, এম জাফরুল আলম এবং নাসির হায়দারের নাম জানা যায়।

---

[১৫৩] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ৩০.৬.৫৫ তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী

[১৫৪] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ ২৩ নভেম্বর ২০১৬

[১৫৫] আমিনুল ইসলাম, "বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১২, পৃ. ২৮৫

চিত্র-২২ : খান ম্যানশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা; এই ভবনে ১৯৫২ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের কার্যক্রম চলেছিল, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

জয়নুল আবেদিনের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা : ইউরোপে শিক্ষা ভ্রমণ শেষে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে জয়নুল আবেদিন দেশে ফেরেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি লন্ডনে স্লেড স্কুল অব আর্টে বিখ্যাত এচার, এনগ্রেভার ও পেইন্টার জন বাকল্যান্ড রাইটের অধীনে এচিং ও পেইন্টিংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া এই স্কলারশিপের সময় তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও তুরস্কের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও বহু শিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং ওই সব দেশের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি দুটি একক চিত্র প্রদর্শনী করেন। এর একটি অনুষ্ঠিত হয় রয়াল ইন্ডিয়া পাকিস্তান অ্যান্ড সিলোন সোসাইটির উদ্যোগে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটে ১৯৫১ সালের ৩ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অন্য প্রদর্শনীটি ১৯৫২ সালের ১৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত লন্ডনের বার্কলে গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে জয়নুলের চিত্রকলা নিয়ে পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা শিল্প সমালোচকদের বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে দ্য সানডে টাইমস ও ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার শিল্প সমালোচক Eric Newton, বিখ্যাত এচার ও শিল্প সমালোচক Dr. Dolf Reiser, প্রাচ্যশিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শিল্প সমালোচক Dr. Reginald Le Mey, বিখ্যাত এচার ও এনগ্রেভার John Bucland Wright, শিল্প সমালোচক Mourice Collis প্রমুখের রচনা সংকলিত হয়।[১৫৬] এ সকল শিল্পবোদ্ধা ও শিল্প সমালোচকরা জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের প্রশংসায় তিনি তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়ে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

[১৫৬] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃজনশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭–৭৮

লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শনকালে লক্ষ করেন, বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো সেখানে সযত্নে প্রদর্শিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। বিষয়টি তাঁকে বেশ আলোড়িত করে। এ বিষয়ে তিনি পরবর্তীকালে দুঃখ করে বলতেন—

> বিদেশে গিয়ে আমার দেশকে চিনতে হলো, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বাংলাদেশের মূল লোকশিল্পের প্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক সব নিদর্শনই সংরক্ষিত আছে। ওগুলো না দেখলে নিজের দেশকে বুঝতে পারতাম না, দেশকে আগে না বুঝে বিদেশে যাওয়া ঠিক নয়, তাহলে আমার মতো ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসতে হয়।[১৫৭]

শুধু ইউরোপ ভ্রমণই জয়নুলের লোকশিল্পের প্রতি আকর্ষণ বাড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলিও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯৭৪ সালের ১৫ মার্চ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের নেওয়া জয়নুল আবেদিনের এক সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেন—

> পাকিস্তানে এলাম, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। বাঙালির ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়লো অবচেতনভাবে আমার মনে, বাঙালির লোকজ শিল্পরীতিকে তুলে ধরতে হবে। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার বিদ্রোহ হিসাবেই রচিত হলো আমার একটি চিত্র পর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে এই সব শক্তি কাজ করেছে।[১৫৮]

ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর বিভিন্ন মিউজিয়ামে এবং আর্ট গ্যালারিতে সমকালীন শিল্পীদের ছবি দেখা এবং শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ইউরোপের সমকালীন শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। তখন ইউরোপে চিত্রকলা বাস্তবানুগ অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে ইউরোপজুড়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পকলা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এসব বিষয় উপলব্ধির পর জয়নুল আবেদিনের মধ্যে নতুন চিত্র আঙ্গিক নিয়ে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়। সাদৃশ্য রূপ ছেড়ে ফর্মের জ্যামিতিক বিভঙ্গ তাঁকে আকৃষ্ট করে। শিল্পের রূপের অতিরঞ্জনের প্রয়োগ সম্পর্কে এলো সচেতনতা। তবে তাঁর এই নব উপলব্ধি তাঁকে পাশ্চাত্যমুখী না করে বরং করে তুলল আরো অন্তর্মুখী।[১৫৯] এ ক্ষেত্রে তিনি বেছে নেন পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকে। তিনি অনুভব করেছিলেন, লোকশিল্পই বাংলার শিল্পের অন্তরাত্মা। তাকে অবলম্বন করেই আধুনিক শিল্পের পথে অগ্রসর হতে হবে। লোকজীবন ও লোকশিল্পের প্রতীকী ও রূপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি এসব ছবি আঁকা শুরু করেন। তাঁর এই লোকশিল্পের প্রতীকগুলো ব্যবহারের

---

[১৫৭] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[১৫৮] নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, পৃ. ১১১

[১৫৯] আবুল মনসুর : *জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৩, পৃ. ২৮

পেছনে উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী ভাবালুতা নেই। অর্থপূর্ণ ডিজাইন ও ব্যঞ্জনাত্মক রঙের ব্যবহারে যে দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন তা একদিকে আমাদের লোকশিল্পের নব নব অর্থ পরিগ্রহের ক্ষমতার পরিচয় ছাড়াও আবেদিনের সৃজনীশক্তির পরম নিদর্শন।[১৬০]

ছোট ও মাঝারি কাগজের ওপর জলরং, গোয়াশ ও তেলরঙে আঁকা এই ছবিগুলো ছিল দ্বিমাত্রিক এবং এখানে পারস্পেকটিভের শর্ত মানা হয়নি। কিউবিজমের জ্যামিতিক ফর্মের সঙ্গে লোকশিল্প ধারার সমন্বয় ঘটিয়ে ছবিগুলো আঁকা। জয়নুল আবেদিনের এই নতুন চিত্রশৈলীকে শিল্প সমালোচক নজরুল ইসলাম নামকরণ করেছেন 'আধুনিক বাঙালি ঢং' নামে।[১৬১]

এ দেশের চিত্রকলাকে বাস্তবানুগ অনুকরণের জায়গা থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমকালীন আধুনিক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন জয়নুল আবেদিন। সে হিসেবে বলা যায়, বাংলায় আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা হয়েছে তাঁর হাতেই। ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁর শিল্পচর্চার গতিপথের এই পরিবর্তন বাংলাদেশের চিত্রকলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। জয়নুল আবেদিনের এই অভাবনীয় পরিবর্তন প্রসঙ্গে শিল্পী কামরুল হাসান উল্লেখ করেছেন—

> তিনি যেন নতুন আলোকে আলোক প্রাপ্ত হয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রভাব ও পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একটি মানুষ তিনি তখন। ১৯৩৯ সালে আমি ব্রতচারী আন্দোলনে প্রবেশ করেই এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের কাছ থেকে বাংলার শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলাম শিল্পাচার্যের মুখে শুনলাম তার পুনরাবৃত্তি। ঐতিহ্যেরই যেন নতুন প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। আর কেউ না হোক আমি ব্যক্তিগতভাবে অবর্ণনীয় এক শিহরণে শিহরিত হলাম।[১৬২]

কামরুল হাসান আরো উল্লেখ করেছেন, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের চিত্রকলার বিদেশে কী মর্যাদা এবং এটাই আমাদের চিত্রকলার আসল পরিচয় বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ব্রতচারী শিবিরে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নতুন করে আঁকড়ে ধরি।'[১৬৩] কামরুল হাসানের মতো আরো অনেকেই জয়নুল আবেদিনের এই নবপ্রবর্তিত শিল্পধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে জয়নুল আবেদিন লোকশিল্পের আঙ্গিকে চিত্রচর্চার পাশাপাশি লোকশিল্প সংগ্রহের প্রতিও মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

---

[১৬০] সৈয়দ নুরুদ্দিন, "শিল্পকলায় পূর্ব বাংলার ঐতিহ্য ও জয়নুল আবেদীন", *মাহেনও*, ঢাকা ১৯৫৪, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
[১৬১] নজরুল ইসলাম, *জয়নুল আবেদিন*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২
[১৬২] কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য দুটি এচিং মেশিন ও কিছু বই কিনে পাঠান। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল এবং এর উন্নয়নের বিষয়টি সব সময় যে ভাবতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই এচিং মেশিন ও বই ক্রয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে।

আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডি : লেডি ভিকারুননিসা নূনকে সভাপতি করে ১৯৫২ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়। সদস্য ছিলেন ডিপিআই আব্দুল হাকিম, কবি জসীমউদ্‌দীন, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮–১৯৪৬), ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ (১৯১১–১৯৮৪), ড. এ এইচ জুবেরি (১৯১০–১৯৪৬), টি এইচ ম্যাথুউম্যান, কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ এবং সম্পাদক অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন। ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটায় পূর্ব বাংলার গভর্নরের বাসভবনে।[১৬৪] কারণ ভিকারুননিসা নূন ছিলেন গভর্নরের স্ত্রী। সম্ভবত তাঁর আগ্রহের কারণেই সেখানে গভর্নিং বডির সভা হয়েছিল।

এই সভায় মোট দশটি নির্ধারিত বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নেওয়া এ সকল সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো :

১ নম্বর সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির সভাপতিকে অনুরোধ করা হয় ইনস্টিটিউটের উন্নয়নের জন্য ‘সোশ্যাল আপ-কিম স্কিম’-এর জন্য যে বরাদ্দ পাওয়ার কথা ছিল সেটি কবে নাগাদ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সরকারের কাছে খোঁজ নেওয়ার। ৩ নম্বর সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটের ডিজাইন ও ক্রাফট বিভাগের উন্নতির জন্য টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট দিয়ে সহায়তা এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশনা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য ইউনেসকোর কাছে সহযোগিতা চাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৪ নম্বর সিদ্ধান্তে লাইব্রেরির উন্নতির জন্য সরকারের কাছ থেকে ৪০০০ টাকার একটি আর্থিক বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন এবং উক্ত বরাদ্দের সমপরিমাণ বই কেনার অর্ডার অধ্যক্ষকে দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ৬ নম্বর সিদ্ধান্তে স্টাফদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘Ad-Interni scheme’ সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৭ নম্বর সিদ্ধান্তে আর্ট ইনস্টিটিউটের পাশে পঞ্চাশ জন ছাত্রের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ৮ নম্বর সিদ্ধান্তে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ (জুলাই ’৫৩ থেকে) ইনস্টিটিউটে মেয়েদের ভর্তি নেওয়ার

[১৬৪] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৯ নম্বর সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নতিতে অবদান রাখার জন্য গভর্নিং বডির সভাপতি লেডি ই ভি নূনকে গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে সদস্য ড. আই এইচ জুবেরি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১০ নম্বর সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস গ্রেড এবং স্পেশাল বেতন ও ভাতা প্রদান বিষয়টি আইনসম্মত হওয়ার গভর্নিং বডির সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়।

গভর্নিং বডির এই সভা থেকে কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের নির্মাণ প্রকল্পটির অনুমোদনের নিশ্চয়তা এই সভা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এই তথ্যের আলোকে ধারণা করা যায়, জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের পরিকল্পনা ইউরোপ থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। এই প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে গভর্নর ফিরোজ খান নূন ও লেডি ভিকারুননিসা নূন বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন।

ইনস্টিটিউটে ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটিও বেশ গুরুত্ব বহন করে। ইনস্টিটিউটে শুরুতে ছাত্রী ভর্তির বিষয়টি সম্ভবত সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেছিল ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। তা না হলে নতুন করে ছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। শুরুতে ছাত্রী ভর্তির বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার কিছু কারণও ছিল। ইনস্টিটিউটের স্বল্প পরিসর ছিল অন্যতম কারণ। এ ছাড়া অভিভাবকদের রক্ষণশীল মনোভাব এবং শিল্পশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে অনীহা ছিল।

সভার ১০ নম্বর সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষের সিনিয়র এডুকেশনাল সার্ভিসের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদ ছিল এডুকেশনাল সার্ভিস ক্যাডারের। অধ্যক্ষ পদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির জন্য জয়নুল আবেদিন যোগদানের পূর্ব থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তাঁর যোগদানের সময় থেকে এই সভার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষ পদটির পদমর্যাদা ও বেতনের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। গভর্নিং বডির এই সভা থেকে অধ্যক্ষ পদটি সিনিয়র এডুকেশনাল সার্ভিস ক্যাডারে উন্নীত করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।

জয়নুল আবেদিনের উদ্দেশ্য ছিল ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নতি। এ কারণে কমার্শিয়াল ও ক্রাফটস্ বিভাগের উন্নতির জন্য তিনি এ সময় ইউনেসকোর কাছে কারিগরি সহযোগিতা এবং এক্সপার্ট সহায়তার বিষয়টি গভর্নিং বডির সভায় উত্থাপন করেছেন। এ ছাড়া ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের পঞ্চাশ

আসনের হোস্টেলের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তটিও ছিল সময়োপযোগী। শিল্পশিক্ষা ছিল বেশ ব্যয়বহুল। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্রদের জন্য এ সময় হোস্টেলের খুবই প্রয়োজন ছিল। লাইব্রেরির জন্য বই কেনা, অফিস পরিচালনার জন্য অধিক সরকারি অর্থ বরাদ্দ, স্টাফদের দক্ষতা বাড়াতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় ছিল ওই সময়ের জন্য অতিপ্রয়োজনীয়। জয়নুল আবেদিন সেগুলোর সমাধান ও অনুমোদনের জন্য জোর প্রচেষ্ট চালিয়ে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার্বিক উন্নতির মধ্য দিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে একটি আদর্শ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী : আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ছাত্রদের কোনো চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষ বরাবর একাধিকবার প্রদর্শনী আয়োজনের দাবি জানালেও ফান্ডের অভাবে প্রদর্শনী আয়োজন সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে ১৯৫৩ সালে জয়নুল আবেদিনের পরামর্শে আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ডিপিআই বরাবর আবেদন করলে দুই হাজার টাকা অনুমোদিত হয়। অর্থপ্রাপ্তির পর ওই বছরে জুন মাসে আর্ট ইনস্টিটিউটের সেগুনবাগিচার ভবনে চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ব্যাপক লোকসমাগম হয়েছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে বাষট্টি জন শিল্পীর মোট ৬১৬টি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা হলেন—এলিমেন্টারি প্রথম বর্ষের এ কে এম শাহাতাব উদ্দীন, গোলাম সারোয়ার, জ্যোতির্ময় সুর, কে এ মান্নান, মোঃ হোসেন মোল্লা এবং এলিমেন্টারি দ্বিতীয় বর্ষের এ বাসেত, এ আমীন, দেবদাস চক্রবর্তী, মাহবুব, কাজী আবদুর রউফ। অ্যাডভান্সড প্রথম বর্ষের ফাইন আর্ট বিভাগের আবদুস সবুর, ইবনে ইমাম, শামসুল এহসান, কাজী তাহের উদ্দীন আহমেদ, মোঃ ইদ্রিস, নূরুল ইসলাম (১), নূরুল ইসলাম (২), সৈয়দ আলী আজম, শামসুল আলম, সালাহ্উদ্দীন আকবর; দ্বিতীয় বর্ষের আবদুর রাজ্জাক, আনোয়ার জগলুল, আলী রেজা, আকতারুজ্জামান, আমিনুর রহমান, আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী, একরামুল হক, হুমায়ুন কাদির, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী এবং তৃতীয় বর্ষের আমিনুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার, বিজন চৌধুরী ও শামসুল কাদির।

অ্যাডভান্সড প্রথম বর্ষ কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের আবদুস শুকুর, আনোয়ারুল হাকিম, আবদুল কুদ্দুস, এম এ সিরাজী, এম এস কামাল, মীর মুস্তাফা আলী, মবিনুল আজম, নিজামুল হক; দ্বিতীয় বর্ষের ইমদাদ হোসেন, জুনাবুল ইসলাম এবং তৃতীয় বর্ষের আলফাজউদ্দীন খন্দকার, আবুল কাশেম, আবদুর রহমান ভূঁইয়া, আমানুল্লাহ খান, আলী আকবর, জুলফিকার আলী, মোঃ ইসমাইল ও শামসুল আলম প্রদর্শনীতে

অংশগ্রহণ করেন। আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, খাজা শফিক আহমেদ এবং কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে ছিল।

প্রতিজন ছাত্র ও শিক্ষকের একাধিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। যেমন ছাত্রদের মধ্যে আমিনুল ইসলামের বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা ত্রিশটি, বিজন চৌধুরীর একত্রিশটি, আবদুর রাজ্জাকের বত্রিশটি, হুমায়ুন কাদিরের তেতাল্লিশটি, রশিদ চৌধুরীর ছাব্বিশটি, মুর্তজা বশীরের ষোলোটি এবং কাইয়ুম চৌধুরীর পাঁচটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এলিমেন্টারি পর্বের ছাত্রদের পেনসিল ও পেন, স্কেচ ও ড্রইং; অ্যাডভান্সড পর্বের ফাইন আর্ট বিভাগের ছাত্রদের জলরং, তেলরং, লিনোকাট, লিথোগ্রাফ, উডকাট মাধ্যমের চিত্রকর্ম এবং কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের ছাত্রদের টেক্সটাইল, পেইন্টিং, ইলাস্ট্রেশন, পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শনীতে ছিল। প্রদর্শনীতে লিনোকাট, উডকাট ও লিথোগ্রাফ মাধ্যমের চিত্রকর্ম থেকে বোঝা যায় গ্রাফিক আর্ট স্বতন্ত্র বিভাগ না হওয়া সত্ত্বেও সফিউদ্দীন আহমেদ ও হবিবুর রহমানের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর এ সকল মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

ক্যাটালগের ভূমিকায় প্রদর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়—

> It is going to be the first venture of students and staff of the government institute of Arts, Dacca, to present to the public a comprehensive collection of their works through which one would be able to survey the progress made by them.[165]

এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। এই প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে উজ্জীবিত করে।

প্রথম ব্যাচের পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন : ১৯৫৩ সালে মে/জুন মাসে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের অ্যাডভান্সড পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ফাইন আর্ট বিভাগের সাতজন এবং কমার্শিয়াল বিভাগের নয়জন অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ফাইন আর্ট বিভাগের বিজন চৌধুরী ও আমিনুল ইসলাম যথাক্রমে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।[১৬৬] ১৯৫৩–৫৪ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউটে ষষ্ঠ ব্যাচে ভর্তি হন শামসুল ইসলাম নিজামী, সুজা হায়দার, এ কে এম আব্দুর রউফ, আব্দুর রশিদ, এম এ মোতালিব প্রমুখ।

---

[১৬৫] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ

[১৬৬] আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

চিত্র-২৩ : ১৯৫৩ সালে বৃত্তি নিয়ে আমিনুল ইসলামের ইতালি যাওয়ার প্রাক্কালে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনসহ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, কয়েকজন শিল্পানুরাগী ও শিক্ষার্থীরা, উৎস : Art of Bangladesh Series-10; Aminul Islam

শিল্পশিক্ষার জন্য আমিনুল ইসলামের ইতালি গমন : ১৯৫৩ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাসে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের মেধাবী ছাত্র আমিনুল ইসলাম ইতালি সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি প্রাপ্তিতে তিনি নিজে যেমন আনন্দিত ও শিহরিত হয়েছিলেন তেমনি তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠীরাও আনন্দিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনসহ অন্য শিক্ষকগণ তাঁকে ইনস্টিটিউটে এনে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে ইতালির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।[১৬৭] ইতালিতে গিয়ে তিনি ফ্লোরেন্সের একাডেমি দ্য বেলি আর্ত অর্থাৎ একাডেমি অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হন। শিল্পশিক্ষার্থে তাঁর ইউরোপ যাত্রা আর্ট ইনস্টিটিউটের অনেক ছাত্রকে উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

আর্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মাণ : জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদানের পর থেকেই একটি নিজস্ব ভবনসহ স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে আসছিলেন। ক্রমাগত ছাত্র বৃদ্ধির কারণে ১৯৫২ সালে ইনস্টিটিউট জনসন রোড থেকে সেগুনবাগিচায় একটি পুরাতন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে। এই ভবনও তাঁর কাছে উপযুক্ত মনে না হওয়ায় ইনস্টিটিউটের একটি নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরির বিষয়ে তিনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সরকারের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা

[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ও দেনদরবারের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালের শুরুর দিকে 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন'-এর অর্থ সাহায্যে শাহবাগের বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করাতে সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার গভর্নরের পত্নী লেডি ই ভি নূন বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন।[১৬৮] সরকার এই ভবন নির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেয় তৎকালীন সিঅ্যান্ডবি বিভাগের কনসুলেটিং আর্কিটেক্ট বিভাগের ওপর। এই বিভাগের কনসুলেটিং আর্কিটেক্ট ছিলেন আর ম্যাক কোনেল (R. Mc Connell)। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই শাখায় সহকারী আর্কিটেক্ট হিসেবে যোগ দেন স্থপতি মাযহারুল ইসলাম। যোগদানের পরেই তিনি প্রথম দায়িত্ব পান শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউট ভবন ও পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ প্রকল্পের। এটা ছিল তাঁর কর্মজীবনের প্রথম কাজ।[১৬৯]

জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য বেছে নেন শাহবাগে গাছপালায় ভরা একসময় ঢাকার নবাবদের বাগানবাড়ির অংশবিশেষ। ১৮৪৪–৪৫ সালে জমিদার গণি মিয়া (পরবর্তীকালে নবাব আব্দুল গণি) জর্জ গ্রিফিথের কাছ থেকে রমনার পশ্চিমাংশে একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে তিনি ও তাঁর পুত্র আহসানউল্লাহ এ সম্পত্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বর্তমান বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে কলাভবন এলাকা, শাহবাগ, পরীবাগ হয়ে ঢাকা ক্লাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। আনুমানিক উনিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশক থেকে নবাব আহসানউল্লাহ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকা, চারুকলা অনুষদ ও জাদুঘর অঞ্চলে গড়ে তুলেছিলেন একটি বাগানবাড়ি, যেখানে ছোট-বড় অট্টালিকা, দরবার কক্ষ আর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রকমারি গাছের বাগান ছিল। এখানে একটি বড় পুকুর ছিল, যার মাঝখানে প্রশস্ত গোলাকার চত্বর ছিল। যেখানে যাওয়ার জন্য লোহার সেতুর ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া বেগমদের জন্য উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত বাঁধাই করা পুকুর ছিল, যেখানে কৃত্রিমভাবে পানি ভরা ও অপসারণের ব্যবস্থা ছিল। শাহবাগ তখন ব্যবহৃত হতো নবাবদের আমোদ-প্রমোদ ও সাধারণ অনুষ্ঠানের জন্য।[১৭০] নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর অযত্ন-অবহেলায় শাহবাগের ভবনগুলো জরাজীর্ণ আর এলাকা জঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

বঙ্গভঙ্গের (১৯০৬) পর রমনা অঞ্চল নিয়ে সরকার নতুন রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনা করলে এ অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি হয়। এই অঞ্চলকে রমনা সিভিল স্টেশন, রমনা পার্ক ও রেসকোর্স এই তিনটি ভাগে ভাগ করে এখানে গড়ে তোলা হয় সুদৃশ্য অট্টালিকা, প্রশস্ত রাস্তা এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বাগান। রমনা

---

[১৬৮] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, প্রাগুক্ত

[১৬৯] *An Architect in Bangladesh: Conversation with Mazharul Islam,* edited by Kazi Khaleed Ashraf, Dhaka, Loka Press, 2014, P. 72

[170] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১–২৩

এলাকায় নিসর্গ পরিকল্পনার জন্য লন্ডনের কিউ গার্ডেনের কিউরেটর এল প্রাউড লককে আনা হয়। এ সকল উন্নয়ন নবাবদের গড়ে তোলা শাহবাগকে স্পর্শ করেনি; কারণ শাহবাগ তখন ছিল নবাবদের নিজস্ব সম্পত্তি। এরপর কোনো একসময় এই সম্পত্তি সরকারের অধীনে চলে যায়। ১৯২১ সালে শাহবাগের সন্নিকটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে এবং পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত হয়ে শাহবাগ এলাকাকে স্পর্শ করলে এই এলাকার মর্যাদা বাড়তে থাকে। নির্জন এই এলাকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে।[১৭১]

জয়নুল আবেদিন যখন আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য ময়মনসিংহ রোডসংলগ্ন শাহবাগের অংশ নির্ধারণ করেন তখনো এখানে বাগানবাড়ির নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। মাযহারুল ইসলাম নতুন আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনার সময় শাহবাগের বাগানবাড়ির পরিবেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। জয়নুল আবেদিনের প্রত্যাশা ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখে শৈল্পিক স্থাপনায় গড়ে উঠবে তাঁর নতুন ইনস্টিটিউট ভবন, যার ভেতর, বারান্দা ও ছাদ থেকে উপভোগ করা যাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এ বিষয়ে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে মাযহারুল ইসলামের অনেকবার মতবিনিময় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন—

> তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন জয়নুল আবেদিন সাহেব। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন বসেছি, কামরুল হাসান সাহেবের সঙ্গে বসেছি। একটা কথা ছিল যে, আমরা যেন বাইরে বসে কাজ টাজ করতে পারি। আবেদিন সাহেব রবি ঠাকুরের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা বলেছিলেন। উনি যেখানে লেখাপড়া করেছেন, কলকাতায় সেই পরিবেশ ভয়ানক বদ্ধ ছিল। আমাদের এখানে advantage ছিল, সেটা নষ্ট না করে ওটার সঙ্গে যেন মিলিয়ে করার চেষ্টা করি।[১৭২]

এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্যের শৈল্পিক সমন্বয় ঘটিয়ে একটি আধুনিক ভবন তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

আর্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য প্রথমে রমনার রেসকোর্স ময়দানের শাহবাগের দক্ষিণাংশে ঢাকা শহরে মৌজার ৬২ নম্বর প্লটের অংশবিশেষের মোট তিন একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তখন এই জায়গার সীমানা ছিল পূর্বে ময়মনসিংহ রোড এবং পশ্চিম বর্তমান বড় গোল পুকুরের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। পূর্বের অংশ ছিল ২৬০ ফুট প্রশস্ত এবং পশ্চিমের অংশ ছিল ৩০০ ফুট প্রশস্ত এবং দৈর্ঘ্য ছিল ৪৮০ ফুট। অধিগৃহীত জায়গাটি তখন ট্রাপিজিয়াম আকৃতির ছিল। এই তিন একর জায়গার ওপর মাযহারুল ইসলাম আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে এই

---

[১৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

[১৭২] An Architect in Bangladesh : Conversation with Mazharul Islam, Ibid, P. 74

জায়গার উত্তর দিকে (বর্তমান পাবলিক লাইব্রেরির দিকে) ৪৬, ৫৪, ৬০ এবং ২ নম্বর প্লটের আরো এক একর জায়গা অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয় এবং পশ্চিম দিকে ইনস্টিটিউটের বর্ধিত অংশ হিসেবে ৬০, ৫১ ও ৫৩ নম্বর প্লটের আরো দুই একর ৯২ শতাংশ জায়গা ভবিষ্যতে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। অধিগৃহীত এবং অধিগ্রহণের প্রস্তাবকৃত মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ছয় একর ৯২ শতাংশ।[১৭৩]

মাযহারুল ইসলাম অনেক ধৈর্য ও সময় নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা করেন। ২০১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে স্থপতি মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনা ও নকশাসমূহের একটি প্রদর্শনী হয়। সেখানে আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে একটি বর্ধিত ভূমি অধিগ্রহণের প্ল্যান বাদে বাকি সাতটি প্ল্যান মাযহারুল ইসলামের আঁকা। এগুলো হলো দ্বিতীয় তলার প্ল্যান (সূত্র নং-১৮৪৬/১/১, তারিখ ২৪.১২.৫৩), ভবনসমূহের চূড়ান্ত এলিভেশনস প্ল্যান (সূত্র নং-৪০০৫/১/১, তারিখ ২৫.১.৫৪), টিচার্স ব্লকের বিভিন্ন সেকশনের ড্রইং (রেফারেন্স নং-১৯৬৮/১/১, তারিখ ২২/৫/৫৪), নিচতলার প্ল্যান (সংশোধিত, তারিখ : ১৭.২.৫৫), দক্ষিণ শাহবাগ এলাকার সাইড প্ল্যান (তারিখ ৫.১২.৫৫) এবং ফাইনাল সাইড প্ল্যান (সূত্র নং-৪০০৫/১/১, তারিখের স্থানটি ছেঁড়া)। আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইনাল সাইড প্ল্যানে (সূত্র নং-৪০০৫/১/১) টপ ভিউ থেকে ভবনের নিচতলার কক্ষে অবস্থান, বড় গোল পুকুর, পথ এবং সীমানাপ্রাচীরের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৪]

ইনস্টিটিউট ভবনটি তিনটি অংশে ভাগ করে নকশা করা হয়েছে। পূর্ব দিক থেকে প্রথম অংশে দুটি বড় গোলাকার কক্ষ, একটি ছোট গোলাকার কক্ষ এবং সংলগ্ন আরো একটি কক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। গোলাকার প্রথম কক্ষটি লাইব্রেরি (বর্তমান ১ নম্বর গ্যালারি), দ্বিতীয় গোলাকার কক্ষটি ছাত্র কমনরুম (বর্তমানে ২ নম্বর গ্যালারি), মাঝখানের ছোট গোলাকার কক্ষটি ল্যাবরেটরি (বর্তমানে স্টোর রুম) এবং সংলগ্ন কক্ষটি স্টোররুম (বর্তমান স্টোররুম) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় অংশে আছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী তিনটি শ্রেণিকক্ষ। এই অংশের সঙ্গে সংযুক্ত তৃতীয় অংশটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অর্ধবৃত্তাকার, যেখানে আটটি কক্ষ আছে। যার মধ্যে ছয়টি শ্রেণিকক্ষ (ক্রাফট রুম হিসেবে উল্লিখিত), একটি কক্ষ মাজার এবং একটি স্টোর হিসেবে উল্লেখ করা। এই অংশের পশ্চিমে

---

[১৭৩] Final site plan showing the walks and the boundary walls, ref, no: 4005/1/1, তারিখের অংশটি ছেঁড়া। ম্যাক কোনেল ও মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আয়োজিত ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী।

[১৭৪] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের সাইড প্ল্যান, সূত্র নং-৪০০৫, তারিখ : ২৫.১.১৯৫৪, উৎস : প্রাগুক্ত

বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চারদিকে পাকা পথ বেষ্টিত একটি গোল পুকুরের অবস্থান। পুকুরটি কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ৯২ ফুট প্রশস্ত।

ইনস্টিটিউটের সামনে অবস্থিত ময়মনসিংহ রোডের পূর্ব ও পশ্চিম পাশের ফুটপাথের অংশও তিনি নকশার অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সামনের রাস্তা ও ইনস্টিটিউটের সীমানাপ্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে ছয় ফুট প্রশস্ত জায়গা ফাঁকা রেখে সেখানে ৪০ ফুট পর পর মাঝারি ধরনের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। তারপর ছয় ফুট প্রশস্ত সিরামিক ইটের নির্মিত ফুটপাথের নকশা করা হয়। রাস্তার পূর্ব পাশেও অনুরূপভাবে নকশা করা হয়।

দ্বিতীয় তলার প্ল্যানে (সূত্র নং-১৮৪৬/১/১, তারিখ ২৪.১২.৫৩) দেখা যায়, উত্তর দিকে ভবনের প্রথম অংশে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কক্ষ, টিচার্স কমনরুম, অফিসরুম এবং এক্সিবিশন স্পেস, সামনে ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে মেয়েদের কমনরুম। দ্বিতীয় অংশে পর পর তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং তারপর লাইফ স্টাডি রুম। লাইফ স্টাডি রুমের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে বিস্তীর্ণ ছাদ।[১৭৫]

এই পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[১৭৬]

এরপর শুরু হয় বিপুল কর্মযজ্ঞ। এ সময় জয়নুল আবেদিনের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় এই ভবন নির্মাণের প্রতি। প্রতিদিন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নিজে উপস্থিত থেকে এর নির্মাণকাজ তদারক করেছেন। এই ভবনের নির্মাণকাজ তদারকিতে নিয়োজিত ছিল সরকারের সিঅ্যান্ডবি বিভাগ। মাযহারুল ইসলামও ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সতর্ক ছিলেন। ভবন নির্মাণের সময় সেখানে অবস্থিত কোনো গাছ তিনি কাটতে দেননি। মাযহারুল ইসলাম ও জয়নুল আবেদিনের সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে ১৯৫৬ সালের শেষ পর্যায়ে ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়।

অল পাকিস্তান আর্ট এক্সিবিশনে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ : পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯৫৪ সালের আগস্টে ঢাকায় অল পাকিস্তান আর্ট এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়

[১৭৫] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের দ্বিতীয় তলার প্ল্যান, রেফারেন্স নং ১৮৪৬/১/১, তারিখ : ২৪.১২.৫৩, সিঅ্যান্ডবির কনসুলেটিং আর্কিটেক্ট ম্যাক কোনেল ও সহকারী আর্কিটেক্ট মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত

[১৭৬] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর, ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

বর্ধমান হাউসে। পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের একত্র করে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে প্রসারিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল গঠিত হয় প্রথমে লাহোরে ১৯৫৩ সালে; তারপর ঢাকায় ১৯৫৪ সালে। কাউন্সিলের প্রথম অনুষ্ঠান হিসেবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।[১৭৭] প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, সমগ্র পাকিস্তানের সাতাশি জন শিল্পীর ৪৬১টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। সমগ্র পাকিস্তানের খ্যাতিমান শিল্পীদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার ছত্রিশ জন শিক্ষার্থী শিল্পী ও কয়েকজন (সম্ভবত বারো জন) শৌখিন শিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রদর্শনীতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিশ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন নারী শিল্পী। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের প্রথম মুসলমান শিক্ষক আব্দুল মঈনের তিনটি চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। পূর্ব বাংলায় বসবাসরত বিদেশি বেটি আই নিউম্যানের চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। এ ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন পূর্ব বাংলার শিল্পী।[১৭৮]

প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীরা হলেন আব্দুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৯–১৯৭৫), আল্লা বখ্‌শ (১৮৮৫–১৯৭৮), আন্না মূলকা আহমেদ (১৯১৭–৯৪), জুবায়দা আগা (১৯২২–৯৭), সাকির আলী (১৯১৪–৭৫), আব্বাসী তাজমল, আব্দুল আজিজ, আলী মোহাম্মদ মাস্তার, আলী ইমাম (১৯২৪–২০০২), এস এ নাগী (১৯১৬–২০০৬), এম এ মঈন নাজমী, মাল্লিক শেখ, নাসিম আনোয়ার, রাজিয়া ফিরোজ, এস সফদার, সিদ্দিক নজর, তাহেরা আজ, ইয়াসমিন মাজহার, আনোয়ার আফজাল ও মুবারক হোসেন। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আব্দুর রহমান চুঘতাই, আল্লা বখ্‌শ, সাকির আলী প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পী ঢাকায় এসেছিলেন।[১৭৯] পূর্ব বাংলার বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া প্রমুখ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সদ্য পাস করা ও ছাত্র-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মোস্তফা আজিজ, এস শফিকুল হোসেন, বজলে মাওলা, আব্দুল হাই, আবদুর রাজ্জাক, আব্দুস সবুর, আব্দুল সহিদ, আনোয়ারুল হাকিম, আব্দুর রউফ, আমিনুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আকতারুজ্জামান, এহসানুল আমিন, এ কে আশরাফুজ্জামান, বিজন চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, ইমদাদ হোসেন, একরামুল হক, গোলাম সারোয়ার তালুকদার, হুমায়ুন কাদের, এম এ কাদের, মোবিনুল আজিম, মোঃ ইদ্রিস, নূরুল ইসলাম, এম আর সিরাজী, মীর মোস্তফা আলী, মুর্তজা বশীর, মোঃ কাইয়ুম চৌধুরী, আর এ খান, রশিদ চৌধুরী, এস আহসান, এস জাহাঙ্গীর, শাহউদ্দিন আকবর, সৈয়দ আলী আযম, জুনাবুল ইসলাম প্রমুখ। শৌখিন

[১৭৭] Ahmed Jalal Uddin, *Art in Pakistan*, Karachi, Pakistan Publication, 2nd Edition, 1962, p. 31
[১৭৮] *Catalogue,* All-Pakistan Art Exhibition 1954, Pakistan Arts Council-Dacca
[১৭৯] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মিস সখিনা, এম এস হোসেন, মিস ওবায়দুল্লাহ, মোহাম্মদ সৈয়দ, বেগম রহমত আলী খান, সুভাষ দত্ত (মিতাজী), মনজুর হোসেন, প্রবীর রায়, শিরিন, আঞ্জুমান আরা বেগম, রেখা আমিন প্রমুখ। প্রদর্শনীতে তেলরং, জলরং, পেনসিল, উডকাট, উড এনগ্রেভিং, এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, কালি-তুলি ইত্যাদি মাধ্যমের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল।

প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকায় পাকিস্তানের শিল্পকলা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে জয়নুল আবেদিনকে পাকিস্তানের আধুনিক চিত্রকলার নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ভূমিকায় লেখা হয় :

> Broadly speaking, the artistic scene in Pakistan is divided into two groups. One is that of the traditionalists led by the old Master Abdur Rahman Chughtai and the other, the modern, led by Zainul Abedin.[১৮০]

ঢাকা আর্ট গ্রুপের এই প্রদর্শনী ছিল পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম শিল্পকলা প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ব্যাপক দর্শক সমাগম ঘটে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছিলেন। ঢাকার শিল্পী ও শিল্পরসিক দর্শকগণ এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে পাকিস্তানের উভয় অংশের শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ পেয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীদেরও সুযোগ হয়েছিল পূর্ব বাংলার শিল্পীদের চিত্রকর্ম দেখার এবং শিল্পীদের সম্পর্কে জানার। এই প্রদর্শনী থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং সদ্য পাস করা তরুণ শিল্পীরা। তাঁরা পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পমাধ্যম, করণ-কৌশল এবং চিত্রশৈলী সম্পর্কে সরাসরি জানতে পেরেছিলেন। এ সকল বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে একত্রে প্রদর্শনী করার অভিজ্ঞতা চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের আরো আত্মবিশ্বাসী করেছিল।

এই প্রদর্শনী সম্পর্কে মাসিক 'সমকাল' পত্রিকায় কামরুল হাসান লেখেন—

> এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীরা নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করল। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীরাও প্রচুর ছবি দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আপন সত্তা নিয়ে যিনি ছিলেন তিনি আব্দুর রহমান চুঘতাই। বাকি যারা ছিলেন তারা সকলেই সুদূর পশ্চিমের সঙ্গে একাকার। ৫৪ সালের প্রদর্শনীতে পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীদের সৃষ্টির মৌলিকতা যে রকম সকলের কাছে সেদিন সহজভাবে রেখাপাত করেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সে ধারেও আসতে পারেনি।[১৮১]

এই প্রদর্শনী পাকিস্তানের দুটি অংশের শিল্পীদের পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দেয়। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসা আব্দুর রহমান চুঘতাই, আল্লা বখ্শ, সাকির আলী প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে জয়নুল

---

[১৮০] *Catalogue,* All-Pakistan Art Exhibition 1954, Ibid, P. 13

[১৮১] কামরুল হাসান, "পূর্ব বাংলার শিল্প সৃষ্টির ধারা", *মাসিক সমকাল*, ঢাকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৬৪, পৃ. ৪৯

আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে ঢাকার শিল্পীদের স্বাভাবিক কারণেই লাহোর ও করাচির শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম ছাত্রী ভর্তি : ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরবর্তী ছয়টি শিক্ষাবর্ষে (১৯৪৮–৪৯ থেকে ১৯৫৩–৫৪) কোনো ছাত্রী ভর্তি হননি। অভিভাবকরা ঢাকার রক্ষণশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের শিল্পশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে আগ্রহী হতেন না। অপর পক্ষে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ক্লাসরুমের সংকট, পুরাতন ঢাকার রক্ষণশীল পরিবেশ ও নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে জনসন রোডে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থাকাকালে ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচায় স্থানান্তরের পর ১৯৫৩ সালে ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির প্রথম সভায় ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৮২] এই সিদ্ধান্তের এক বছর পর ১৯৫৪–৫৫ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম ব্যাচে প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তি হন। তাঁরা হলেন তাহেরা খানম, রওশন আরা (পরে রওশন আরা আমীন), হাসিনা আলী (পরে মিনু জামান) জেবাইদা আক্তার খাতুন (পরে জোবাইদা ইসলাম) ও সৈয়দা মঈনা আহসান (পরে মঈনা করিম ইকবাল)।[১৮৩] এই ব্যাচে গোলাম মোস্তফা, নিত্য গোপাল কুন্ডু, হারাধন বর্মণ প্রমুখ ভর্তি হয়েছিলেন।[১৮৪]

নারীদের শিল্পশিক্ষার বিষয়টি রক্ষণশীল সমাজ যাতে নেতিবাচক প্রচারণার দিকে নিতে না পারে সে বিষয়ে জয়নুল আবেদিনসহ সকল শিক্ষক ছিলেন সতর্ক। এ কারণে প্রথম দিকে ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথকভাবে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে শিক্ষকরা ছিলেন রক্ষণশীল। ছাত্রীরা ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের কাজ দেখতে চাইলে অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে যেতে হতো। ক্লাস শেষে প্রতিদিন ছাত্রীদের রিকশায় তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন শিক্ষকরা। অবশ্য এ সকল সীমাবদ্ধতা বেশি দিন থাকেনি। ইনস্টিটিউট শাহবাগের নতুন ভবনে স্থানান্তরের পর ছাত্রীদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা ও সম্মতিতে ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হয়।[১৮৫]

---

[১৮২] ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার গভর্নর হাউসে লেডি ই ভি নূনের সভাপতিত্বে আয়োজিত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির প্রথম সভার কার্যবিবরণী, কার্যবিবরণীর ৮ নং অনুচ্ছেদে ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রাগুক্ত

[১৮৩] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

[১৮৪] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্রদের স্টাইপেন্ড/স্কলারশিপের রেজিস্ট্রার (১৯৫৮–১৯৬৪)

[১৮৫] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্ররা পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কাইয়ুম চৌধুরী ও হুমায়ুন কাদির দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও তাঁদের কাজের মান ছিল বেশ উন্নত।[১৮৬]

ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ খোলা এবং শফিকুল আমীনের যোগদান : ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটে ওরিয়েন্টাল আর্ট বা প্রাচ্যকলা বিভাগ খোলার এবং এই বিভাগের জন্য একটি লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদ অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভাগটি এমন সময় খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যখন পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটছিল। বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের সহযোগিতায় এবং স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নব্যবঙ্গীয় চিত্রধারা প্রবর্তন করেছিলেন দেশবিভাগের পরেও পাকিস্তানি শিল্পী আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের চর্চার মধ্য দিয়ে সেই প্রাচ্যচিত্রকলা সমগ্র পাকিস্তানে একটি অন্যতম চিত্রধারা হিসেবে প্রবহমান ছিল। জয়নুল আবেদিন ফাইন আর্টের সাবেক ছাত্র ও শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাচ্য শিল্পকলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমাজে প্রাচ্যচিত্রকলার গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করে তিনি ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময়ে নতুন একটি বিভাগ খোলার এবং সেখানে লেকচারার পদ অনুমোদনের আরো একটি কারণ ছিল। ওই সময় ইনস্টিটিউট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাজে তাঁর সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসনিক কাজে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। কারণ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের অব্যাহত চাপে তাঁর ছবি আঁকায় ব্যাঘাত ঘটছিল। এমতাবস্থায় তাঁর কলকাতা আর্ট স্কুলের সহপাঠী ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের লেকচারার শফিকুল আমীনকে ইনস্টিটিউটে নিয়োগদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শফিকুল আমীন ১৯৪৮ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে হেড ডিজাইনার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় দুই মাস চাকরি করার পর ওই বছরের নভেম্বর মাসে অধিক বেতনের চাকরি পেয়ে ইনস্টিটিউটের চাকরি ছেড়ে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে আর্ট ইনস্টিটিউটে বদলি করে আনার চেষ্টা করেন জয়নুল আবেদিন কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত আর্ট ইনস্টিটিউটে কোনো লেকচারার পদ খালি না থাকায় তাঁকে বদলি করে আনা সম্ভব হয়নি। এরপর ১৯৫৫ সালে শফিকুল আমীনকে ইনস্টিটিউটে আনার উদ্দেশ্যেই একটি লেকচারার পদ অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

[১৮৬] শিল্পী মুর্তজা বশীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

শফিকুল আমীন আর্ট ইনস্টিটিউটে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে ১৯৫৫ সালের ৫ এপ্রিল যোগদান করেন। তাঁর নিয়োগের পর জয়নুল আবেদিন তাঁর ওপর শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের অতিরিক্ত হিসেবে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১৮৭] লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ইনস্টিটিউটের অষ্টম বিভাগ হিসেবে ওরিয়েন্টাল বিভাগের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই বিভাগ খোলার অনুপ্রেরণা এসেছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং বিভাগ থেকে। ১৯১৬ সালে পার্সি ব্রাউনের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর ফাইন আর্ট বিভাগকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফাইন আর্ট ও ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং করা হয়।[১৮৮] এর পূর্বে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে হ্যাভেলের সহযোগিতায় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় এখানে ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা শিক্ষা গুরুত্ব পায়। তখন এই বিভাগে প্রধানত ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও কল্পকাহিনি অবলম্বনে জলরং, টেম্পারা ও ওয়াশ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হতো। যেহেতু প্রাচ্যকলা নামে এই স্কুলে আগে থেকে অনচ্ছ জলরঙে ও ওয়াশে ছবি আঁকা শেখানো হতো এ কারণে মাধ্যমগত পদ্ধতি প্রাচ্যদেশীয় নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১৮৯] ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরঙের অভিজ্ঞতা, জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি, মুঘল মিনিয়েচারের সূক্ষ্মতা আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ওয়াশ টেকনিকের প্রবর্তন করেছিলেন সেটিই ছিল এই বিভাগের প্রধান মাধ্যম।

ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিংয়ের অনুকরণে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ চালু করা হলেও এই বিভাগের নামকরণের ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিনকে কৌশলী হতে হয়েছে। কারণ তখন পাকিস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং নাম বাদ দিয়ে এর বিকল্প হিসেবে ওরিয়েন্টাল আর্ট বা প্রাচ্যকলা শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। ওই সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোনো বিভাগের নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি যুক্ত করাটা ছিল স্পর্শকাতর বিষয়। প্রাচ্যকলা বলতে সাধারণত প্রাচ্যদেশীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কলাশিল্পের বিষয়টি বোঝানো হলেও এখানে চীন, জাপান, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। মূলত কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের 'ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং'-এর শিল্পশিক্ষাক্রমের অনুকরণে এখানে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। এখানে ইন্ডিয়ান স্টাইলে ড্রইং, কম্পোজিশন, ওরিয়েন্টাল ওল্ড মাস্টার আর্টিস্টদের চিত্রকর্মের কপি করা, ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষণীয় করা হয়।

[১৮৭] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[১৮৮] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
[১৮৯] শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ খোলার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে তেমন কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। ১৯৬৩ সালে ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বিভাগে কিশোয়ার মমতাজ নামে একজন মাত্র ছাত্রী সম্পর্কে জানা যায়। যিনি কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শিক্ষক খাজা শফিক আহমেদের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫৬–৫৭ শিক্ষাবর্ষে আর্ট ইনস্টিটিউটে এলিমেন্টারি পর্বে ভর্তি হয়েছিলেন এবং অ্যাডভান্সড পর্বে ওরিয়েন্টাল বিভাগে ভর্তি হন ১৯৫৮ সালে।[১৯০]

উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আবদুর রাজ্জাকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন : ১৯৫৫ সালের প্রথমার্ধে আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের মেধাবী ছাত্র আবদুর রাজ্জাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফুলব্রাইট বৃত্তি লাভ করে আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। পূর্ব বাংলার মধ্যে তিনিই প্রথম স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিল্পশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশ থেকে বৃত্তি লাভ করেন। ইতিপূর্বে যাঁরা বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন তাঁরা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন।[১৯১]

আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির তৃতীয় সভা : ১৯৫৫ সালের ৩০ জুন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় সেগুনবাগিচার ইনস্টিটিউট ভবনে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে। গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন জসীমউদ্‌দীন, অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ এবং সদস্যসচিব অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন।[১৯২]

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইনস্টিটিউটে ড্রাফটসম্যান ও ট্রেচার কোর্স চালু করা, শাহবাগে নির্মাণাধীন ইনস্টিটিউট ভবনের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তরের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণীর ৫ নম্বর সিদ্ধান্তে দ্রুত ড্রাফটসম্যানশিপ অ্যান্ড ট্রেচার কোর্স খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন ক্যাম্পাসে ড্রাফটসম্যান অ্যান্ড ট্রেচার কোর্স খোলার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ও জায়গা ছিল। ড্রাফটসম্যান কোর্সটি আর্ট ইনস্টিটিউটের শুরুতেই অনুমোদিত ছিল। মূলত স্থান স্বল্পতার কারণে বিভাগটি খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অভিজ্ঞ ড্রাফটসম্যান শিক্ষক

---

[১৯০] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনসংক্রান্ত রেগুলেশন ফরম। এখানে কিশোয়ার মমতাজকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১৯১] নজরুল ইসলাম, *আর্ট অব বাংলাদেশ*, *সিরিজ-৭ : আবদুর রাজ্জাক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ৯৭

[১৯২] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৫ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আলী আহসান আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে এখানে যোগদান করেছিলেন। পূর্ব বাংলায় তখন ড্রাফটসম্যানশিপ শিক্ষার চাহিদা ছিল। তখনো এখানে কোনো পলিটেকনিক বা আর্কিটেকচার কলেজ না থাকায় ড্রাফসম্যানশিপ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর নির্ভর করতে হতো। কলকাতা আর্ট স্কুল এবং করাচির মেয়ো স্কুল অব আর্টে অনেক আগে থেকে ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ সকল বিষয় বিবেচনায় এনে আর্ট ইনস্টিটিউট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ড্রাফটসম্যান কোর্স চালু করার ব্যাপারে স্থপতি মাযহারুল ইসলামেরও তাগিদ ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণকাজকে কেন্দ্র করে জয়নুল আবেদিন ও মাযহারুল ইসলাম পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মাযহারুল ইসলামের ইচ্ছা ছিল আর্ট ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের পাশে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে তুলবেন আর্কিটেকচার কলেজ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৫ সালের ৫ ডিসেম্বর (রেফারেন্স নং ৫০০২/১/১) পাবলিক লাইব্রেরি এবং আর্ট ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য করা দক্ষিণ শাহবাগ অঞ্চলের সাইড প্ল্যান থেকে। তাঁর করা এই সাইড প্ল্যানে পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের মধ্যবর্তী স্থানকে (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ ও কবি কাজী নজরুলের সমাধিস্থল) কলেজ অব আর্কিটেকচারের নির্ধারিত স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৩] সভার কার্যবিবরণীর ৮ নম্বর সিদ্ধান্তে শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণকাজের অগ্রগতি তুলে ধরা হয় এবং ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে ভবনটি ইনস্টিটিউটের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে আশা প্রকাশ করা হয়।

কার্যবিবরণীর ৯ নম্বর সিদ্ধান্তে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য স্থায়ী হোস্টেল নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেগুনবাগিচার খান মঞ্জিলের কাছাকাছি স্থানে অস্থায়ী ভিত্তিতে ছাত্রদের হোস্টেলের ব্যবস্থা করার একটি উদ্যোগ আগে থেকেই চলছিল। যেহেতু আর্ট ইনস্টিটিউট দ্রুত সেগুনবাগিচা থেকে শাহবাগের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবে সেহেতু সেই উদ্যোগ স্থগিত করে ছাত্রদের জন্য একটি স্থায়ী হোস্টেল নির্মাণের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচার খান মঞ্জিলে স্থানান্তর হওয়ার পর থেকে আরো অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে থাকেন। ১৯৫৫–৫৬ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ত্রিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সমরজিৎ রায় চৌধুরী, বিনোদবিহারী মন্ডল, রুমি ইসলাম, আব্দুল মোক্তাদির, সচীন্দ্রলাল বড়ুয়া, গৌরাঙ্গ চন্দ্র মন্ডল, সালাউদ্দীন ইস্কান্দার, নূর মোহাম্মদ, কাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

---

[১৯৩] পাবলিক লাইব্রেরি ও আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য করা দক্ষিণ শাহবাগের সাইড প্ল্যান। ম্যাক কোনেল ও মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, রেফারেন্স নং ৫০০২/১/১, তারিখ : ৫.১২.৫৫, উৎস : চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে আয়োজিত আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও পেইন্টিংয়ের প্রদর্শনী

শিক্ষক পদে মোহাম্মদ কিবরিয়ার পুনরায় যোগদান : আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আরো শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। কয়েক মাস আগে শফিকুল আমীনকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ করা হলেও তিনি প্রশাসনিক কাজে অধিক ব্যস্ত থাকায় ক্লাসে বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। এমতাবস্থায় ১৯৫৫ সালের ১০ জুলাই শিক্ষক হিসেবে মোহাম্মদ কিবরিয়া আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। তিনি ইতিপূর্বে জয়নুল আবেদিনের ইউরোপ ভ্রমণের সময় (১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) তাঁর ছুটিজনিত শূন্যস্থানে শিক্ষক পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষকতা করেছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে যোগদানের সময় তাঁর বেতন স্কেল ছিল ১২৫-২৫০ টাকা। এর আগে তিনি নওয়াবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ড্রইং মাস্টার পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের অধিবাসী।[১৯৪] ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে ছয় বছরের কোর্স সম্পন্ন করে জীবিকার অন্বেষণে ১৯৫১ সালের শেষের দিকে ঢাকায় চলে আসেন। আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর তিনি এলিমেন্টারি পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

আর্ট ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের প্রদর্শনী : জয়নুল আবেদিনের আগ্রহে ১৯৫৫ সালের ১৫ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত আর্ট ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল। প্রদর্শনীতে রংপুর ও বগুড়া ছাড়া পূর্ব বাংলার সতেরোটি জেলার মধ্যে পনেরোটি জেলা থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পূর্ব বাংলার তৎকালীন গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে লোকশিল্পের উৎকর্ষ অনুযায়ী জেলাভিত্তিক পুরস্কার পায় যশোর জেলা, দ্বিতীয় পুরস্কার পায় ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং তৃতীয় পুরস্কার পায় ঢাকা ও রাজশাহী জেলা। ১৯৫২ সালে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে জয়নুল আবেদিন এ দেশের শিল্পের গতিমুখ লোক-ঐতিহ্যের দিকে ফেরানোর এবং এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আধুনিক শিল্পে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। এই লোকশিল্প প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পী ও শিল্পরসিকদের সামনে পূর্ব বাংলার লোকশিল্পের সমৃদ্ধিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।[১৯৫]

---

[১৯৪] মোহাম্মদ কিবরিয়ার আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রিন্টমেকিং বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য করা আবেদনপত্র ও জীবনবৃত্তান্ত, তারিখ : ২১.৪.৮৫, মোহাম্মদ কিবরিয়ার ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৯৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪–৯৫

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ছিল শিক্ষা বিভাগের ডিপিআইয়ের অধীনে। এর প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করত ডিপিআই অফিস। কিন্তু ইনস্টিটিউটের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো না।

১৯৫৫ সালে ইনস্টিটিউটের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ওই সময়ের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচলিত নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ১ জুলাই শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এ কিউ আনসারীর লেখা দীর্ঘ অফিস নোট থেকে এ বিষয়ে জানা যায়।[১৯৬] এই অফিস নোটে জনাব আনসারী ইনস্টিটিউটের চলমান অবস্থা তুলে ধরে এর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বাড়ানোর জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এই অফিস নোটের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল ডিপিআই আবদুল হামিদ এক পত্রে অধ্যক্ষকে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তাব পেশ করতে অনুরোধ করেন। এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে এ বিষয়ে আর একটি পত্র দেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ড. এম আহম্মদ। তিনি ইনস্টিটিউটটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে বলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক বা অন্য কেউ গেলে তাঁকে যেকোনো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রি কলেজে রূপান্তর করার জন্য এটাই ছিল সম্ভবত প্রথম পদক্ষেপ।

১৯৫৬ সাল ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবহুল বছর। এ বছরের মার্চ মাসে সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে একত্র করে এক ইউনিট গঠনের ফলে এর নাম হয় 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্ব বাংলার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'।[১৯৭]

---

[১৯৬] শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এ কিউ আনসারীর ১.৭.১৯৫৫ তারিখে স্বাক্ষরিত অফিস নোট। Transfer of the govt. Institute of Arts to the University of Dacca শীর্ষক নথি, নথি নং-c-33, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৯৭] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পা.), *সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ. ১০৯

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির চতুর্থ ও পঞ্চম সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ : ১৯৫৬ সালের ১৭ মে আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির চতুর্থ সভা ঢাকার কমিশনার জি এ মাদানীর সভাপতিত্বে শাহবাগের নির্মাণাধীন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্নিং বডির সদস্য বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, অজিত কুমার গুহ, মুজিবুর রহমান খান, শফিকুল আমীন, খাজা শফিক আহমেদ এবং সদস্যসচিব জয়নুল আবেদিন উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, এই সভায় শিক্ষক হবিবুর রহমান ও খাজা শফিক আহমেদের অবেক্ষাধীন সময় সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হওয়ায় তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণের সুপারিশ, ইনস্টিটিউটের জন্য অনুমোদিত সহযোগী স্টাফদের জন্য সরকারি বরাদ্দ ছাড় করা এবং হেডক্লার্ক-কাম-অ্যাকউনট্যান্ট নিয়োগের জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শাহবাগে নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবন হস্তান্তরের দিন নির্ধারণ এবং ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণের সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৯৮]

সভার ১১ নম্বর সিদ্ধান্তে ১৯৫৬ সালের ১ জুলাই শাহবাগে নবনির্মিত আর্ট ইনস্টিটিউট ভবন হস্তান্তরের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তার আগে ২০ জুনের মধ্যে ভবনের বৈদ্যুতিক কাজসহ অন্যান্য কাজ যেন সমাপ্ত করা হয় অধ্যক্ষ সে বিষয়ে সভাপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গভর্নিং বডির তৃতীয় সভায় (১৯৫৫ সালের ৩০ জুন) ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন হস্তান্তরের সম্ভাব্য সময় ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। এই সভা আয়োজনের সময় পর্যন্ত ভবনের অধিকাংশ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলেও বৈদ্যুতিক কাজসহ আরো কিছু কাজ বাকি ছিল। তবে অধিকাংশ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলেই সেখানে বসে গভর্নিং বডির সভা করা সম্ভব হয়েছিল।

এই সভার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো শাহবাগে নতুন ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণের সীমানা নির্ধারণ। শাহবাগে ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রথমে তিন একর জায়গা অধিগ্রহণ করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ইনস্টিটিউটের জন্য প্রয়োজন ছিল আরো জায়গার। বিষয়টি সভায় উত্থাপিত হলে আরো কী পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জমির সাইড প্ল্যানসহ নোট আকারে ঢাকার কমিশনারের কাছে পাঠানোর জন্য সভাপতি বলেন। সভার এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন প্রাঙ্গণের জন্য ১৯৫৬ সালের ৯ জুন একটি সাইড প্ল্যান করা হয়। এই সাইড প্ল্যানে ঢাকা শহর মৌজার ৬১ এবং ৬২ নম্বরের প্লটের পূর্ণ অংশ ও ৪৬, ৪৯, ৫৪, ৫৫, ৫৯,

---

[১৯৮] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির ১৯৫৬ সালের ১৭ মে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬০, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৫১ এবং ২৮ নম্বর প্লটের অংশবিশেষ নিয়ে মোট ছয় একর ৯২ শতাংশ এলাকা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ময়মনসিংহ রোডের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বর্তমান বড় গোল পুকুরের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত তিন একর জায়গা তখন অধিগ্রহণকৃত ছিল। বর্তমান জয়নুল গ্যালারির উত্তর পাশ থেকে বকুলগাছ ও বটগাছের উত্তর পাশে আরো এক একর জায়গা অধিগ্রহণের প্রস্তাব কার হয়েছিল; কিন্তু তখনো নিষ্পত্তি হয়নি। গোল পুকুরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পশ্চিম দিকে আরো দুই একর ৯২ শতাংশ জমি ইনস্টিটিউটের বর্ধিত অংশ হিসেবে অধিগ্রহণের জন্য সাইড প্ল্যানে উল্লেখ করা হয়।[১৯৯]

১৯৫৬ সালের ২৫ জুলাই আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির পঞ্চম সভা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে সেগুনবাগিচায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্ধারিত ছয়টি আলোচ্য বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৫ ও ৬ নম্বর সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ার এখানে উল্লেখ করা হলো। সভার কার্যবিবরণীর ৫ নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়, আর্ট ইনস্টিটিউট শাহবাগের নতুন ভবনে কার্যক্রমের শুরু করার আগেই সরকার অধ্যক্ষের জন্য এখানে যেন একটি কোয়ার্টার নির্মাণের জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬ নম্বর সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হস্তান্তর না হওয়ার সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং জরুরি ভিত্তিতে ভবন হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০০]

১৯৫৬–৫৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী : ১৯৫৬–৫৭ শিক্ষাবর্ষে নবম ব্যাচে আটাশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন প্রাণেশ কুমার মন্ডল, আবুল হাশেম খান, গোপেশ মালাকার, এডলিন দাস (পরে এডলিন মালাকার), জোবাইদা ইসলাম, মমতাজ আফরোজ জাহান, সিরাজুল হক, মোস্তফা কামাল, আশীষ কুমার সেন গুপ্ত, মনসুর আহমেদ রাহী, সুরঞ্জন দত্ত, মোহম্মদ ইউনুস, আবুল খায়ের, আমানুল্লাহ খান প্রমুখ।[২০১] এ বছর আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে বের হন চতুর্থ ব্যাচের কাজী আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, আব্দুর রউফ, এহসানুল আমিন, আবু তাহের প্রমুখ।

---

[১৯৯] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সিএএস অফিস কর্তৃক প্ল্যান, ডিজাইন নং ৫০৮০/১/১.ডি. তারিখ : ৯ জুন ১৯৫৬ উৎস : প্রাগুক্ত

[২০০] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির ১৯৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী, উৎস : প্রাগুক্ত

[২০১] *ক্যাটালগ*, চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের চিত্র প্রদর্শনী, ১৫–২১ মে, ১৯৯৯, জয়নুল গ্যালারি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি; শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২২.১১.২০১৬

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ ও বিদেশ ভ্রমণ : ১৯৫৬ সালে ইউরোপ থেকে শিল্পশিক্ষা নিয়ে হামিদুর রহমান, নভেরা আহমেদ ও আমিনুল ইসলাম দেশে ফেরেন। এ বছর জয়নুল আবেদিন রকফেলর ফাউন্ডেশনের ট্রাভেল গ্রান্ট নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যান। আর শিল্পশিক্ষার জন্য ইউরোপ যান রশিদ চৌধুরী, সফিউদ্দীন আহমেদ ও মুর্তজা বশীর। এ সকল শিল্পীর ইউরোপে শিল্পশিক্ষা ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এ দেশে আধুনিক শিল্পকলার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

হামিদুর রহমান লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন থেকে চিত্রকলা বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে দেশে ফেরেন ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে। হামিদুর রহমানই প্রথম শিল্পী যিনি ইউরোপ থেকে স্নাতক পর্যায়ের শিল্পশিক্ষা নিয়ে দেশে ফেরেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ১৯৫৩ সালে ফ্লোরেন্সের আকাদেমি দা বেল্লি আর্ত থেকে ম্যুরাল বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করেন।[২০২] প্যারিস, লন্ডন ও ফ্লোরেন্সের জাদুঘরগুলোতে সংরক্ষিত বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখার অভিজ্ঞতা এবং মেধাবী সতীর্থদের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানে তিনি সমৃদ্ধ হন। ওই সময়ে ইউরোপে সংঘটিত আধুনিক শিল্পান্দোলনসমূহের দ্বারা তিনি দারুণভাবে আকৃষ্ট হন। নভেরা আহমেদ এ অঞ্চলের কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা না নিয়েই পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে নিজস্ব উদ্যোগে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ক্যাম্বারওয়েল স্কুল অব আর্ট থেকে ভাস্কর্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সম্ভবত হামিদুর রহমানের সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ইতালি ও অস্ট্রিয়াতে গিয়ে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে হেনরি ম্যুর, বারবারা হেপওয়াডসহ অন্যান্য আধুনিক ভাস্করের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন।[২০৩] তিনি একাডেমিক ভাস্কর্যে দক্ষতার পাশাপাশি আধুনিক ভাস্কর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। নভেরা ভাস্কর্য বিষয়ে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভাস্কর, যাঁর হাত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার সূচনা হয়। হামিদুর রহমানও দেশে ফিরে বিচিত্র করণ-কৌশলের মাধ্যমে নিরীক্ষাধর্মী চিত্রচর্চার মনোযোগ দেন। হামিদ ও নভেরার মাধ্যমে এ দেশে আধুনিক ম্যুরাল ও রিলিফ ভাস্কর্যের সূচনা হয়। সদ্যসমাপ্ত পাবলিক লাইব্রেরির দেয়ালে এ সময় নভেরা একটি রিলিফ ওয়ার্ক এবং হামিদ একটি ম্যুরালের কাজ শুরু করেন।

হামিদুর রহমানের ইচ্ছা ছিল আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করার। আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন জয়নুল আবেদিনের

---

[২০২] মঈনুদ্দীন খালেদ, "সমকালীন শিল্পকলার দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা : ক. হামিদুর রহমান", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

[২০৩] লালা রুখ সেলিম, "সমকালীন শিল্পকলায় দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা : ঘ. নভেরা আহমেদ", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

কাছে। নভেরাকে দিয়ে ইনস্টিটিউটে ভাস্কর্য বিভাগ খোলার বিষয়েও বলেছিলেন।[২০৪] কিন্তু ইনিস্টিটিউটের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ভাস্কর্য শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় তখন ভাস্কর্য বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালের মাধ্যবর্তী সময়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের মেধাবী ছাত্র রশিদ চৌধুরী স্পেন সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি নিয়ে মাদ্রিদের সেন্ট্রাল এসকুলা দেস বেলিয়াস আর্টস দা সান ফার্নান্দোতে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্পেনে যান।[২০৫]

এ বছরের ১৫ আগস্ট আমিনুল ইসলাম তিন বছরের শিল্পশিক্ষা নিয়ে ইতালি থেকে দেশে ফেরেন। তিনি ফ্লোরেন্সের আকাদেমি দেল বেল্লে আর্ত থেকে প্রফেসর প্রিমো কন্টির (১৯০০-৮৮) অধীনে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সেখানে অবস্থানকালে তিনি মোজাইক ম্যুরাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। কলম্বিয়ার বিখ্যাত শিল্পী ফোরনান্দো বোতেরো ছিলেন আমিনুলের সতীর্থ।[২০৬] ওই সময় ইতালিয়ান শিল্পী আফ্রো বাসালদেল্লার (১৯১২–৭৬) নির্বস্তুক কাজ এবং রেনাতো গুত্তোসোর (১৯২২–৮৭) ফিগারেটিভ কাজ তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল।[২০৭] তিনি ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন করেন। ১৯৫৪ সালে বিখ্যাত ভেনিস বিয়েন্নালে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রদর্শনী দেখতে ভেনিসে যান। সারা বিশ্বের খ্যাতিমান সব শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখে তিনি সমকালীন বিশ্বের বিচিত্র শিল্পধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

আমিনুল ইসলামের ইনস্টিটিউটে যোগদান : ১৯৫৬ সালের জুনে জয়নুল আবেদিনের রকফেলর ফাউন্ডেশনের এক বছরের ট্রাভেল গ্রান্ট চূড়ান্ত হয় এবং সফিউদ্দীন আহমেদ উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হন—এমন পরিস্থিতিতে ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংকট এড়াতে জয়নুল আবেদিন লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে আমিনুল ইসলামকে যোগদানের আহ্বান জানান। ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ অনুমোদিত এই লেকচারার পদটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান এডুকেশন সার্ভিসের ক্যাডার পদ।

জয়নুল আবেদিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত ইনস্টিটিউটে যোগদানের ক্ষেত্রে আমিনুল দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ তাঁর তিন বছরের বৃত্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরো এক বছর বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন এবং সেই আবেদন অনুমোদনের নিশ্চয়তা ছিল। তিনি ওই সময় দেশে ফিরেছিলেন

---

[২০৪] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪–০৫

[২০৫] নাসিমা হক মিতু, 'সমকালীন শিল্পকলার দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা : ঙ. রশিদ চৌধুরী', *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[২০৬] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

[২০৭] মঈনুদ্দীন খালেদ, "সমকালীন শিল্পকলার দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা : গ. আমিনুল ইসলাম", *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

দুই মাসের ছুটি কাটানোর জন্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল বর্ধিত বৃত্তির মেয়াদের শিক্ষা শেষে তিনি চাকরিতে যোগদান করবেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের ওই সময়ের বাস্তবতায় জয়নুল আবেদিন চেয়েছিলেন তিনি দ্রুত ইনস্টিটিউটে যোগদান করুন। কারণ জয়নুল আবেদিন ১৯৫৬ সালে জুন মাসে রকফেলর ফাউন্ডেশনের অধীনে এক বছরের 'ট্রাভেল গ্রান্ট' লাভ করেন এবং এ বছরের আগস্ট মাসের শেষার্ধে এই গ্রান্টের অধীনে তাঁর বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।[২০৮] অন্যদিকে আর্ট ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাজের অন্যতম ভরসা সফিউদ্দীন আহমেদও জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন নিজ খরচে ইংল্যান্ডে গিয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য দুই বছরের ছুটি অনুমোদনের জন্য।[২০৯] তাঁদের অনুপস্থিতকালে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি তাঁকে (জয়নুল আবেদিনকে) বেশ ভাবিয়ে তোলে। ভবিষ্যতে শিক্ষক সংকট এড়াতে তিনি আমিনুল ইসলামকে লেকচারার পদে নিয়োগের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

ওই সময় তাঁর বিশ্বভ্রমণের ছুটিকালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী আনোয়ারুল হকের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দেয়। প্রশাসনিক দক্ষতার কথা বিবেচনা করে তিনি শফিকুল আমীনকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন।[২১০] কিন্তু আনোয়ারুল হক বিষয়টি না মেনে তাঁর জ্যেষ্ঠতা উল্লেখ করে ডিপিআই বরাবর আবেদন করলে আনোয়ারুল হককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ করার অফিস আদেশ দেন ডিপিআই। আনোয়ারুল হক অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্তিতে ফাইন আর্ট বিভাগে শিক্ষক সংকট দেখা দেওয়ার বিষয়টি জয়নুল আবেদিনকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।[২১১]

জয়নুল আবেদিনের প্রবল ইচ্ছা ছিল বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার আগে আমিনুলের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন সিঅ্যান্ডবি বিভাগের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন। এ কারণে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার সভা করে গভর্নিং বডির মাধ্যমে এবং সরকারের উচ্চ মহলের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের দিয়ে সিঅ্যান্ডবি কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার আগে কোনোটাই সম্ভব হয়নি। ২৫ আগস্ট কলকাতা থেকে তিনি বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তার আগে তিনি ঢাকা থেকে আসেন কলকাতায়।[২১২] তাঁর অনুপস্থিতিতে আনোয়ারুল হক

[২০৮] রকফেলর ফাউন্ডেশনের কাউন্সিলরকে লেখা জয়নুল আবেদিনের পত্র, তারিখ ২৫ জুলাই ১৯৫৬, প্রাপ্তি : প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন

[২০৯] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫–২০৭

[২১০] প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫–২০৭

[২১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[২১২] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হন। এ বছরের নভেম্বরে আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্রাফিক আর্টের লেকচারার সফিউদ্দীন আহমদ উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে যান।[২১৩]

এই পরিস্থিতিতে সকল দ্বিধা কাটিয়ে ১৯৫৬ সালের ১০ নভেম্বর আমিনুল ইসলাম আর্ট ইনস্টিটিউটে লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে যোগদান করেন।[২১৪] এর আগে ৪ অক্টোবর তিনি নিয়োগপত্র লাভ করেন। আমিনুল ছিলেন ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা এবং ইউরোপে শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম শিক্ষক। জয়নুল আবেদিনের প্রিয় ও আস্থাভাজন ছাত্র। তিনি একাডেমিক কাজে যেমন ছিলেন দক্ষ, তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে ছিলেন অবহিত। তাঁর সাজ-পোশাক ও শিল্পচর্চায় ছিল আধুনিক ইউরোপের প্রভাব। ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও ঢাকার তরুণ শিল্পীদের কাছে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। এ প্রসঙ্গে কাইয়ুম চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, 'আমাদের চোখে হিরো তখন আমিনুল। আমাদের আদর্শ। তাঁর ছবি, সাজ-পোশাক আমাদের অনুকরণীয় হয়ে উঠল।'[২১৫]

শাহবাগের নতুন ভবনে আর্ট ইনস্টিটিউট স্থানান্তর : মাযহারুল ইসলাম আর জয়নুল আবেদিনের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই বছরাধিককাল ব্যাপক কর্মযজ্ঞের পর ১৯৫৬ সালের একেবারে শেষ পর্যায়ে শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের কাজ শেষ হয়। ৩২০০ বর্গমিটার বিস্তৃত এই দ্বিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল নয় লক্ষ টাকা। ১৫০ জন শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন করে ভবনটি নির্মাণ করা হয়।[২১৬] আয়তাকার ও বৃত্তাকার আকৃতির ছোট-বড় পঁচিশটি কক্ষ আছে এই ভবনে। যার মধ্যে দশটি শ্রেণিকক্ষ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক কক্ষ ছাড়াও আছে লাইব্রেরি, গ্যালারি, ছাত্র ও ছাত্রী কমনরুম ও অফিসকক্ষ। গোলাকার সাদা স্তম্ভ, লাল ইটের দেয়াল, চওড়া টানা বারান্দা, সুদৃশ্য কাঠের প্যানেল, বিশাল স্তম্ভে ভর করা ঘোরানো সিঁড়ি, সুপরিসর আঙিনা, চারদিকে সবুজের সমারোহ—এসবের সমন্বয়ে আর্ট ইনস্টিটিউট পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক স্থাপত্যের ইতিহাসের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের কাজ ১৯৫৬ সালের শেষ পর্যায়ে শেষ হলেও সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। আমিনুল ইসলাম 'বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '১০ নভেম্বর ইনস্টিটিউটে লেকচারার ইন

---

২১৩ সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ২০১৩, পৃ. ১১২

২১৪ আমিনুল ইসলামের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে যোগদান পত্র, তারিখ ১০ নভেঃ আমিনুল ইসলামের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১৫ কাইয়ুম চৌধুরী, "বৈরী স্রোতের শিল্পী আমিনুল ইসলাম", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিঃ ২০১২, পৃ. ৪৩

২১৬ Selim Lala Rukh, "50 Years of the fine Art Institute", *Art*, Dhaka, Vol.4.No-3, January-March 1999, p. 5

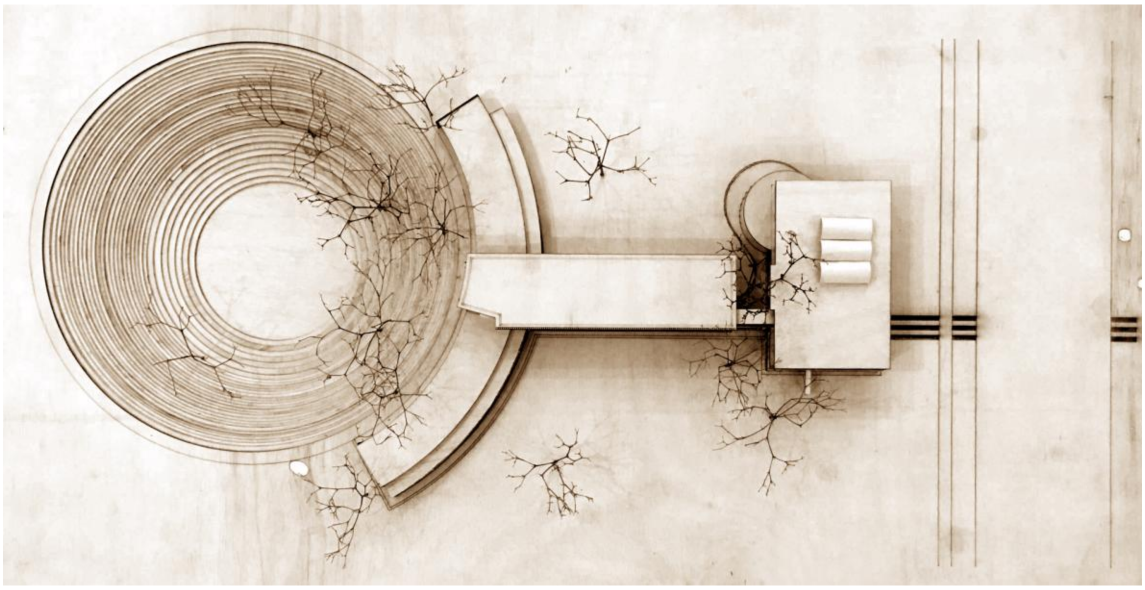

চিত্র-২৪ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ভবনের নকশা, উৎস : মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদে আয়োজিত প্রদর্শনী ২০১৬

চিত্র-২৫ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রশাসনিক ভবন

চিত্র-২৬ : গোল পুকুরসহ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ভবন, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

ফাইন আর্ট পদে নিযুক্ত পত্রে সই করে শিক্ষকতা শুরু করলাম শাহবাগের নতুন ভবনে।'[২১৭] তাঁর এই বক্তব্য থেকে মনে হয় ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে অথবা এর আগেই নতুন ভবনে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ভবনের উদ্বোধন ও কার্যক্রম শুরুর সময়কাল প্রসঙ্গে শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং শিল্পী হাশেম খান কিছুটা ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। হাশেম খান সাক্ষাৎকারে জানান, ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে সম্ভবত জানুয়ারি মাসে শাহবাগের নতুন ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সেখানে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সেগুনবাগিচার ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়ে পাঁচ-ছয় মাস সেখানে ক্লাস করার পরে শাহবাগের ক্যাম্পাসে আসেন বলে জানান। তিনি আরো জানান,

[২১৭] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

১৯৫৬ সালের শেষে নির্মাণকাজ শেষ হয়; কিন্তু উদ্বোধনের আগেই আমিনুল ইসলাম ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার শুরু করেন। তিনি আরো জানান, আর্ট ইনস্টিটিউটে ধরে রাখার জন্য জয়নুল আবেদিন তাঁকে ওই বাড়তি সুবিধা দিয়েছিলেন।[২১৮] জয়নুল আবেদিন যে আমিনুল ইসলামকে শাহবাগের নতুন ভবনে স্টুডিও করার সুবিধা করে দিয়েছিলেন সে তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কাইয়ুম চৌধুরীর লেখাতে। এ সম্পর্কে 'অনন্য আমিনুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাজের জায়গা করে দিলেন জয়নুল আবেদিন। আর্ট কলেজের ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের শিক্ষকদের বর্তমান বসার কক্ষটি। আমিনুল তাঁর স্টুডিও বানিয়ে নিলেন।'[২১৯] এখানে কাইয়ুম চৌধুরীর লেখার ধারাবাহিকতায় মনে হয় জয়নুল আবেদিন দেশে থাকতে অর্থাৎ আগস্টে বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার আগে তিনি আমিনুল ইসলামকে চারুকলার নতুন ভবনে স্টুডিও বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। এরূপ হয়ে থাকলে আমিনুল ইসলাম ভবন উদ্বোধনের আগেই জয়নুল আবেদিনের অনুমতি সাপেক্ষে এখানে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ১৯৫৬ সালের ২১ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হক স্টুডিওর চাবি তাঁর কাছে হস্তান্তরের জন্য পত্র দেন। এরপর স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায় ডিসেম্বরের শেষের দিকে।[২২০]

ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন উদ্বোধন সম্পর্কে ওই সময়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র (ভর্তির শিক্ষাবর্ষ ১৯৫৫–৫৬) অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী সাক্ষাৎকারে জানান, ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে সম্ভবত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে শাহবাগের ইনস্টিটিউট ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপিআই শামসুল হক। গোল পুকুরের পশ্চিম পাশের ফাঁকা মাঠে তৈরি মঞ্চে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে জানান।[২২১]

ভবনের অধিকাংশ নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত জটিলতা। ১৯৫৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভায় দ্রুত বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করে ভবন হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ থেকে সেটি মনে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য আলাদা বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের ব্যবস্থা না করে পাবলিক লাইব্রেরি থেকে একটি বর্ধিত লাইনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

---

[২১৮] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২২.১১.২০১৬, ঢাকা

[২১৯] কাইয়ুম চৌধুরী, "বৈরী স্রোতের শিল্পী আমিনুল ইসলাম", *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[২২০] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হক কর্তৃক আমিনুল ইসলামকে লিখিত পত্র, পত্র নং-৬০০/এ-২৪, তারিখ ২১.১২.১৯৫৬ আমিনুল ইসলামের ব্যক্তিগত নথি

[২২১] শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২২.৭.২০১৬

উল্লিখিত তথ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শাহবাগে নবনির্মিত ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯৫৬ সালের শেষ দিক। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আগেই একটি কক্ষ স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন আমিনুল ইসলাম। ডিসেম্বরে মধ্যবর্তী সময় থেকে শাহবাগের ভবনে ইনস্টিটিউট মালপত্র স্থানান্তরসহ আংশিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে ভবনের উদ্বোধনের পর সেখানে পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু হয়।

নতুন ভবনে এসে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হক কঠোর নিয়ম-কানুনের প্রচলন করেন। এর মধ্যে ছিল ছাত্র ও শিক্ষকদের যথাসময়ে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে আসা এবং অফিস সময় শেষে অর্থাৎ বিকাল চারটার পর সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস ত্যাগ করা। অফিস সময়ের পরে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী যাতে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে অবস্থান না করতে পারেন বা ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পারেন সে বিষয়ে তিনি কঠোর নির্দেশনা দেন।

কাজী আবদুল বাসেতের শিক্ষক পদে যোগদান : অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন ও সফিউদ্দীন আহমেদের মতো জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে যে শিক্ষক সংকট তৈরি হয়েছিল তা শুধু আমিনুল ইসলামের যোগদানের ফলে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া সফিউদ্দীন আহমেদ বিদেশে যাওয়ার ফলে লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট পদটিও কয়েক বছরের জন্য খালি হওয়ায় নতুন শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কাজী আবদুল বাসেত আর্ট ইনস্টিটিউটে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ডিপিআই অফিস থেকে তাঁর নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি।[২২২] আর্ট ইনস্টিটিউটের চতুর্থ ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ১৯৫১–৫২) শিক্ষার্থী কাজী আবদুল বাসেত ১৯৫৬ সালে ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ওই ব্যাচের সেরা ছাত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৬ সালের ২৮ আগস্ট থেকে নওয়াবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ড্রইং মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর শিক্ষক হিসেবে যোগদানের ফলে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সংখ্যা হয় ১১ জন (অধ্যক্ষ, লেকচারার, হেড ডিজাইনারসহ)। ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে কারণে আরো শিক্ষক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হলে ১৯৫৭ সালের ১৮ জুন আরো তিনটি শিক্ষক পদ অনুমোদন করে শিক্ষা বিভাগ।[২২৩]

---

[২২২] কাজী আবদুল বাসেতের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে নিয়োগপত্র, পত্র নং ১৩৯০/৪-এ, তারিখ-১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ এবং তাঁর যোগদান পত্র, তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ এবং তাঁর যোগদান পত্র, তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

[২২৩] শিক্ষক পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত অফিস আদেশ, পত্র নং ৫১৫৮-এফ, তারিখ : ১৮ জুন ১৯৫৭

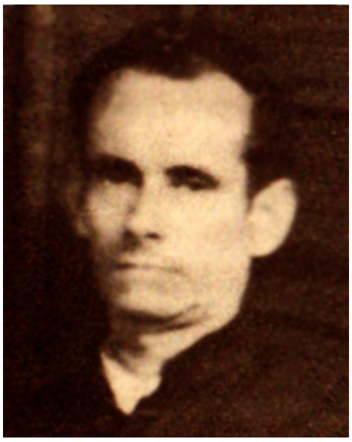

শিল্পী খাজা শফিক আহমেদ
শিক্ষক

শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া
শিক্ষক

শিল্পী আমিনুল ইসলাম
লেকচারার ইন ফাইন আর্ট

শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত
শিক্ষক

শিল্পী আবদুর রাজ্জাক
শিক্ষক

শিল্পী রশিদ চৌধুরী
শিক্ষক

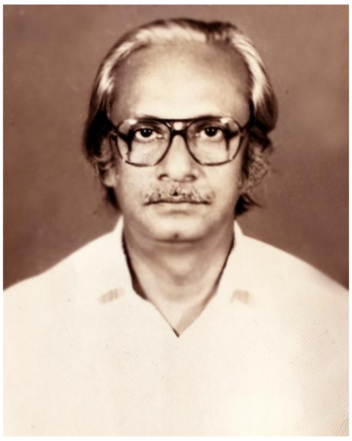

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
শিক্ষক

চিত্র-২৭ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে পঞ্চাশের দশকে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ

১৯৫৭–৫৮ শিক্ষাবর্ষে দশম ব্যাচে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন মোহাম্মদ আলী, এ এম আলী, আকতারুজ্জামান, মোঃ আব্দুস সাত্তার, মিস দিলরুবা বান্টি, হাফিজা খাতুন, আবুল মনসুর আহমেদ, মোতাহারুল হক চৌধুরী, খগেন্দ্র কুমার সরকার, যতিন্দ্র মোহন পাল, মহিউদ্দিন আহমেদ, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, বসন্ত কুমার সাহা প্রমুখ।[২২৪]

বিশ্বভ্রমণ শেষে জয়নুল আবেদিনের দেশে ফেরা : রকফেলর ফাউন্ডেশনের ট্রাভেল গ্রান্টের অধীনে বিশ্বভ্রমণ শেষে জয়নুল আবেদিন করাচি হয়ে দেশে ফেরেন **১৯৫৭** সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এক বছরের অধিক কালব্যাপী (**১৯৫৬** সালের আগস্ট থেকে **১৯৫৭** সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত) তিনি জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও স্পেন ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি এসব দেশের বিখ্যাত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, বিখ্যাত স্থান ও স্থাপনা পরিদর্শন করেন। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে একক চিত্র প্রদর্শনী করেন। এসব দেশের অনেক সমকালীন শিল্পী, শিল্প সমালোচক, শিল্প সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।[২২৫] ওই সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার আধুনিক শিল্পের প্রবণতা সম্পর্কে যেমন তিনি জানতে পারেন, তেমনি জানতে পারেন মেক্সিকোর বিখ্যাত ফ্রেসকো এবং জাপানের ঐতিহ্যবাহী কাঠ খোদাই ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে।

জয়নুল আবেদিনের বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মডার্ন আর্টের প্রবণতা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা; বিশেষ করে তিনি ফাইন আর্ট ও গ্রাফিক আর্ট সম্পর্কে জানতে চান। পাশ্চাত্য শিল্পের আধুনিক বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কার্যকরভাবে সেই জ্ঞানের সঞ্চার ঘটাবেন—এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।[২২৬] এই দীর্ঘ বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিজীবনকে আরো সমৃদ্ধ করেছিল বটে, তবে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর যে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ছিল সেখান থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। **১৯৫১–৫২** সালের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পধারার সমন্বয়ে ব্যাপকভাবে শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বভ্রমণের পর তাঁর মধ্যে নতুন আঙ্গিকে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লক্ষ করা যায় না বরং **১৯৫১–৫৩** সালের মধ্যে যে নিজস্ব আধুনিক শিল্পধারা তৈরি করেছিলেন সেখান থেকে সরে গিয়ে বাস্তবভিত্তিক করে কিছুটা ইম্প্রেশনিস্ট ধারার চিত্রচর্চায় ফিরে যান। জয়নুল আবেদিন ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পধারার সরাসরি অনুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস

[২২৪] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্র বেতন ফরম, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ
[২২৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯–১০৮
[২২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

করতেন, 'জীবনবোধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই প্রকৃত আর্ট নির্মিত হয়।' যে রীতিতেই শিল্পকলা নির্মিত হোক না কেন তার সাযুজ্য থাকতেই হবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ সমাজ, পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের সঙ্গে।[২২৭]

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব জয়নুলের তরুণ সহকর্মী মোহাম্মদ কিবরিয়া, ছাত্র আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, আবদুল বাসেতসহ তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ব্যতিক্রম শিল্পভাবনার সৃষ্টি হয়। তাঁরা সমকালীন বিশ্বজনীন আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে সচেষ্ট হন। তাঁদের চিত্রে দেশীয় বিষয়বস্তু থাকলেও ঐতিহ্যের বিষয়টি মুখ্য রইল না। তবে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জয়নুল আবেদিন অবজ্ঞা করেননি। বরং স্বীকৃতি দিয়েছেন বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে।

জয়নুল আবেদিন বিশ্বভ্রমণ থেকে ফিরে নতুন ভবনে নব উদ্যমে ইনস্টিটিউট পরিচালনা শুরু করেন। তিনি ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। ইনস্টিটিউটে ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথকভাবে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রোধ করে ছাত্রীদের অভিভাবকদের সম্মতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে ক্লাস করানোর ব্যবস্থা করেন। নতুন ভবনে আসার পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কারণে ১৯৫৮ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের মেধাবী ছাত্র আবদুর রাজ্জাক ও রশিদ চৌধুরীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই বছর উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষক মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপানে যান। এই বছরে আর্ট ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ করার প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক বেশি ঝামেলা পোহাতে হয় জয়নুল আবেদিনকে। শুধু আর্ট ইনস্টিটিউটের কাজ নয় জাতীর স্বার্থে শহীদ মিনার নির্মাণকাজেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে শিশুদের চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আর্ট ইনস্টিটিউট চত্বরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

শিশু শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা : জয়নুল আবেদিন এ দেশের সকল স্তরের শিল্পশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যেমন এ দেশের তরুণদের মাঝে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তেমনি আর্ট ইনস্টিটিউট চত্বরে একটি শিশু শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের শিল্পশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। 'তিনি মনে করতেন শিশুদের ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সূচনা হোক। তাহলে তাদের মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি যে

---

[২২৭] নজরুল ইসলাম, "জয়নুল আবেদিনের শিল্পভাষা : একটি সাক্ষাৎকার", *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১১৪

ভালোবাসা জন্মাবে তার প্রভাব পড়বে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।'[২২৮] এমন ধারণা থেকেই শাহবাগের ইনস্টিটিউট ভবনের প্রাঙ্গণেই শিশুদের জন্য একটি শিল্প শিক্ষালয় গড়ে তোলেন। শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের মূল ভবন তৈরির সময় বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী রাখার জন্য ঠিকাদার একটি টিনশেড নির্মাণ করে। কাজ শেষে জয়নুল আবেদিন সেটি অক্ষত রেখে সেখানে শিশু শিক্ষালয় চালু করেন ১৯৫৮ সালে। প্রথমে শিশু কল্যাণ পরিষদের সহায়তায় এটি গড়ে তোলা হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮–১৯৬৮)। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'শামসুন্নাহার শিশুকলা কেন্দ্র'। জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'জয়নুল শিশুকলা নিকেতন'। চারুকলা অনুষদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালয়টি পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি এখনো শিশুদের শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[২২৯]

আবদুর রাজ্জাক ও রশিদ চৌধুরীর শিক্ষক হিসেবে যোগদান : আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের মেধাবী ছাত্র আবদুর রাজ্জাক (১৯৩২–২০০৫) ও রশিদ চৌধুরী (১৯৩২–৮৬) ১৯৫৮ সালের ৬ জানুয়ারি শিক্ষক পদে ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।[২৩০] ১৯৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর অনুমোদিত তিনটি শিক্ষক পদের মধ্যে দুটি পদে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়। রাজ্জাক ১৯৫৪ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৫৭ সালে ছাপচিত্র বিষয়ে মাস্টার্স অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশি শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।[২৩১] এ সময় তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন খ্যাতিমান প্রিন্ট মেকার মরিসিও লানাসস্কি ও হুমবার্ট। তিনি সেখানে ভাস্কর্য ও টেম্পারা মাধ্যমের টেকনিক সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করেন। মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের পর তিনি ১৯৫৭ সালের মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির আর্ট ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর লংম্যানের অধীনে গবেষণা সহকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[২৩২] এ ছাড়া ১৯৫৭ সালে তিনি নিউ ইয়র্কে প্রফেসর জেমস লিচ পরিচালিত ড্রইং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি যখন আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন তখন ইউরোপ-আমেরিকায় অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের চিত্ররীতির প্রাধান্য ছিল।

---

[২২৮] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[২২৯] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯–১১০; অধ্যাপক আবুল বারক আলভীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ০৮.০৩.২০১৭

[২৩০] শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনপত্র, তারিখ : ১৬ এপ্রিল ১৯৮৫, উৎস : তাঁর ব্যক্তিগত নথি, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৩১] ১৯৫৭ সালে ইস্যুকৃত আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আবদুর রাজ্জাককে প্রদত্ত মাস্টার্স অব ফাইন আর্টস ডিগ্রির সনদপত্রের কপি, আবদুর রাজ্জাকের ব্যক্তিগত নথি, প্রাপ্তিস্থান ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[২৩২] আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির আর্ট ডিপার্টমেন্টের গবেষণা সহকারী হিসেবে আবদুর রাজ্জাকের যোগদান পত্র, তারিখ : ৫ মার্চ ১৯৫৭, প্রাগুক্ত

কিন্তু সেদিকে না গিয়ে ফিগার বা প্রকৃতিনির্ভর আধা বিমূর্ত চিত্রশৈলীর প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁর কাজে লিচির ড্রইংয়ের বিশেষ প্রভাব ছিল।[২৩৩]

রশিদ চৌধুরী ১৯৫৪ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকতার আশুতোষ মিউজিয়ামে দেশীয় শিল্প সমঝদারির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করেন। ১৯৫৬–৫৭ সময়কালে তিনি স্পেন সরকারের বৃত্তি নিয়ে মাদ্রিদের 'সেন্ট্রাল এস্কুলা দেস বেলিয়াস আর্টেস দ্য সান ফার্নান্দো' থেকে ভাস্কর্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।[২৩৪] ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁর মনোজগতে মার্ক শাগলের (১৮৮৭–১৯৮৫) চিত্রকর্মের প্রভাব পড়ে।

একাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থী : ১৯৫৮–৫৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ ব্যাচে আর্ট ইনস্টিটিউটে যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তি হন তাঁদের মধ্যে এ কে এম নাসির উদ্দিন, গোলাম সারোয়ার, মোঃ মোহসিন, রফিক হাসান, আবদুল মতিন, মোঃ রেজাউল করিম, এ ওয়াহিদ ভূঁইয়া, আবু তাহের, এম এ কাইয়ুম, কালাম মাহমুদ, এ কে এম নজরুল ইসলাম, মোঃ আবদুল হালিম, সালাউদ্দিন আহমেদ, মোঃ মনসুর আহমেদ, বসন্ত কুমার সাহা প্রমুখের নাম জানা যায়।

চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৮ সালে শিক্ষার্থীদের পশু-পাখি অনুশীলনের সুবিধার্থে একটি ছোট চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটের একতলা ভবনের (বর্তমান প্রিন্টমেকিং বিভাগের) উত্তর পাশে বাউন্ডারি ওয়াল সংলগ্ন একটি বৃহৎ বটগাছ ছিল। সেই বটগাছটিকে কেন্দ্র করে তারের নেট দিয়ে ঘিরে কয়েকটি হরিণ, একটি হাড়গিলা পাখি, কবুতর ইত্যাদি দিয়ে চিড়িয়াখানাটি গড়ে তোলা হয়।[২৩৫] শিল্পশিক্ষার জন্য চিড়িয়াখানাটি ছিল অপরিহার্য। কারণ আর্ট ইনস্টিটিউটে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হতো সরাসরি জীবজন্তু ও দৃশ্যমান বস্তু থেকে অনুকরণের মাধ্যমে। মানুষ, জড় বস্তু, গাছপালা প্রাকৃতিক দৃশ্যের পাশাপাশি পশু-পাখির অনুশীলন ছিল আবশ্যিক বিষয়। কয়েক প্রজাতির গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে এই অনুশীলন সীমাবদ্ধ না রেখে বিচিত্র পশু-পাখির অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন জয়নুল আবেদিন।

কলেজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ করার বিষয়ে পূর্বে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জয়নুল আবেদিনের বিদেশ ভ্রমণের কারণে তা প্রায়

---

[২৩৩] নজরুল ইসলাম : *আবদুর রাজ্জাক*, ঢাকা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ২১

[২৩৪] আবুল মনসুর, *রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ১০৩

[২৩৫] "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব ১৯৭৩, ঢাকা, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৪

দেড় বছর বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয় ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। এ বছর ২৭ ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষা বিভাগের উপসচিব কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর লেখা একটি পত্রের মাধ্যমে আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ করার বিষয়ে পুনরায় প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পত্রে উপসচিব গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস খোলা অথবা ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের অধীনে নেওয়ার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে সে বিষয়ে দ্রুত সরকারকে জানাতে বলেন। এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের ১২ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট ইনস্টিটিউটকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, ডিপিআইয়ের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। ১৯৫৮ সালের ৩০ এপ্রিল এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে।[২৩৬] সভায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের জন্য প্রস্তাবনা পত্রের খসড়া তৈরির জন্য এবং প্রস্তাবনা পত্রের খসড়া কপি সকল সদস্যের কাছে পাঠানোর জন্য সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের সাফল্য : ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ঢাকা, লাহোর ও করাচি থেকে নির্বাচিত আশি জন শিল্পীর ২৫০টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। ঢাকা থেকে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, কাজী আবদুল বাসেত, নিত্য গোপাল কুন্ডু প্রমুখ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। ঢাকার শিল্পীদের চিত্রকর্ম পাকিস্তানের শিল্পবোদ্ধা ও শিল্প সমালোচকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ কিবরিয়া তাঁর 'তিন আত্মা' (Three Souls) শীর্ষক চিত্রের জন্য। আর্ট ইনস্টিটিউটের আর এক তরুণ শিক্ষক কাজী আবদুল বাসেত লাভ করেন দ্বিতীয় পুরস্কার। তাঁর চিত্রের শিরোনাম ছিল 'মা ও শিশু' (তেলরং)। কিবরিয়ার 'তিন আত্মা' চিত্রটি জ্যামিতিক ফর্মে

[২৩৬] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটির ৩০ এপ্রিল ১৯৫৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, কার্যবিবরণীর সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১২.৩.১৯৫৮ তারিখের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল।

কিউবিক ঢঙে তেলরঙে আঁকা। চিত্রের মূল বিষয়বস্তু হলো প্রতীকীভাবে আঁকা তিনটি মানুষের অবয়ব, যা আঁকা হয়েছে ত্রিভুজ ও বৃত্তের সমন্বয়ে। চিত্রপটে পুরু করে রং প্রয়োগ করে স্ক্রেচার দ্বারা আঁচড় কেটে বুনট সৃষ্টি করা হয়েছে।

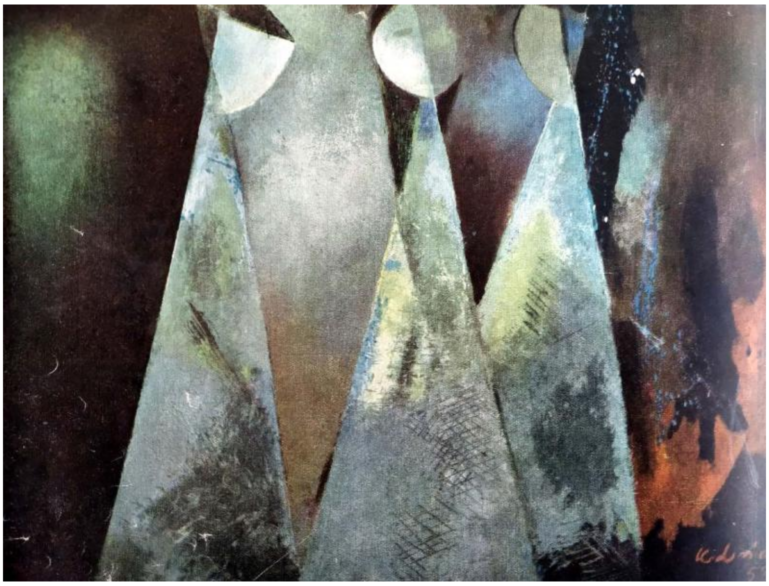

চিত্র-২৮ : 'তিন আত্মা', শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া
উৎস : পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ১৯৫৯

চিত্র-২৯ : 'মা ও শিশু'
শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত

বাসেতের 'মা ও শিশু' চিত্রের বিষয়বস্তু হলো দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একজন মা ও একটি কন্যাশিশু। কিউবিজমের জ্যামিতিক বিন্যাসে চিত্রটি আঁকা। মা ও শিশুর মুখমণ্ডলের আদল ও রেখায় বাংলার টেপা পুতুলের সাদৃশ্য রয়েছে, যা জয়নুল আবেদিন ১৯৫১–৫৩ পর্বে আঁকা নিরীক্ষাধর্মী চিত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তবে বর্ণ প্রয়োগ ও ফর্মের বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা লক্ষ করা যায়।

এই প্রদর্শনী নিয়ে পাকিস্তান কোয়ার্টারলিতে একটি সচিত্র প্রতিবেদন লেখেন এস আমজাদ আলী। তিনি ঢাকার শিল্পীদের সম্পর্কে লেখেন :

> Similarly the work of the Dacca artists is not all impressionistic landscape. Even in these landscapes some artists (as kundu) are seeking abstract shapes or rhythmic patterns; while their most promising young artists—kibria, Basit, Aminul Islam and others - are going openly abstract. Rashid Chowdhury is experimenting in the surrealistic manner of Chagall, Murtaza Bashir is employing the style of the Italian Primitives to express the modern sense of form and space, and so on.[237]

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দেশে অবস্থানরত তরুণ শিল্পীরা (তাঁদের মধ্যে মুর্তজা বশীর বাদে সকলেই ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক) আধুনিক পাশ্চাত্য

২৩৭ Ali S. Amjad, "National Art Exhibition", *Pakistan Quarterly*, Karachi, Spring 1959, p. 28–33

শিল্পধারার আলোকে যে শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন তা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। পাকিস্তানে প্রথম জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভের পর দ্বিতীয় জাতীয় প্রদর্শনীতে কিবরিয়ার প্রথম পুরস্কার লাভ তাঁকে পাকিস্তানের অন্যতম আধুনিক শিল্পী হিসেবে পরিচিত করে তোলে। এই প্রদর্শনীতে বাসেতের পুরস্কারপ্রাপ্তিও ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পুরো পাকিস্তানের শিল্পীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দুজন তরুণ শিল্পীর আধুনিক চিত্রকর্মের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি এ দেশের আধুনিক শিল্পচর্চাকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জয়নুল আবেদিনের প্রাইড অব পারফরম্যান্স ও হিলাল-ই-ইমতিয়াজ খেতাব অর্জন : ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তান সরকার শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ক্রীড়া, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য হেলাল-ই-ইমতিয়াজ, প্রাইড অব পারফরম্যান্স, তমাঘ-ই-ইমতিয়াজসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির খেতাব ও পুরস্কার প্রবর্তন করে। ১৯৫৯ সালে সৃজনশীল কাজে অসামান্য অবদানের জন্য জয়নুল আবেদিন পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক পুরস্কার প্রাইড অব পারফরম্যান্স লাভ করেন। এ বছর মার্চ মাসে তিনি শিল্পকলা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' শীর্ষক বেসামরিক উপাধিতে ভূষিত হন।[২৩৮] সমগ্র পাকিস্তানের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিল্পকলা ক্ষেত্রে এই সম্মান লাভের গৌরব অর্জন করেন।

মোহাম্মদ কিবরিয়ার জাপান গমন এবং কাইয়ুম চৌধুরীর শিক্ষক হিসেবে ইনস্টিটিউটে যোগদান : ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম পর্যায়ে মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান সরকারের তিন বছরের বৃত্তি নিয়ে (এক বছরের এক্সটেনসহ) উচ্চশিক্ষার্থে টোকিও যান। তিনি টোকিও আর্ট ইউনিভার্সিটির ফাইন আর্ট ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক হিসেবে কাইয়ুম চৌধুরী আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন ১৯৫৯ সালের ১ এপ্রিল।[২৩৯] তিনি ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ১৯৫৪ সালে উত্তীর্ণ হন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন কমার্শিয়াল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাস করার পর তিনি বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে মনোনিবেশ করেন এবং একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কমার্শিয়াল কাজ করতেন। কমার্শিয়াল আর্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁকে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। এ সময় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে শিক্ষক ছিলেন

---

[২৩৮] নজরুল ইসলাম, *জয়নুল আবেদিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২৩৯] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৯ সালের হাজিরা খাতা। মার্চ মাস পর্যন্ত মোহাম্মদ কিবরিয়ার হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর আছে। এপ্রিল মাসে হাজিরা খাতায় তাঁর নাম তোলা হয়। কিন্তু তাঁর নামের নিচে কিউ চৌধুরী লেখা আছে নীল কালি দিয়ে। সেখানে এপ্রিলের ১ তারিখ থেকে তাঁর নিয়মিত স্বাক্ষর আছে। হাজিরা খাতার তথ্য থেকে মোহাম্মদ কিবরিয়ায় জাপান গমনের সময় এবং কাইয়ুম চৌধুরীর নিয়োগের সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত দুজন, কামরুল হাসান ও খাজা শফিক আহমেদ। কাইয়ুম চৌধুরী ছাত্র অবস্থা থেকে কামরুল হাসানের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইনস্টিটিউটের দ্বাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থী : ১৯৬১ সালে বেতন রজিস্ট্রার থেকে দ্বাদশ ব্যাচের (১৯৫৯–৬০) আটাশজন শিক্ষার্থীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে পঁচিশ জনের নাম পাওয়া যায় এবং তিনজন (রোল নম্বর ৫, ৭ ও ২১) ছাত্রের ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকলেও সেখানে নাম উল্লেখ নেই। তাঁরা হলেন রফিকুন নবী, আনোয়ার হোসেন, বীরেন্দ্রকিশোর সান্যাল, রঞ্জিত নিয়োগী, কাজী গোলাম মোস্তফা, কেরামত মাওলা, মোঃ জমির উদ্দিন, প্রফুল্ল রায়, দেবদাস রায়, হরিদাস বর্মণ, এ কে এম শামসুল ইসলাম, আহমেদ ফজলুল করিম, হাসান আহমেদ, গোপাল চন্দ্র মন্ডল, রফিক চৌধুরী, বলরাম সাহা, এ কে এম নূরুল ইসলাম, কাজী আনোয়ার হোসেন, আলী আকবর, মোঃ আব্দুল মান্নান খান, মিস ফারাদি চৌধুরী, মিস সুফিয়া খাতুন, গৌরঙ্গ চন্দ্র সরকার, মাযহারুল ইসলাম এবং এস এ ওয়ালিদ কামাল।[২৪০]

সফিউদ্দীন আহমেদের ইউরোপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা : ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের শেষ পর্যায়ে সফিউদ্দীন আহমেদ উচ্চশিক্ষা শেষে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরেন।[২৪১] তিনি নিজ খরচে সবেতনে ছুটি নিয়ে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে গিয়ে সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে এচিং ও কপার এনগ্রেভিং (তাম্রতক্ষণ) বিষয়ে দুই বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনিই একমাত্র এচিং ও এনগ্রেভিং উভয় বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ডিপ্লোমা লাভের পরেও এক বছর সেখানে অবস্থান করে ওই স্কুল থেকে এচিংয়ের সর্বাধুনিক টেকনিকগুলো রপ্ত করেন। এ ছাড়া তিনি সেখানে তেলরং, ম্যুরাল পেইন্টিং ও ভাস্কর্য মাধ্যমেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম জোনাটন এবং ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান ছিলেন মেলুয়িন ইভনিস।

লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি একটি একক চিত্র প্রদর্শনী করেন এবং ইউরোপে অনুষ্ঠিত কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ২০ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত লন্ডনের নিউ ভিশন সেন্টার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী। এ ছাড়া ১৯৫৮ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রিয়েনিয়াল অব অরিজিনাল লাকার্ড গ্রাফিকে, একই বছর লন্ডনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের পাঁচ শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনীতে, ১৯৫১ সালে লন্ডনে এচারস অ্যান্ড এনগ্রেভারস আয়োজিত ৭৭তম বার্ষিক

[২৪০] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকার ১৯৬১ সালের ছাত্র বেতন সংক্রান্ত রেগুলেশন ফরম। উৎস : ডিন অফিস চারুকলা অনুষদ

[২৪১] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ : ১০.৯.২০১৭

প্রদর্শনীতে এবং রয়াল একাডেমি অব আর্টের ১৯১তম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। লন্ডনে শিক্ষা শেষে তিনি ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত মিউজিয়াম ও শিল্পকর্ম পরিদর্শন করেন।[২৪২] কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে পাস করার পর ১৯৫৬ সালে লন্ডনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সফিউদ্দীনের কাজ ছিল মূলত বাস্তবভিত্তিক। প্রথম দিকে সূক্ষ্ম টোনে ডিটেল করে করা উড এনগ্রেভিং আর পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ধারার তেলরঙে ল্যান্ডস্কেপ করে তিনি যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন। এ ছাড়া পঞ্চাশের দশকের প্রথমে দ্বিমাত্রিক বর্ণ প্রয়োগে এবং আলংকারিকভাবে কিছু ড্রইং ও তেলরং চিত্র করেছিলেন। কিন্তু লন্ডনে যাওয়ার পর তাঁর কাজের টেকনিক ও ফর্মে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬–৫৯ কাল পর্বে লন্ডনে গিয়ে করা এচিং ও এনগ্রেভিং চিত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমত, সাদাকালোর পরিবর্তে তাঁর ছাপচিত্র হয়ে ওঠে রঙিন। দ্বিতীয়ত, দৃশ্যবস্তুকে হুবহু চিত্রায়িত করার পরিবর্তে তাঁর চিত্রতলে ঘটে অবয়বের ব্যাপক ভাঙচুর এবং চিত্রতল ভরে ওঠে রূপকল্পের সূক্ষ্ম প্রতীকধর্মিতায়।[২৪৩] লন্ডনে গিয়ে প্রথম পর্যায়ে এচিং অ্যাকুয়াটিন্টে করা 'জড়জীবন' (১৯৫৭) চিত্রের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই চিত্রে বিষয়ের বাস্তব রূপকে ভেঙে ফ্লাট সারফেসের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে আঁকা হয়েছে। চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতও উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে অ্যাকুয়াটিন্টে করা 'বন্যা', 'বন্যা নেমে যাওয়ার পর', 'সেতু পারাপার' ইত্যাদি চিত্রে গাছ, নৌকা ও পারিপার্শ্বিক বিষয় আঁকা হয়েছে ফর্ম ভেঙে মূর্ত বা আধাবিমূর্তভাবে। গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতার গ্রুপ এবং জল আঁকা হয়েছে প্রতীকী ও আলংকারিকভাবে। লন্ডনে অবস্থানকালে এই চিত্রগুলো আঁকা হলেও এখানে তাঁর দেশ ও দেশের দুর্যোগকেই তিনি তুলে ধরেছেন। সফিউদ্দীন শিক্ষা গ্রহণের জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন পরিণত বয়সে। এ জন্য ইউরোপীয় বিচিত্র চিত্রধারার প্রভাবে তিনি দিক্‌ভ্রষ্ট হননি। তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সাম্প্রতিক উন্নত করণ-কৌশলের মাধ্যমে দেশীয় বিষয়বস্তুকে আধুনিকভাবে শিল্পে তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন—

> বিলেতে গেলাম গ্রাফিক্স-এ উচ্চতর শিক্ষা নেওয়ার জন্য। আমার যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমি নিজে কী ছবি আঁকছি, কী করছি তা' তুলনামূলকভাবে জানার সুযোগ গ্রহণের জন্য। আমি গেছি টেকনিক এবং লেটেস্ট টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। ওদের বিষয়বস্তু তো আমার দরকার ছিলো না। ওদের শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রয়োগ-নিপুণতা ও করণ-কৌশল নিয়ে আমাদের দেশের বিষয়বস্তুতে তা' প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলাম। লন্ডনে আমি একক প্রদর্শনী করি এ দেশের ঝড় ও বন্যার বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি দিয়েই। এখনও আমি

---

[২৪২] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, ঢাকা বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৩, পৃ. ১১২–১৩

[২৪৩] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

> সেইভাবেই কাজ করি। বিদেশে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলাটা ঠিক নয়। ... আমি সেই কাজ করতে চাই যাতে আমি থাকবো—যাতে আমার দেশ থাকবে।[২৪৪]

তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিনের চিন্তার সঙ্গে সফিউদ্দীনও একমত পোষণ করতেন। জয়নুল আবেদিনও মনে করতেন, যেকোনো রীতিতেই শিল্পকর্ম তৈরি হতে পারে তবে তার সাযুজ্য থাকতে হবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ সমাজ, পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের সঙ্গে।

আর্ট ইনস্টিটিউট ছেড়ে কামরুল হাসান ও কাইয়ুম চৌধুরীর ডিজাইন সেন্টারে চলে যাওয়া এবং মুস্তাফা মনোয়ার ও সমরজিৎ রায় চৌধুরীর শিক্ষক পদে যোগদান : ১৯৬০ সালের প্রথম পর্যায়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার ডিজাইন সেন্টার। কামরুল হাসান আর্ট ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইন পদের চাকরি ছেড়ে ওই বছরের ১৬ মার্চ ডিজাইন সেন্টারে চিফ ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন।[২৪৫] ডিজাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ডিজাইন সেন্টার পরিচালিত হবে। কিন্তু কামরুল হাসানের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটি আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত না রেখে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। তিনি যোগদানের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডিজাইন সেন্টারে এসে যোগ দেন কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি সম্ভবত মার্চ মাসের শেষ পর্যায়ে এখানে যোগ দেন।[২৪৬] কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে মূলত তিনজন শিক্ষক ছিলেন—হেড ডিজাইনার কামরুল হাসান, শিক্ষক খাজা শফিক আহমেদ ও কাইয়ুম চৌধুরী। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুজন শিক্ষক ইনস্টিটিউট ছেড়ে চলে যাওয়ায় ব্যাপক শিক্ষক সংকটে পড়ে বিভাগটি। খালি হওয়া হেড ডিজাইনার পদে ওই বিভাগের শিক্ষক খাজা শফিক আহমেদকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৬০ সালের ২৭ জুনে। একই সঙ্গে তিনি কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শফিক আহমেদের পদোন্নতিতে দুটি শিক্ষক পদ খালি হলে একটি পদে জয়নুল আবেদিনের মৌখিক নির্দেশে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষক হিসেবে কাজ করা শুরু করেন মুস্তাফা

---

২৪৪ সফিউদ্দীন আহমেদ, "নিজের কথা", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ*, ঢাকা, মানব প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৫

২৪৫ কামরুল হাসানের আর্ট ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইনার পদ থেকে পদত্যাগপত্র, পত্র নং সি এস১/৫৪, তারিখে : ৬ নভেম্বর ১৯৬০ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৬০ সালের ১৬ মার্চ থেকে তিনি হেড ডিজাইনার পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪৬ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৬০ সালের শিক্ষক কর্মচারীর হাজিরা খাতা। এ বছরের এপ্রিল মাসে কাইয়ুম চৌধুরীর নাম লেখা থাকলেও ১ তারিখ থেকে হাজিরার ঘরগুলো ফাঁকা আছে। মার্চ মাস ছিল রোজা ও ঈদের বন্ধ। বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্বাক্ষর আছে।

মনোয়ার (১৯৩৫)।[২৪৭] ১৯৬১ সালের ২৯ জুলাই ডিপিআই তাঁকে দাপ্তরিকভাবে নিয়োগপত্র দেয়। এই নিয়োগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শিক্ষক পদে আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন ১৯৬১ সালের ২ আগস্ট।[২৪৮] তিনি ১৯৫৮ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। জলরঙে ছবি আঁকায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নাটক ও সংগীতেও তিনি ছিলেন উদ্যোগী ব্যক্তি। স্কুলে অধ্যয়নকালে ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ার কারণে তিনি একবার কারাভোগ করেছিলেন। খালি থাকা অন্য আর একটি শিক্ষক পদে ১৯৬০ সালের ১ নভেম্বর যোগ দেন সদ্য পাস করা সমরজিৎ রায় চৌধুরী (১৯৩৭)।[২৪৯] তিনি ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের অষ্টম ব্যাচের ছাত্র। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ১৯৬০ সালে পাস করেন। ইতিপূর্বে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে যে সকল শিক্ষক কর্মরত ছিলেন তাঁরা সকলে ছিলেন ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাস করা; একমাত্র সমরজিৎ রায়ই প্রথম কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে পাস করে শিক্ষক হিসেবে ওই বিভাগে যোগদান করেন। এ বছর আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক রশিদ চৌধুরী ফরাসি সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে যান। সেখানে গিয়ে তিনি একাডেমি অব জুলিয়ান অ্যান্ড বোজ আর্টসে ভর্তি হন। এ বছর আর্ট টিচিং কোর্স করার জন্য এক বছরের বৃত্তি নিয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির অধীনে ব্রিগটন কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটে ভর্তি হন শফিকুল আমীন।[২৫০]

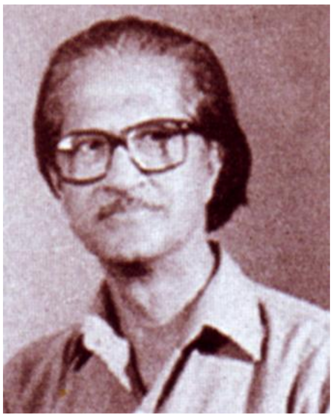

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার

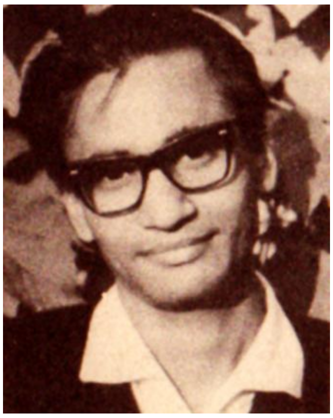

শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী

চিত্র-৩০ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষক

---

[২৪৭] মুস্তাফা মনোয়ারের ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত অফিস নোটের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় ১৯-৯-৬০ তারিখে উল্লেখ করেছেন, তিনি ১৯৬০ সালের ২৭ জুন দুপুরে যোগদান করেছেন। পরবর্তী অংশে জয়নুল আবেদিনের লেখা নোট থেকে খাজা শফিক আহমেদের হেড ডিজাইনার পদের আবেদন গ্রহণের বিষয়টি জানা যায়। ২৭-৬-৬০ তারিখ থেকে কামরুল হাসানের ছেড়ে যাওয়া শূন্য পদে তাঁকে নিয়োগদানের সুপারিশ করা হয়েছে। নথি নং : এ-৩৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ।

[২৪৮] মুস্তাফা মনোয়ারের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে শিক্ষক পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ২-৮-৬১, মুস্তাফা মনোয়ারের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[২৪৯] শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২৫০] শফিকুল আমীন, *নানা রঙের দিনগুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

দ্বাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থী : ১৯৬০–৬১ শিক্ষাবর্ষে আর্ট ইনস্টিটিউটে দ্বাদশ ব্যাচে তেত্রিশ জন শিক্ষার্থীর নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন শামসুদ্দীন ভূইয়া, আলী আক্তার, ওয়াকিল পারভেজ, নূরুল হক, মোজাম্মেল হোসেন, হোসনে জামাল, লুৎফে আলম, মোঃ কাশেম আলী, সুনীল কান্তি রায়চৌধুরী, গিলানী ওসমান, আমিরুল ইসলাম, আমানুল্লাহ সিদ্দিক, বিমান চন্দ্র সাহা, এ এফ এম আলাউদ্দিন, আনোয়ারুল হক, হাফিজ আহমেদ, কাউসার আহমেদ চৌধুরী, রসিকলাল সাহা পোদ্দার, গৌরঙ্গ চৌধুরী নন্দী, অহীন্দ্র কুমার মানিক, সৈয়দ আকবর আলী, শামসুল আলম, স্বাধীন কুমার সাহা, অহীন্দ্র নাথ নন্দী, জগদীশ তালুকদার, আনোয়ার জাহান, সৈয়দ এনামুল হোসেন, মোঃ মহিউদ্দীন ফারুক, রমেণ চন্দ্র সাহা, জিয়াউল হক, মোঃ ফারুক ভূইয়া, অনিল চন্দ্র সাহা, শামিমা মালিক, আলিয়া আলী আকবর প্রমুখ।[২৫১]

ডিপ্লোমা ইন ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স : আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সময় ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু সে সময় কোর্সটি চালু করা হয়নি। ১৯৫৫ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির তৃতীয় সভায় ইনস্টিটিউটে ড্রাফটসম্যান অ্যান্ড ট্রেচার কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ বছর পরে ১৯৬০ সালে (১৯৬০–৬১ শিক্ষাবর্ষে) 'ডিপ্লোমা ইন ড্রাফটসম্যানশিপ'-এর তিন বছর মেয়াদি কোর্স খোলা হয়।[২৫২] এই কোর্সের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান; যিনি ড্রাফটসম্যানশিপে কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছুকাল সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। এই কোর্স খোলার আগে ১৯৫৯ সালের ১৩ আগস্টে একটি লেকচারার ইন ড্রাফটসম্যানশিপ পদ পাস করা হয়।[২৫৩] সেই পদের বিপরীতে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার ড. মোঃ শামসুল আলমকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাসের পর শিক্ষার্থীরা সরাসরি ডিপ্লোমা ইন ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেতেন। ডিপ্লোমা লাভের পর তাঁদের আর্ট ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো বিভাগে (অ্যাডভান্সড পর্বে) ভর্তির সুযোগ ছিল না।

১৯৬১ সালে ১০ জানুয়ারিতে আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ করার যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় সেখানে এই কোর্সের সিলেবাস ও মানবণ্টনের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তীকালে অনুমোদিত হয়েছিল। সুতরাং এই বিবেচনায় বলা যেতে পারে, ১৯৬০ সালে ড্রাফটসম্যানশিপের সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুরূপ একটি

---

[২৫১] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৬১ সালের ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি সংক্রান্ত রেগুলেশন ফরম, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাবি

[২৫২] শিল্পী হাশেম খান ও শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, তাঁরা দুজনই বলেছেন ১৯৬০ সাল থেকে ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়।

[২৫৩] চারুকলা অনুষদের শিল্পকলা ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল আলমের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২.৫.২০১৮, উল্লেখ্য ড. শামসুল আলম ছিলেন ড. রফিকুল আলমের সহোদর।

শিক্ষাক্রম দ্বারা শুরু হয়েছিল। প্রস্তাবিত সিলেবাসে ৭০০ নম্বরে অঙ্কন ও নির্মাণ এবং ১০০ নম্বরের তত্ত্বীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল। বিষয়গুলো হলো :

Prectical:

1. Arehitectural Design	-100
2. Building Drawing with Plan, Elevation & Section	-100
3. Orthographic and Isometric Projection	-100
4. Lettering	-100
5. Blue Printing	-100
6. Simple Mechanical Drawing	-100
7. Scale Drawing	-100

Theoretical:

1. Estimating	-100
Total:	800[২৫৪]

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ছাত্র বেতন বহি থেকে ড্রাফটসম্যানশিপের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের সম্পর্কে জানা যায়। এই কোর্সে প্রথম ব্যাচে ১৯৬০ সালে ভর্তি হয়েছিলেন সতেরোজন ছাত্র। এর মধ্যে নিয়মিত ছিলেন পনেরো জন। তাঁরা হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান রাজা, দেশপ্রিয় বড়ুয়া, মোঃ ইমদাদ হোসেন, মোঃ আব্দুল লতিফ হাওলাদার, মোঃ গোলাম মুর্তজা, মোঃ আলাউদ্দিন, মোঃ হজরত আলী, সিরাজুদ্দিন আহমেদ, পূর্ণেন্দু বিকাশ দাস, মোশাররফ হোসেন, দেওয়ান আব্দুল হালিম, মনসুর আলী হাওলাদার, সৈয়দ আহমেদ, এ কে এম হবিবুর রহমান এবং মোঃ মহিউদ্দিন লস্কর।[২৫৫]

আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে রূপান্তরের সময় ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ তখন প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ঢাকায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ড্রাফটসম্যান বিষয়ে শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্সের জন্য অনুমোদিত লেকচারার পদটি পরবর্তীকালে (১৯৬৩) পরিবর্তন করে লেকচারার ইন ফাইন আর্ট করা হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত করে লোকশিল্প জাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা : জয়নুল আবেদিন আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি লোকশিল্প জাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন সম্ভবত এই বছরে। 'A Preliminary scheme for the Establishment of a folk Art Museum in East Pakistan' শীর্ষক একটি প্রস্তাব তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তার

---

[২৫৪] ১৯৬১ সালের ১০ জানুয়ারিতে প্রণীত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ করার খসড়া পরিকল্পনা, নথি নং-সি-৩৩, প্রাগুক্ত

[২৫৫] ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র বেতন বহি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জন্য পেশ করেন। সাধারণ মানুষের হাতে সৃষ্ট এই শিল্পের বৈচিত্র্য, গুরুত্ব ও নান্দনিক বৈভব্যের কথা তুলে ধরে ওই প্রস্তাবে বলা হয়, নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পের চেয়ে লোকশিল্প কোনো অংশে কম সমৃদ্ধ বা কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। এর মোটিফ ও নকশা এতই সমৃদ্ধ যে তা থেকে আধুনিক শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারেন। লোকশিল্প জাদুঘর গড়ে তোলা একটি জাতির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য কতটা জরুরি জয়নুল এই প্রস্তাবে তা তুলে ধরেন। জাদুঘরের জন্য আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত দ্বিতল ভবন নির্মাণের জন্য চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়। জাদুঘরের জন্য বিশ ধরনের লোকশিল্পসামগ্রী সংগ্রহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, পুতুল সুচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প, টেরাকোটা, অলংকার, বিভিন্ন ধরনের দেশি নৌকার মিনিয়েচার ফর্ম প্রভৃতি। প্রস্তাবিত জাদুঘরের প্রশাসনিক বিষয়ে বলা হয়, এটিকে আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত রাখা হবে। ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে এই জাদুঘরের কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া আর্ট ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র লেকচারার নিদর্শন সংগ্রহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। লোকশিল্পের বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন সেক্রেটারি এবং কয়েকজন সহকারীর মাধ্যমে এর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।[২৫৬] কিন্তু এই প্রকল্প পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়নি।

মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা : আর্ট ইনস্টিটিউটে মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা হয় ১৯৬১ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে। এ দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের আধুনিক মৃৎশিল্পের করণ-কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে মৃৎশিল্পকে সৃজনশীল শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে এবং জাপানি মৃৎশিল্পী কোইচি তাকিতা ও মীর মোস্তফা আলীর শিক্ষকতায় এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্যালারির উত্তর-পূর্ব পাশের বারান্দায় বেড়া দিয়ে তৈরি একটি কক্ষে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভাগটি ইনস্টিটিউটের মূল ভবনের বকুলতলা সংলগ্ন দুটি কক্ষে স্থানান্তরিত হয়। 'এর আগে এই অঞ্চলে প্রথমে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সহযোগিতার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুরে এবং ঢাকার তেজগাঁওয়ে গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলেও নানাবিধ সীমাবদ্ধতায় প্রতিষ্ঠান দুটো কার্যকর সৃজনশীলতা ও মানোত্তীর্ণ শিল্প তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।'[২৫৭]

---

[২৫৬] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, পৃ. ১১৪–১৫

[২৫৭] ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, "মৃৎশিল্প বিকাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন", নিসার হোসেন (সম্পা.), *জয়নুল জন্মশতবর্ষ প্রবন্ধাবলি*, ঢাকা : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৪২

ভারতীয় উপমহাদেশে মৃৎশিল্পের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের প্রথম সরকারি আর্ট স্কুল মাদ্রাজ স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট (১৮৫৫) গড়ে উঠেছিল মৃৎশিল্প ও কারুশিল্পের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে মৃৎ ও কারুশিল্প বিষয়ে গুরুত্বসহকারে শিক্ষা প্রদানের জন্য মাদ্রাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত টি অরুস কুমারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে জয়নুল আবেদিনের ইচ্ছা ছিল এখানে মৃৎশিল্প বিভাগ খোলার। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র মীর মোস্তফা আলীকে মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য লন্ডনে পাঠান। লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৯ সালে। এরপর জয়নুল আবেদিন উদ্যোগ গ্রহণ করেন মৃৎশিল্প বিভাগ খোলার। কিন্তু মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন ছিল, যা তখন শুধু ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা ছিল কঠিন। এমন পরিস্থিতিতে জয়নুল আবেদিনের প্রচেষ্টায় মৃৎশিল্প বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে এশিয়া ফাউন্ডেশন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে প্রস্তাবিত মৃৎশিল্প বিষয়ে দুই বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে এশিয়া ফাউন্ডেশন আর্থিক সহযোগিতা করতে সম্মত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৃৎশিল্প বিষয়ে দুই বছর মেয়াদি একটি বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয় দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে এই বিশেষ কোর্স শুরুর মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা হয়।[২৫৮]

শিল্পী কোইচি তাকিতা

শিল্পী মীর মোস্তফা আলী

চিত্র-৩১ : মৃৎশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক

প্রতিষ্ঠালগ্নে মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষার্থী শিল্পী হাশেম খান ও জাপানি মৃৎশিল্পী কোইচি তাকিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সেই সময় প্রকাশিত কনটেম্পরারি আর্ট অব পাকিস্তান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রতিবেদন

[২৫৮] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০১৬

থেকে জানা যায়, এশিয়া ফাউন্ডেশন এই প্রকল্পে জাপানি মৃৎশিল্পী কোইচি তাকিতাকে (Koichi Takita: 1927–2022) সিনিয়র এক্সপার্ট হিসেবে এবং লন্ডন থেকে মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে সদ্য দেশে ফেরা মীর মোস্তফা আলীকে (১৯৩২–২০১৭) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিয়োগ করা হয়। শিল্পী হাশেম খান ছিলেন মৃৎশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষার্থী। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এশিয়া ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্পের সিনিয়র এক্সপার্ট হিসেবে কোইচি তাকিতাকে এবং মীর মোস্তফা আলীকে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৫৯] কোইচি তাকিতা তাঁর কন্যা সারিনা তাকিতার মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যে উল্লেখ করেছেন, তাঁকে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশন নিযুক্ত করে এবং তিনিই ওই সময়ে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের মৃৎশিল্প বিভাগের ইন-চার্জ ছিলেন।[২৬০] হাশেম খান ও কোইচি তাকিতার এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় করাচি থেকে প্রকাশিত *Contemporary Arts in Pakistan* ম্যাগাজিনে ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় এম এ জায়েদীর লেখা 'Dacca Art Institute' শীর্ষক প্রতিবেদনে। তিনি উল্লেখ করেছেন—The newly-opened Ceramics section is in charge of Japanise expart Mr. Kochi Takita who is assisted by Mir Mustafa Ali, just back from Europe after having obtained a diploma in Pottery.[261]

এ প্রসঙ্গে এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েল (E.M. Howell)-এর কাছে তাকিতার লিখিত একটি পত্রের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯৬১ সালের ২৯ আগস্ট লিখিত এই পত্রে নবপ্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্প বিভাগের অগ্রগতির প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। এই পত্রে তাঁর পদের কোনো উল্লেখ নেই। তবে এ ধরনের প্রতিবেদন সাধারণত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তরাই লিখে থাকেন।[২৬২] এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায়, আর্ট ইনস্টিটিউটে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত প্রকল্পে কোইচি তাকিতা ও মীর মোস্তফা আলীকে নিযুক্ত করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন কোইচি তাকিতা। মীর মোস্তফা আলী এ সময় মৃৎশিল্প বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে মৃৎশিল্প বিভাগে স্থায়ী ভিত্তিতে যোগদান করেন এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

---

[২৫৯] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২৬০] শিল্পী কোইচি তাকিতার কন্যা সারিনা তাকিতার কাছ থেকে ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য (মৃৎশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন তথ্য ও আলোকচিত্র), তারিখ : ৯ ও ১৭ অক্টোবর, ২০১৭

[২৬১] Zahedi M.J, "Dacca Art Institute", *Contemporary Arts in Pakistan*, Karachi Vol.11, No.2, Summer 1961, p. 5–6

[২৬২] পূর্ব পাকিস্তান এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েলের কাছে লেখা কোইচি তাকিতার পত্র, তারিখ : ২৯ আগস্ট ১৯৬১, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পী হাশেম খানের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, মৃৎশিল্প বিভাগের দুই বছর মেয়াদি এই কোর্সে ছয়জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন শিক্ষার্থী ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ছাত্র এবং একজন মৃৎশিল্পে অভিজ্ঞ পাল পরিবারের সন্তান। তাঁরা হলেন ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের ছাত্র আবুল হাশেম খান, গোপেশ মালাকার, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তাফা শওকত কামাল, জোবাইদা ইসলাম এবং পাল পরিবারের মরণ চাঁদ পাল। মরণচাঁদ পাল এ সময় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোর ছিলেন। তাঁর মৃৎশিল্পের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে জয়নুল আবেদিন তাঁকে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।[২৬৩] তবে মৃৎশিল্প বিভাগের সংরক্ষিত তথ্যে জোবাইদা ইসলাম ব্যতীত পাঁচজন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

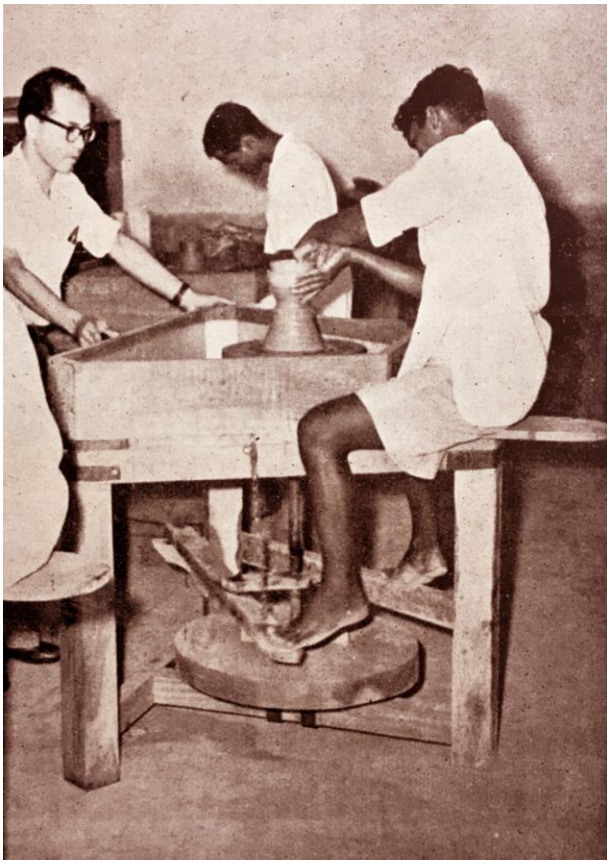

চিত্র-৩২ : নবগঠিত মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম। পায়ে চালিত হুইলে মৃৎপাত্র তৈরি করছেন মরণচাঁদ পাল, তাঁকে সহযোগিতা করছেন কোইচি তাকিতা; পেছনে কাজে মগ্ন গোপেশ মালাকার, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১

সিরামিক বিভাগে প্রথমে যে দুই বছর মেয়াদি কোর্স শুরু হয়েছিল তা ছিল সেই সময়ে প্রচলিত অন্যান্য বিভাগের কোর্স থেকে ব্যতিক্রম। মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে তাঁদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হতো। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে যে কয়জন শিক্ষার্থী এই কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে কোর্স শেষ হয়েছিল। ১৯৬২ সালে এখানে শিক্ষার্থী ভর্তির কোনো

[২৬৩] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

তথ্য পাওয়া যায় না। দুই বছরের এই বিশেষ কোর্স সমাপ্তির পর মৃৎশিল্প বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এখানে তিন বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হয়।

কোইচি তাকিতা কর্তৃক এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েলকে লেখা সিরামিক বিভাগের কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট থেকে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সিরামিক বিভাগের কাঠামোগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। সিরামিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দ্বারা মৃৎশিল্প তৈরির সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করা, অবকাঠামো গড়ে তোলা, মৃৎশিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে গবেষণা করা এবং মৃৎশিল্পের করণ-কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে এ বিষয়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

কোইচি তাকিতা ছিলেন জাপানের উদীয়মান তরুণ মৃৎশিল্পী। তিনি ১৯৪৬ সালে টোকিও আর্ট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জাপানের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী সোজি হামাদার অধীনে মৃৎশিল্প বিষয়ে তিন বছর কাজ করেন। হামাদা জাপানের লোকজ কারুশিল্পের পুনর্জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাকিতা ছিলেন হামাদার যোগ্য উত্তরসূরি। তাকিতা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক টেকনিক, আকার ও অলংকরণের সমন্বয় ঘটিয়ে সৃজনশীল মৃৎপাত্র তৈরির মাধ্যমে তরুণ বয়সেই জাপানে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে জাপান ফোক আর্ট মিউজিয়াম আয়োজিত প্রদর্শনীতে তিনি পুরস্কার লাভ করেন।[২৬৪] এশিয়া ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের সিরামিক বিভাগে যোগদানের উদ্দেশ্যে সপরিবারে ঢাকায় আসেন ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন ১৯৬২ সালের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঢাকায় আসার পূর্বে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল কলেজ অব আর্টসে সিরামিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এক বছর লাহোরে অবস্থান করেছিলেন।[২৬৫]

মীর মোস্তফা আলী ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থেকে ১৯৫৫ সালে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করার পর জয়নুল আবেদিনের আগ্রহে মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য যুক্তরাজ্যে যান। লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে পটারি বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা লাভ করেন ১৯৬০ সালে। তিনি সিটি অব স্পেস অন ট্রেন্ট কলেজ অব আর্টসে সংক্ষিপ্ত

---

[২৬৪] Yellin Robert, "A dream of Living pots", *The Japan Times*, Tokyo, Sept. 11, 2002, পত্রিকার সংশ্লিষ্ট অংশটি কোইচি তাকিতার কন্যা সারিনা তাকিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত

[২৬৫] কোইচি তাকিতার ওই সময়ের পাসপোর্টের কপি, যেখানে তাঁর টোকিও থেকে করাচি, করাচি থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে টোকিও যাওয়ার তথ্য রয়েছে, পাসপোর্টের কপি তাঁর কন্যা সারিনা তাকিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত

প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। এ সময় তিনি লণ্ডন স্কুল অব আর্টসের পটারি স্টুডিও এবং টয়ফোর্ডের সেনেটারিওয়্যার ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন সিরামিক স্টুডিও পরিদর্শন করেন।[২৬৬]

তাকিতা ও মীর মোস্তফার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মৃৎশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরুর এক বছরের মধ্যে সিরামিক স্টুডিও এবং চুল্লি নির্মাণসহ বিভাগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েলের কাছে কোইচি তাকিতার ১৯৬১ সালের ২৯ আগস্ট লেখা এক পত্র থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্প বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। পত্রে তাকিতা উল্লেখ করেন—

> As you know we have taken a lot of troubles for the fulfillment of our mission from the very beginning. But I am proud to mention here that in spite of all the hindrances we met in the past, the first firing will start early next week. [২৬৭]

এই পত্রে তিনি আরো উল্লেখ করেন, তাঁদের সামনে প্রধান বাধা ছিল চুল্লি ও সিরামকি স্টুডিও নির্মাণের জন্য বিভিন্ন উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা। এখানে রেডিমেড ম্যাটেরিয়াল পাওয়া না যাওয়ায় স্থানীয়দের দিয়ে পছন্দের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান ফায়ার ক্লে ও ব্রিকসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগান দিয়েছে, যা দিয়ে স্টুডিও ও চুল্লি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরো লিখছেন, সাম্প্রতিককালে তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া ও সিলেট জেলায় কিছু অঞ্চল থেকে ক্লের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। মৃৎশিল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি এগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন।

কনটেম্পরারি আর্টস ইন পাকিস্তান-এর ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালীন সংখ্যার এম এ জায়েদীর লেখা 'Dacca Art Institute' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে কোইচি তাকিতার মৃৎশিল্প বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়। তিনি ঢাকায় এসে কাজে যোগদানের পর প্রথম দুই-তিন মাস ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোতে ঘুরে সিরামিক পটারি তৈরির উপযোগী ক্লে, গ্লেজসহ বিভিন্ন খনিজ উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে অ্যাশ গ্লেজ, রেড লিড, হোয়াইট লিডসহ বেশ কিছু লোকাল গ্লেজিং উপকরণ সংগ্রহ করেন। তাকিতা স্থানীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের স্টোনওয়্যার তৈরির কৌশল শেখানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি মিরপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্লের সংমিশ্রণে স্টোনওয়্যার তৈরির কৌশল

---

[২৬৬] সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে ১৯৬০ সালের ৩০ জুন ইস্যুকৃত মীর মোস্তফা আলীর 'পটারি' বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভের সনদপত্র এবং সিটি অব স্টোক অন ট্রেন্ট কলেজ অব আর্টসের Memorandum-এর কপি, উৎস : মীর মোস্তফা আলীর ব্যক্তিগত নথি; মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ

[২৬৭] পূর্ব পাকিস্তান এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েলের কাছে লেখা কোইচি তাকিতার পত্র, প্রাগুক্ত

আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউটে পায়ে চালিত হুইল স্থাপন করে সেখান থেকে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ডিজাইন ও আকৃতির পাত্র তৈরির পদ্ধতি ছাত্রদের শেখান।[২৬৮]

তাকিতার ওই সময়ের পাসপোর্ট থেকে জানা যায়, তিনি ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে টোকিওর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। প্রকল্প শেষে তাকিতা জাপানে ফিরে গেলে এই বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় মীর মোস্তফা আলীর ওপর। তাঁকে মৃৎশিল্প বিভাগে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগদানের জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৬৩ সালের ৮ জুলাই শিক্ষা বিভাগ থেকে লেকচারার ইন সিরামিক পদ পাস করিয়ে আনেন। উক্ত পদে মীর মোস্তফা আলী ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই যোগদান করেন[২৬৯] এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। জয়নুল আবেদিনের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা এবং মীর মোস্তফা আলীর নেতৃত্বে বিভাগটি পরিচালিত হয়েছে।

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন : ১৯৫৯ সালের আগস্টে আর্ট ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার যে পরিকল্পনা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সকল সংশোধন দিয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালের ২৭ এপ্রিল সংশোধিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।[২৭০] পরিকল্পনার শিরোনাম ছিল ‘Scheme for opening a Faculty of Arts and Crafts under the University of Dacca’.

আর্ট ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য ১৯৬১ সালের ৫ অক্টোবর মূল্যায়ন কমিটির (আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজে উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১২.৩.৫৮-তে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠন করে তার অধীনে কলেজ হিসেবে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের পর ১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাবনাটি অনুমোদিত হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯৬১ সালের ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস খোলার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবনায় উপস্থাপিত

---

[২৬৮] Zahedi M.J, “Dacca Art Institute”, *Contemporary arts in Pakistan*, Ibid, P. 5-6.

[২৬৯] The list of gazatted officers of the East Pakistan College of Arts & Carfts, Dhaka, No-110, Date 8.3.1964, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৭০] ১৯৬১ সালের ১০ জানুয়ারি প্রণীত ‘Scheme for opening a faculty of Arts and Crafts under the University of Dacca’ শীর্ষক পরিকল্পনা, নথি নং সি-৩৩, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়সমূহ কার্যকর করার জন্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য উপাচার্যকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিন্ডিকেটের এই সভার সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্ট অংশ ২১ নভেম্বরে পত্রাকারে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়।[২৭১]

১৯৬১ সালের বার্ষিক প্রদর্শনী : ১৯৬১ সালের সম্ভবত মার্চ মাসে আর্ট ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় শাহবাগের নিজস্ব ভবনে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা সংবলিত একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়। ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, এলিমেন্টারি পর্বের ছেচল্লিশ জন, ফাইন আর্টের আটাশ জন, কমার্শিয়াল আর্টের বারো জন, ওরিয়েন্টাল আর্টের একজন, ড্রাফটসম্যানশিপের বারো জন শিক্ষার্থী; সাবেক শিক্ষার্থী সতেরো জন, শিক্ষক সাতজনসহ ১২৩ জন অংশগ্রহণকারীর ৭৪২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। তাঁদের মধ্যে আটজন ছাত্রী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ওরিয়েন্টাল বিভাগের একমাত্র ছাত্রী কিশোয়ার মমতাজও ছিলেন। এই প্রদর্শনীতে ব্যতিক্রম ছিল ইনস্টিটিউটে সদ্য চালু হওয়া ডিপ্লোমা ইন ড্রাফটসম্যানশিপের ছাত্রদের তৈরি বসতবাড়ি, লাইব্রেরি, সিনেমা হলসহ বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিংয়ের ডিজাইন ও মডেলের প্রদর্শনী।

এই প্রদর্শনীতে এলিমেন্টারি প্রথম বর্ষের আয়েশা আলী আকবর, আমিরুল ইসলাম, আনোয়ার জাহান, অনীল চন্দ্র সরকার, হোসেন জামাল, লুৎফে আলম, মোজাম্মেল হোসেন, শামীমা মালিক, সৈয়দ এনায়েত হোসেন প্রমুখ এবং দ্বিতীয় বর্ষের রফিকুন নবী, রঞ্জিত নিয়োগী, কেরামত মাওলা, মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রফুল্ল কুমার রায়, কাজী গোলাম মোস্তফা প্রমুখ অংশ নেন। ফাইন আর্ট প্রথম বর্ষের আবু তাহের, গোলাম সারোয়ার, কালাম মাহমুদ, এম এ কাইয়ুম, মোঃ মহসিন প্রমুখ; দ্বিতীয় বর্ষের এ জামান, হাফিজা খাতুন, মোহাম্মদ আলী, সখিনা, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ এবং তৃতীয় বর্ষের আশীষ কুমার সেন গুপ্ত, গোপেশ মালাকার, হাশেম খান, এডলিন মালাকার, প্রাণেশ কুমার মন্ডল, সিরাজুল হক প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের প্রথম বর্ষের এ কে এম নজরুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, সালাউদ্দীন আহমেদ, বসন্ত কুমার সাহা, যতীন্দ্র মোহন পাল প্রমুখ; দ্বিতীয় বর্ষের খগেন্দ্র কুমার সরকার, মোজাম্মেল হোসেন, মহিউদ্দীন আহমেদ, মোতাহারুল হক চৌধুরী এবং তৃতীয় বর্ষের আমানুল্লাহ খান প্রমুখ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

[২৭১] ৪ নভেম্বর ১৯৬১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পত্রাকারে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করেন ২১.১১.১৯৬১ তারিখে, নথি নং সি-৩৩, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ।

সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এহসানুল আলম, দেবদাস চক্রবর্তী, হোসেন জামাল, শামসুল ইসলাম নিজামী, দুররে সিওয়ার খানুম, মহসীনা আলী, নুরুল ইসলাম, কাজী আব্দুর রউফ এবং শাহতাব। শিক্ষকদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন আবদুল বাসেত, আবদুর রাজ্জাক, আমিনুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, কাইয়ুম চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরী।[২৭২]

হোস্টেল নির্মাণসহ আর্ট ইনস্টিটিউটে উন্নয়নকাজ : ১৯৬১ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে ছাত্রাবাস নির্মাণকাজ শুরু হওয়াসহ ইনস্টিটিউট চত্বরে বেশ কিছু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজের পরিকল্পনা করা হয়। ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করছিল ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির একাধিক সভায় হোস্টেল নির্মাণের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে ঢাকা কলেজের কাছে নিউ মার্কেট সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর আর্ট ইনস্টিটিউটের হোস্টেলের নির্মাণকাজ শুরু হয় ওই বছর। ১৯৬১ সালের ১৭ অক্টোবর ডিপিআই এস এ রশিদ কর্তৃক সিঅ্যান্ডবির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে লেখা পত্র থেকে এই ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং ইনস্টিটিউট চত্বরে অতিরিক্ত কিছু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনার তথ্য পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউট চত্বরে আরো কিছু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৩,৬৪,০০০ টাকার প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পত্রে উল্লেখ করা হয়। পত্রে প্রস্তাবিত ভবনসমূহ হলো—

> (a) Building of studios in the existing building to Crafts wing (4,572 Sq.ft), (b) Cottges for handicrafts (3,600 Sq.ft), (c) Zoo and aviary studio (3,000 Sq.ft), (d) Auditorium (4,000 Sq.ft), (e) Building for Ceramics (3,500 Sq.ft)[২৭৩]

এ সময় আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলমান ছিল। কলেজ বাস্তবায়নের সময় সেখানে সকল বিভাগ খোলার বিষয়ে ভাবা হচ্ছিল। সুতরাং বর্ধিত বিভাগগুলোর জন্য নতুন শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে ক্রাফট উইং বর্ধিত করার কথা বলা হয়েছে। মাযহারুল ইসলাম আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের ডিজাইনে ফাইন আর্ট ছাড়া অন্য সব শ্রেণিকক্ষকে ক্রাফটস্ রুম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জয়নুল আবেদিনের ব্যবহারিক, লোকজ ও কারুশিল্পের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটের শুরুতেই তিন বছর মেয়াদি কারুশিল্পের কোর্স অনুমোদিত ছিল। সেটি চালু করতে তিনি বেশ আগ্রহী ছিলেন। লোকজ ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ

---

[২৭২] *ক্যাটালগ*, বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ১৯৬১, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা, প্রাপ্তি : শিল্পী আমিরুল ইসলাম

[২৭৩] ডিপিআই এস এ রশিদ কর্তৃক সিঅ্যান্ডবির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে লেখা পত্র, পত্র নং ১৫২০/৪-পি, তারিখ : ১৭ অক্টোবর ১৯৬৯, নথি নং-সি-৩৩, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কারণে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউট চত্বরে একটি হস্তশিল্পের আলাদা ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। **১৯৬১** সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত *কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান* ম্যাগাজিনে এ জে জাহেদীর লেখা 'Dacca Art Institute' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জয়নুল আবেদিন ইনস্টিটিউটে হস্তশিল্প বিষয়ে কিছু কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করেছিলেন।[২৭৪]

ইনস্টিটিউটের চত্বরের একটি ছোট আকারের চিড়িয়াখানা ও পক্ষীশালা **১৯৫৮** সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। কয়েক প্রজাতির গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে এই অনুশীলন আবদ্ধ না রেখে বিচিত্র পশু-পাখির অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি চিড়িয়াখানা ও পক্ষীশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জয়নুল আবেদিন। চিড়িয়াখানার ভবন নির্মাণের জন্য এ সময় প্রস্তাব করা হয়। শিল্পবিষয়ক সেমিনার, তত্ত্বীয় বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ইনস্টিটিউটে একটি অডিটরিয়াম ছিল অপরিহার্য। এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সিরামিক বিষয়ক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সদ্য সিরামিক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিরামিক বিভাগের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবনের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে সিরামিক বিল্ডিং তৈরির প্রস্তাব করা হয়।

এই প্রস্তাবনায় সকল ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে চিড়িয়াখানা, ক্রাফটস্ উইং, এক্সটেনশন বিল্ডিং (কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্ট বিল্ডিং) এবং সিরামিক বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে হ্যান্ডিক্রাফটস্ কটেজ ও অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়নি।

ষাটের দশকের শুরুতে আর্ট ইনস্টিটিউটের সার্বিক অবস্থা : **১৯৬১** সালে ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক আর্ট ম্যাগাজিন *Contemporary Arts in Pakistan*-এর গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায়। এম জে জাহেদীর লেখা প্রতিবেদনে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস এবং ওই সময়ের ছাত্র-শিক্ষক, অবকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থাসহ সার্বিক বিষয় উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের শুরুতে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটকে পাকিস্তানের সবচেয়ে সুন্দর শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শাহবাগের আইয়ুব এভিনিউতে (ময়মনসিংহ রোড) অবস্থিত আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের পরিকল্পনা **১৯৫২** সালে করা

---

[২৭৪] Zahedi M. J, "Dacca: Art Institute", *Contemporary Art in Pakistan*, Summer 1961: Vol II, No. 2, P. 7 তিনি উল্লেখ করেছেন : 'Principal Zainul Abidin has plaus to open a few course. One of them will teach the students handicrafts such as ornament design, furniture design, wood-carving, modeling, Sculpturing and also photography.'

হয়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১২৫ জন। চৌদ্দটি স্টুডিও কাম ক্লাস রুমে মডেল এবং পুরাতন পেইন্টিংয়ের অনুকরণে নিয়মিত অনুশীলন করানো হয়। ইনস্টিটিউটের চত্বরের বর্ণনায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে বৃক্ষ ও পুষ্পে সুশোভিত ইনস্টিটিউটের বিস্তীর্ণ চত্বর, ভেতরে প্রশস্ত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য শিক্ষার্থীদের আউটডোর ক্লাসের জন্য বিশেষ উপযোগী। প্রতিবেদনে ইনস্টিটিউটের তিনটি গ্যালারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি ছিল ওল্ড মাস্টার শিল্পী, শিক্ষক এবং এখান থেকে উত্তীর্ণ কৃতী শিল্পীদের শিল্পকর্মের স্থায়ী গ্যালারি। দ্বিতীয়টি শিক্ষক ও ছাত্রদের শিল্পকর্মের গ্যালারি এবং তৃতীয় গ্যালারিটি বছরের বিভিন্ন সময়ে ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের অস্থায়ী প্রদর্শনীর জন্য।

প্রতিবেদনে ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসহ) এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া নতুন খোলা সিরামিক সেকশনের বিষয়েও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে যে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। শুধু শিক্ষকদের তালিকায় ড্রাফসম্যানশিপ বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র-৩৩ : সফিউদ্দীন আহমেদের কাছ থেকে ছাপচিত্র বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন জনৈক শিক্ষার্থী, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১

শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্পী জয়নুল আবেদিন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং লেকচারার ও শিক্ষকসহ চৌদ্দজন এখানে নিয়োজিত রয়েছেন, যার অধিকাংশই এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। যাঁরা বিদেশে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা নিয়েছেন এবং শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

> The senior staff consists of Anwarul Huq (Still Life and Anatomy), Safiuddin Ahmed (Graphic Art), Shafiqul Ameen (Oriental Art) and Khwaja Shafiq Ahmed (Commercial Art). The younger teachers include Aminul Islam (Painting), Rashid Chowdhury (Life and Water colour), Mohammad Kibria (Life and Water colour), Kazi Abdul Baset (Life and Water colour) and Abdur Razzaque (Drawing and Painting). Recent Addition to the faculty are Samarjit Roy Choudhury (Commercial), Habibur Rahman (Wood-cut and Engraving), Mustafa Manwar (Water colour and Landscape), Mir Mustafa Ali (Ceramics) and Mr. Syed Ali Ahsan (Draughtsmanship).[২৭৫]

উল্লিখিত শিক্ষক তালিকায় কোন শিক্ষক কী বিষয়ে শেখাতেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পদমর্যাদার ভিত্তিতে শিক্ষক তালিকা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। পদমর্যাদা অনুযায়ী ওই সময়ে শিক্ষক তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

১. জয়নুল আবেদিন	অধ্যক্ষ
২. আনোয়ারুল হক	লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস ও হেড অব দ্য ফাইন আর্ট
৩. সফিউদ্দীন আহমেদ	লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট
৪. শফিকুল আমীন	লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট ও হেড অব দ্য ওরিয়েন্টাল আর্ট
৫. খাজা শফিক আহমেদ	হেড ডিজাইনার ও হেড অব দ্য কমার্শিয়াল আর্ট
৬. আমিনুল ইসলাম	লেকচারার ইন ফাইন আর্ট
৭. সৈয়দ আলী আহসান	শিক্ষক, ড্রাফটসম্যানশিপ
৮. মোহাম্মদ কিবরিয়া	শিক্ষক, এলিমেন্টারি ও ফাইন আর্ট (উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে)
৯. কাজী আবদুল বাসেত	শিক্ষক, এলিমেন্টারি ও ফাইন আর্ট
১০. আবদুর রাজ্জাক	শিক্ষক, এলিমেন্টারি ও ফাইন আর্ট
১১. রশিদ চৌধুরী	শিক্ষক, এলিমেন্টারি ও ফাইন আর্ট (উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ)
১২. সমরজিৎ রায় চৌধুরী	শিক্ষক, কমার্শিয়াল আর্ট
১৩. মুস্তাফা মনোয়ার	শিক্ষক, এলিমেন্টারি ও ফাইন আর্ট
১৪. হবিবুর রহমান জমাদার	শিক্ষক, উডকাট
১৫. কোইচি তাকিতা	প্রধান বিশেষজ্ঞ, সিরামিক
১৬. মীর মোস্তফা আলী	সিনিয়র রিচার্স ফেলো, সিরামিক

[২৭৫] M. J. Zahedi, “Dacca Art Institute”, *Contemporary Art in Pakistan,* Ibid, p. 2–7

এ সময় ১৯৫৭ সালে অনুমোদিত মডেলিং এবং ১৯৫৯ সালে অনুমোদিত লেকচারার ইন ড্রাফটসম্যানশিপ পদ দুটি তখনো খালি ছিল।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অতিদ্রুত ইনস্টিটিউটে চলমান কোর্সকে ডিগ্রি কোর্সের মর্যাদা দেওয়া হবে। মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো আর্ট ইনস্টিটিউটকেও পুনর্বিন্যস্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের অধীনে এটি পরিচালিত হবে।

এখান থেকে পাস করার পর ছাত্ররা কী করবেন এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইনস্টিটিউটের শিক্ষক পদ খালি থাকা সাপেক্ষে কৃতী শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষকতায় প্রবেশ করার সুযোগ পান আর তা না হলে ভাগ্য অন্বেষণে তাঁকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করতে হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র কয়েকটি রয়েছে। কয়েকটি সরকারি বিভাগেও চাকরির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তা স্বল্প বেতন স্কেলের। যাঁরা এসব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না তাঁরা ছোটখাটো কমার্শিয়াল কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান : ১৯৫৩ থেকে ’৬১ সাল পর্যন্ত আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাস করে বের হয়েছেন সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে এখানকার শিক্ষার্থীদের মাঝে অনিশ্চিত কর্মজীবনের হতাশা লেগেই থাকত। আর্ট ইনস্টিটিউটের চাকরির বাইরে সীমিত কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিল্পীদের চাকরির সুযোগ ছিল। ১৯৬১ সালের ৮ জুলাই দৈনিক পত্রিকায় ‘অঙ্কন শিল্পীদের অসচ্ছলতা; পুরাদস্তুর কাজের মওসুমে বেকার জীবন যাপন’ শীর্ষক খবরে শিল্পীদের কর্মসংস্থানের সমস্যা ও আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। ওই সময়ে ‘আইসিএতে তিনজন, মার্কিন প্রচার কেন্দ্রে দুজন, প্রদেশ জনসংযোগ বিভাগে একজন, স্বাস্থ্য বিভাগে দুজন, পল্লী উন্নয়ন বিভাগে তিনজন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ডিজাইন কেন্দ্রে আটজন শিল্পী চাকরিরত ছিলেন। এ ছাড়া কয়েকটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অঙ্কন শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষক পদে কয়েকজন শিল্পী নিয়োজিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রসঙ্গে এই খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষকদের অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা আর্থিক দিক হতে খুবই অসচ্ছল। অন্যান্য বিভাগের অফিসারদের তুলনায় তাঁদের বেতন হতাশাব্যঞ্জক। দেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জনকারী প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল

আবেদিন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে তেরো বছর যাবৎ চাকরি করে বর্তমানে মাত্র ৫০০ টাকা বেতন পান। এ ছাড়া অন্য শিক্ষকদের বেতন মাত্র ১২৫ টাকা থেকে শুরু হয়।[২৭৬]

আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং সাবেক ছাত্ররা যাঁরা সৃজনশীল শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না। শিল্পের বাজার বলতে যা বোঝায় তখনো ঢাকায় তা তৈরি হয়নি। দু-একজন আমলা আর শিল্পপতি যে দু-একটি চিত্রকর্ম সংগ্রহ করতেন তা ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ছিল সামান্য কিছু বিদেশি ক্রেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দু-একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আর্থিক অনিশ্চয়তার কথা বিবেচনা করে এ সময়ের সৃজনশীল শিল্পীদের একক প্রদর্শনী আয়োজনে উৎসাহী হতেন না। তবে এর মধ্যেও কয়েকজন তরুণ শিল্পী আর্থিক লাভালাভের বিষয়টি বিবেচনা না করে নিজেদের শিল্প দক্ষতা দর্শকদের মাঝে তুলে ধরার জন্য একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে যার সূচনা করেন শিল্পী হামিদুর রহমান (১৯৫৬), শিল্পী আমিনুল ইসলাম (১৯৫৬) এবং ভাস্কর নভেরা আহমেদ (১৯৬০); এরপর মুর্তজা বশীর (১৯৫৯ করাচি, ১৯৬০ লাহোর), সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রমুখ শিল্পী একক চিত্র প্রদর্শনী করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পচর্চায় তাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। শিল্পচর্চায় তাঁরা ছিলেন সমকালীন আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার প্রবল অনুরাগী। বিশ্বজনীন শিল্পচর্চাই ছিল তাঁদের একান্ত বাসনা। এই ধারার নবীনতম সদস্য ছিলেন রুমী ইসলাম। ১৯৬০ সালের নভেম্বরে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে একক চিত্র প্রদর্শনী করেন। আর্ট ম্যাগাজিন *কনটেম্পরারি আর্টস ইন পাকিস্তান*-এর প্রতিবেদক এ এল খতিব তাঁর চিত্র প্রদর্শনীকে ঢাকায় প্রথম কোনো নারী চিত্রশিল্পীর প্রদর্শনী হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৭৭] ইতিপূর্বে নভেরা আহমেদ ১৯৬০ সালে পাবলিক লাইব্রেরিতে যে প্রদর্শনী করেছিলেন তা ছিল মূলত ভাস্কর্যের।

শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিল্পচর্চা : আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রমে তত্ত্বীয় পাঠ্য বিষয় ছিল না এবং স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার বিশেষ সুযোগ ছিল না। একটি রীতিবদ্ধ পদ্ধতিতে নির্ধারিত কয়েকটি মাধ্যমে চিত্রচর্চা করতে হতো। কিন্তু এই গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা নিয়েও তখনকার শিক্ষার্থীরা নিজের তাগিদে বিশ্বশিল্পের আধুনিক প্রবণতা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চা করতেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুপ্রেরণা ছিলেন প্রধানত দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক ধারার তরুণ শিক্ষকরা। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, কাজী

[২৭৬] নিজস্ব সংবাদদাতা, "অঙ্কন শিল্পীদের অসচ্ছলতা : পুরাদস্তুর কাজের মওসুমে বেকার জীবন যাপন", *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, তারিখ ৮ জুলাই ১৯৬১

[২৭৭] Khatib A L, "Rumi Islam : a woman painter", *Contemporary Arts in Pakistan,* Karachi, winter 1961: Vol. II. No. 4 1961, p. 07

আবদুল বাসেত, রশিদ চৌধুরী ও আবদুর রাজ্জাক। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কামরুল হাসানও চিত্রের করণ-কৌশল সম্পর্কে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। চিত্রকলায় স্বদেশি ঐতিহ্যের বিষয়ে জয়নুল আবেদিন পক্ষপাতী ছিলেন, তবে আধুনিক শিল্পপ্রবণতার সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সংযোগ ঘটাতে তিনি যেমন ছাত্রদের বিদেশে যেতে সহযোগিতা করতেন, তেমনি সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশি শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে এনে কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থাও করতেন।

ইনস্টিটিউটের ১৯৫৬–৫৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র শিল্পী হাশেম খান এবং ১৯৫৯–৬০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র শিল্পী রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, পাশ্চাত্য আধুনিক ধারায় শিল্পচর্চা করার ক্ষেত্রে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করতেন আমিনুল ইসলাম। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পেইন্টিংয়ের আধুনিক করণ-কৌশলের ওপর বক্তৃতা করতেন বর্তমান তত্ত্বীয় ক্লাসের মতো। ইউরোপ থেকে ফিরে শিক্ষক হওয়ার পর থেকেই তিনি সিনিয়র ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন পাশ্চাত্য শিল্পধারার অনুপ্রেরণায় স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করতে। তিনি ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের যেমন উদ্বুদ্ধ করতেন তেমনি তাঁর পাশ্চাত্য আধুনিক ধারায় আঁকা শিল্পকর্ম দ্বারাও অনুপ্রাণিত করতেন। মোহাম্মদ কিবরিয়ার পেইন্টিং দ্বারা শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হতেন। তাঁর আধুনিক ধারার আঁকা শিল্পকর্মের জন্য ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে দুইবার জাতীয় পুরস্কার এবং ১৯৫৯ সালে জাপানে স্টারলেম পুরস্কারপ্রাপ্তির ফলে তিনি ছাত্রদের কাছে আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে ওঠেন। কাজী আবদুল বাসেতও এ সময় আধুনিক ধারার ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেন।

রশিদ চৌধুরী ও আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকেও শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিল্পচর্চার করণ-কৌশল এবং প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারতেন। তাঁরাও আধুনিক ধারার শিল্পচর্চায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতেন। তবে তাঁরা চিত্রের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ প্রত্যাশা করতেন। কামরুল হাসান নির্ধারিত ক্লাসের পরে ছাত্রদের কালার, ফর্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পাদর্শ সম্পর্কে ধারণা দিতেন। শিক্ষার্থীরাও উদ্যোগী হয়ে এ সকল বিষয়ে জানার জন্য শিক্ষকদের কাছে যেতেন। এ সময়ে ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ক্লাসের পরেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের বাসায় ও স্টুডিওতে যেতেন তাঁদের শিল্পকর্ম দেখে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্পকলা সম্পর্কে নতুন কিছু শেখার উদ্দেশ্যে।[২৭৮]

[২৭৮] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২২.১১.২০১৬ এবং ২০.৯.২০১৭, প্রাগুক্ত; শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২১.১০.২০১৭

পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যায়ে এসে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে আধুনিক শিল্পকলা বিষয়ক বইয়ের সংগ্রহ বেড়েছিল। লাইব্রেরিতে রক্ষিত বই এবং পত্রপত্রিকা থেকেও শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পধারা সম্পর্কে জানার এবং আধুনিক শিল্পীদের কাজের অনুলিপি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এভাবে ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রমের বাইরে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা এবং বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে মাঝে মাঝে শিল্পী আসতেন পাকিস্তানে। তাঁদের অধিকাংশ লাহোর বা করাচি ঘুরে চলে যেতেন। কিন্তু দু-একজনের আগমন ঘটত ঢাকায়। শিল্পী হাশেম খান ও শিল্পী রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৬১ সালে মি. হজল নামে একজন আমেরিকান শিল্পী সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন। তিনি কয়েক মাস (শিল্পী হাশেম খান বলেছেন প্রায় ছয় মাস এবং শিল্পী রফিকুন নবী বলেছেন এক/দেড় মাস) ঢাকায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে মাসব্যাপী একটি ড্রইং কর্মশালা করান। ওই কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। অসাধারণ ড্রইং করতেন তিনি। নতুন নতুন পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের ড্রইং শিখিয়েছিলেন। এই ওয়ার্কশপ সম্পর্কে হাশেম খান বলেন—

> 'তিনি যখন শেষ বর্ষের ছাত্র তখন মি. হজল নামে একজন আমেরিকান শিল্পী ঢাকায় আসেন। তিনি আমাদের এক মাসের একটি ড্রইং ওয়ার্কশপ করান। তিনি প্রথমে মডেল থেকে ডিটেল ড্রইং করাতেন, তারপর কুইক ড্রইং; এরপর মডেলকে কিছুক্ষণ সামনে বসানোর পর তাকে বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে মেমোরি থেকে মডেলকে আঁকতে বলতেন। গতিময় লাইন দিয়ে তিনি ড্রইং করতে উৎসাহিত করতেন। অ্যাডভান্সড পর্বের ছাত্ররাই ওয়ার্কশপে অংশ নিত, তবে নিচের ক্লাসের ছাত্ররাও উপস্থিত থাকত।'[২৭৯]

শিল্পী রফিকুন নবী একই কর্মশালা সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> 'আমি যখন সম্ভবত সেকেন্ড ইয়ারে তখন মি. হজল নামে একজন আমেরিকান শিল্পী আর্ট ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। তিনি প্রায় এক মাসের একটি ড্রইং ওয়ার্কশপ করান। মডেল থেকে ড্রইং করাতেন। তারপর কীভাবে সেটা স্টাইলাইজড করা যায় সে বিষয়টি দেখাতেন। রিয়েলিস্টিক ড্রইং থেকে কীভাবে কার্টুন করতে হয় সেটাও দেখাতেন। পেনের সিঙ্গেল লাইনে চমৎকার সব ড্রইং করতেন। সাইকেলেরও অনেক ড্রইং করেছিলেন। বৃত্ত থেকে চাকা তার পরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাইকেল আঁকতেন। আমরা ড্রইং সম্পর্কে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।'[২৮০]

---

[২৭৯] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত
[২৮০] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

হজল ঢাকার জনজীবনের ওপর একটি ড্রইং প্রদর্শনী করেন ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। শিল্পী রফিকুন নবী আরো বলেন, তিনি যখন ফাইনাল ইয়ারে তখন মি. বয়ার নামে (সম্ভবত) আর একজন আমেরিকান শিল্পী ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন এবং পেইন্টিং ওয়ার্কশপ করিয়েছিলেন। তিনি মূলত দেখিয়েছিলেন কীভাবে রিয়েলিস্টিক বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়। এভাবে আধুনিকমনস্ক তরুণ শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা, লাইব্রেরির বইপত্র এবং বিদেশি শিল্পীদের কর্মশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আধুনিক পাশ্চাত্য ধারায় নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চা করেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে।

আর্ট কলেজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে অধ্যক্ষের সুপারিশমালা : ১৯৬১ সালে ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের সিদ্ধান্ত এবং এই ফ্যাকাল্টির অধীনে আর্ট ইনস্টিটিউটকে একটি ডিগ্রি কলেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপাচার্যকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কলেজ বাস্তবায়নের জন্য কী করণীয় এবং নীতিমালা কী হবে সে বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পক্ষে রেজিস্ট্রার শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে একাধিক পত্র প্রেরণ করেন। এ সকল পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর ১৯৬২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব পত্র পেশ করেন।

এই প্রস্তাবনায় শুরুতে উল্লেখ করা হয়, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে সময় উপযোগী শিল্পশিক্ষার জন্য সিলেবাস ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টির অধীনে নেওয়া প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির সময় এর পরিবর্তিত নাম হবে 'কলেজ অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্'। প্রস্তাবে চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়—

১. একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিলেবাস অনুমোদন করা।

২. লাহোর ন্যাশনাল কলেজ অব আর্টসের ন্যায় শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা।

৩. ডিগ্রি কোর্স চালু করার জন্য কলেজকে পর্যাপ্তরূপে প্রস্তুত করা।

৪. লাইব্রেরির পুনরায় উন্নতি করা।

এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে সিলেবাসের কপি কলা অনুষদের ডিনের কাছে পাঠানো হয়েছে।[২৮১]

[২৮১] গভঃ ইনস্টিটিউট অব আর্টস কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শিল্প বিভাগের (বিভাগ-৪) সেকশন অফিসারকে লেখা পত্র এবং পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ২ পৃষ্ঠার প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ, অফিস আদেশ নং ২/৮ (২) সি-৩৩, তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৯৬২ সালের ২৫ এপ্রিল আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা তৎকালীন পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) বৈশাখের আহ্বানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তরুণ শিক্ষক মুস্তাফা মনোয়ারের নির্দেশনায়। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় 'বসন্ত বিদায় ও বৈশাখের আহ্বান' শীর্ষক গীতি-বিচিত্রা এবং মঞ্চস্থ করা হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটক। আর্ট ইনস্টিটিউটের বাইরে বৃহৎ পরিসরে এখানকার শিক্ষার্থীদের করা এটিই ছিল ওই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুস্তাফা মনোয়ার জানিয়েছেন—

> এখানে এসে দেখি শুধু ছবি আঁকা হচ্ছে, অন্য কোন একটিভিটিজ নেই। শিল্পকলা মানে তো শুধু পেইন্টিং করা নয়। কতভাবেই তো শিক্ষার্থীরা তাদের নান্দনিক বোধের প্রকাশ ঘটাতে পারে। জয়নুল আবেদিন বলতেন শিক্ষার্থীদের জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শুধু ইজেল পেইন্টিং করালে হবে না, তাদের নানাভাবে মৌলিক ও নান্দনিক কাজগুলো সম্পর্কে জানাতে হবে এবং চর্চা করাতে হবে। সে জন্য আমার এই উদ্যোগ নেওয়া।[২৮২]

অনুষ্ঠানের গীতি-বিচিত্রা অংশটি সাজানো হয় রবীন্দ্রসংগীত, গজল ও আবৃত্তি দিয়ে। মুস্তাফা মনোয়ারের নেতৃত্বে সম্মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবশেন করেন টেলি সামাদ, জিয়া হক, রাজিয়া রহিম, ফারাদী চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছিলেন আমিরুল ইসলাম এবং আবৃত্তি করেছিলেন সুফিয়া খাতুন।[২৮৩] গীতি-বিচিত্রার পর মঞ্চস্থ হয় 'ডাকঘর' নাটক। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন কেরামত মাওলা, টেলি সামাদ প্রমুখ।

মুস্তাফা মনোয়ার সম্পর্কে ইনস্টিটিউটের ১৯৫৯–৬০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক পরিচালক আনোয়ার হোসেন চারুশিল্পের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত *রূপবন্ধে* লিখেছেন—

> আমাদের মাঝে এক নতুন শিক্ষকের আগমন হল। তিনি আমাদের ক্লাশ টিচার হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চলনে, বলনে, অঙ্কনে, গানে, তেল রঙ, জল রঙ, ড্রইং-এর চমৎকারিত্বে ও তাঁর প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা সকলেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠলাম। সারা প্রতিষ্ঠান মেতে উঠলো আনন্দে, অনুষ্ঠানে, অঙ্কনে। তাঁরই উৎসাহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক মঞ্চস্থ হল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। তিনি হলেন আমার চির শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় শিক্ষক মুস্তাফা মনোয়ার।[২৮৪]

---

[২৮২] শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ১০.৫.২০২০

[২৮৩] ময়মনসিংহ টিটি কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ ০৮.০২.২০১৫, সাক্ষাৎকালে তিনি উক্ত অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ও তাঁর লেখা অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্যের পাণ্ডুলিপির কপি প্রদান করেন।

[২৮৪] আনোয়ার হোসেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন", *রূপবন্ধ*, মতলুব আলী (সম্পা.), ঢাকা, মানব প্রকাশন, ১৯৯৮. পৃ. ২০৮

বৈশাখের আহ্বান করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষকে আহ্বান করে আয়োজিত এটিই সম্ভবত আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম অনুষ্ঠান। সেটি সাজানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান ও নাটক এবং কবি সুকান্তের কবিতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান ও নাটকসহ বাঙালি সংস্কৃতির কোনো আয়োজনকে তৎকালীন সরকার ভালোভাবে গ্রহণ করত না। সরকারি চাকরিজীবী হয়ে ওই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা ছিল দুঃসাহসিক ব্যাপার। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলন হয়েছিল সেখানে শুরু থেকে যুক্ত হয়েছিলেন শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচর্চার মাধ্যমে। কিন্তু বৈশাখের আহ্বান শীর্ষক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সেই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের একদল শিক্ষার্থী মুস্তাফা মনোয়ারের নেতৃত্বে।

দ্বিতীয়ত, এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি একদল প্রগতিশীল শিক্ষার্থীকে একত্র করেছিলেন এবং তাঁদের মাঝে চিত্রকলার পাশাপাশি সংগীত ও নাটকে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে নাটকে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টেলি সামাদ ও কেরামত মাওলা।

এই বছর ইনস্টিটিউটে পনেরোতম ব্যাচে (শিক্ষাবর্ষ ১৯৬২–৬৩) ভর্তি হন হামিদুজ্জামান খান, মাহমুদা খাতুন, আনিসুর রহমান, মুনশী মহিউদ্দীন, মেজবাহ উদ্দীন, মনোজবাবু মিশ্র (নেপালি ছাত্র) প্রমুখ।[২৮৫] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের এঁরাই ছিলেন পাঁচ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্সের শেষ ব্যাচের শিক্ষার্থী। এর পর থেকে আর্ট ইনস্টিটিউট আর্ট কলেজে পরিণত হয় এবং এখানে বিএফএ কোর্স চালু হয়। এই বছরে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করে বের হন নবম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। এই ব্যাচে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল। এই ব্যাচের চারজন ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা হলেন : আশীষ সেন গুপ্ত, মনসুর আহমেদ রাহী, প্রাণেশ মন্ডল ও হাশেম খান।[২৮৬]

শিক্ষক হিসেবে হাশেম খানের যোগদান : কাজী আবদুল বাসেত ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে দি আর্ট ইনস্টিটিউট অব শিকাগোতে যান এক বছর মেয়াদি শিল্পশিক্ষা গ্রহণের জন্য। তাঁর ছুটিজনিত শূন্যপদে জয়নুল আবেদিনের মৌখিক নির্দেশে হাশেম

[২৮৫] শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, নিমতলী, ঢাকা, তারিখ : ১০.৫.২০১৮
[২৮৬] হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

খান (১৯৪১) অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৬২ সালের ১৩ আগস্টে।[২৮৭] তিনি মূলত এলিমেন্টারি পর্বের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তবে শিক্ষক পদে তিনি ডিপিআই কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে।

১৯৬২ সালের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী : ১৯৬২ সালের শেষার্ধে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রদর্শনী হয় ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। এই প্রদর্শনী নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান* ম্যাগাজিনে ওই বছরের শীতকালীন সংখ্যায়। প্রতিবেদনে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি—বলা হয়েছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত। এই ম্যাগাজিনের শীতকালীন সংখ্যা প্রকাশিত হতো সাধারণত ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং ডিসেম্বর মাসের নিকটবর্তী সময়ে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের লেখা এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিভিন্ন মাধ্যমের ৬৫০টির অধিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পেনসিল, কালি কলম, জলরং, তেলরং, মিশ্র মাধ্যমে আঁকা চিত্রকর্ম ছাড়াও এই প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য ও সিরামিক শিল্প প্রদর্শিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে রঞ্জিত নিয়োগী, কাজী আনোয়ার হোসেন, কালাম মাহমুদ, আনোয়ার হোসেন, রমনকুমার সাহা, কেরামত মাওলা, প্রফুল্ল রায়, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, হাসান আহমেদ, ফজলুল করিম, রেজাউল করিম, আব্দুল মতিন, মাহমুদা খাতুন, এম এ লতিফ, মোহাম্মদ মহসিন, আবু তাহের, আনোয়ার জাহান প্রমুখের শিল্পকর্ম প্রতিবেদনে গুরুত্ব পায়।

রেজাউলের ‘হাই কোর্ট’, ‘গাছের নীচে’, মতিনের ‘গ্রাম্য পথ’ রফিকের ‘যাত্রীর জন্য অপেক্ষা’, ‘আত্ম প্রতিকৃতি’, বজলুল করিমের ‘ব্যস্ত ঘাট’, কাজী আনোয়ারের ‘ল্যান্ডস্কেপ’ শীর্ষক জলরং চিত্র; মিশ্র মাধ্যমে আঁকা রঞ্জিতের ‘ব্যস্ত ঘাট’ এবং তেলরঙে আঁকা রফিক হোসেনের ‘শীতের যাত্রী’, এম এ লতিফের ‘গাছের মাঝ দিয়ে রাস্তা’ প্রভৃতি চিত্রকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জিত নিয়োগীর বলিষ্ঠ ব্রাশ লাইনের, কালাম মাহমুদের অপূর্ব জলরং এবং কাজী আনোয়ার ও বসন্ত কুমারের জলরং ও কম্পোজিশন জ্ঞানের প্রশংসা করা হয় প্রতিবেদনে। এই প্রদর্শনীতে ব্যতিক্রম ছিল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আনোয়ার জাহানের নিরীক্ষাধর্মী ও পোড়া কাঠের ভাস্কর্যের উপস্থাপন। এ ছাড়া নতুন খোলা সিরামিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের তৈরি সিরামিক শিল্পের উপস্থিতি ছিল এই প্রদর্শনীর আর একটি ব্যতিক্রম সংযোজন।[২৮৮]

---

[২৮৭] কাজী আবদুল বাসেত ও হাশেম খানের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ; শিল্পী হাশেম খানের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে যোগদান পত্র, তারিখ : ২২ আগসট, ১৯৬২

[২৮৮] Nazrul Islam, “Dacca Art Institute: Annual Exhibition”, *Contemporary Arts in Pakistan,* Karachi, winter, 1962: Vol: III. No 4. P.7–9

দ্রুত আর্ট কলেজ বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র আন্দোলন : এই বছরের শেষের দিকে দ্রুত আর্ট কলেজ বাস্তবায়ন এবং এলিমেন্টারি কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগদানের দাবিতে আর্ট ইনস্টিটিউটে এক জোরালো ছাত্র আন্দোলন হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করার প্রক্রিয়া বেশ আগে থেকেই শুরু হলেও বিভিন্ন কারণে তার বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। ইনস্টিটিউটকে কলেজ করার উদ্যোগকে শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি করে আসছিলেন। কলেজ হলে ছাত্র হিসেবে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পাস করার পর চাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কলেজের সনদপত্র অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনা করে ছাত্ররা দ্রুত কলেজ বাস্তবায়নের জন্য জোরালো দাবি তুলতে শুরু করেন ষাটের দশকের শুরু থেকে। ১৯৬২ সালে সেই দাবি আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন কেরামত মাওলা, আনোয়ার হোসেন, প্রফুল্ল রায়, রণজিৎ নিয়োগী, শামসুল ইসলাম নান্টু, মুনশী মহিউদ্দীন, আর এম সালাম, লুৎফর রহমান, আনোয়ার জাহান, বেলাল আহমেদ প্রমুখ।

১৯৬২ সালের শেষার্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ইনস্টিটিউট বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন। এর পর থেকে ইনস্টিটিউটের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। এই ধর্মঘটের ফলে দীর্ঘদিন ক্লাস বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তিনি ডিপিআইয়ের শরণাপন্ন হন। ডিপিআই শামসুল হক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন ও আন্দোলনরত ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর অফিসকক্ষে আলোচনায় বসেন। তিনি ছাত্রদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রদের ওপর চাপ প্রয়োগও করেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এরপর আন্দোলন আরো জোরদার হয় এবং ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে তাঁরা মিছিল ও সভার আয়োজন করেন। তাঁদের দাবির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় একটি সভা করেন। সেখানে কেরামত মাওলা বক্তৃতা করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্ররা একদিন অধ্যক্ষের অফিস উদ্দেশ্য করে ঢিল ছুড়লে পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করে। উত্তেজিত ছাত্ররা তখন পুলিশের উদ্দেশ্যে ঢিল ছোড়া শুরু করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইনস্টিটিউটের আটজন ছাত্রকে নিষিদ্ধ করে সরকার। তাঁরা হলেন আনোয়ার হোসেন, কেরামত মাওলা, শামসুল ইসলাম, হাসান আহমেদ, প্রফুল্ল রায়, মুনশী মহিউদ্দীন, বেলাল আহমেদ এবং আর এম সালাম।

ছাত্রদের এই দাবির প্রতি জয়নুল আবেদিনেরও সহানুভূতি ছিল। ছাত্রদের 'রাস্টিকেট' হওয়ার সংবাদ দেওয়ার জন্য ছাত্রনেতারা যখন তাঁর বাসায় যান তখন তিনি জানতে চান কতজনকে রাস্টিকেট করা হয়েছে। ছাত্ররা তাঁকে জানান আটজন। কিন্তু এ কথা শোনার পর তিনি বলে ওঠেন, আটজন না, নয়জন। তোমরা ফিজিক্যালি আর আমি মেন্টালি। এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের দাবির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়নুল আবেদিনের তৎপরতায় প্রায় দুই মাস পর ছাত্রদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় সরকার।[২৮৯]

ছাত্রদের চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্দোলন ও রাস্টিকেট হওয়ার ঘটনা সম্ভবত **১৯৬২** সালের শেষ দিক থেকে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে **১৯৬৩** সালের মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলেছিল। আনোয়ার হোসেন তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন, আন্দোলনের একপর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিকুল আমীনসহ আন্দোলনরত ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ডিপিআই শামসুল হক সভা করেন। সৈয়দ আজিজুল হকের *জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবন সমগ্র* বই থেকে জানা যায়, জয়নুল আবেদিন **১৯৬২** সালের নভেম্বরে অথবা ডিসেম্বরে মেয়ো স্কুল অব আর্টসের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে লাহোরে যান। তাঁর লাহোর ভ্রমণকালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন শফিকুল আমীন। শফিকুল আমীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালে ডিপিআইয়ের সঙ্গে ছাত্রদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য সভা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে উন্নীত করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ **১৯৬১** সালে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সে লক্ষ্যে 'ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস' গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে দ্রুত কলেজ বাস্তবায়নের জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন; সিলেবাস ও নীতিমালা তৈরির কাজও ছিল প্রক্রিয়াধীন। তাহলে ছাত্রদের জোরালো আন্দোলন কেন হলো? এমন প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী রফিকুন নবী বলেছেন, 'এই আন্দোলন করা হয়েছিল আমাদের ক্লাস থেকে। আমাদের দাবি ছিল অবিলম্বে কলেজ বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। সুতরাং আমাদের দিয়ে ডিগ্রি চালু করা হোক। মূলত এই নিয়ে আমরা আন্দোলন করি।'[২৯০]

---

[২৮৯] আনোয়ার হোসেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন", *রূপবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭–১৩

[২৯০] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

১৯৫৯–৬০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা **১৯৬২** সালে এলিমেন্টারি পর্ব পাস করেন। তাঁদের দাবি ছিল দ্রুত আর্ট কলেজ বাস্তবায়ন করে বিএফএ কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া। তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন **১৯৬০–৬১** সালে ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া ড্রাফটসম্যানশিপের শিক্ষার্থীরাও। ড্রাফটসম্যানশিপের ছাত্রদের দাবি ছিল, ডিপ্লোমা পাসের পর তাঁদের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য, ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার পর ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলেও চারুকলার কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেতেন না।

কলেজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি : কলেজ বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগ জোর তৎপরতা চালাতে থাকে। **১৯৬১** সালের **২১** ডিসেম্বর কলেজ বাস্তবায়নের জন্য নতুন আঙ্গিকে একটি অধ্যক্ষ পদ, চারটি প্রফেসর পদ এবং সাতটি লেকচারার পদ অনুমোদন করা হয়।[২৯১] এ ছাড়া পূর্বে অনুমোদিত শিক্ষক ও দাপ্তরিক স্টাফ পদগুলো বহাল ছিল।

১৯৬৩ সালের **১৯** জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৯২] এ সিদ্ধান্তের আলোকে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে পরিচালিত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠিত হয়।[২৯৩]

অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ডিন নিযুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে **১৯৬৩** সালের **১** জুলাই থেকে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ নামে একটি সরকারি ডিগ্রি কলেজ হিসেবে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের পনেরো বছরের (১৯৪৮–১৯৬৩) শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা : আর্ট ইনস্টিটিউটের শুরুতে সাতটি বিভাগ অনুমোদিত হলেও প্রথম পর্যায়ে স্থান ও শিক্ষক সংকট এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সকল বিভাগের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। ওই সময়ে

[২৯১] পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং ১০৫২/১-শিক্ষা, তারিখ-২১ ডিসেম্বর ১৯৬২। নথি নং সি ৩৩, ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক পদগুলো আসলে আধুনিক শিক্ষা কাঠামোয় যুক্ত অধ্যাপক পদের সমতুল্য নয়। এই পদগুলো আসলে বর্তমান সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার। কিন্তু তৎকালীন নথিপত্রে প্রফেসর লেখা হয়েছে।

[২৯২] ১৯৬৩ সালের ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী, সভাটি বিকাল ৫টায় উপাচার্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৯৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের সেক্রেটারি বি আহমেদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং-১২৩৯-শিক্ষা, তারিখ : ৩ অক্টোবর ১৯৬৩, উৎস : প্রাগুক্ত

উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে শুধু ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এ ছাড়া গ্রাফিক আর্টের উডকাট ও লিথোগ্রাফ বিষয় উভয় বিভাগে শেখানো হয়েছে। ১৯৫৭ সালে মডেলিং বিভাগের একটি প্রভাষক পদ পাস করা হলেও সরকারি ইনস্টিটিউট পর্যায়ে এখানে ভাস্কর্য শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়নি। ষাটের দশকের শুরুতে ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হলেও আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে রূপান্তরের সময় এই কোর্সটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। টিচার্স ট্রেনিং কোর্স ও কারুশিল্প বিভাগ এই পর্যায়ে চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয় ১৯৬১ সালে। এ ছাড়া নতুন বিভাগ প্রাচ্যকলা খোলা হয় ১৯৫৫ সালে। সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যায়ের পনেরো বছরে ঢাকায় শিল্পশিক্ষা পরিচালিত হয়েছিল এ সকল বিভাগের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার প্রথম পনেরো বছরে আর্ট ইনস্টিটিউটে চিত্রকলার ব্যবহারিক শিক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। তখন এখানে কোনো তত্ত্বীয় বিষয় শিক্ষণীয় ছিল না। এই পর্যায়ে প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে একজন মাত্র শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার কারণে ওই সময়ে প্রাচ্যশিল্পের বিকাশ ঘটেনি। আর্ট ইনস্টিটিউটের শিল্পশিক্ষা পরিচালিত হয়েছে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পধারা অনুসারে বাস্তবানুগ অনুশীলনের মাধ্যমে। তবে জলরং ও তেলরং মাধ্যমে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব ছিল। ভারতীয় চিত্ররীতির ঐতিহ্য, লোকশিল্পের ও প্রাচ্যকলা ভাবাদর্শের কিছু কিছু অনুষঙ্গ, যেমন প্রাচ্যধারার সমৃদ্ধ রেখা ও জলরং আঙ্গিক, লোকশিল্পের সহজ প্রকাশভঙ্গি আমাদের শিল্পাঙ্গনে ঘুরেফিরে এলেও তার চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটেছে প্রভাবশালী পাশ্চাত্য শিল্পধারার আঙ্গিকে।

শিল্পশিক্ষার সূচনাতেই জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শন শিল্পীদের শিল্পচর্চার গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জয়নুলের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদ এবং দেশীয় ঐতিহ্য সচেতনতা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে উচ্চশিক্ষার্থে জয়নুল আবেদিনের ইউরোপ ভ্রমণ এবং সেখানকার জাদুঘরে বাংলার লোকশিল্পের সমাদর দেখে লোকশিল্পের প্রতি তাঁর নতুন অনুভূতির সঞ্চার হয়। তিনি উপলব্ধি করেন, লোকশিল্পই বাংলার শিল্পের অন্তরাত্মা, তাকে অবলম্বন করেই বাংলার শিল্প আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবে। এ ছাড়া ওই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক যে আন্দোলন চলেছিল এ ক্ষেত্রে তারও প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনোজগতে। এই পর্যায়ে তিনি লোকশিল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পধারার (কিউবিজমের জ্যামিতিক ফর্মের) সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক শিল্পের একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেন। এভাবে জয়নুল আবেদিনের হাতে এ দেশের আধুনিক শিল্পধারার সূত্রপাত ঘটে পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্যায় থেকে। এ পর্যায়ে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটটি বাঙালি ঐতিহ্য সচেতন আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দিকে মনোযোগ দেন। লোকশিল্পীদের উজ্জীবিত করতে এবং চারুকলার শিক্ষার্থীদের

ঐতিহ্য সচেতন করার জন্য তিনি ইনস্টিটিউটে লোকশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মনোযোগী হয়েছেন। মৃৎশিল্প বিভাগ চালু করার উদ্দেশ্যে তিনি মীর মোস্তফা আলীকে মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে যুগোপযোগী শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে এ পর্যায়ে মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা করেন দুই বছর মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে। সেখানে জাপানি শিল্পী কোইচি তাকিতা ও মীর মোস্তফা আলীকে নিযুক্ত করেছিলেন।

তৎকালীন পূর্ব বাংলার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে প্রেক্ষাপটে শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা নানা প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে এবং সমস্যা মোকাবেলা করে নেহাতই দেশপ্রেমিক চেতনা আর শিল্পের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এক সুদৃঢ় আশাবাদী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এই অঞ্চলের ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠী বরাবরই এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। শুধু শিল্পকলার ক্ষেত্রে নয়, তারা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এ পর্যায়ে সংঘটিত বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

শুরুতেই আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঘিরে এ দেশের শিল্পকলাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন সংঘটিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকা আর্ট গ্রুপ গঠন, ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ঢাকাবাসী কয়েকজন শিল্পীর অংশগ্রহণে পরপর দুটি প্রদর্শনী আয়োজন (১৯৫০ এবং ১৯৫২) এবং সেই প্রদর্শনীতে প্রাদেশিক সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গকে এনে তাঁদের কাছে শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের দাবি তুলে ধরা ছিল এ পর্যায়ের অনন্য ঘটনা। এই দুটি প্রদর্শনী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চায় দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রদর্শনী দুটির মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের প্রতি সরকারের ঊর্ধ্বতনদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। প্রথম প্রদর্শনীর পর আর্ট ইনস্টিটিউটের অনুকূলে আরো দুটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পর সেগুনবাগিচায় একটি দ্বিতল ভবন ইনস্টিটিউটের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর এক বছরের মধ্যে শাহবাগে আর্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন তৈরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। এ দেশের স্বনামধন্য স্থপতি মাযহারুল ইসলামের নান্দনিক ও আধুনিক নকশায় সেটি নির্মিত হয়। ১৯৫৬ সালের শেষ পর্যায়ে সেখানে ইনস্টিটিউট স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালে ইনস্টিটিউটে প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এখান থেকে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীর (আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী ও আবদুর রাজ্জাক) ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ শিল্পশিক্ষা গ্রহণ এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁদের আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান ছিল এ পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তখনো বিদেশে যাননি এ রকম আরো দুই-তিনজন শিক্ষক (মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাজী আবদুল বাসেত প্রমুখ) এই দশকে যোগদান করেছিলেন। এ সকল তরুণ শিক্ষক ওই সময় পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পধারায় আকৃষ্ট হয়ে বিচিত্র রং, ফর্ম, বুনটের সমন্বয়ে সম-বিমূর্ত ও বিমূর্ত ধারায় শিল্পচর্চার মাধ্যমে এ দেশে আধুনিক শিল্পচর্চার যে জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষকগণ (বিশেষ করে জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান) বাংলার লোক-ঐতিহ্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পধারার জ্যামিতিক ফর্মের সমন্বয়ে একধরনের দেশীয় আধুনিক শিল্পচর্চায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের চিত্রে দেশীয় ঐতিহ্য ও বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষকদের প্রচেষ্টা ছিল ইউরোপীয় সমকালীন শিল্পধারার অনুসরণে শিল্পচর্চার মাধ্যমে বিশ্বজনীন শিল্পধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তাঁদের অধিকাংশের চিত্রে দেশীয় ঐতিহ্যের বিষয়টি মুখ্য ছিল না। এই দুটি শিল্পধারাই ছিল পাশ্চাত্য প্রভাবিত। প্রাচ্যশিল্পের রেখা, ওয়াশ পদ্ধতি, কোনো কোনো শিল্পীর চিত্রে পাওয়া গেলেও সেটি চিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে, চিত্রের প্রধান ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্যায়ে শিল্পশিক্ষাক্রম ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটেনে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত। ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে আধুনিক শিল্পকলার যে আন্দোলন ঘটেছিল এই শিল্পশিক্ষাক্রমে সে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানকার শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষকদের এবং বইপত্র ও জার্নালের মাধ্যমে সমকালীন শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার চেষ্টা করেছেন। তবে এই প্রচেষ্টা ছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রমের বাইরে।

আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষা নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পরিচালিত হলেও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। দেশ-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিল্প সম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হয়েছেন। এখান থেকে পাসের পর তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসূত্রে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সমকালীন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমকালীন আধুনিক শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ওই সময়ের মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী শিল্পশিক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী, হামিদুর রহমান, সৈয়দ শফিকুল

হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, জুনাবুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, মীর মোস্তফা আলী, মবিনুল আজিম, আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, নিত্য গোপাল কুন্ডু (নিতুন কুন্ডু), সমরজিৎ রায় চৌধুরী, রুমি ইসলাম, হাশেম খান, প্রাণেশ কুমার মন্ডল, গোপেশ মালাকার, মোঃ মহসিন, মোঃ রেজাউল করিম, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, নাসির বিশ্বাস, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ওই সময় সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোনো শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল না। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল ওই সময়ে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছিল। শিক্ষা বিভাগের পরামর্শক্রমে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যায়ে ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ডিগ্রি কলেজ করার প্রস্তাব করা হয়।[১৮] দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অনুষদ ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস খুলে তার অধীনে আর্ট ইনস্টিটিউকে 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্'-এ পরিণত করা হয়। কলেজ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এখানে শিল্পশিক্ষার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

পরিশেষে বলা যায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস গড়ে উঠেছিল দেশবিভাগের বাস্তবতায় পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষা প্রসারের জন্য; জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, শফিকুল আমীন, কামরুল হাসান প্রমুখ তরুণ শিল্পীর প্রচেষ্টায়। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের আদলে, বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিল্পশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে। যে প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় গড়ে উঠেছিল সেখানে নতুন কিছু করার অবকাশ ছিল না। দেশভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিল্পশিক্ষার ধারাটি পূর্ব বাংলায় চালু করাই ছিল মূল লক্ষ্য। তবে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে দেশীয় ঐতিহ্য সচেতন একটি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় : আর্ট কলেজ

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প (Constituent) ডিগ্রি কলেজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর প্রতিষ্ঠানটি কলেজ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এই কলেজের নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা। ১৯৭২ সালে কলেজের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ বা বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা করা হয়। আশির দশকের মধ্যে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে (১৯৭৩), রাজশাহীতে (১৯৭৮) এবং খুলনায় (১৯৮৩) আরো তিনটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধ্যায়ে 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা', 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা' এবং 'অন্যান্য আর্ট কলেজ'—এই তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

চিত্র-৩৪ : গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা

আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে আর্ট কলেজ : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে একটি উপাদানকল্প ডিগ্রি কলেজ হয়েছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে আছে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহকর্মীদের অব্যাহত প্রচেষ্টা, শিক্ষা বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ইতিহাস।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে একটি ডিগ্রি আর্ট কলেজে উন্নীত করার উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। প্রতিষ্ঠানটির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমমানের সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে শিক্ষার মান বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে আর্ট ইনস্টিটিউটকে আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশবিভাগের উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে শুরু থেকে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসংগতি থেকে গিয়েছিল। আর্ট ইনস্টিটিউট একটি ব্যতিক্রম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ায় এমনটি হয়েছিল। ওই সময় আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করত পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীন জনশিক্ষা বিভাগ। কিন্তু শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়, যেমন : সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট ইস্যু ইত্যাদি বিষয় কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো না। শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ তাঁর শিক্ষকদের মাধ্যমে নিজেরাই সম্পন্ন করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্ট ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন নেওয়া হতো। এখান থেকে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্নের পর শিক্ষার্থীদের কোনো মুদ্রিত সনদপত্রও প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হতো। কোনো শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এই প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা চাকরিপ্রাপ্তি বা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমনের সময় সমস্যার মুখোমুখি হতেন। এই প্রত্যয়নপত্র ডিগ্রির সমমানের কি না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি যাচাই করার প্রয়োজন পড়ত। এ সকল অসংগতি দূর করে ইনস্টিটিউটের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ওই সময়ের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজগুলো পরিচালনার জন্য শিক্ষা বিভাগ পরামর্শ দেয়। শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন

কর্মকর্তা এ কিউ আনসারী আর্ট ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে শিক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরে ১৯৫৫ সালের ১ জুলাই একটি দীর্ঘ ফাইল নোট লেখেন। এই নোটে তিনি ইনস্টিটিউটের চলমান অবস্থা তুলে ধরে এর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বাড়ানোর জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিষয়ে সুপারিশ করেন।

তিনি ফাইল নোটে উল্লেখ করেন—

> ...In Calcutta, there is a Board which controls the Govt. School of Arts these respects. We do not have any Board here. At the same time, the five year course prescribed for the final examination of the Govt. Institute of Arts is long enough to warrant conferment of University degrees on the successful candidates. University degrees will certainly be much more attractive and will carry much greater weight than diplomas awarded by a Board, which may at best be recognised by the University.[১]

এ ছাড়া প্রিলিমিনারি ও ডিগ্রি কোর্সের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক কাজের স্বল্পমেয়াদি কোর্সের বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন। এই ফাইল নোটের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের ডিপিআই আব্দুল হামিদ আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে পত্র দেন।[২] এই পত্রে তিনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অধ্যক্ষকে প্রস্তাব পাঠাতে বলেন। ওই মাসের ৩০ তারিখে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে এ বিষয়ে আর একটি পত্র দেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব ড. এম আহম্মদ।[৩] তিনি ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে বলেন। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তর করার জন্য এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এরপর অধ্যক্ষ আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে আর্ট ইনস্টিটিউটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে সম্মত হয়নি। ১৯৫৬ সালের ১২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এক পত্রে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেন

---

[১] পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এ কিউ আনসারীর লেখা ফাইল নোট, তারিখ : ১.০৭.১৯৫৫, নথি নং-সি-৩৩, প্রাগুক্ত

[২] পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক এ হামিদ কর্তৃক আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং-২৬১৫-এস, তারিখ : ২৪ এপ্রিল ১৯৫৬, প্রাগুক্ত

[৩] পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. এস আহম্মদ কর্তৃক আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং ৩৯৫/১৩, তারিখ : ৩০ এপ্রিল ১৯৫৬, প্রাগুক্ত

যে, আর্ট ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করার কোনো সুযোগ নেই।[৪] কলেজ পরিদর্শকের এই পত্র দেওয়ার মাত্র তেরো দিন পরে ১৯৫৬ সালের ২৫ জুন তিনি আরেকটি পত্র দেন অধ্যক্ষকে (পত্র নং-১০২৯)। যেখানে তিনি ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির জন্য কিছু তথ্য চেয়ে এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সাজিয়ে পাঠাতে বলেন। পত্রে তিনি জানতে চান, এখানে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা দুটোই থাকবে কি না। বিস্তারিত কোর্স কারিকুলাম, কোর্সের সময়কাল, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিয়ম, ভর্তির নীতিমালা কী হবে—ইত্যাদি।

এই পত্রপ্রাপ্তির পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। সংশ্লিষ্ট নথিতে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো পত্র পাওয়া যায় না। সম্ভবত জয়নুল আবেদিন ১৯৫৬-৫৭ সালে রকফেলর ট্রাভেল গ্র্যান্ট নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার কারণে বিষয়টি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

১৯৫৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষা বিভাগের উপসচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এক পত্রে আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস খোলা অথবা ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের অধীনে নেওয়ার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে সে বিষয়ে দ্রুত সরকারকে জানাতে বলেন।[৫] ১৯৫৮ সালের ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট ইনস্টিটিউটকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এবং সদস্যসচিব করা হয় রেজিস্ট্রারকে। সদস্য করা হয় কলা অনুষদের ডিন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, ডিপিআইয়ের পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে। ১৯৫৮ সালের ৩০ এপ্রিল এই পর্যালোচনা কমিটির সভায় আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনে কলেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরির জন্য আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবের কপি অন্য সদস্যদের কাছে প্রেরণের জন্য

[৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক কর্তৃক আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং-১০১৫, তারিখ : ১২ জুন ১৯৫৬, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৫] শিক্ষা বিভাগের উপসচিব কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং-৭৫৫-শিক্ষা, তারিখ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

সভার পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয়।[৬] দীর্ঘ সময়ের পর অধ্যক্ষ এ বিষয়ে একটি খসড়া পরিকল্পনা (ড্রাফট স্কিম) শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করেন, যার কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করেন ১৯৫৯ সালের ১৫ আগস্ট। পরিকল্পনার শিরোনাম ছিল 'Question of Transfer of the Government Institute of Arts to the Dacca University.' দুটি ভাগে ভাগ করে তৈরি প্রস্তাবনাটির প্রথম ভাগে ছিল শিক্ষা পদ্ধতি ও টিচিং স্টাফ এবং দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত।[৭]

প্রস্তাবের প্রথম অনুচ্ছেদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ নামে নতুন অনুষদ খোলার এবং উক্ত অনুষদে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পাঁচ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি খোলার প্রস্তাব করা হয়। যার প্রথম দুই বছর ইন্টারমিডিয়েট কোর্স এবং পরবর্তী তিন বছর অ্যাডভান্সড কোর্স। তৃতীয় অনুচ্ছেদে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, চারটি অধ্যাপক (বর্তমান সহকারী অধ্যাপকের সমমানের), ১৫টি লেকচারার এবং পাঁচটি ডেমোনেস্ট্রেটর পদের প্রস্তাব করা হয়।

এই প্রস্তাবনায় মোট সাতটি শিক্ষণীয় বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে।

(1) Fine Art, (2) Commercial Art (Including Industrial Art), (3) Oriental Art, (4) History and Theory of Art, (5) Graphic Art, (6) Sculpture & Clay Modelling and (7) Design and Crafts Course.

হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি অব আর্ট বাদে অন্য বিভাগ ও কোর্সের সিলেবাসের উল্লেখ করা হয়। সিলেবাস থেকে বোঝা যায় ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, ওরিয়েন্টাল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট এবং স্কাল্পচার ও ক্লে-মডেলিং ছিল তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স। এ ছাড়া ডিজাইন অ্যান্ড ক্রাফটস্ কোর্স ছিল স্বল্পমেয়াদি ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট কোর্স; যেখানে টেক্সটাইল, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, বাঁশ ও বেতের কাজের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রস্তাবনায় হিস্ট্রি অ্যান্ড থিওরি অব আর্ট ছাড়া অন্য কোনো বিভাগে তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হয়নি। ১৯৫১ সালে কলকাতা আর্ট স্কুল কলেজে রূপান্তরের সময় অনুরূপ পাঁচটি বিভাগ (হিস্ট্রি অব আর্টস

[৬] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গঠিত পর্যালোচনা কমিটির ১৯৫৮ সালের ৩০ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে ১২.৩.১৯৫৮ তারিখের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৭] Question of Transfer of the Government Institute of Arts to the Dacca University শীর্ষক প্রস্তাবনা, আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে প্রেরিত, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

বাদে) এবং স্বল্পমেয়াদি ক্রাফটস্ কোর্স চালু করা হয়েছিল। ক্রাফটস্ কোর্সের মধ্যে টেক্সটাইল, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, লেদার ওয়ার্কস, উড কার্ভিং শিক্ষণীয় ছিল।[৮]

১৯৫৯ সালের ১২ অক্টোবরে লেখা পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে জানান, প্রেরিত প্রস্তাবনাটি অসম্পূর্ণ। পত্রে কিছু বিষয় উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণের জন্য তিনি অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন।[৯] পত্রে রেজিস্ট্রার জানতে চেয়েছিলেন ইন্টারমিডিয়েট (এলিমেন্টারি) ও ডিগ্রি (অ্যাডভান্সড) কোর্সের পরীক্ষা পদ্ধতি, নম্বর বিভাজন, কোর্সের ধরন, সিলেবাস গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদি কেমন হবে সেই সম্পর্কে। এরপর ১৯৬১ সালের ২৭ এপ্রিল প্রণীত 'Schem for opening a Faculty of Arts and crafts under the University of Dacca.' শিরোনামে একটি সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ পেশ করেন।[১০]

সংশোধিত এই প্রস্তাবনাটি ছিল পূর্বের তুলনায় সুগঠিত ও সংক্ষিপ্ত। এই প্রস্তাবে ১. ফাইন আর্ট, ২. কমার্শিয়াল আর্ট, ৩. ওরিয়েন্টাল আর্ট, ৪. স্কাল্পচার অ্যান্ড ক্লে-মডেলিং, ৫. গ্রাফিক আর্ট, ৬. সিরামিক ও ক্রাফটস্ বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিন বছর মেয়াদি ড্রাফটসম্যান ও ট্রেচার বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সের উল্লেখ ছিল।

আর্ট ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে প্রেরিত আর্ট কলেজের প্রস্তাবনা পর্যালোচনার জন্য ১৯৬১ সালের ৫ অক্টোবর মূল্যায়ন কমিটির (আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত করার জন্য ১২.৩.৫৮ তারিখে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি) সভা অনুষ্ঠিত হয় উপাচার্য ভবনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ডিপিআই, কলা অনুষদের ডিন, ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং কলেজ পরিদর্শক। কমিটি আর্ট কলেজ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে সুপারিশ করে।[১১]

---

[৮] Bagal Jogesh Chandra, "History of the Govt. college of Art & craft", Ibid. p. 51

[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে লেখা পত্র, তারিখ : ২২ অক্টোবর ১৯৫৯, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১০] Schem for opening a Faculty of Arts and Carfts under the University of Dacca, তারিখ : ২৭ এপ্রিল ১৯৬১, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১১] আর্ট ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূতকরণ সম্পর্কিত মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ৫ অক্টোবর ১৯৬১, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

প্রথমত, ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠন এবং তার অধীনে ফাইন আর্ট বিষয়ে ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা প্রচলন। দ্বিতীয়ত, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের নাম পরিবর্তন করে 'কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট' করা এবং কলেজটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কলেজের অধ্যক্ষকে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের প্রধান করা।

তৃতীয়ত, কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্ত প্রযোজ্য হবে—

(ক) সিলেবাস একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(খ) শিক্ষকদের বেতন স্কেল লাহোরের ন্যাশনাল কলেজ অব আর্টসের অনুরূপ হবে।

(গ) কলেজটি ডিগ্রি কোর্স শিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে প্রস্তুত করতে হবে।

(ঘ) লাইব্রেরির পুনরায় উন্নতি করতে হবে।

চতুর্থত, সিলেবাস এবং প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটি গঠিত হয়।

১. ডিন, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস	-সভাপতি
২. জয়নুল আবেদিন, অধ্যক্ষ, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস	-সম্পাদক
৩. এ এইচ দানী, ইতিহাস গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-সদস্য
৪. শফিকুল আমীন	-সদস্য
৫. আনোয়ারুল হক	-সদস্য
৬. সফিউদ্দীন আহমেদ	-সদস্য
৭. ড. সিরাজুল ইসলাম	-সদস্য

কমিটির চেয়ারম্যানকে কোর্সসমূহের সিলেবাস এবং সিলেবাস সম্পর্কিত প্রস্তাবনাগুলো যাচাই-বাছাই করে সরাসরি একাডেমিক কমিটিতে উপস্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

এই সুপারিশের পর ১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাবনাটি অনুমোদিত হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯৬১ সালের ৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় প্রস্তাবনার প্রথম অংশ (পরিশিষ্ট-'এ') 'ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস' খোলার বিষয়টি অনুমোদিত হয় এবং উপস্থাপিত অন্য বিষয়সমূহ কার্যকর করার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উপাচার্যকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সিন্ডিকেটের সভার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়—

> That the report (5-10-61) of the committee appointed by the Academic Council (12.03.58) regarding the scheme for the creation of a Faculty of Fine Arts, as set out in Appendix-A, be approved and the Vice-Chancellor be authorised to negotiate with the Government on the basis of the proposals contained in the Report.[১২]

এ ছাড়া পত্রের শেষাংশে প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের বিধিমালা, সিলেবাস ইত্যাদির বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত সাত কপি প্রস্তাবনা এডহক কমিটির কাছে পাঠানোর জন্য অধ্যক্ষকে বলা হয়।

সিন্ডিকেট সভার নির্দেশনা অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় (৫ অক্টোবর ১৯৬১) গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের বিধিমালা ও সিলেবাসসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন ১৯৬২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সেকশন অফিসারের কাছে প্রেরণ করেন। প্রস্তাবনার কপি প্রেরণ করেন ডিপিআইয়ের কাছেও। প্রস্তাবনার শিরোনাম ছিল 'Scheme for opening a Faculty of Fine Arts and Crafts under the University of Dacca.'[১৩]

এদিকে কাঙ্ক্ষিত আর্ট কলেজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯৫৫–৫৬ সাল থেকে আর্ট ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি সরকারি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ১৯৬২ সালের জুনের মধ্যে তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় দ্রুত কলেজ বাস্তবায়নের দাবিতে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন।[১৪] শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন দ্রুত কলেজ বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছিল। এ সময় শিক্ষা বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত আর্ট কলেজ বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ নিতে থাকে। ১৯৬২ সালের ২১ ডিসেম্বর শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি এক পত্রে প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের টিচিং স্টাফ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে অবগত করেন এবং পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠন এবং সেখানে নিয়োগের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। পত্রে তিনি জানান, নিম্নলিখিত

---

[১২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ১৯৬১ সালের ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্ট অংশ, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১৩] "Scheme for opening a Faculty of Fine Arts and Crafts under the University of Dacca" শীর্ষক সংশোধিত প্রস্তাব, আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্তৃক শিক্ষা বিভাগের সেকশন অফিসারের কাছে প্রেরিত, তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১৪] আনোয়ার হোসেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্প ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন", মতলুব আলী (সম্পা.), *রূপবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

শিক্ষক ও অফিস স্টাফ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ গঠিত হবে।

(i) One Principal in the East Pakistan Senior Education Service in the scale of Rs. 350-1150 plus a special pay of Rs. 100/-P.M.
(ii) Four posts of Professors in E.P.E.S scale of Rs. 275-850/-
(iii) Seven posts of Lecturers in the E.P.J.E.S scale of Rs. 250-550/-
(iv) Other junior and clarical staff[১৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অধ্যক্ষ, চারটি প্রফেসর (বর্তমান সহকারী অধ্যাপকের পদমর্যাদার), সাতটি লেকচারার পদ এবং অন্যান্য জুনিয়র পদ অর্থাৎ পূর্বের শিক্ষক পদ ও ক্লারিক্যাল পদ নিয়ে একটি জনবল কাঠামো গঠন করেছে শিক্ষা বিভাগ।

১৯৬৩ সালের ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় College of Fine Arts and Crafts ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট (উপাদানকল্প) কলেজ হিসেবে অনুমোদিত হয়। সিন্ডিকেটের সভার কার্যবিবরণীর ২০ নং সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়—

(1) That the college of Fine Arts and Crafts, Dacca be a constituent College of the University of Dacca.
(2) That the College be under the Faculty of Fine Arts.
(3) That the following new section be added at the end of section 4 of the First Statutes of the University : '4A. In Addition to the Faculties mentioned in sub-clause (1) of section 25 of the Dacca University Ordinance, there shall be a Faculty of Fine Arts.'[১৬]

অর্থাৎ (১) গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাদানকল্প কলেজ হবে,

(২) এই কলেজটি চারুকলা অনুষদের অধীনে হবে,

(৩) নিম্নলিখিত নতুন ধারাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্ট্যাটিউটের ৪ নম্বর ধারার শেষান্তে সংযুক্ত হবে;

'৪/এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ২৪ ধারার (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত অনুষদসমূহের অতিরিক্ত হিসেবে চারুকলা অনুষদ হিসেবে একটি অনুষদ থাকবে।'

---

[১৫] পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং ১০৫২/১ শিক্ষা, তারিখ ২১ ডিসেম্বর ১৯৬২, পত্রের কপি আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে প্রেরণ করা হয়, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১৬] ১৯৬৩ সালের ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্ট্যাটিউটস সংশোধন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের বিষয়টি মহামান্য আচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিব (আচার্যের সচিব) বি আহমেদ এক পত্রে (৩ অক্টোবর ১৯৬৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে আচার্য কর্তৃক ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস অনুমোদনের বিষয়টি অবগত করেন। তিনি পত্রে উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের প্রেরিত পত্রের (পত্র নং-৪৬ জি, তারিখ : ৮ জুলাই, ১৯৬৩) পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছেন যে, মহামান্য আচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের ৩১(৩) ধারার অধীনে চারুকলা অনুষদ গঠনকল্পে নিম্নবর্ণিত স্ট্যাটিউট সংশোধনীর প্রতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং সংশোধনীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের স্ট্যাটিউটের ৪/বি নম্বর ধারা বলে বিবেচিত হবে। নিম্নলিখিতভাবে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠিত হবে :

(i) The Principal, East Pakistan College of Arts & Crafts.
(ii) The Dean of the Faculty of Arts, Dhaka University.
(iii) The Dean of the Faculty of Science, Dhaka University.
(iv) The Dean of the Faculty of Education, Dhaka University.
(v) The Director of Public Instruction, East Pakistan.
(vi) The Principal, Teachers Training College for women, Mymensingh.
(vii) The Secretary, Arts Council, Dacca.
(viii) The Heads of the Departments comprised in the Faculty.
(ix) Such other member as may be co-opted by the Faculty as constituted under clause (i) to (viii) above, provided that the total number of members of the Faculty shall not exceed 15.[১৭]

১৯৬৩ সালের ১৪ নভেম্বর শিক্ষা বিভাগ থেকে এক পত্রের মাধ্যমে ডিপিআইকে জানানো হয়, সরকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকাকে পরিবর্তন করে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ করেছে; যা ১-৭-১৯৬৩ থেকে কার্যকর।[১৮] মহামান্য আচার্য কর্তৃক ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠনের অনুমোদন ও শিক্ষা বিভাগের পত্র পাওয়ার আগেই ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই থেকে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

[১৭] পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিব বি আহমেদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে প্রেরিত পত্র, পত্র নং ১২৩৯-শিক্ষা, তারিখ ৩ অক্টোবর ১৯৬৩, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[১৮] শিক্ষা বিভাগের সেকশন অফিসার কর্তৃক ডিপিআইকে প্রেরিত পত্র, পত্র নং-৮৫৫ শিক্ষা, তারিখ ১৪ নভেম্বর ১৯৬৩, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কাঠামো : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ নবগঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাদানকল্প সরকারি আর্ট কলেজ হিসেবে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ নামে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই অর্থাৎ ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে। অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন এই অনুষদের ডিন নিযুক্ত হন।

নবগঠিত আর্ট কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে নিম্নলিখিত ছয়টি বিভাগ অনুমোদিত হয় :

1. Drawing and Painting
2. Sculpture
3. Commercial Art
4. Oriental Art
5. Graphic Art
6. Crafts and Ceramics.[১৯]

পূর্বের সার্টিফিকেট কোর্স পরিবর্তন করে এ সময় পাঁচ বছর মেয়াদি Bachelor of Fine Arts (BFA) ডিগ্রি প্রবর্তন করা হয়। দুটি পর্বে এই ডিগ্রি কোর্স বিভক্ত ছিল। যার প্রথম দুই বছর Preliminary Bachelor of Fine Arts সংক্ষেপে Pre.-BFA পর্যায়; দুই বছরের শিক্ষা শেষে প্রি-ডিগ্রির চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী তিন বছর ছিল ডিগ্রি পর্যায় : সেখানে প্রি-বিএফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটি বিভাগে ভর্তির সুযোগ ছিল। তিন বছর শেষে বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর্ট কলেজে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় পাস এবং বয়স হতে হবে অনূর্ধ্ব বিশ বছর। ভর্তির জন্য প্রার্থীকে একটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রি-বিএফএ ও বিএফএ ডিগ্রি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত ছিল : ১. ভালো আচরণ, ২. নির্ধারিত উপস্থিতি সম্পন্ন করা, ৩. সকল কলেজ পরীক্ষা (বার্ষিক পরীক্ষা) এবং ক্লাস ও সেশনাল কাজে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ৪. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম থাকা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ নম্বরের প্রয়োজন ছিল। প্রথম বিভাগ পেতে হলে ৬০ শতাংশের অধিক নম্বর, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য ৪৫ শতাংশ এবং তৃতীয় বিভাগের জন্য ৪০ শতাংশের অধিক নম্বর প্রয়োজন ছিল। মোট ৮০ শতাংশ নম্বর পেলে ডিস্টিংশন পেয়ে এবং ৩৬ থেকে ৩৯ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তরা অ্যাগ্রিগেট (Aggregate) পেয়ে উত্তীর্ণ হতেন। পুনর্গঠিত আর্ট কলেজের ডিগ্রি কোর্সের সময়কালের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না।

---

[১৯] *Prospectus of The East Pakistan College of Arts and Crafts*, Dhaka, Published by East Pakistan Government Press, Dhaka, 1965

আর্ট কলেজের পুনর্গঠিত শিক্ষাক্রমে পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টসহ), গ্রাফিক আর্ট, মডেলিং, ড্রাফটসম্যানশিপ, ড্রইং মাস্টার্স কোর্স এবং ক্রাফটস্ বিভাগ অনুমোদিত ছিল। কিন্তু সে সময় অ্যাডভান্সড পর্যায়ে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট এই দুটি বিভাগ খোলা হয়। এই দুটি বিভাগে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে নতুন করে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ চালু করা হলেও কলেজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাত্র একজন ছাত্রী সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে ড্রাফটসম্যানশিপে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬১ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা হয়। ওই সময়ে অনুমোদিত মডেলিং, ক্রাফটস্ বিভাগ ও ড্রইং মাস্টার্স কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি। আর্ট ইনস্টিটিউটে এ সকল বিষয়ে শিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

নবগঠিত শিক্ষাক্রম থেকে ড্রইং মাস্টার্স কোর্স ও ড্রাফটসম্যানশিপের ডিপ্লোমা কোর্স বাদ দেওয়া হয়। কারণ ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য অনেক প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেখানে চারুকলা বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিক্যাল কলেজের প্রসার ঘটায় এবং সেখানে ড্রাফটসম্যানশিপ শেখার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রম থেকে বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। ওই সময় ফাইন আর্ট বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং করা হয় এবং ক্রাফটস্ ও সিরামিক দুটো বিষয় একত্র করে একটি বিভাগ করা হয়।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে আর্ট কলেজে প্রিলিমিনারি বিএফএ ও বিএফএ ডিগ্রির কার্যক্রম শুরু করা ছিল এ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জয়নুল আবেদিন এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই সময়ের মধ্যে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল এবং মেয়ো স্কুল অব আর্টস যথাক্রমে সরকারি আর্ট কলেজ (১৯৫১ সালে) এবং ন্যাশনাল কলেজ অব আর্টস (১৯৫৮ সালে) হিসেবে রূপান্তরিত হলেও ওই সকল প্রতিষ্ঠানে সে সময় বিএফএ কোর্স চালু করা হয়নি। কলকাতায় চালু করা হয়েছিল ডিপ্লোমা কোর্স আর লাহোরে পূর্বতন শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল পরবর্তী বেশ কয়েক বছর। ১৯৮৩ সালে কলকাতা আর্ট কলেজে বিভিএ কোর্স[২০] এবং ১৯৮৫ সাল থেকে ন্যাশনাল কলেজ অব আর্ট ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। এ ছাড়া

[২০] *Government College of Art & Craft, Calcatta : A Glimpse*, published by Government College of Art & Craft, Calcutta

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কলাভবনে বি. ফাইন নামক ডিগ্রি কোর্স চালু হয় ১৯৬৭ সালে। তার পূর্বে সেখানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল।[২১] ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল প্রধানত লন্ডনের কেন্সিংটনের গভর্নমেন্ট স্কুল অব ডিজাইনের আদলে। ১৯৩৭ সালে কলেজটি রয়াল কলেজ অব আর্টের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত হয় ১৯৬৭ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল।[২২]

রয়াল কলেজ অব আর্ট এবং কেন্সিংটন স্কুল অব ডিজাইন ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানের পাঠ্যক্রম ছিল সংকীর্ণ এবং সেখানে সমকালীন শিল্প চেতনার প্রতিফলন ছিল না।[২৩] ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে ১৮৭১ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কলা ও মানবিক অনুষদের অধীনে গড়ে উঠেছিল স্লেড স্কুল অব আর্ট। শুরুতেই সেখানে ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকলার ইতিহাস ও শিল্পের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে সেখানে এচিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে এক বছর অবস্থান করেছিলেন জয়নুল আবেদিন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি রকফেলর ফাউন্ডেশনের ট্র্যাভেল গ্রান্টের অধীনে এক বছরব্যাপী বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক আর্টের প্রবণতা সম্পর্কে জানা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যকরভাবে সেই জ্ঞানের সঞ্চার করা।[২৪]

শিল্পশিক্ষার আধুনিকায়নে ব্রিটেন অপেক্ষা আমেরিকা এগিয়ে ছিল। আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন আর্ট স্কুল ইয়েল স্কুল অব আর্ট (Yale School of Art 1869)। ১৮৯১ সালে এখানে প্রথম (আমেরিকার মধ্যে) ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি খোলা হয়।[২৫] এরপর আমেরিকার বেশ কিছু শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রি চালু হয়। আবদুর রাজ্জাক পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জয়নুল আবেদিনের লন্ডনে শিক্ষা গ্রহণ, বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং আবদুর রাজ্জাকের আমেরিকায় শিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা ঢাকার আর্ট কলেজে বিএফএ ডিগ্রি প্রবর্তন এবং কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে তাঁদের সহকর্মীরা মনে করেন।

---

[২১] বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, ১৮ অক্টোবর ২০২১

[২২] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ও ৫৩

[২৩] Postle Martin, *The Foundation of the Slade School of Fine Art: Fifty Nine Letters in the Record office of University college London.* The Walpole Society, Vol.58 (1995/1996), p. 140

[২৪] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[২৫] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yale_School_of_Art , Date: 23.07.2022

তবে প্রি-ডিগ্রি ও বিএফএ সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট কলেজ অন্তর্ভুক্তির মূল্যায়ন কমিটির (১২ মার্চ ১৯৫৮ সালে গঠিত) সুপারিশ এবং সিলেবাস যাচাই-বাছাই কমিটি (৫ অক্টোবর ১৯৬১ সালে গঠিত) বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। আর্ট ইনস্টিটউটকে কলেজে রূপান্তর করা সংক্রান্ত নথিতে দুটি খসড়া সিলেবাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটি ১৯৫৯ সালের ১৫ আগস্টে আর্ট কলেজের প্রস্তাবনার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬১ সালের ২৭ এপ্রিল প্রণয়ন করা হয়। প্রথম সিলেবাসটি তৎকালীন কলকাতা আর্ট কলেজে প্রচলিত ডিপ্লোমা কোর্সের অনুরূপ। এই সিলেবাসে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের উল্লেখ আছে কিন্তু অন্যান্য বিভাগে তত্ত্বীয় বিষয়ের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় সিলেবাসে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের উল্লেখ নেই তবে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ইতিহাসের (History of Arts & Architecture) উল্লেখ আছে। মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী একাধিকবার সংশোধন করে সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয় বাংলা, ইংরেজি, সভ্যতার ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব যুক্ত করে চূড়ান্ত করা হয়। এ সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রম তৈরিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাজমুল করিম ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ।

শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত আর্ট কলেজের প্রসপেক্টাসের (Prospects) অনুচ্ছেদে আর্ট কলেজে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে—

> The gradual industrialisation of the country provides impetus to Commercial Art and Industrial Design and increase the interest of Fine Arts by the Colleges/Junior Training Colleges/Schools in East Pakistan include drawing as a subject in curriculum also requires a number of qualified Art Teacher and Art Lecturers. Thus successful students from the college have various openings either in business of their own or in suitable appointment in these above mentioned schools and colleges.[২৬]

এই উদ্ধৃতি থেকে আর্ট কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল চারুকলা বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়া। যাঁরা এখান থেকে শিক্ষা নেবেন, তাঁরা প্রধানত সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ডিজাইনার হিসেবে নিযুক্ত হবেন—এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৪৭ সালে ৫ নভেম্বর জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা বিভাগের কাছে পূর্ব বাংলায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব পেশ

[২৬] Prospectus of The East Pakistan College of Arts and Crafts, Ibid. p. 6

করেছিলেন, সেখানে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

> There is at the moment a very great demand for qualified drawing masters in High Schools as most of the drawing masters, being non-moslems, opted out for West Bengal. There is also bound to be an increasingly great demand from trade and industry for people specially trained in Industrial and Commercial Art, and Draftsmanship.[২৭]

এখানে দেখা যাচ্ছে আর্ট ইনস্টিটিউট যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেশে শিল্পশিক্ষার সূচনা করেছিল ১৫ বছর পরে কলেজ পর্যায়ে এসেও তার কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পশিক্ষার সূচনাও হয়েছিল অনুরূপ উদ্দেশ্যে। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল শিল্প সহায়ক দক্ষ কারিগর তৈরির জন্য। অর্থাৎ জীবিকার প্রয়োজনে। প্রায় শতাধিক বছর পরে সেই উদ্দেশ্য থেকে শিল্পশিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। শিল্পশিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই রয়ে গিয়েছিল। চাকরি বা শিল্পচর্চা করে অর্থ উপার্জনই ছিল এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ফলে এমন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করে নতুন কিছু বাস্তবায়ন করা কঠিন ছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৬ সালে আমিনুল ইসলামের সঙ্গে জয়নুল আবেদিনের কথোপকথনের অংশবিশেষ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে; যা তিনি (আমিনুল ইসলাম) *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> '...আমাদের সমস্যাটাকে দেখতে হবে তো। তা ছাড়াও আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাব্যবস্থা যা আমরা এতদিনে দাঁড় করিয়েছি ওটা তো রাতারাতি ভাঙা যাবে না। অধিকাংশ ছাত্রের বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল কাজ করেই জীবন ধারণ করতে হবে, তাই ওদের জন্য একাডেমিক শিক্ষাটা অতীব জরুরি। শুধু ভালো ছবি এঁকে জীবনধারণ করা এখানে সুদূর পরাহত। ...ওদের ভবিষ্যৎটা আমাদেরই দেখতে হবে।'[২৮]

জয়নুল আবেদিন এ ক্ষেত্রে 'ভবিষ্যৎ' বলতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার ইঙ্গিত করেছেন। আমিনুল ইসলামের এই স্মৃতিচারণা থেকে ধারণা করা যায়, ওই সময়ে এ দেশের শিল্পশিক্ষা কর্মমুখী হওয়ায় বাস্তববাদী অনুশীলনের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গুরুত্ব পায়নি।

আর্ট কলেজের শিক্ষায় একটি বড় সাফল্য ছিল তত্ত্বীয় শিক্ষা যুক্ত করা। তত্ত্বীয় শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলার ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালীন আধুনিক শিল্পের প্রবণতা সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়। শিল্পকলার বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কে তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের ফলে শিক্ষার্থীরা সমকালীন বিশ্ব

---

[২৭] পূর্ব বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ড. কুদরাত-এ-খুদা কর্তৃক শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে প্রেরিত Scheme for opening a Government Institute of Art in East Bengal, প্রাগুক্ত

[২৮] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

শিল্পে প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হন। তত্ত্বীয় শিক্ষা আর্ট কলেজকে নিছক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সমকালীন আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপনীত করে। পূর্ব বাংলার শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটা বড় অর্জন।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি : আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষক পদগুলো পুনর্বিন্যাস করা হয়। পদগুলো হলো ইস্ট পাকিস্তান হায়ার এডুকেশন সার্ভিস মর্যাদার একটি অধ্যক্ষ পদ, এডুকেশন সার্ভিস মর্যাদার চারটি প্রফেসর পদ, জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের সাতটি লেকচারার পদ, সাব-অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস মর্যাদার একটি ডিজাইনার এবং সাতটি শিক্ষক পদ।[২৯] উল্লেখ্য যে, তখন কলেজের প্রফেসর পদগুলো বর্তমান সহকারী অধ্যাপকের মর্যাদার ছিল। চারটি প্রফেসর পদ হলো—১. প্রফেসর অব ফাইন আর্ট, ২. প্রফেসর অব গ্রাফিক আর্ট, ৩. প্রফেসর অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এবং ৪. প্রফেসর অব কমার্শিয়াল আর্ট। উল্লিখিত পদগুলোতে পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রিসহ দশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয় পঁয়তাল্লিশ বছর।[৩০] ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর প্রফেসর অব ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে শফিকুল আমীন, প্রফেসর অব ফাইন আর্ট পদে আনোয়ারুল হক, প্রফেসর অব গ্রাফিক আর্ট পদে সফিউদ্দীন আহমেদ এবং প্রফেসর অব কমার্শিয়াল আর্ট পদে খাজা শফিক আহমেদ নিয়োগ পান।[৩১]

কলেজের নবগঠিত জনবল কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সাতটি লেকচারার পদ হলো—১. লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস, ২. লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট, ৩. লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট, ৪. লেকচারার ইন ফাইন আর্ট, ৫. লেকচারার ইন স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং, ৬. লেকচারার ইন ড্রাফটসম্যান এবং ৭. লেকচারার (কোনো বিষয় উল্লেখবিহীন)। এই সাতটি পদের মধ্যে প্রথম দুটি পদ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল সৃষ্ট। তৃতীয় পদটি ১৯৫৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এবং চতুর্থ পদটি ১৯৫৬ সালের ১০ জুলাই অনুমোদিত। পঞ্চম পদটি ১৯৫৭ সালের ১৩ অক্টোবর এবং ষষ্ঠ পদটি ১৯৫৯

---

[২৯] পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র (কপি অধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়), পত্র নং-১০৫২/১ শিক্ষা, তারিখ : ২১.১২.৬২, উৎস : প্রাগুক্ত

[৩০] ডিপিআইকে লেখা গভ. ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অধ্যক্ষের ২.২.১৯৬৩ তারিখে লেখা পত্র; যেখানে প্রফেসর নিয়োগের যোগ্যতা নিরূপণ করা হয়েছে, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৩১] পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলকে লেখা কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের অধ্যক্ষের পত্র, পত্রে তিনি (অধ্যক্ষ) প্রফেসর নিয়োগের বিষয়টি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলকে অবগত করে তাঁদের স্লিপ ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করেন, পত্রে তারিখ : ২৫.১.৬৪, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

সালের ১৩ আগস্ট অনুমোদিত ছিল। সপ্তম লেকচারার পদটি শুধু কলেজ হওয়ার সময় ১৯৬৩ সালের ৮ জুন অনুমোদিত হয়। উল্লিখিত পদগুলোর মধ্যে লেকচারার ইন স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং পদটি সাময়িকভাবে ফাইন আর্ট বিভাগে বদলি করার এবং লেকচারার ইন ড্রাফটসম্যানশিপ পদটির নাম পরিবর্তন করে লেকচারার ইন ফাইন আর্ট করার প্রস্তাব করা হয় শিক্ষা বিভাগে। এ ছাড়া নতুন অনুমোদিত লেকচারার পদটি লেকচারার ইন সিরামিক করার প্রস্তাব করা হয় ১৯৬৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর।[৩২] কারণ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ড্রাফটসম্যানশিপ বিভাগ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় আর্ট কলেজে ড্রাফটসম্যানশিপ বিভাগে লেকচারারের প্রয়োজন ছিল না। প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি পর্যায়ে ফাইন আর্ট বিভাগে অধিক শিক্ষার্থী হওয়ায় উল্লিখিত লেকচারার পদ দুটি পরিবর্তন করে ফাইন আর্টের লেকচারার করার সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া ইতোমধ্যে শুরু হওয়া মৃৎশিল্প বিভাগের জন্য একটি লেকচারার পদের জরুরি প্রয়োজন ছিল। তবে এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু নতুন পাস হওয়া লেকচারার পদটি সাময়িকভাবে লেকচারার ইন সিরামিক করা হয়। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে এ সময় কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। কলেজ হওয়ার পর পূর্বের সাব-অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের পদমর্যাদার লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস, লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট এবং লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদ তিনটি আপগ্রেড করে জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের মর্যাদার লেকচারার পদ করা হয়।[৩৩]

লেকচারার পদগুলোর নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাস এবং যেকোনো আর্ট ইনস্টিটিউট বা কলেজ থেকে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা অথবা পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সয়সসীমা ধার্য করা হয় পঁয়ত্রিশ বছর। প্রমোশনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় পাকিস্তান অথবা ভারতের যেকোনো স্বীকৃত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আর্ট ফাইনাল সার্টিফিকেট উত্তীর্ণ এবং আর্ট স্কুল বা কলেজে দশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা। সাত বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আর্ট ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষকের লেকচারার পদে আবেদনের সুযোগ রাখা হয়।[৩৪]

---

[৩২] শিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে লেখা ডিপিআইয়ের পত্র, পত্র নং : ৪৬৫ (আর অ্যান্ড ই), তারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৩৩] ডিপিআইয়ের সচিবকে লেখা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সেকশন অফিসারের লেখা পত্র, পত্র নং-৬৭০/১-শিক্ষা, তারিখ : ১৩.১০.১৯৬৩, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৩৪] পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সেকশন অফিসার কর্তৃক ডিপিআইকে লেখা পত্র, পত্র নং ৮৭০/২ (আর অ্যান্ড ই), তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

লেকচারার পদগুলোর মধ্যে লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে আমিনুল ইসলামকে বহাল রাখা হয়। লেকচারার ইন সিরামিক পদে মীর মোস্তফা আলী যোগদান করেন ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই। ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর মোহাম্মদ কিবরিয়া লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট পদে, কাজী আবদুল বাসেত লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে এবং আবদুর রাজ্জাক লেকচারার ইন স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং পদে যোগদান করেন। ওরিয়েন্টাল আর্ট ও ড্রাফটসম্যানশিপের লেকচারার পদ দুটি তখনো খালি ছিল। সাব-অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের পদের মধ্যে সমরজিৎ রায় চৌধুরীকে হেড ডিজাইনার পদে, সৈয়দ আলী আহসান ও মুস্তাফা মনোয়ারকে শিক্ষক পদে এবং হবিবুর রহমানকে উডকাট শিক্ষক পদে বহাল রাখা হয়। আবদুর রাজ্জাকের পদোন্নতিতে খালি হওয়া শিক্ষক পদে হাশেম খান যোগদান করেন ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর। তিনটি শিক্ষক পদ তখন খালি ছিল।[৩৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, আর্ট কলেজের সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হলেও এই শিক্ষক কাঠামোর মধ্যে তত্ত্বীয় বিষয়ের শিক্ষক পদ ছিল না। কলেজ হওয়ার পর এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে লেকচারার ইন হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন, লেকচারার ইন ইংলিশ এবং লেকচারার ইন সোশিওলজি পদ অনুমোদন করে যথাক্রমে এ কে এম আবদুল মতিন সরকার (১৯৪১–২০১৯), মতিউর রহমান ও বুলবন ওসমানকে (জন্ম : ১৯৪১) নিযুক্ত করা হয়।

প্রিলিমিনারি ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস কোর্স : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের প্রতিষ্ঠার সময় প্রবর্তিত দুই বছরের এলিমেন্টারি কোর্সটি পরিবর্তন করে এ সময় প্রিলিমিনারি ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস সংক্ষেপে প্রি-বিএফএ কোর্স করা হয়। এটি ছিল বেসিক কোর্স। এই পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। এই কোর্সটি ছিল উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্সের সমমানের। আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যায়ে এলিমেন্টারি বা প্রি-ডিগ্রি ছিল চিত্রকলানির্ভর; এখানে ড্রইং, স্কেচ, পারস্পেকটিভসহ চিত্রকলাবিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হতো প্রধানত পেনসিলে। এ ছাড়া কালি-কলম, কালি-তুলি, মনোক্রম জলরং ইত্যাদি মাধ্যমে ছবি আঁকা শেখানো হতো। এ ছাড়াও উডকাট শেখানো হতো। এ কারণে প্রি-ডিগ্রি পরিচালিত হতো প্রধানত ফাইন আর্ট বিভাগের শিক্ষকদের দ্বারা। কলেজ হওয়ার পর এই কোর্সে মডেলিং ও সিরামিক বিষয় যুক্ত হলে ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষকরাও এ পর্যায়ের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হন।

[৩৫] ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের শিক্ষক তালিকা, তারিখ : ১৮.৬.১৯৬৫, প্রাগুক্ত

কলেজ হওয়ার পর প্রি-বিএফএ ডিগ্রিতে সাধারণ ইংরেজি ও সভ্যতার ইতিহাস নামে দুটি তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত হয়। এ ছাড়া মডেলিং ও সিরামিকস নামে একটি ব্যবহারিক বিষয়ও রাখা হয়। ওই সময় ইংরেজি পড়ানোর জন্য লেকচারার ইন ইংলিশ পদে মতিউর রহমান এবং সভ্যতার ইতিহাস পড়ানোর জন্য লেকচারার ইন হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন পদে এ কে এম আব্দুল মতিন সরকারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। মডেলিং ও সিরামিকস বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন লেকচারার ইন মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচারে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আবদুর রাজ্জাক ও লেকচার ইন সিরামিকস মীর মোস্তফা আলী; আর গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন লেকচার ইন গ্রাফিক আর্টসে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ কিবরিয়া ও উডকাট শিক্ষক হবিবুর রহমান।

প্রি-বিএফএ সিলেবাস : নবগঠিত আর্ট কলেজের জন্য সিলেবাস পুনর্গঠন করা হয়। প্রি-ডিগ্রি সিলেবাসে নতুন করে তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হয় এবং প্রচলিত অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়গুলো কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করে নতুন করে সাজানো হয়। সিলেবাসে ছয়টি অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক কোর্স এবং দুইটি তত্ত্বীয় কোর্স রাখা হয়।[৩৬]

Priliminary BFA Syllabus[৩৭]

Type of Courses	SL. No.	Subjects	Marks
Theoretical	i)	General English	100
	ii)	History of Civilisation	100
Practical	iii)	Modelling or Ceramics	100
	iv)	Still Life with Foliage and Flowers	100
	v)	Composition with animal or bird	100
	vi)	Graphic Art	100
	vii)	Perspective	100
	viii)	Sketch	100
Total			800

প্রিলিমিনারি পর্যায় ছিল শিল্পশিক্ষার বেসিক কোর্স। প্রিলিমিনারি বিএফএ পর্যায়ে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং আর্ট

[৩৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের ১৯৬৩ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৩৭] Prospectus of the East Pakistan Collage of Arts and Crafts, Ibid, p. 3

কলেজের বিএফএ ডিগ্রি পর্যায়ে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে তার সঙ্গে সংগতি রেখেই প্রিলিমিনারি বিএফএর সিলেবাস তৈরি করা হয়। কলেজ পর্যায়ে পুনর্গঠিত সিলেবাস থেকে পূর্বের চার্ট ড্রইং বাদ দিয়ে পশু বা পাখির কম্পোজিশন যুক্ত করা হয় এবং নতুন করে মডেলিং অথবা সিরামিক বিষয়টি যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া তত্ত্বীয় বিষয়ে সাধারণ ইংরেজি ও সভ্যতার ইতিহাস যুক্ত করা হয়। ১৯৬৭–৬৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই শিক্ষাক্রমের সঙ্গে ১০০ নম্বরের ডিজাইন, লেটারিং এবং ব্ল্যাক বোর্ড ড্রইং যুক্ত হয়ে মোট ৯০০ নম্বরের সিলেবাস করা হয়।[৩৮]

কোর্স কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ আবশ্যিক ব্যবহারিক বিষয়গুলোর শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু; ১৯৬৭ সালের ৩০ অক্টোবরের ফ্যাকাল্টি সভায় অনুমোদিত হয়। এখানে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন গুরুত্ব পায়।

ক) প্রি-ডিগ্রির প্রথম বর্ষের শিক্ষার মাধ্যম হবে পেনসিল, পেন, ব্রাশ লাইন ও ফ্লাট কালার।
খ) পেনসিলের রেখার মাধ্যমে মাটির পাত্র ও তৈজসপত্র অঙ্কন ও অন্যান্য আকার ও আকৃতি অঙ্কন।
গ) রেখা, ফ্লাট ওয়াশ ও রঙের মাধ্যমে গাছপালা ও ফলমূল অঙ্কন।
ঘ) গোলাকৃতি, মই, ক্রস, ষড়ভুজ ইত্যাদি আকার-আকৃতি অঙ্কনের মাধ্যমে পরিপ্রেক্ষিতের অনুশীলন।
ঙ) অতিরিক্ত দক্ষতার জন্য মনোক্রম রঙের ওয়াশে পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলন।
চ) প্রি-ডিগ্রি প্রথম বর্ষে পেনসিল এবং দ্বিতীয় বর্ষে রঙের মাধ্যমে কম্পোজিশন অঙ্কন।
ছ) প্রি-ডিগ্রি প্রথম বর্ষ শেষে ব্রাশ লাইনে গাছপালার অনুশীলন।[৩৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম হবিবুল্লাহর পরামর্শ অনুযায়ী কোর্স কমিটি যথাক্রমে জেনারেল ইংলিশ ও হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন কোর্সের সিলেবাস তৈরি করেন।[৪০] ১৯৬৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় সিলেবাস দুটি গৃহীত হয়। জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে মান বণ্টন করা হয়, 'i) Essay-20, ii) Precis-15, iii) Letter Writing-15, iv) Text-50, Total=100 Marks' ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে পাঠ্য সাধারণ ইংরেজি টেক্সট বুক এবং ইংরেজি গ্রামার এ পর্যায়ে পাঠ্য করা হয়।

সভ্যতার ইতিহাসে পাঠ্য ছিল—ক) প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, খ) প্রাগৈতিহাসিক সমাজ, গ) মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য, ঘ) চীন ও জার্মান, ঙ) গ্রিক রোমান, চ) বাইজেন্টাইন, ছ) মধ্যযুগের ইউরোপ ও রেনেসাঁ এবং

[৩৮] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ৩০ আগস্ট ১৯৬৭, নথি নং-সি-৫১, উৎস : প্রাগুক্ত
[৩৯] প্রাগুক্ত
[৪০] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৬৪, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

জ) ইন্দো-পাক।[৪১] এই সিলেবাস ১৯৬৩–৬৪, ১৯৬৪–৬৫ এবং ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে মর্মে সভায় (২৫ ফেব্রুয়ারির ফ্যাকাল্টি সভায়) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৬৫ সালের ২৪ জুন অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় প্রিলিমিনারি বিএফএ ও বিএফএ ডিগ্রির কোর্সসমূহের নম্বর দুই ভাগে ভাগ করে সেশনাল মার্কস-৫০ এবং এক্সামিনেশন মার্কস-৫০ করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ নিয়ম কার্যকর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ব্যবহারিক কোর্সের সেশনাল মার্কস ৫০ এবং তত্ত্বীয় বিষয়ের সেশনাল মার্কস ২৫ করা হয়। ১৯৬৬–৬৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ নিয়ম কার্যকরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪২]

১৯৬৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় প্রি-ডিগ্রির মডেলিং অথবা সিরামিকস কোর্সের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুমোদিত হয়। প্রি-ডিগ্রি প্রথম বর্ষে মডেলিং কোর্সে শিক্ষণীয় ছিল : মডেলিংয়ের ভূমিকা, কার্ভিং, টেরাকোটা, রিলিফ এবং কাদামাটি, কাঠ, ধাতুসহ ভাস্কর্যের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে তত্ত্বীয় শিক্ষা প্রদান। মডেলিংয়ের জন্য উপকরণ ও কাদামাটি প্রস্তুতকরণ এবং মডেলিং সংরক্ষণ। কাদামাটি দিয়ে গোলক, নলাকার, ঘনক, ডিম্বাকৃতি, বর্গাকার ইত্যাদি ফর্ম তৈরি। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মূর্তি, টেরাকোটা এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর অনুকৃতি তৈরি করা।

দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষণীয় ছিল—বক্র, অবতল, উত্তল, ফাঁকা এবং সলিডসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত ফর্ম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। কাদামাটি দিয়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুশীলন করা। যেমন : নাক, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সকল চিত্রাঙ্কন অনুশীলন।

সিরামিক কোর্সে প্রথম বর্ষে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল—হাতে টিপে শিল্পবস্তু তৈরির পদ্ধতি (Pinch method), মাটি প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি (Coil method), স্ল্যাব তৈরির পদ্ধতি (Slab method), ঐতিহ্যবাহী পুতুল তৈরি পদ্ধতি (Doll 'making' Traditional Shapes) এবং মৃৎশিল্প বস্তু তৈরির জন্য কাদামাটি তৈরি পদ্ধতি। দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষণীয় ছিল—কাদামাটি তৈরি, স্লাব তৈরির পদ্ধতি, ঐতিহ্যবাহী পুতুল তৈরি এবং বিস্কিট ফায়ার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।[৪৩]

---

[৪১] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৪২] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২৪ জুন ১৯৬৫ এবং ২৫ আগস্ট ১৯৬৬, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

[৪৩] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস কোর্সের বিভাগসমূহ

১৯৬৪–৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আর্ট কলেজে বিএফএ কোর্সের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রি-বিএফএর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএফএ কোর্সের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীদের দাবির কারণে ১৯৬২–৬৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৬৪–৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএফএ কোর্সের কার্যক্রম শুরু করতে হয়। অনুমোদিত ছয়টি বিভাগের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে পূর্ণাঙ্গরূপে বিএফএ কোর্সের কার্যক্রম শুরু হয়। গ্রাফিক আর্ট, স্কাল্পচার এবং ক্রাফটস্ অ্যান্ড মৃৎশিল্প বিভাগ শুধু ঐচ্ছিক বিষয় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভাস্কর্য বিভাগ, ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মৃৎশিল্প বিভাগ এবং ১৯৭৭–৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রাফিক আর্ট বিভাগে বিএফএ কোর্সের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

শিল্পী হাশেম খান

শিল্পী রফিকুন নবী

চিত্র-৩৫ : কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ে ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষক

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ (Department of Drawing and Painting) : বিভাগটি আর্ট কলেজের অন্যতম প্রাচীন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক দিয়ে বৃহৎ বিভাগ। ১৯৫০ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে অ্যাডভান্সড কোর্সে প্রথম যে দুটি বিভাগ খোলা হয় তার মধ্যে প্রথম ক্রমিকে ছিল এই বিভাগের নাম। তখন বিভাগটির নাম ছিল ফাইন আর্ট বা সুকুমার কলা। কলেজ পর্যায়ে এসে এর পরিবর্তিত নাম হয় ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বা অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ। বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আনোয়ারুল হক কলেজ বাস্তবায়নের পরেও এই পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পুনর্গঠিত অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের শিক্ষক ও সিলেবাস সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

চিত্র-৩৬ : অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, উৎস : কনটেম্পররি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১

এই বিভাগে আমিনুল ইসলাম লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে, কাজী আবদুল বাসেত লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে এবং মুস্তাফা মনোয়ার ও হাশেম খান শিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। কলেজ বাস্তবায়নের পর ১৯৬৪ সালের ৩ আগস্ট রফিকুন নবী এই বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[৪৪] তিনি ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের দ্বাদশ ব্যাচের (১৯৫৯–৬০ শিক্ষাবর্ষের) ছাত্র। ১৯৬৪ সালে তিনি ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পাস করার অব্যবহিত পরেই জয়নুল আবেদিনের আহ্বানে তিনি আর্ট কলেজে যোগদান করেন।[৪৫] শিক্ষার্থী হিসেবে বিএফএ প্রথম ব্যাচে (১৯৬৪–৬৫ শিক্ষাবর্ষ) এই বিভাগে ভর্তি হন হামিদুজ্জামান খান, মাহামুদা খাতুন, আনিসুর রহমান, মেজবাহউদ্দিন প্রমুখ। দ্বিতীয় ব্যাচে ভর্তি হন মাহমুদুল হক, সৈয়দ আবুল বারক আল্‌ভী, মিজানুর রহিম, রেজাউল করিম, আব্দুল মান্নান, শাহাদাৎ আলী চৌধুরী, মনোজ বাবু মিশ্র প্রমুখ।[৪৬] ফাইন আর্ট বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো কলেজের মূল ভবনের (দ্বিতল ভবন) তিনটি কক্ষে। বর্তমানে যে কক্ষটি বিভাগের ‘টিচার্স রুম’ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি ছিল ওই সময়ে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের শ্রেণিকক্ষ। দ্বিতীয় তলার মাঝখানের কক্ষটিতে দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষের ক্লাস হতো এক তলার পূর্ব পাশের প্রথম কক্ষে।

---

[৪৪] শিল্পী রফিকুন নবীর সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করা আবেদন ফরম ও জীবনবৃত্তান্ত, তারিখ : ১৩.০৪.১৯৮৫, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[৪৫] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, প্রাগুক্ত

[৪৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৬৮ সালের বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল পত্র, তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

সিলেবাস : আর্ট কলেজের বিএফএ ডিগ্রির জন্য আটটি বিষয় নিয়ে ৮০০ নম্বরের সিলেবাস পুনর্গঠন করা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রতিটি ১০০ নম্বরের দুটি আবশ্যিক তত্ত্বীয় বিষয়, ১০০ নম্বরের পাঁচটি ব্যবহারিক বিষয় এবং ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয়। ১৯৭০ সাল থেকে সকল বিভাগের সিলেবাসে ১০০ নম্বরের 'স্কেচ' বিষয়টি যুক্ত করে নম্বর ৯০০ করা হয়। তত্ত্বীয় বিষয় দুটো প্রতি বিভাগে পাঠ্য ছিল। অনুমোদিত ছয়টি বিভাগ গ্রুপ 'এ' ও গ্রুপ 'বি' এই দুটি ভাগে ভাগ করে সিলেবাস তৈরি করা হয়। 'এ' গ্রুপের শিক্ষার্থীরা 'বি' গ্রুপ থেকে এবং 'বি' গ্রুপের শিক্ষার্থীরা 'এ' গ্রুপ থেকে পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে পারতেন।

গ্রুপ-এ : (১) ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, (২) কমার্শিয়াল আর্ট ও (৩) ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ।

গ্রুপ-বি : (১) মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার, (২) গ্রাফিক আর্ট ও (৩) ক্রাফটস্ অ্যান্ড সিরামিক বিভাগ।

Syllabus for BFA Final Exam (Since–1968)

Department of Drawing and Painting[৪৭]

Type of Courses	**SL. No.**	**Subjects**	**Marks**
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Drawing	100
	4.	Painting (Oil)	100
	5.	Still Life (Oil)	100
	6.	Portrait Painting (Oil)	100
	7.	Composition (Oil)	100
	8.	Sketch (from 1970)	100
	9.	Any one of the paper from Group-B	100
Total Marks			900

হিস্টোরি অব আর্ট ও সোশিওলজি কোর্সের ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালের বিএফএ পরীক্ষার জন্য ১৯৬৬ সালে সিলেবাস তৈরি করা হয়। উক্ত সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয়ের মান বণ্টন ছিল লিখিত-৭৫, শ্রেণির কাজ-১৫ এবং মৌখিক-১০, মোট ১০০ নম্বর।

[৪৭] Syllabus for B.F.A Final Exam. (Since 1968), File No. C-51, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেবাসে শিল্পকলার ইতিহাসে পাঠ্য বিষয়কে প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, রেনেসাঁ এবং প্রাচ্যশিল্পের ইতিহাস—এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের মধ্যে পলিওলিথিক, নিয়োলিথিক এবং প্রিমিটিভ শিল্প; দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে মিশরীয়, মেসোপটেমীয়, গ্রিক ও রোমান শিল্প; তৃতীয় ভাগে মধ্যযুগীয় শিল্পের মধ্যে আরলি খ্রিষ্টান, বাইজেন্টাইন, রোমানেস্ক ও গথিক শিল্প; চতুর্থ ভাগে রেনেসাঁ, পোস্ট-রেনেসাঁ এবং বিশ শতকের আধুনিক শিল্প; পঞ্চম ভাগে ভারতীয়, চাইনিজ ও জাপানিজ এবং পাকিস্তান শিল্প সম্পর্কে পড়ানো হতো।[৪৮]

সমাজতত্ত্বের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে সমাজতত্ত্বের উপাদান (Elements of Sociology) এবং সমাজতত্ত্ব ও শিল্প (Art & Sociology)—এই দুটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে ছিল সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সভ্যতা, শিক্ষা, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। এ ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক এবং পরবর্তী পর্যায়ের অগ্রবর্তী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা; যেমন : পরিবার, আত্মীয়তা, সম্পদ, সামাজিক স্তর বিন্যাস, আইন ও সরকার, ধর্ম ও আচার, ভাষা ও জনগণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

ওরিয়েন্টাল আর্ট পর্বে ছিল প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ও ব্যাবিলন শিল্পশিক্ষা, ক্লাসিক্যাল গ্রিক আর্ট, অজান্তা ও ইলোরা এবং এথেন্স ও গ্রিক আর্টের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। এর পরে মুঘল, রাজপুত ও পূর্ব পাকিস্তান চিত্রকলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট; পূর্ব পাকিস্তানের লোকশিল্প ও সংস্কৃতি; সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়বস্তু; আধুনিক শিল্পের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগ (Department of Commercial Art) : আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠালগ্নে অনুমোদিত বিভাগগুলোর মধ্যে অন্যতম বিভাগ হলো কমার্শিয়াল আর্ট বা বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগ। ১৯৫০ সালে কামরুল হাসানকে প্রধান করে অ্যাডভান্সড পর্বে এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৬০ সালে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের চাকরি ছেড়ে ডিজাইন সেন্টারে যোগ দিলে খাজা শফিক আহমেদ এ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ব্যবহারিক ও বাণিজ্য শিল্পনির্ভর এই বিভাগে শুরুতে স্কেচ, ক্যালেন্ডার ডিজাইন, প্রেস লে-আউট, পোস্টার ডিজাইন, লিথোগ্রাফে বুক কভার ডিজাইন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। কলেজ হওয়ার পর সিলেবাস পুনর্গঠিত করা হলেও শিক্ষক পদগুলোয় বিশেষ পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে এই বিভাগের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় এ পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সিলেবাস সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

---

[৪৮] ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ সালের বিএফএ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হিস্টোরি অব আর্টের বিস্তারিত সিলেবাস, নথি নং ও উৎস : প্রাগুক্ত

আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করার সময় খাজা শফিক আহমেদকে হেড ডিজাইনার পদ থেকে পদোন্নতি দিয়ে প্রফেসর ইন কমার্শিয়াল আর্ট পদে এবং সমরজিৎ রায় চৌধুরীকে শিক্ষক পদ থেকে হেড ডিজাইনার পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৪ সালের ৩ আগস্ট মো. জমির উদ্দীন কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে শিক্ষক পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হন। তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৯৫৯–৬০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে পাস করেন। ১৯৬৪–৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি কার্যক্রম শুরু হয়। এই ব্যাচে শিক্ষার্থী ছিলেন নিখিল হালদার, আবদুস সাত্তার, আবদুল কাদের প্রমুখ। ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় ব্যাচে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে ডিগ্রিতে ভর্তি হন আলাউদ্দীন আহাম্মেদ, এ কে এম মাহতাব, ফরিদ আহমেদ, মতিউর রহমান, আব্দুস সাত্তার, আশফাকুল আশেকীন প্রমুখ।[৪৯]

চিত্র-৩৭ : কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১

এ সময় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো বর্তমানে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের দ্বিতল ভবনের সিঁড়িসংলগ্ন নিচতলার একটি এবং দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে। নিচতলার কক্ষে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের এবং দ্বিতীয় তলার কক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ক্লাস হতো। ১৯৭২ সালে বিভাগটি বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়।[৫০]

---

[৪৯] ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অধ্যাপক মিজানুর রহিম এবং শিল্পী আব্দুল মান্নানের সঙ্গে মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ২৪.৩.২০২০

[৫০] Shifa Farhana, “Graphic Design Department, Editor : Lala Rukh Selim,” *Art*, Dhaka, Oct-Dec, 1998, P. 22

সিলেবাস

BFA Degree Syllabus (Since–1968)

Department of Commercial Art[৫১]

Type of Courses	SL. No.	Subjects	Marks
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Poster Design	100
	4.	Press Layout	100
	5.	Calendar Design or Package Design	100
	6.	Illustration	100
	7.	Life study	100
	8.	Sketch (from 1970)	100
	9.	Any one of the paper from Group-B	100
Total Marks			900

পূর্ববর্তী সিলেবাসের সঙ্গে এই সিলেবাসের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বের সিলেবাসে পাঁচটি ব্যবহারিক বিষয়ের স্থলে নতুন সিলেবাসে দুটি তত্ত্বীয় ও সাতটি ব্যবহারিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বের সিলেবাসের পোস্টার ডিজাইন, প্রেস লে-আউট, ক্যালেন্ডার ডিজাইন, স্কেচ ও লিথোগ্রাফে কভার ডিজাইনের মধ্যে নতুন সিলেবাসে পোস্টার ডিজাইন, প্রেস লে-আউট বিষয় দুটি ঠিক রাখা হয়েছে; ক্যালেন্ডার ডিজাইনের সঙ্গে নতুন করে প্যাকেজ ডিজাইন যুক্ত করে ক্যালেন্ডার ডিজাইন অথবা প্যাকেজ ডিজাইন করা হয়েছে। স্কেচ বাদ দিয়ে নতুন করে ইলাস্ট্রেশন ও লাইফ স্টাডি বিষয় দুটো সিলেবাসে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া লিথোগ্রাফ বাদ দিয়ে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে ‘বি’ গ্রুপের যেকোনো একটি বিষয়কে (মডেলিং, গ্রাফিক আর্ট অথবা ক্রাফটস্ অ্যান্ড সিরামিক)।

৩. প্রাচ্যকলা বিভাগ (Department of Oriental Art) : ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল আর্ট বা প্রাচ্যকলা বিভাগ শফিকুল আমীনকে বিভাগীয় প্রধান করে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার পরে তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি এ সময় পদোন্নতি পেয়ে প্রফেসর ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়নি। আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যায়ে এখানে একজন মাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন—এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভাগের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হওয়ায় এ পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের পরবর্তী ঘটনাসমূহের উল্লেখ করা হলো। শফিকুল আমীনের পদোন্নতির

[৫১] Syllabus for B.F.A Final Exam. (Since 1968) Ibid.

ফলে খালি হওয়া লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে ১৯৬৫ সালের ১ মার্চ এডহক ভিত্তিতে রশিদ চৌধুরী যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি (রশিদ চৌধুরী) আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক পদে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৬০ সালে তিনি ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে প্যারিসে যান। সেখানে একাডেমি অব জুলিয়ান অ্যান্ড বোজ আর্টস থেকে ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য ও ট্যাপিস্ট্রি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা শেষে ১৯৬৪ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালে ফ্রান্সের এক রমণীকে বিয়ে করেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আইন অনুযায়ী সরকারি চাকরিজীবীদের বিদেশি স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ১৯৬৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি চাকরিচ্যুত হন।[৫২]

১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাচ্যকলা বিভাগে বিএফএ ডিগ্রিতে একমাত্র ছাত্র মো. তাজুল ইসলাম ভর্তি হন। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি রশিদ চৌধুরীর ট্যাপিস্ট্রি ও ড্রইং দেখে মুগ্ধ হয়ে মূলত তাঁর (রশিদ চৌধুরী) সান্নিধ্যে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু রশিদ চৌধুরীর হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় তিনি শিক্ষক সংকটে পড়েন। শফিকুল আমীন বিভাগীয় প্রধান হলেও তিনি প্রশাসনিক কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। ফলে বিভিন্ন শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে ১৯৬৮ সালে তিনি এ বিভাগ থেকে বিএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন।[৫৩] ওই সময়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় এই বিভাগের সাবেক ছাত্র এবং অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তারের লেখায়। তিনি লিখেছেন—

> প্রি-ডিগ্রি পাস করার [১৯৬৮ সালে] পর আমি প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হতে চাইলে তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব আনোয়ারুল হক বাধা দিয়ে বলেন, প্রাচ্যকলা বিভাগটি বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে কোনো ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক নেই। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে অনানুষ্ঠানিকভাবে দু'জন প্রাচ্যকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে খাজা শফিক আহমেদের স্ত্রী এবং তাজুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দু'জনের সময় প্রকৃত অর্থে বিভাগ বন্ধই ছিল এবং কোনো শিক্ষকও ছিলেন না। অন্য বিভাগের কোনো কোনো শিক্ষক তাঁদের সাহায্য করেছেন।[৫৪]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে ড. আব্দুস সাত্তার লিখেছেন, 'ইতোপূর্বে অনানুষ্ঠানিকভাবে দুজন প্রাচ্যকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৮ সালে প্রাচ্যকলা বিভাগে ভর্তি হওয়া কিশোয়ার মমতাজ এবং ১৯৬৫ সালে ভর্তি হওয়া তাজুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি হয়ে তাঁদের শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন।

---

[৫২] শিল্পী রশিদ চৌধুরীর আর্ট কলেজে এডহক ভিত্তিতে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ১ মার্চ ১৯৬৫ এবং ডিপিআই কর্তৃক লেখা রশিদ চৌধুরীর চাকরি থেকে অব্যাহতির অফিস আদেশ, পত্র নং ৩৫/৩-সি, তারিখ : ১০.৮.৬৮

[৫৩] ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী শিল্পী তাজুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২৮.৬.২০২০

[৫৪] ড. আব্দুস সাত্তার, "প্রাচ্যকলা বিভাগ যেভাবে সচল হলো", *প্রাচ্যকলার ৬০ বছর-পুনর্মিলনীর স্মরণিকা*, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫, পৃ. ১৪

তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন সংক্রান্ত রেগুলেশন ফরমে ওরিয়েন্টাল আর্টের শিক্ষার্থী হিসেবে কিশোয়ার মমতাজের নাম উল্লেখ রয়েছে।[৫৫] আর তাজুল ইসলাম যখন ভর্তি হয়েছেন তখন প্রাচ্যকলা বিভাগের ডিগ্রি পর্যায়ের অনুমোদিত সিলেবাস ছিল এবং বিভাগীয় প্রধানও নিয়োজিত ছিলেন। তবে এ কথা ঠিক যে, ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে শফিকুল আমীন আর্ট কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলে বিভাগটি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে। এই শিক্ষকশূন্য বিভাগে বিএফএ ডিগ্রিতে ১৯৬৮ সালে ভর্তি হয়েছিলেন আব্দুস সাত্তার। শিক্ষকশূন্য থাকার সাত মাস পরে হাশেম খান শিক্ষক পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে যোগদান করেন।[৫৬] এরপর তাঁর নেতৃত্বেই বিভাগটি পরিচালিত হতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই বিভাগে ভর্তি হন রফিক আহমেদ (শিক্ষাবর্ষ : ১৯৬৮–৬৯), মোহাম্মদ তাসাদ্দুক হোসেন (শিক্ষাবর্ষ : ১৯৬৮–৬৯), লক্ষ্মণকুমার সূত্রধর (শিক্ষাবর্ষ : ১৯৬৯–৭০) প্রমুখ।

সিলেবাস

Syllabus for BFA Final Exam (Since–1968)

Department of Oriental Art

Type of Courses	SL. No.	Subjects	Marks
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Drawing	100
	4.	Comparative study of composition in different Oriental styles	100
	5.	Study of the methods and memories of old oriental masters	100
	6.	Compositions	100
	7.	Outdoor study (Landscape & figure)	100
	8.	Sketch (from 1970)	100
	9.	Any one of the paper from group-B	100
Total Marks			900

[৫৫] গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষার্থীদের ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনসংক্রান্ত রেগুলেশন ফরম, এখানে কিশোয়ার মমতাজকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাগুক্ত

[৫৬] শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

৪. কারুকলা ও মৃৎশিল্প বিভাগ (Department of Crafts and Ceramics) : ১৯৬৩ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট সরকারি কলেজে উন্নীত হওয়ার সময় সিরামিকস ও ক্রাফটস্ এই দুটি বিভাগ একত্র করে ক্রাফটস্ অ্যান্ড সিরামিক বিভাগ গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার সময় সপ্তম বিভাগ হিসেবে ক্রাফটস্ বিভাগ অনুমোদিত হয় এবং ১৯৬১ সালে একটি সিরামিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনা হয়। এই প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাপানি শিল্পী কইচি তাকিতা এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের সাবেক ছাত্র (১৯৫০–৫১ শিক্ষাবর্ষের) মীর মোস্তফা আলী। দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের শিক্ষার্থী ছিলেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের ছাত্র হাশেম খান, গোপেশ মালাকার, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তফা শওকত কামাল, জোবাইদা ইসলাম এবং পাল পরিবার থেকে আসা মরণচাঁদ পাল। পূর্বে এই কোর্স সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে ক্রাফটস্ বিভাগ অনুমোদিত হলেও গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস পর্যায়ে (১৯৪৮–৬২) বিভাগটি খোলা হয়নি। ওই সময় জয়নুল আবেদিন কারুশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রদর্শনী ও কারুশিল্পীদের পুরস্কারের ব্যবস্থাসহ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অভাবসহ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে কারুকলা বিভাগ বা কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি।

নবগঠিত ক্রাফটস্ অ্যান্ড সিরামিকস বা কারুকলা ও মৃৎশিল্প বিভাগের প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই লেকচারার ইন সিরামিকস পদে নিয়োগপ্রাপ্ত মীর মোস্তফা আলী। যিনি ইতোপূর্বে সিরামিকস প্রকল্পে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিভাগটি ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের ১ জুন এখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন মরণচাঁদ পাল (১৯৪৫–২০১৩)।[৫৭] ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন তাঁকে আর্ট ইনস্টিটিউটের সিরামিক প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত (১৯৬১-৬২) প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে এই কোর্স সম্পন্ন করেন। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প তৈরিতে তাঁর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে জয়নুল আবেদিন তাঁকে মৃৎশিল্প বিভাগে নিযুক্ত করেছিলেন।

নবগঠিত বিভাগের নাম ক্রাফটস্ অ্যান্ড সিরামিকস হলেও এই বিভাগের কার্যক্রম সিরামিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; বলা যায় মৃৎশিল্প বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে নতুন আঙ্গিকে প্রি-

---

[৫৭] চারুকলা ইনস্টিটিউটের সিঅ্যান্ডডি কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ, তারিখ ৯.৫.২০০৬, পরিচালক অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান স্বাক্ষরিত; সিদ্ধান্তে মরণচাঁদ পাল অবসরে যাওয়ার পূর্বে তাঁকে প্রভাষক পদে পদোন্নতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়, উক্ত সুপারিশে তাঁর যোগদানের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৫ সালের ১ জুন

ডিগ্রি ও ডিগ্রি পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস করা হয়েছিল শুধু মৃৎশিল্প বিভাগের জন্য। এই সিলেবাসে সিরামিকের কোর্সের সঙ্গে ক্রাফটসের কোর্সের কোনোরূপ সমন্বয় করা হয়নি। সিলেবাসে ক্রাফটস্‌কে আলাদাভাবে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্‌ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় বিভাগটির নাম Crafts and Ceramics লিখিত হলেও মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রে এবং ফ্যাকাল্টির মিটিংসমূহে বিভাগটির নাম সিরামিকসই লিখিত হয়েছে।

মৃৎশিল্প বিভাগ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ বিভাগে পরিণত হয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো ১৯৬১–৬২ সালে সিরামিক প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত সিরামিকস কোর্স, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো বিকল্প ও ঐচ্ছিক কোর্স পর্যায়; এ সময়ের শুরু ১৯৬৩ সাল থেকে। আর্ট কলেজের নবগঠিত সিলেবাসে প্রি-ডিগ্রিতে ‘মডেলিং’ অথবা ‘সিরামিকস’ বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি কোর্স রাখা হয়। ওই কোর্স শিক্ষাদানের মাধ্যমে ১৯৬৩ সাল থেকে মৃৎশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় মডেলিং অথবা সিরামিকসের মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় নিতে হতো। ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাসে ‘এ’ গ্রুপের অর্থাৎ ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্টের শিক্ষার্থীদের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সিরামিকস কোর্স শিক্ষণীয় ছিল, যা ১৯৬৪ সাল থেকে ডিগ্রি পর্যায়ে চালু হয়। এভাবে ঐচ্ছিক কোর্সের শিক্ষার মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায় হলো ‘সিরামিকস সার্টিফিকেট কোর্স’ পর্যায়; এ পর্যায়ে বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সিরামিকস বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি কোর্স করানো হতো। এই কোর্সে সরাসরি মৃৎশিল্প বিভাগে ভর্তি হতে হতো; প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। মৃৎশিল্প বিভাগের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু হয়ে সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের শিক্ষার্থী ছিলেন আব্দুর রশিদ ভূইয়া, আশফাক ওসমান, মাজহারুল হক সিদ্দিক, গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রউফ, নাসরিন রহমান, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।[৫৮]

[৫৮] ১৯৬৫ সালে শিক্ষার্থীদের তালিকা, সেখানে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে আব্দুর রশিদ ভূইয়া ও আশফাক ওসমানের নামের উল্লেখ রয়েছে এবং সিরামিকস সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের টেবুলেশন শিট, মীর মোস্তফা আলী ও মরণচাঁদ পাল স্বাক্ষরিত, তারিখ ১.৬.১৯৬৭ এবং ৩০.৮.৬৯, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্র-৩৮ : মৃৎশিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন মীর মোস্তফা আলী, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

চতুর্থ পর্যায় হলো ডিপ্লোমা কোর্স পর্যায়; এ সময়ে তিন বছর মেয়াদি 'ডিপ্লোমা ইন সিরামিকস' কোর্স চালু হয়। সার্টিফিকেট কোর্স বন্ধ করে এই কোর্স শুরু করা হয়েছিল ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে। এই কোর্স তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল, যেখানে মীর মোস্তফা আলীসহ কলেজের সিনিয়র শিক্ষক এবং পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মীর মোস্তফা আলীর অনেক চেষ্টার পর ১৯৭৯ সালে 'সরকার এই কোর্সের কোনোরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেবে না' শর্তে ডিপ্লোমা কোর্স চালু রাখার অনুমতি দেয়।[৫৯] ইতোমধ্যে ডিগ্রি বিএফএ কোর্স চালু হওয়ায় সেখানে ভর্তির জন্য ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীরা দাবি জানাতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯–৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস কোর্সে ন্যূনতম ৫০% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সিরামিক বিষয়ে বিএফএ ডিগ্রিতে ভর্তির সুযোগ পান।[৬০] সিরামিক ডিগ্রি কোর্স চালু হওয়ার পরও কয়েক বছর ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল।

[৫৯] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টা এস এম সাইফুদ্দীন কর্তৃক জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং-৪/২ সি-১২৫/৭৮/১-শিক্ষা, তারিখ : ২৩.১.১৯৭৯, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৬০] ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২২.১০.১৯৭৯ তারিখে অধ্যক্ষের কাছে লেখা পত্র, পত্রে উল্লেখ করা হয় ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিরামিকসে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% নম্বর থাকা সাপেক্ষে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়, পত্রের মূল বিষয় ছিল নম্বর শিথিল করে দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিএফএ কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া, পত্রে ৩২ জন শিক্ষার্থী স্বাক্ষর করেন; উৎস : প্রাগুক্ত

পঞ্চম পর্যায় হলো বিএফএ ডিগ্রি পর্যায়; ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।[৬১] এভাবে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে এ বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি কোর্স চালু হয়।

সিলেবাস

ক) সিরামিকস সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাস

SL. No.	Subjects	Marks
1.	Design	100
2.	Working on Wheel	100
3.	Moul making and casting	100
4.	Ceramic Sculpture and Modelling	100
5.	Glazing	100
6.	Firing, Packing and Unpacking the Kiln	100
Total Marks		600

সার্টিফিকেট কোর্সে ছয়টি বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এর বাইরে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন করণ-কৌশল ও মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রথম বর্ষে শিক্ষণীয় ছিল বিভিন্ন আকৃতির ড্রইং, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন পাত্রের নকশা আঁকা, জাদুঘর থেকে ঐতিহ্যবাহী নকশার অনুশীলন, হুইলের মাধ্যমে ফুলদানিসহ বিভিন্ন আকৃতির পাত্র তৈরি, ক্লে প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষণীয় ছিল হুইলের কাজ, নিত্যব্যবহার্য পাত্র তৈরি, জাদুঘর থেকে অনুশীলন, পোড়ানোর জন্য চুল্লি সাজানো, গ্লেজ তৈরি, ডিজাইন, সরাসরি ব্যক্তি বা বস্তু থেকে ড্রইং, মৃৎ ভাস্কর্য তৈরি এবং টাইলস তৈরি ও মোজাইক ডিজাইন। তৃতীয় বর্ষে ছিল গ্লেজ টেস্ট, টাইলস তৈরি ও মোজাইক, মৃৎ ভাস্কর্য, মডেল তৈরি, বিভিন্ন মৃৎপাত্র তৈরি (টি-সেট, ডিশ, ফুলদানি), ডিশ সেট ডিজাইন এবং হুইলের মাধ্যমে ডিশ সেট তৈরি, ফরসিলিন ও স্টোনওয়্যার প্রস্তুতকরণ; বিস্কিট ফায়ার, গ্লেজিং, গ্লেজ ফায়ারিং এবং গ্লেস মিক্সিং। সার্টিফিকেট কোর্সে তত্ত্বীয় কোনো বিষয় শিক্ষণীয় ছিল না।

সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষার্থীদের প্রমোশনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ শেষে ৬০০ নম্বরের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তৃতীয় বছর শেষে ৬০০ নম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হতো।[৬২]

---

[৬১] মৃৎশিল্প বিভাগের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী আখতারুন্নাহারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৪.৩.২০২০; আলাউদ্দীন আহাম্মেদের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ৮.১২.২০২০

খ) ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস কোর্সের সিলেবাস

1st Year

SL. No.	Subjects	Marks
01.	Design	100
02.	Working on Wheel	100
03.	Making Mould & Casting	100
04.	Ceramics Sculpture	100
05.	Arranging of Kiln	100
06.	Drawing of human Figure	100
07.	Use of glaze	100
08.	Sketch	100
09.	History of Civilisation	100
10.	Ceramic Chemistry	100
Total Marks		1000

এই সিলেবাস অনুযায়ী তিন বছর শিক্ষা শেষে ডিপ্লোমা-ইন সিরামিকসের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। এই সিলেবাসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তত্ত্বীয় বিষয় সভ্যতার ইতিহাস ও মৃৎশিল্পের রসায়ন যুক্ত করা।[৬৩]

গ) বিএফএ ডিগ্রি সিলেবাস

Syllabus for BFA Exam. (Since – 1968)[৬৪]

Department of Ceramics

Type of Courses	SL. No.	Subjects	Marks
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Glaze Mixing application	100
	4.	Ceramics Sculpture	100
	5.	Decoration	100
	6.	Making Tree Shapes in Stone ware, Earthen ware and Porcelin	100
	7.	Packing and Unpacking of Kiln and Firing	100
	8.	Sketch (from 1970)	100
	9.	Any one of the paper from group-A	100
Total Marks			900

[৬২] সিরামিকস সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাস, উৎস : মো. রবিউল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত

[৬৩] চারুকলা অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক স্বপন কুমার শিকদারের ২২.৫.১৯৮৩ তারিখে আর্ট কলেজ থেকে ইস্যুকৃত ডিপ্লোমা ইন সিরামিকস কোর্সের নম্বরপত্র, উৎস : সিরামিকস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৬৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাস, সিলেবাসটি ১৯৬৮ সাল থেকে আর্ট কলেজে কার্যকর হয়েছিল, প্রাগুক্ত

৫. গ্রাফিক আর্ট বিভাগ (Department of Graphic Art) : ১৯৪৮ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের যে সাতটি বিভাগ অনুমোদিত হয় তার মধ্যে তৃতীয় বিভাগ ছিল গ্রাফিক আর্ট বিভাগ। কিন্তু ১৯৬৩ সালে কলেজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভাগটি খোলা হয়নি। ওই সময়ে 'গ্রাফিক আর্ট' ও 'লিথোগ্রাফ' নামে দুটি কোর্স যথাক্রমে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে শিক্ষণীয় ছিল। ১৯৫৫ সালের পর থেকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগেও বিষয়টি শিক্ষণীয় ছিল। এ ছাড়া এলিমেন্টারি পর্বে উডকাট আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে সফিউদ্দীন আহমেদ এবং উডকাট শিক্ষক হবিবুর রহমান গ্রাফিক আর্ট বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। প্রিন্ট নেওয়াসহ টেকনিক্যাল কাজের জন্য নিয়োজিত ছিলেন প্রেসম্যান শেখ আনোয়ার।

১৯৬৩ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হওয়ার পর সফিউদ্দীন আহমেদকে প্রফেসর অব গ্রাফিক আর্টে পদোন্নতি দিয়ে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৫৮ সালে লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে এচিং ও কপার এনগ্রেভিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করেন। তাঁর ছেড়ে আসা লেকচারার ইন গ্রাফিক আর্ট পদে নিযুক্ত হন শিক্ষক মোহাম্মদ কিবরিয়া। উডকাট শিক্ষক পদে হবিবুর রহমান পদোন্নতি পেয়ে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। নতুন গঠিত এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমান প্রিন্টমেকিং বিভাগের দক্ষিণ পাশের তিনটি কক্ষ নিয়ে।

উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার শুরু থেকে গ্রাফিক আর্টের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষণীয় ছিল। অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের প্রথম পর্যায় থেকে উড-এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফ বিষয় দুটি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছবি মুদ্রণের জন্য দক্ষ শিল্পী/কারিগর তৈরির জন্য এই দুটি বিষয়ে শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। অধ্যক্ষ পার্শি ব্রাউনের সময় (১৯০৯–২৭) লিথোগ্রাফ ও উড-এনগ্রেভিং ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগের উপবিভাগ। অধ্যক্ষ মুকুল দের যোগদানের (১৯২৮) পর উড-এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফকে দুটি আলাদা বিভাগ করা হয়। কলকাতা আর্ট স্কুল ১৯৫১ সালে কলেজে রূপান্তরের সময় এই দুটি বিভাগকে একত্র করে এবং এর সঙ্গে এচিং যুক্ত করে নতুন বিভাগ হিসেবে গ্রাফিক আর্ট গড়ে তোলা হয়। গ্রাফিক আর্ট বিভাগের বিষয়গুলোর উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করে জয়নুল আবেদিন গ্রাফিক আর্ট শিক্ষা আর্ট ইনস্টিটিউটের শুরুতে শিক্ষাক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেন। কিন্তু ওই সময়ে শ্রেণিকক্ষের অপ্রতুলতা ও যন্ত্রপাতির অভাবে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু করা সম্ভব হয়নি।

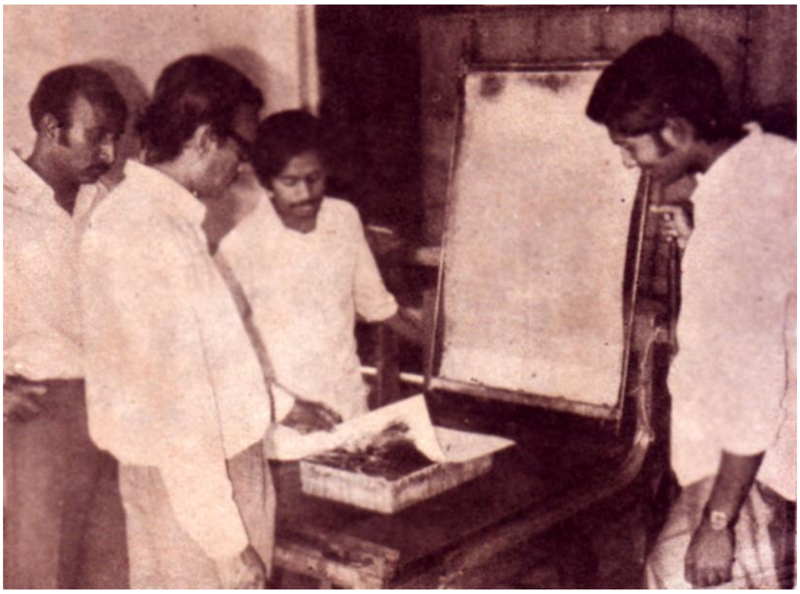

চিত্র-৩৯ : মোহাম্মদ কিবরিয়ার তত্ত্বাবধানে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম, উৎস : বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবের স্মরণিকা, ১৯৭৩

বিভাগটির অনুমোদন ১৯৪৮ সালে হলেও ঠিক কখন থেকে কার্যক্রম শুরু করেছিল সে বিষয়ে কিছু ভিন্নমত রয়েছে। সঠিক তথ্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চারুকলা অনুষদ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত 'বিধিমালা ও নিয়ম-কানুন'-এর 'চারুকলা অনুষদ পরিচিতি'তে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল প্রাথমিক বিভাগ, সুকুমার কলা বিভাগ (Drawing and Painting), বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগ (Graphic Design) ও ছাপচিত্র বিভাগ (Printmaking)—এই মোট চারটি বিভাগীয় কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে।[৬৫] কিন্তু ১৯৪৮ সালের আর্ট ইনস্টিটিউটের অনুমোদন পত্রে (গঠনতন্ত্র) কোর্স অব স্টাডিজ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

> An advanced course, on the successful completion of the elementary course in any one of the flowing subjects during the next three years:- (i) Fine Art, (ii) Commercial Art (including Industrial Art), (iii) Graphic Art, (iv) Modelling, (v) Draftsmanship, (vi) Drawing masters course, (vii) Crafts.[৬৬]

চারুকলা অনুষদে সংরক্ষিত নথিপত্র, সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লেখা এবং সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এই বিভাগগুলোর মধ্যে ১৯৫০ সালে অ্যাডভান্সড পর্বে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ খোলা হয়েছিল। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত বিধিমালায় বিভাগ পরিচিতিতে প্রিন্টমেকিং

[৬৫] *চারুকলা অনুষদের বিধিমালা ও নিয়ম-কানুন*, মতলুব আলী (সম্পা.), চারুকলা অনুষদ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫

[৬৬] শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব কর্তৃক ডিপিআইকে লেখা "Establishment of a Government Institute of Arts in East Bengal" শীর্ষক পত্র, প্রাগুক্ত

বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রাফিক আর্ট বিভাগ ১৯৪৮ সালে অনুমোদিত হয়; এখানে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করা হয় ১৯৬৩ সালে এবং বিএফএ ডিগ্রিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৭ সালে। ১৯৪৮–৬২ পর্যন্ত গ্রাফিক আর্টের বিষয়গুলো ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের অধীনে শিক্ষণীয় ছিল। ১৯৬৩–৭৫ সাল পর্যন্ত প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে 'গ্রাফিক আর্ট' শীর্ষক একটি আবশ্যিক কোর্স এবং ডিগ্রি পর্যায়ে 'এ' গ্রুপের (ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্ট) একটি ঐচ্ছিক কোর্সের শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।[৬৭]

সিলেবাস

Syllabus for BFA Exam. (Since–1968)

Department of Graphic Art

Type of Courses	SL. No.	Subjects	Marks
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Lithography	100
	4.	Dry point, Etching & Aquatint	100
	5.	Woodcut	100
	6.	Engraving	100
	7.	Commercial Art (Publicity Design)	100
	8.	Sketch (Since 1970)	100
	9.	Any one of the paper from group-A	100
Total Marks			900

৬. স্কাল্পচার ও মডেলিং বিভাগ (Department of Sculpture and Modelling) : প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনাকাল থেকে ভাস্কর্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে প্রতিষ্ঠিত সরকারি আর্ট স্কুলগুলোতে স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং বিষয়টি শিক্ষণীয় ছিল। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ (সরকার নিয়োজিত) হেনরি হোবার লকের সময় (১৮৬৪–

[৬৭] Shifa Farhana, "Print-Making Department; Brief History of the Departments, Institute of Fine Art", *ART*, Ibid.

১৮৮২) শিক্ষণীয় বারোটি বিষয়ের মধ্যে মডেলিং অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সময় (১৮৯৬–১৯০৬) মডেলিং ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগের উপবিভাগ এবং স্কাল্পচার ছিল ফাইন আর্ট বিভাগের অধীনে। অধ্যক্ষ মুকুল দের সময়ে (১৯২৯–১৯৪৩) প্রবর্তিত আর্ট স্কুলের আটটি বিভাগের মধ্যে ক্লে-মডেলিং অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে মডেলিং ও স্কাল্পচার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। কলকাতা আর্ট স্কুল ১৯৫১ সালে কলেজ হওয়ার সময় স্কাল্পচার (মডেলিং) স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৬৮] ১৯৪৮ সালে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার সময় অনুমোদিত সাতটি বিভাগের মধ্যে 'মডেলিং' ছিল চতুর্থ নম্বর বিভাগ। ইনস্টিটিউটের শুরুতে এই বিভাগের কোনো শিক্ষক পদ না থাকা, স্থান সংকট এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের কারণে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইনস্টিটিউটে (১৯৪৮–৬২ পর্যন্ত) 'মডেলিং' বিভাগ চালু করা বা এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে জয়নুল আবেদিন চেষ্টা করেছেন 'মডেলিং ও স্কাল্পচার' বিভাগ খোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। তাঁর উদ্যোগে এ বিভাগের জন্য ১৯৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লেকচারার ইন স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং পদ অনুমোদিত হয়।[৬৯] ভাস্কর নভেরা আহমেদ এ সময় চারুকলা ইনস্টিটিউটে যোগদানের চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁকে দিয়ে মডেলিং বিভাগ খোলা হোক।[৭০] কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। আর্ট ইনস্টিটিউট আর্ট কলেজে রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত পদটি খালি ছিল।

১৯৬৩ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের পুনর্গঠিত শিক্ষাক্রমে বিভাগটির নাম স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং করা হয়। এ সময় আবদুর রাজ্জাককে লেকচারার ইন স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং পদে পদোন্নতি দিয়ে স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং বিভাগ গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রদান করেন জয়নুল আবেদিন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবদুর রাজ্জাক আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ছাপচিত্র বিষয়ে মাস্টার্স অব ফাইন আর্ট ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৫৭)। তাঁর মূল বিষয় ছাপচিত্র হলেও এ পর্যায়ে তিনি ভাস্কর্য মাধ্যমের বিভিন্ন টেকনিক সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন; যা তাঁকে মডেলিং ও স্কাল্পচার বিভাগ গঠনে সাহস জুগিয়েছিল। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বর্তমান জয়নুল গ্যালারির পূর্ব-উত্তর পাশের বারান্দা বেড়া দিয়ে ঘিরে সেখানে এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

---

[৬৮] Bagal Jogesh Chandra, Ibid, p. 5, 21, 45, 51

[৬৯] শিক্ষা বিভাগের অফিস আদেশ নং ৫৮৬৯-শিক্ষা, তারিখ : ১৩.৯.৫৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[৭০] আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'হামিদেরও ইচ্ছা শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে; তবে ও চাচ্ছে ভাস্কর্য বিভাগ খোলা হোক নভেরার জন্য'; Selim Lala Rukh, "Sculpture Department", *Art* a Quarterly Journal, Dhaka, January – March 1999, p. 20

প্রথম পর্যায়ে বিভাগটির কার্যক্রম প্রি-ডিগ্রির ঐচ্ছিক বিষয় 'মডেলিং' এবং বিএফএ ডিগ্রির 'এ' গ্রুপের তিনটি বিভাগের (ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্ট) ঐচ্ছিক বিষয় মডেলিং ও স্কাল্পচার সম্পর্কে শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রি-ডিগ্রি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ভাস্কর্য বিভাগের প্রথম শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে বিএফএ ডিগ্রিতে ঐচ্ছিক বিষয় মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার নিয়েছিলেন ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের একমাত্র ছাত্র মিজানুর রহিম।[৭১] এ ছাড়া সদ্য পাস করা আনোয়ার জাহান, আনোয়ারুল হক পিয়ারু প্রমুখ এই বিভাগে অনানুষ্ঠানিকভাবে আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আনোয়ার জাহান পরবর্তী সময়ে ভাস্কর্যচর্চা অব্যাহত রাখেন এবং একজন তরুণ ভাস্কর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে।[৭২] ডিগ্রি কোর্সে এই বিভাগে প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে। এ বছর শামীম আরা শিকদারের ভর্তির মধ্য দিয়ে মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার বিভাগে ডিগ্রি কোর্সের যাত্রা শুরু হয়।

[৭১] অধ্যাপক মিজানুর রহিমের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[৭২] আনোয়ার জাহানের প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, প্রদর্শনীর স্থান : ঢাকা জাদুঘর, তারিখ ১১.১৮.১৯৬৭, প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তাঁর জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৬ সালে ভাস্কর্যে এক বছরের বিশেষ শিক্ষা লাভ। এখানে বিশেষ শিক্ষা লাভ অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ওই সময় আর্ট কলেজে প্রচলিত ডিগ্রি কোর্সের বাইরে ভাস্কর্য বিভাগে আর কোনো কোর্স চালু ছিল না; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৪৯ : আনোয়ার জাহান*-এর জীবনবৃত্তান্তে ১৯৬৬ সালে তাঁকে 'ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চারুকলা অনুষদে রক্ষিত কোনো নথিপত্রে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না; ১৯৯৯ সালে লালা রুখ সেলিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *Art* ম্যাগাজিনের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে 'Anwar Jahan joined the Sculpture Department as teacher in 1966 for a short period.' কিন্তু তাঁর প্রদর্শনীর ক্যাটালগে শিক্ষকতার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। '৬৬ সালে তিনি ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক রফিকুন নবী, অধ্যাপক আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, ভাস্কর্য বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী অধ্যাপক শামীম শিকদার এবং ভাস্কর্য বিভাগের (ঐচ্ছিক : ১৯৬৫–৬৮) প্রথম ছাত্র অধ্যাপক মিজানুর রহিম জানিয়েছেন, আনোয়ার জাহান কখনো আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেননি।

সিলেবাস

Syllabus for BFA Exam. (Since – 1968)

Department of Sculpture and Modelling

Type of Courses	**SL. No.**	**Subjects**	**Marks**
Theoretical	1.	History of Arts	100
	2.	Sociology with special reference to the Aesthetics	100
Practical	3.	Composition	100
	4.	Modelling	100
	5.	Carving	100
	6.	Casting	100
	7.	Terracotta	100
	8.	Sketch (from 1970)	100
	9.	Any one of the paper from group-A	100
Total Marks			900

স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং কোর্সের (ঐচ্ছিক) সিলেবাস : ডিগ্রি পর্যায়ে 'এ' গ্রুপের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় ঐচ্ছিক কোর্স 'স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং'-এর বিস্তারিত সিলেবাস তৈরি করা হয় ১৯৬৬ সালে। এই কোর্সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের ভাস্কর্য নির্মাণের বিভিন্ন কৌশল ও লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। কাদা-মাটি (ক্লে), প্লাস্টার, কাঠ ও বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা ভাস্কর্য তৈরির শিক্ষা দেওয়া এবং এর বিভিন্ন দিককে পরবর্তীকালে তাঁদের সৃজনশীল দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশে সক্ষম করে গড়ে তোলা। সিলেবাসে অনেক বিষয় শিক্ষণীয় থাকলেও পরীক্ষা নেওয়া হতো কাদা-মাটি অথবা প্লাস্টার দিয়ে মানুষের মাথা অথবা ফিগার তৈরি।

প্রথম বর্ষে কাদা-মাটি দিয়ে মাথার ও মানবদেহের মডেলিং। প্লাস্টার কাস্টিংয়ে মাথা নির্মাণের জন্য অভ্যন্তরীণ কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়ন। দ্বিতীয় বর্ষে প্লাস্টার মাধ্যমে মাথা তৈরি, প্লাস্টার কাস্টিংয়ে মানবদেহ নির্মাণের জন্য অভ্যন্তরীণ কাঠামো তৈরি, উড-এনগ্রেভিং এবং প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ড্রইং অনুশীলন। তৃতীয় বর্ষে ঢালাই পদ্ধতিতে মাথা, দেহ অথবা যেকোনো বিষয় নির্মাণ, উড কার্ভিংয়ে মাথা, দেহ অথবা যেকোনো বিষয় নির্মাণ, একক বা একাধিক মানবদেহ নির্মাণ (কাদা-মাটি, প্লাস্টার এবং কাঠ মাধ্যম) এবং প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ড্রইং অনুশীলন।[৭৩]

[৭৩] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৯৬৬, প্রাগুক্ত

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের কার্যক্রম ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) কর্তৃক ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অনুমোদন পেতে এবং সরকার কর্তৃক আর্ট ইনস্টিটিউটকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে উপাদানকল্প ডিগ্রি কলেজ হিসেবে অফিশিয়াল স্বীকৃতি দিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত লেগে যায়। এরপর ডিসেম্বর মাসের শুরুতে নতুন আঙ্গিকে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের মধ্য দিয়ে আর্ট কলেজের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। আর্ট কলেজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরো কিছু একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া তখনো প্রক্রিয়াধীন ছিল। যেমন নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস কমিটি পূর্ণাঙ্গরূপে গঠন করা, তত্ত্বীয় পাঠ্য বিষয়গুলোর বিস্তারিত সিলেবাস করা, তত্ত্বীয় বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, পরীক্ষার নিয়ম-কানুন তৈরি ইত্যাদি। এ সকল বিষয় গুছিয়ে ওঠার আগেই জয়নুল আবেদিন জাতীয় বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর্ট কলেজের ওই সময়ের নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের মে মাসের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অধিকাংশ সময় তিনি আর্ট কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। সরকারি কাজে এ সময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন বলে জানা যায়।[৭৪] এর মধ্যে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি কলেজে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্ট বিভাগ খোলার জন্য পেশোয়ারে অবস্থান করেন। এ সময় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ডিন ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন শফিকুল আমীন।

১৯৬৪ সালের ১৮ মে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ভারপ্রাপ্ত ডিন শফিকুল আমীনের সভাপতিত্বে। সভায় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস কমিটিতে তিনজন সদস্য কো-অপ্ট করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন, ১৯৬৪ সালে প্রথম প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা গ্রহণ, সিলেবাসে উল্লিখিত কোর্সগুলোর বিস্তারিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য কোর্স কমিটি গঠন এবং পরীক্ষা কমিটি গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া কলেজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরো শিক্ষক পদ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়।[৭৫]

---

[৭৪] জয়নুল আবেদিনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিনের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ১৭.৪.২০২০

[৭৫] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের প্রথম সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৮ মে ১৯৬৪, নথি নং-৫১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠন : ফ্যাকাল্টি সভায় পূর্ণাঙ্গ ফ্যাকাল্টি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে তিনজন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস গঠিত হয়েছিল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, শিক্ষা অনুষদের ডিন, জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক, ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (মহিলা) অধ্যক্ষ, আর্ট কাউন্সিলের সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টির সকল বিভাগের প্রধানদের নিয়ে। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী উল্লিখিত সদস্যগণের মাধ্যমে আরো কিছু সদস্য কো-অপ্ট করার সুযোগ ছিল। কারণ ফ্যাকাল্টি কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য অনধিক পনেরো জন থাকার বিধান ছিল। এই সভায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার সলিমুল্লাহ ফাওমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ এবং 'বাফা'র হেড মিস্ট্রেস (কে. জি.) জাহান আরা ইমামকে ফ্যাকাল্টি কমিটিতে কো-অপ্ট করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে সলিমুল্লাহ ফাওমী এই সদস্যপদ থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন।[৭৬] তাঁর স্থলে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হককে।

প্রি-ডিগ্রির প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা গ্রহণ : ১৯৬৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রি-ডিগ্রির দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা কীভাবে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে উল্লিখিত ফ্যাকাল্টি সভায় আলোচনা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রি-ডিগ্রি কোর্স শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষর্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২–৬৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রি-ডিগ্রিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র এক বছর প্রি-ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করেন। ব্যবহারিক বিষয়ে পূর্ববর্তী সিলেবাসের সঙ্গে নতুন সিলেবাসের অনেকাংশে মিল থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা হয়নি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল সিলেবাসে নতুন সংযোজিত দুটি তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে। কারণ তখনো পর্যন্ত (মে, ১৯৬৪) সাধারণ ইংরেজি ও সভ্যতার ইতিহাস কোর্সের কোনো বিস্তারিত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়নি এবং এ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। এসব কারণে এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৬৪ সালের প্রি-ডিগ্রির দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা ইংরেজি ও সভ্যতার ইতিহাস ব্যতীত সকল বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই দুটি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার কার্যবিবরণীর ৩ নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়—

> University authority be moved to arrange pre-degree examination of the present 2nd year students to be held in the year 1964 in all the subject except English (general) and History of Civilisation

[৭৬] চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন শফিকুল আমীনের কাছে লেখা সলিমুল্লাহ ফাওমীর পত্র, তারিখ : ৮ মার্চ ১৯৬৫, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

which would be conducted in the year 1965–June, along with the 1st year boys (present) for want of teachers in these subjects.[৭৭]

তত্ত্বীয় বিষয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে ক্লাস না হওয়ার বিষয়টি ওই সময়ের শিক্ষার্থী (শিক্ষাবর্ষ ১৯৬২–৬৩) এবং চারুকলা অনুষদের সাবেক অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খানের কাছ থেকেও জানা যায়। তিনি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শিক্ষকের অভাবে প্রি-ডিগ্রিতে তত্ত্বীয় ক্লাস না হওয়ায় বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁদের জুনিয়র ব্যাচের (১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষের) সঙ্গে তত্ত্বীয় বিষয়ের ক্লাস করতে ও পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।[৭৮]

এই ফ্যাকাল্টি সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রি-ডিগ্রির পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, ফাইন আর্ট বিভাগের প্রধান আনোয়ারুল হক, কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের প্রধান খাজা শফিক আহমেদ এবং ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের স্পেশালিস্ট সৈয়দ শফিকুল হোসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা কমিটিতে একজন বহিরাগত সদস্য থাকার বিধান থাকায় সৈয়দ শফিকুল হোসেনকে পরীক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ সময় থেকে আর্ট কলেজের প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষার পরীক্ষক হিসেবে বিভাগীয় শিক্ষকদের পাশাপাশি বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু আর্ট কলেজ পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিল্পীদের (আর্ট ইনস্টিটিউটের সাবেক ছাত্র) বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৪ সালের প্রি-ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করা হয় মডেলিং বিষয়ে এনআইপিএ-এর শিল্পী বজলে মাওলাকে; স্টিল লাইফ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের চিফ ডিজাইনার কামরুল হাসানকে, কম্পোজিশন বিষয়ে কৃষি তথ্য বিভাগের শিল্পী প্রণেশ মণ্ডলকে এবং স্কেচ বিষয়ে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের সৈয়দ শফিকুল হোসেনকে।[৭৯] এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ সালের প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা কিছুটা বিলম্বে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পরীক্ষার ফি নির্ধারিত হয়েছিল প্রি-ডিগ্রির জন্য ত্রিশ টাকা, ডিগ্রির জন্য চল্লিশ টাকা এবং রেফার্ডপ্রাপ্তদের জন্য দশ টাকা।

প্রি-ডিগ্রিকে স্বতন্ত্র কোর্স করার সিদ্ধান্ত : পূর্বে ইনস্টিটিউট থাকার সময় পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম দুই বছরের এলিমেন্টারি বা প্রি-ডিগ্রি কোর্সের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হতো না; অর্থাৎ এ

---

[৭৭] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের প্রথম সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৮ মে ১৯৬৪, প্রাগুক্ত

[৭৮] সাক্ষাৎকার : শিক্ষার্থী হামিদুজ্জামান খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৮.৫.২০২০

[৭৯] ১৯৬৪ সালের প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৫ আগস্ট ১৯৬৪, নথি নং-সি-৫১, প্রাগুক্ত

পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনের পর কোনো সনদপত্র বা নম্বরপত্র প্রদানের নিয়ম ছিল না। কলেজ বাস্তবায়নের পর ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্সকে স্বতন্ত্র কোর্স করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার ৪ নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'That the Pre-Degree Course be independent of each other'.[৮০] ইতোপূর্বে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের সনদপত্রে এলিমেন্টারি পর্বের কোনো উল্লেখ থাকত না। কিন্তু কলেজ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএফএ পাসের যে সনদপত্র প্রদান করা হতো সেখানে প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফলেরও উল্লেখ করা শুরু হয়। এ ছাড়া প্রি-ডিগ্রির চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরপত্রও দেওয়া শুরু হয়। এভাবে প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রিকে স্বতন্ত্র ডিগ্রির মর্যাদা দেওয়া হয়।

শিক্ষক পদ অনুমোদন : ১৯৬৪ সালে আর্ট কলেজে নতুন কিছু লেকচারার ও শিক্ষক পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং খালি থাকা লেকচারার ও শিক্ষক পদে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ বছরের ১৮ মে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় আর্ট কলেজের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরো কিছু সংখ্যক প্রফেসর, লেকচারার, ডেমোনেস্ট্রেটর ইত্যাদি পদ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়।[৮১] এ সময় তত্ত্বীয় বিষয়ের শিক্ষক পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রি-ডিগ্রি কোর্সের তত্ত্বীয় বিষয়ে পড়ানোর জন্য জেনারেল ইংলিশ ও হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন বিষয়ের লেকচারার পদ সৃষ্টি করে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য অধ্যক্ষকে জনশিক্ষার পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ২১ জুলাইয়ের ফ্যাকাল্টি সভায় দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৮২] এ সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পদ সৃষ্টির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের ৩০ ডিসেম্বর জেনারেল ইংলিশ, হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন, ক্রাফটস্, ডিজাইন এবং সিরামিকস বিষয়ের লেকচারার পদ অনুমোদিত হয়।[৮৩] এ সময় আরো চারটি শিক্ষক পদ অনুমোদিত হয়। তবে নতুন করে প্রফেসর ও ডেমোনেস্ট্রেটর পদ অনুমোদনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

---

[৮০] কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২১ জুলাই ১৯৬৪, নথি নং-সি-৫১, উৎস : প্রাগুক্ত

[৮১] গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৮ মে ১৯৬৪, প্রাগুক্ত

[৮২] গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২১ জুলাই ১৯৬৪, প্রাগুক্ত

[৮৩] "Statement showing the staff position of the East Pakistan College of Arts & Crafts, Dacca" শীর্ষক পদের তালিকা, তালিকায় পদমর্যাদা ও অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ আছে, অধ্যক্ষের পক্ষে শফিকুল আমীন স্বাক্ষরিত, তারিখ : ২৪.৬.৬৫, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

জয়নুল আবেদিনের পেশোয়ার গমন : জয়নুল আবেদিন ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে (১৭ তারিখের পর) পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্ট ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য পেশোয়ারে যান। এ সময় ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ডিন ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন শফিকুল আমীন। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে যান। এ ক্ষেত্রে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁকে এ জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৩ সালের জুন মাসে।[৮৪] পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্ট ডিপার্টমেন্ট খোলার প্রস্তাব পাওয়ার পর জয়নুল আবেদিন এর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশা তুলে ধরে বিস্তারিত পত্র লেখেন অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর কাছে। নতুন ডিপার্টমেন্ট তিনি কীভাবে খুলতে চান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি কী প্রত্যাশা করছেন তা এই পত্র থেকে জানা যায়। যেমন তাঁর লক্ষ্য হলো, পেশোয়ারের স্থানীয় প্রতিভাদের ব্যবহার করে ডিপার্টমেন্ট গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা। ডিপার্টমেন্টের স্বার্থে শুধু দুই ব্যক্তিকে পেশোয়ারের বাইরে থেকে তিনি নিজের পছন্দমতো বাছাই করবেন। '...বিষয় হিসেবে পেইন্টিং হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেরই অংশ। অন্য বিভাগের [যেমন : প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি] ছাত্রদেরও এ বিভাগে পড়ার অনুমোদন থাকতে হবে।'[৮৫]

জয়নুল আবেদিন আগস্টে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি চিত্রকলা বিষয়কে উপজীব্য করে সেখানে ফাইন আর্টের ওপর দুই বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালে সেখানে বিএফএ এবং ১৯৮২ সালে এমএফএ কোর্স চালু হয়।[৮৬] সেখানে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত করেন আর্ট কলেজের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে ১৯৬৩ সালে পাস করা রফিক হোসেনকে।[৮৭] পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্ট বিভাগ চালু করার পর ১৯৬৫ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিনি ঢাকায় ফিরে আর্ট কলেজে যোগদান করেন।[৮৮] এ সময় তিনি আর্ট কলেজে তত্ত্বীয় বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের চলমান প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন। জয়নুল আবেদিনের ছুটির সময়ে শিক্ষক মুস্তাফা মনোয়ার ১৯৬৪ সালের ১ নভেম্বর চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পাকিস্তান টেলিভিশনে যোগদান করেন।

---

[৮৪] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন; সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[৮৬] Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Peshawar, Date : 08.9.2021

[৮৭] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৪৬

[৮৮] এ সময়ের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আর্ট কলেজের চিঠিপত্রে ৮ মার্চ ১৯৬৫ থেকে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে; এর আগে ভারপ্রাপ্ত ডিন ও অধ্যক্ষ হিসেবে শফিকুল আমীনের স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়।

১৯৬৫ সালে শিক্ষক নিয়োগ : ১৯৬৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মতিউর রহমান (জন্ম : ১৯৪০) লেকচারার ইন জেনারেল ইংলিশ পদে আর্ট কলেজে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর। এর পাঁচ দিন পর ১৫ ফেব্রুয়ারি লেকচারার ইন হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন পদে যোগদান করেন এ কে এম আব্দুল মতিন সরকার (১৯৪১–২০১৯)। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে (১৯৬৩) স্নাতকোত্তর। মতিউর রহমান ও আব্দুল মতিন সরকারের নিয়োগ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। তাঁদের নিয়োগের মাধ্যমে প্রি-ডিগ্রি কোর্সে তত্ত্বীয় বিষয় পড়ানো নিয়ে বিদ্যমান জটিলতার অবসান হয়। মতিন সরকার আর্ট কলেজে যোগদানের পূর্বে কিছুদিন প্রি-ডিগ্রিতে হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন বিষয়ের ক্লাস নিয়েছিলেন। ১৯৬৩–৬৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র অধ্যাপক আবুল বারক আল্‌ভীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে মতিন সরকার তাঁদের হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন বিষয়ে ক্লাস নিতেন। ওই সময় তাঁকে খণ্ডকালীনভাবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।[৮৯]

রশিদ চৌধুরী ১৯৬৪ সালের ১ মার্চ লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে কলেজে এডহক ভিত্তিতে যোগদান করেন। তিনি ইতোপূর্বে আর্ট ইনস্টিটিউটে ১৯৫৮ সাল থেকে শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন।[৯০] ১৯৬০ সালে তিনি ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্যারিসে যান। সেখানে একাডেমি অব জুলিয়ান অ্যান্ড বোজ আর্টস থেকে ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য ও ট্যাপিস্ট্রি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে অবস্থানকালে ১৯৬২ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে তিনি ফ্রান্সের নাগরিক Annie Grangierকে বিয়ে করেন। শিক্ষা শেষে ১৯৬৪ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। আর্ট কলেজে যোগদানের পর তিনি বেশি দিন শিক্ষকতা করতে পারেননি। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আইন অনুযায়ী সরকারি চাকরিজীবীদের বিদেশি স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৯১] কিন্তু তাঁর চাকরি পুনর্বহালের জন্য সরকারের কাছে রশিদ চৌধুরী আবেদন করেন। জয়নুল আবেদিন তাঁর পুনর্নিয়োগের জোরালো প্রচেষ্টা চালান। বিষয়টি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সভায় আলোচিত হয়। ১৯৬৭ সালের ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেয় যে, প্রাদেশিক সরকার

---

[৮৯] সৈয়দ আবুল বারক আল্‌ভীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৩১.৩.২০২০

[৯০] লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে রশিদ চৌধুরীর যোগদান পত্র, তারিখ : ১.৩.১৯৬৫; রশিদ চৌধুরীর নিয়োগ সংক্রান্ত ডিপিআইয়ের Notification, পত্র নং-১৮৯, তারিখ : ৭ জুলাই ১৯৬৫। তাঁর নিয়োগ ১ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়, লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, নথি নং-এ-৭১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৯১] অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদ থেকে অব্যাহতি পত্র, পত্র নং ৯০০৬/৪-সি, তারিখ : ১.১২.১৯৬৫

রশিদ চৌধুরীকে নিয়োগ দিতে পারবে শুধু যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়া যায়।[৯২] এরপর তাঁর এডহকভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং পূর্বে করা তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। নিয়োগপ্রক্রিয়া চলার মধ্যে রমজানের ছুটিতে (২ ডিসেম্বর ১৯৬৭ থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত) সরকারের অনুমতি নিয়ে প্যারিসে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যান। কিন্তু ছুটি শেষে তিনি যথাসময়ে ফিরে আসেননি। ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে ইন্টারভিউ ডাকা হয়।[৯৩] কিন্তু তিনি ইন্টারভিউতে হাজির না হওয়ায় ডিপিআই তাঁকে ১৯৬৭ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে আবার চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়।[৯৪]

১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২–২০১৪) লেকচারার ইন ডিজাইন পদে আর্ট কলেজের কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে যোগদান করেন। তিনি আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৪ সালে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি মোহাম্মদ কিবরিয়ার শিক্ষা ছুটিকালে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬০ সালের মার্চ পর্যন্ত শিক্ষক পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬০ সালে ঢাকায় ডিজাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর কামরুল হাসানের আহ্বানে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক পদ ছেড়ে সেখানে যোগ দেন। কলেজ হওয়ার পর তিনি জয়নুল আবেদিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবার আর্ট কলেজে যোগদান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পেইন্টিং, বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন, পোস্টার ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেশনে নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশনে প্রথম পুরস্কার এবং বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইনের জন্য জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র (ঢাকা) থেকে ১৯৬৪ সালে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।[৯৫]

ইংরেজি বিষয়ের লেকচারার মতিউর রহমান অপেক্ষাকৃত ভালো সরকারি চাকরিপ্রাপ্তির কারণে আর্ট কলেজ থেকে চলে যান। তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদে ১৯৬৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর যোগদান করেন এ এম এম শওকত আলী।

---

[৯২] রাওয়ালপিণ্ডিতে ১৯৬৭ সালের ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী, কেস নং ২৩১/২৪/৬৭, নথি নং-এ-৭১, উৎস : প্রাগুক্ত

[৯৩] প্যারিসে রশিদ চৌধুরীর কাছে লেখা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পত্র, পত্র নং ৮৯/এ-৭১, তারিখ : ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৮, এই পত্রের মাধ্যমে ইন্টারভিউয়ের বিষয়টি তাঁকে অবগত কারা হয়েছে।

[৯৪] ডিপিআই কর্তৃক করা রশিদ চৌধুরীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দানের অফিস আদেশ নং ৩৫১১/৩-সি, তারিখ : ১৮.৪.১৯৬৮, অফিস আদেশে ২.১২.৬৭ থেকে এই আদেশ কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়, উৎস : প্রাগুক্ত

[৯৫] অধ্যাপক কাইয়ুম চৌধুরীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত পত্র এবং তাঁর স্বাক্ষরিত জীবনবৃত্তান্ত, ১৯৬৬

গভর্নিং বডি পুনর্গঠন : ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্ট কলেজের জন্য তিন বছর মেয়াদি গভর্নিং বডি পুনর্গঠন করা হয়। বারো সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিভাগের কমিশনার এবং সম্পাদক ছিলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য ছিলেন প্রফেসর অব ফাইন আর্ট আনোয়ারুল হক এবং প্রফেসর অব কমার্শিয়াল আর্ট খাজা শফিক আহমেদ; বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত সদস্য ছিলেন ড. সিরাজুল হক; অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য ছিলেন এম আর তরফদার, ড. সালাউদ্দীন আহমেদ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম এবং এস এম ইউসুফ। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ এবং সুফিয়া কামাল।

সেশনাল মার্কস প্রবর্তন : ১৯৬৫ সালের ২৪ জুন অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রির কোর্সগুলোর নম্বর সেশনাল ও পরীক্ষা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সেশনাল নম্বর ৫০ এবং পরীক্ষার নম্বর ৫০ করা হয়। ১৯৬৫–৬৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ নিয়ম কার্যকরের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভয় এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ব্যবহারিক কোর্সের সেশনাল নম্বর ৫০ এবং তত্ত্বীয় বিষয়ের সেশনাল নম্বর ২৫ করা হয়। ১৯৬৬–৬৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ নিয়ম কার্যকরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯৬] এখানে উল্লেখ্য যে পূর্বে শুধু ফাইনাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হতো।

১৯৬৫ সালের জুন মাসে আর্ট কলেজের প্রসপেক্টাস প্রকাশিত হয়। প্রসপেক্টাস থেকে ওই সময়ের শিক্ষক ও কর্মচারী, বিভাগ বিন্যাস, শিক্ষাসূচি, ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য, উপবৃত্তি ও বৃত্তি, সাধারণ নিয়ম-কানুন, লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, হোস্টেলসহ বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। এ পর্যায়ে উপবৃত্তি ও বৃত্তি, সাধারণ নিয়ম-কানুন, লাইব্রেরি ও হোস্টেল সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।[৯৭]

উপবৃত্তি ও বৃত্তি : শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, ভালো আচরণ এবং ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উপবৃত্তি ও বৃত্তি এবং গরিব মেধাবীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখা হয়। এ সময় কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদি দশটি আবাসিক এবং দশটি অনাবাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। প্রতি মাসে দশ টাকা হারে এক বছর মেয়াদি আঠারোটি সরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা বারোজন বিনা বেতনে এবং একই সংখ্যক শিক্ষার্থী অর্ধ-বেতনে শিক্ষার সুযোগ পেতেন।

---

[৯৬] ১৯৬৫ সালের ২৫ জুন এবং ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৯৭] *Prospectus*, East Pakistan College of Arts And Crafts, (East Pakistan order no. 5254-c, Dated : 27.6.1965), Dacca

সাধারণ নিয়ম-কানুন : ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে উপস্থিত ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থানের ওপর কঠোর নজরদারি করা হতো। শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির সকল ক্ষেত্রে অধ্যক্ষকে অবগত করতে হতো। তখন ক্লাস শুরু হতো সকাল ১০:৩০টায়, দুপুর ১:১৫ থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতি ছিল এবং শেষ হতো ৪:১৫টায়। ক্লাস শুরু হওয়ার পনেরো মিনিট আগে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকার নিয়ম ছিল। কলেজের কোনো সম্পদ যেন শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিনষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হতো।

লাইব্রেরি : আর্ট কলেজের লাইব্রেরিটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শিল্পবিষয়ক লাইব্রেরি। শিল্পকলাসংক্রান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও জার্নাল সংগ্রহ ছিল এখানে। এ ছাড়া সমকালীন শিল্পসংক্রান্ত দেশি-বিদেশি ম্যাগাজিন ও বই নিয়মিত সংগ্রহ করা হতো। ১৯৭৪ সালে এই লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ ছিল প্রায় চার হাজার। শিল্পসংক্রান্ত আধুনিক বই পড়ার এটাই ছিল দেশের বৃহত্তম সংগ্রহ।[৯৮] এ সময় লাইব্রেরিয়ান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন শামসুন নাহার। বর্তমান জয়নুল গ্যালারির মধ্যবর্তী কক্ষটি লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একজন শিক্ষার্থী তাঁর নিজের প্রয়োজনে একবারে একটিমাত্র বই লাইব্রেরিয়ানের অনুমতি সাপেক্ষে ওঠাতে পারতেন।

চিত্র-৪০ : আর্ট কলেজের লাইব্রেরি, উৎস : কনটেম্পরারি আর্ট ইন পাকিস্তান, ১৯৬১

[৯৮] অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম প্রণীত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্তিকরণের যৌক্তিকতা ও বিভিন্ন সুবিধাবলী শীর্ষক স্মারকপত্র, তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, নথি নং-এ-৯৯, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

ছাত্রাবাস : আর্ট কলেজের ছাত্রদের থাকার জন্য ১৯৬২-৬৩ সালে নিউ মার্কেটের পশ্চিম পাশে তিন বিঘা জমির ওপর একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। এই ছাত্রাবাসে পঞ্চাশ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল।[৯৯] এই ছাত্রাবাস সম্পর্কে অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, ছাত্রাবাসটির নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে। ছাত্রাবাসের ভবনটি তখন দ্বিতল ছিল। এখানে মার্চ মাস থেকে ছাত্র ওঠা শুরু করে। এ সময় শফিকুল আমীনকে ছাত্রাবাসের সুপারিনটেনডেন্ট এবং সমরজিৎ রায় চৌধুরীকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি তখন পুরান ঢাকায় থাকতেন। ওই সময় পুরান ঢাকায় মাঝে মাঝে দাঙ্গা হতো। সমরজিৎ রায় চৌধুরীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জয়নুল আবেদিন তাঁকে ছাত্রাবাসে এসে দায়িত্ব পালনের জন্য বলেন। ছাত্রাবাসে সুপারিনটেনডেন্টের থাকার ব্যবস্থা ছিল। তিনি ছাত্রাবাসে চলে আসেন ওই বছর মার্চ মাসে। ওই সময় মোহাম্মদ কিবরিয়া উচ্চশিক্ষা শেষে জাপান থেকে ফিরে আসেন। জয়নুল আবেদিন তাঁকেও সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।[১০০] সমরজিৎ রায় চৌধুরীর ব্যক্তিগত নথি থেকে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ পাওয়া গেছে। ১৯৬৫ সালের ২ মার্চে করা এই অফিস আদেশে শফিকুল আমীনকে ছাত্রবাসের সুপারিনটেনডেন্ট এবং সমরজিৎ রায় চৌধুরীকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়; যা ১৯৬৪ সালের ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়।[১০১] এই পদ দুটি অনুমোদিত হয় ১৯৬৪ সালের ৩০ ডিসেম্বরে। এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোনো ভাতা ছাড়াই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নিযুক্তির কয়েক মাস পরে শফিকুল আমীন ব্যস্ততার কারণে সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর পর অস্থায়ী ভিত্তিতে কয়েক মাস এই পদে দায়িত্ব পালন করেন মীর মোস্তফা আলী। তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করলে সমরজিৎ রায়কে ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চে সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১০২] অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন মোহাম্মদ কিবরিয়া। ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা আর্ট কলেজের ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধান হয়। নিজস্ব পরিবেশে থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা সেখানে শিল্পচর্চার অনুকূল পরিবেশ পান। বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ইত্যাদি লেখা ও আঁকার মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা।

---

[৯৯] *Prospectus,* East Pakistan College of Arts And Crafts, Ibid, p. 6

[১০০] অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[১০১] শিক্ষা বিভাগ থেকে ইস্যুকৃত অফিস আদেশ নং ৫৯২/২-সি সমরজিৎ রায় চৌধুরীর ব্যক্তিগত নথি, তারিখ : ২৭.৫.১৯৬৫, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢা. বি.

[১০২] শিক্ষা বিভাগ থেকে ইস্যুকৃত অফিস আদেশ, আদেশ নং ২৯২৮/২-সি, সমরজিৎ রায় চৌধুরীর ব্যক্তিগত নথি, তারিখ : ২০ মার্চ ১৯৬৯, উৎস : প্রাগুক্ত

শিক্ষকদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী : ১৯৬৫ সালে ষোলোজন শিক্ষকের শিল্পকর্ম নিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলেজের গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন এবং শিক্ষকদের মধ্যে আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, শফিকুল আমীন, হবিবুর রহমান, খাজা শফিক আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, কাজী আবদুল বাসেত, মীর মোস্তফা আলী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী ও জমির উদ্দীন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রদর্শনীর সময়কাল হিসেবে ক্যাটালগে শুধু সালের উল্লেখ রয়েছে, কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। প্রদর্শনীর সময়কাল সম্পর্কে শিল্পী রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি প্রদর্শনী সম্পর্কে আরো জানান, 'প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ, শওকত ওসমান প্রমুখ।'[১০৩] প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথি সম্পর্কে রফিকুন নবীর প্রদত্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ক্যাটালগে মুদ্রিত সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদের বাণী থেকে। তখন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক; তিনি ওই বোর্ড থেকে প্রদর্শনীর জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। প্রদর্শনী আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেন সফিউদ্দীন আহমেদ ও খাজা শফিক আহমেদ।

প্রদর্শনীতে জয়নুলের আঁকা 'সাঁওতাল দম্পতি' (১৯৫১, জলরং), 'স্টাডি' (১৯৫৩, গোয়াশ); আনোয়ারুল হকের তেলরঙে আঁকা নিরীক্ষাধর্মী 'মিত্র', 'নির্জন' 'অস্তিত্ব', 'গঠন', 'একক যন্ত্রসংগীত' ও 'আকর্ষণ' শিরোনামের চিত্রকর্ম ছিল। প্রদর্শনীতে শফিকুল আমীনের বাস্তবধর্মী চিত্র 'একটি যুবক' (তেলরং) 'একটি মানুষ' (তেলরং), 'একটি বৃদ্ধা' (কালি কলম), 'একটি রচনা' (জলরং), এবং 'প্রাকৃতিক দৃশ্য' (জলরং) প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে সফিউদ্দীন আহমেদের চিত্রকর্ম হচ্ছে 'বিক্ষুব্ধ মৎস্য' (মিশ্র মাধ্যম), 'নীল জল' (মিশ্র মাধ্যম), '(সেতু)' (অ্যাকোয়াটিন্ট), 'স্বপ্ন' (কাঠ খোদাই) এবং 'ঝড়ের পূর্বে' (অ্যাকোয়াটিন্ট) প্রদর্শিত হয়। টেকনিক, ফর্ম ও বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর এই চিত্রকর্মগুলো ছিল অভিনব। তাঁর ছাপচিত্র বিষয়ে দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপে শিক্ষা লাভের অভিজ্ঞতার সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ ছিল এই চিত্রগুলোর মধ্যে। উডকাট শিক্ষক হবিবুর রহমানের কাঠ খোদাইয়ের পাঁচটি কাজ ছিল এই প্রদর্শনীতে। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের প্রধান খাজা শফিক আহমেদের 'ঈদুল ফিতর', 'দুর্গা বিসর্জন'সহ পাঁচটি বাস্তবধর্মী চিত্রকর্ম ছিল প্রদর্শনীতে।

[১০৩] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা, প্রাগুক্ত

প্রদর্শনীতে মোহাম্মদ কিবরিয়ার মিশ্র মাধ্যমে আঁকা 'কম্পোজিশন হলুদ', 'পেইন্টিং-১৯৬৪', 'পেইন্টিং-১৯৬৪ (২)' এবং প্রিন্টমাধ্যমে আঁকা 'কম্পোজিশন সবুজ' ও 'কম্পোজিশন সবুজ-২'; আমিনুল ইসলামের তেলরঙে আঁকা পাঁচটি 'পেইন্টিং' শিরোনামের চিত্র এবং কাজী আবদুল বাসেতের তেলরঙে আঁকা 'ঝরা পাতায় শিশিরবিন্দু', 'গোধূলি', 'কম্পোজিশন-১, ২ ও ৩' শিরোনামের চিত্রকর্মগুলো ছিল ইউরোপীয় আধুনিক বিমূর্ত শিল্পধারার প্রভাবে আঁকা। আবদুর রাজ্জাকের 'কম্পোজিশন-১' ও 'কম্পোজিশন-৩' শীর্ষক চিত্রকর্ম দুটি অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের প্রভাবে আঁকা ছিল।

রশিদ চৌধুরীর গোয়াশ মাধ্যমে আঁকা 'বাংলার প্রতি আনুগত্য-১ ও ২' এবং 'পাখী যখন নাচে' শীর্ষক চিত্রে বাংলার লোকচিত্রের ফর্ম ও রঙের আধুনিক বিন্যাস লক্ষ করা যায়। সমরজিৎ রায় চৌধুরী এ প্রদর্শনীর জন্য জ্যামিতিক বিভাজনে এঁকেছেন 'কম্পোজিশন', 'একটি নারী মুখ'সহ পাঁচটি চিত্র। হাশেম খান ও রফিকুন নবীর অনবদ্য দশটি জলরং চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। হাশেম খানের চিত্রের শিরোনাম ছিল 'চাকমা সুন্দরী', 'চাকমা পরিবার', 'নৌকা মেরামত', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' ও 'রাঙ্গামাটি' এবং রফিকুন নবীর 'বেদে নৌকা', 'সুমদ্র সৈকত কক্সবাজার', 'নৌকা-সদরঘাট', 'স্কেচ' ও 'কর্ণফুলীর একটি দৃশ্য'। প্রদর্শনীতে জমির উদ্দিনের 'প্রতিকৃতি', 'গোলাবাড়ী' এবং 'অন্ধ' শীর্ষক তিনটি চিত্রকর্ম ছিল। প্রদর্শনীর ব্যতিক্রম ছিল মীর মোস্তাফা আলীর 'সিরামিক' শিরোনামের মৃৎপাত্র এবং 'কম্পোজিশন' শিরোনামের চারটি গ্লেজ পেইন্টিং। গ্লেজ পেইন্টিংগুলো বিচিত্র রঙের বিন্যাসে বিমূর্ত ধারার আঁকা।[১০৪]

এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনে আর্ট কলেজের শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেন—

> আমার মনে হয় একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই মিলে একক। তাঁরা সবাই শিল্প মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের পরিবেশে তাঁরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের সমবায়িক দায়িত্বে নিয়োজিত। আজকের পৃথিবীতে অঙ্কন শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে পরম সততার সঙ্গে আমাদের স্মরণ করতেই হবে, এই মহাবিদ্যালয় ও এই শিক্ষকবৃন্দই তা সম্ভব করে তুলেছেন।[১০৫]

এই প্রদর্শনী থেকে আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষকদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং নতুন নতুন টেকনিক ও মাধ্যমে শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

---

[১০৪] *ক্যাটালগ*, ১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনী-১৯৬৫ ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ঢাকা

[১০৫] ড. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, ১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনী-১৯৬৫, প্রাগুক্ত

১৯৬৬ সালে শিক্ষক নিয়োগ : ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে বুলবন ওসমান (জন্ম : ১৯৪১) লেকচারার ইন সোশিওলজি পদে এডহক ভিত্তিতে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন। তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল করিমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর অনুরোধে জয়নুল আর্ট কলেজে সোশিওলজি বিষয়টি পাঠ্য করেছিলেন এবং একটি লেকচারার পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই পদে বুলবন ওসমান যোগদান করেছিলেন। নিয়োগের পরই জয়নুল আবেদিন তাঁকে সোশিওলজির সিলেবাসের দায়িত্ব প্রদান করেন। জয়নুল আবেদিন ও অধ্যাপক নাজমুল করিমের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শিল্পের সমাজতত্ত্বের আলোকে সিলেবাস তৈরি করেন। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে জয়নুল আবেদিন ছুটি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গেলে বুলবন ওসমানের এডহকভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে দেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন। জয়নুল দেশে ফিরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থায়ী ভিত্তিতে বুলবন ওসমানকে লেকচারার ইন সোশিওলজি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এ পর্যায়ে তিনি ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারিতে যোগদান করেন।[১০৬]

১৯৬৬ সালের ১৫ জুলাই মনিরুল ইসলাম (জন্ম : ১৯৪৩) আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১০৭] তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের চতুর্দশ ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ : ১৯৬১–৬২) ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৬ সালে ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। নিযুক্তির পর তিনি প্রি-ডিগ্রির শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

কোর্স কমিটি গঠন : ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি পর্যায়ের তত্ত্বীয় কোর্স এবং ঐচ্ছিক কোর্সের বিস্তারিত সিলেবাস তৈরির জন্য কোর্স কমিটি গঠন, সেশনাল মার্কস সংশোধনসহ আরো কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রির তত্ত্বীয় ও ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত সিলেবাস তৈরির জন্য ১৬ সদস্যের একটি কোর্স কমিটি গঠন করা হয়। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, সকল বিভাগের প্রধানগণ, সকল তত্ত্বীয় শিক্ষক (আব্দুল মতিন সরকার, শওকত আলী,

---

[১০৬] অধ্যাপক বুলবন ওসমানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২২ এপ্রিল ২০১৯ এবং তাঁর লেকচারার ইন সোশিওলজি পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৭, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ ঢা. বি.

[১০৭] শিল্পী মনিরুল ইসলামের গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে শিক্ষক পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ১৫.৭.১৯৬৬; গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থেকে পাঁচ বছরের কোর্স উত্তীর্ণের প্রত্যয়নপত্র, তারিখ : ১১.৭.১৯৬৬, উৎস : প্রাগুক্ত

বুলবন ওসমান) এবং বহিরাগতদের মধ্যে ড. এ বি এম হবিবুল্লাহ, শিল্পী কামরুল হাসান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, বজলে মাওলা ও জুনাবুল ইসলাম কমিটির সদস্য ছিলেন।[১০৮]

১৯৬৬ সালের ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় ১৯৬৭–৬৮ এবং ১৯৬৯ সালের পরীক্ষার জন্য বিএফএ ডিগ্রি ও প্রি-ডিগ্রির কয়েকটি কোর্সের বিস্তারিত পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয়। কোর্সগুলো হলো বিএফএ ডিগ্রির হিস্টোরি অব আর্টস, সোশিওলজি এবং ঐচ্ছিক কোর্স সিরামিক ও মডেলিং। এ ছাড়া প্রি-ডিগ্রির জেনারেল ইংলিশ এবং বিকল্প কোর্স মডেলিং ও সিরামিক। সিলেবাস অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৯]

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে মিউজিক কলেজ অন্তর্ভুক্তি : ১৯৬৭ সালে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে মিউজিক কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব মিউজিক বা বি-মিউজিক ডিগ্রি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কলেজটি ১৯৬৩ সালে কণ্ঠশিল্পী বারীণ মজুমদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বারীণ মজুমদারের উপস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় বি-মিউজিক ডিগ্রি খোলার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১১০] প্রেরিত প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে অনুমোদনের পর ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীনে মিউজিক কলেজে ১৯৬৮–৬৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যাচেলর অব মিউজিক কোর্স চালু হয়।

সিলেবাসে বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি : ১৯৬৭ সালে আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রম কিছুটা সংশোধন করা হয়। প্রি-ডিগ্রি ও বিএফএ ডিগ্রির শিক্ষাক্রমে নতুন করে যথাক্রমে ১০০ নম্বরের ডিজাইন, লেটারিং অ্যান্ড ব্ল্যাক বোর্ড বিষয় এবং ১০০ নম্বরের ‘স্কেচ’ বিষয় যুক্ত করা হয়। এর ফলে প্রি-ডিগ্রি ও বিএফএ ডিগ্রি উভয় বিষয়ে মোট নম্বর বৃদ্ধি পেয়ে ৯০০ হয়। ১৯৬৭–৬৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই সিলেবাস কার্যকর হয়। এ সময় প্রি-ডিগ্রির ব্যবহারিক বিষয়ের বিস্তারিত সিলেবাসও প্রণয়ন করা হয় (এ বিষয়ে প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস পরিচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে)। এ বছরের ৩০ আগস্ট জয়নুল আবেদিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি সভায় শিক্ষাক্রমের সংশোধনীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভায় ১৯৬৭ সালের

[১০৮] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় কার্যবিবরণী, তারিখ : ২৫ আগস্ট, ১৯৬৬, প্রাগুক্ত

[১০৯] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্য বিষয়াবলি, তারিখ : ২২ নভেম্বের ১৯৬৬, নথি নং-সি-৫১, উৎস : প্রাগুক্ত

[১১০] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৬৭ সালের ৩১ জানুয়ারি ও ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, নথি নং সি-৫১, তারিখ : ১৭ এপ্রিল ১৯৬৭, উৎস : প্রাগুক্ত

বিএফএ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিষয়েও আলোচনা হয়।[১১১] এ বছর আর্ট কলেজ থেকে প্রথম বিএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন হামিদুজ্জামান খান, আনিসুর রহমান, মাহামুদা খাতুন, মেজবাহ উদ্দীন প্রমুখ।

আর্ট কলেজ থেকে জয়নুল আবেদিনের অবসর গ্রহণ : ১৯৬৭ সালের শেষ পর্যায়ে জয়নুল আবেদিন তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক কত তারিখে তিনি অবসরে যান সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে চারুকলা অনুষদে সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট, আর্ট কলেজ ও চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবৃন্দের যে তালিকা রয়েছে সেখানে জয়নুল আবেদিনের অধ্যক্ষের সময়কাল ১ মার্চ ১৯৪৯ থেকে ৪ জুলাই ১৯৬৬ উল্লেখ করা হয়েছে। জয়নুল আবেদিনের অধ্যক্ষের সময়কাল প্রসঙ্গে আর্ট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন লিখেছেন, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১১২] জয়নুলের জীবনীকার সৈয়দ আজিজুল হক 'জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, '১৯৬৭ সালের ৪ নভেম্বর জয়নুল আবেদিন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় প্রতিষ্ঠান সরকারি চারু ও কারুকলা কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন।' তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি মিসেস জাহানার আবেদিন ও শিল্পী শফিকুল আমীনের সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শফিকুল আমীনের সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করে আরো উল্লেখ করেছেন, '...১৯৬৭-র অক্টোবরে পূজার ছুটির পরে (জয়নুল আবেদিন) আর কলেজে গেলেন না।'[১১৩] এ বিষয় অনুসন্ধান করে, জয়নুল আবেদিনের ব্যক্তিগত নথি চারুকলা অনুষদে ও তাঁর পরিবারের কাছে পাওয়া যায়নি। তবে চারুকলা অনুষদে সংরক্ষিত বিভিন্ন নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁর অধ্যক্ষ হিসেবে আর্ট কলেজে অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সর্বশেষ স্বাক্ষর পাওয়া যায় অক্টোবরের ২ তারিখে। এ সময় তিনি রশিদ চৌধুরীর স্বাক্ষর প্রতিস্বাক্ষর করেছিলেন।[১১৪] রশিদ চৌধুরী তৃতীয় মেয়াদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের পর সম্ভবত হিসাবসংক্রান্ত প্রয়োজনে তাঁর স্বাক্ষরে অধ্যক্ষের প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়েছিল। এরপর ১৯৬৭ সালের ৬ নভেম্বর রশিদ চৌধুরীর ছুটির আবেদনপত্রে অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে শফিকুল আমীনের স্বাক্ষর দেখা যায়।[১১৫] সুতরাং জয়নুল

[১১১] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ৩০ আগস্ট ১৯৬৭, উৎস : প্রাগুক্ত

[১১২] সৈয়দ শফিকুল হোসেন, "অধ্যক্ষের কথা", *ক্যাটালগ*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব ১৯৭৩, পৃ. অনুল্লেখ

[১১৩] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[১১৪] রশিদ চৌধুরীর স্বাক্ষর অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরকৃত পত্র, তারিখ : ২ অক্টোবর ১৯৬৭, নথি নং-এ-৭১, উৎস : প্রাগুক্ত

[১১৫] ডিপিআইয়ের কাছে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের লেখা রশিদ চৌধুরীর ছুটির অগ্রায়ণ পত্র, তারিখ : ৬ নভেম্বর ১৯৬৭

আবেদিনের স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার সময় সম্পর্কে শফিকুল আমীনের যে বক্তব্য সৈয়দ আজিজুল হক উল্লেখ করেছেন সেটিই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়।

জয়নুল আবেদিন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে কী কারণে অবসরে গিয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁর সহকর্মী ও সহধর্মিণীর কাছ থেকে প্রায় অভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সৈয়দ আজিজুল হক 'জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র' গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিল্পী শফিকুল আমীন, শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং মিসেস জাহানারা আবেদিনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের বক্তব্যে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা হলো—জয়নুল আবেদিন এ পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করতে থাকেন আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে ফেলেছেন, যে কারণে চিত্রচর্চা ব্যাহত হয়েছে। এ জন্য প্রশাসনিক কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন নিজের কাজ করা, অর্থাৎ আঁকার জন্য। এ পর্যায়ে আর্ট কলেজের অভ্যন্তরে কিছু শিক্ষকের সঙ্গে মতানৈক্য সৃষ্টি এবং তাঁদের আচরণে সৃষ্ট অস্বস্তিকর পরিস্থিতি জয়নুলকে হতাশ করেছিল। এ ছাড়া কলেজের নিয়ম-কানুন রক্ষা, ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধন এসব ক্ষেত্রে এমন কিছু ব্যত্যয় লক্ষ করেছিলেন, যা হয়তো তাঁর মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। এসব মিলিয়েই তিনি স্বেচ্ছায় অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১১৬] শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর কী কারণে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল—সে প্রসঙ্গে শিল্পী রফিকুন নবী জানান,

> আর্ট কলেজের উন্নয়নের জন্য ওই সময় [সম্ভবত ১৯৬৫/৬৬ সালে] সরকার থেকে মোটা অঙ্কের আর্থিক অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে বিভিন্ন বিভাগের জন্য শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি—যেমন ট্রাডেল মেশিন, এচিং মেশিন, প্রিন্ট মেশিন ইত্যাদি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবেদিন স্যার এই সব কেনাকাটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন সিনিয়র শিক্ষকের উপর। তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াও এই টাকা দিয়ে কিছু খেলাধুলার ও ব্যায়াম করার সামগ্রী কিনেছিলেন। শিক্ষকদের একটা পক্ষ খেলাধুলার ও ব্যায়ামের সামগ্রী কেনাকে অপ্রয়োজনীয় অর্থ অপচয় আখ্যা দেন এবং কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। ওই শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একটা পক্ষও যুক্ত হয়েছিল। আবেদিন স্যার কেনাকাটার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর উপরে এসবের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে। এসব মিলিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় তিনি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে কলেজে আসা বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে পদত্যাগ করেন।[১১৭]

জয়নুলের স্বেচ্ছায় অবসরের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার কয়েক দিন পর সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব শফিউল আলম সস্ত্রীক জয়নুলের বাসায় গিয়ে তাঁকে অবসরের আবেদন প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন।[১১৮] কিন্তু জয়নুল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আর্ট কলেজের দুই-তিনজন জুনিয়র

---

[১১৬] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩–৩৪

[১১৭] শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, তারিখ : ২৬.৪.২০২০

[১১৮] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

শিক্ষকও তাঁর বাসায় গিয়ে অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়।[১১৯] তবে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে কোনো সংঘবদ্ধ উদ্যোগের কথা জানা যায় না।

তাঁর সহকর্মীদের প্রতি প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তিনি অধ্যক্ষ পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন। সেই অভিমান এতই প্রবল ছিল যে দীর্ঘদিন তিনি আর্ট কলেজে যাননি; এমনকি কলেজের সামনের রাস্তা দিয়েও তিনি যাতায়াত করতেন না। জয়নুল আবেদিনের এই অভিমান ঘোচাতে তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থীরা নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী জয়নুল আবেদিনের নামে উৎসর্গ করা। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'জয়নুল আবেদিনকে আমরা স্মরণ করছি এই শুভ উদ্বোধনে'—এই কথাগুলো লিখিত হয় এবং তাঁর নামের সঙ্গে 'শিল্পাচার্য' উপাধি জুড়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চের মাইক থেকেও তাঁকে 'শিল্পাচার্য' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর জয়নুল আবেদিনের নামের সঙ্গে 'শিল্পাচার্য' উপাধি যুক্ত হয়। তাঁর নামের সঙ্গে 'শিল্পাচার্য' শব্দটি যুক্ত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন শাহাদাৎ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মঞ্জুরুল হাই, মতলুব আলী, রেজাউল করিম প্রমুখ।[১২০] এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁর বাসায় গিয়ে অনেক অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আসতে রাজি হননি।

শফিকুল আমীন ও আনোয়ারুল হকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন : জয়নুল আবেদিন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে শফিকুল আমীন অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি বেশি দিন এই পদে থাকতে পারেননি। ছাত্র আন্দোলন এবং শিক্ষকদের একটা পক্ষের অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। শফিকুল আমীনের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের প্রধান আনোয়ারুল হক অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান ১৯৬৮ সালের ২ জুলাই থেকে। তিনি ১৯৭০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

জুনাবুল ইসলামের যোগদান ও কারুশিল্প শিক্ষার সূচনা : ১৯৬৮ সালের ২৯ জুলাই জুনাবুল ইসলাম (১৯২৯–৯৭) লেকচারার ইন ক্রাফটস্ পদে যোগদান করেন। তিনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে ১৯৫৪ সালে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৫–৬৬ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের ব্রিকটন কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে এক বছর মেয়াদি টিচারশিপ কোর্স করেন। আর্ট কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি মতিঝিলের সেন্ট্রাল

[১১৯] শিল্পী রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[১২০] মতলুব আলী, *আমাদের জয়নুল*, ঢাকা, সুরভি প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ৫৪

গভর্নমেন্ট এইচ ই স্কুলে ড্রইং মাস্টার্সপদে (১৯৫৮–৬৩ পর্যন্ত) এবং ময়মনসিংহের মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার পদে (১৯৬৩–৬৮ পর্যন্ত) নিয়োজিত ছিলেন।[১২১] তিনি নিজ প্রচেষ্টায় বাটিক, টাই-ডাই, স্ক্রিনপ্রিন্ট ইত্যাদি মাধ্যমের করণ-কৌশল শিখেছিলেন এবং এ সকল বিষয়ে শিল্পচর্চা করতেন। তাঁর নিয়োগের পর আর্ট কলেজে কারুকলা শিক্ষার সূচনা হয়। আর্ট কলেজের মূল ভবনের স্থান সংকটের কারণে প্রথমে তাঁর বসার ব্যবস্থা করা হয় গোল পুকুরের পশ্চিম পাশে নির্মাণাধীন এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের (বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইন ভবন) নিচতলার দক্ষিণ পাশের ছোট একটি কক্ষে। সেখানে তিনি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কারুশিল্পের 'বাটিক' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান শুরু করেন।[১২২] ১৯৭২ সালে কারুশিল্প বিভাগ আর্ট কলেজের মূল ভবনের সিঁড়িঘরের পাশে অবস্থিত নিচতলার কক্ষে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত প্রি-ডিগ্রির সিলেবাসে কারুশিল্প ৫০ নম্বরের একটি আবশ্যিক বিষয় করা হলে কারুশিল্প বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়। দেশ স্বাধীনের পর এই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন আব্দুল জব্বার (১৯৪৩–২০১১) এবং আব্দুস শাকুর শাহ্ (জন্ম : ১৯৪৬)।

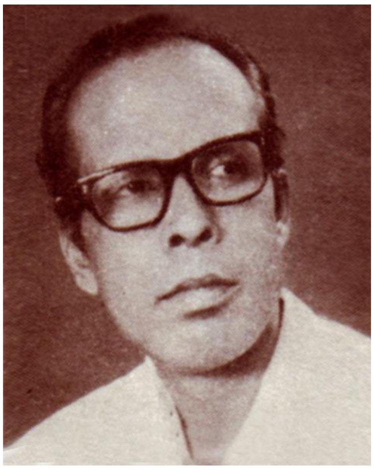

চিত্র-৪১ : শিল্পী জুনাবুল ইসলাম

চিত্র-৪২ : বাটিক ক্লাস, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প সংযুক্ত হওয়ার ইতিহাস বেশ পুরনো। কারুশিল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় যুক্ত হয় উনিশ শতকে প্রথম পর্যায়ে ইউরোপে গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এর পূর্বে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা একাডেমিতে চারুকলাই (চিত্রকলা ও মূর্তিকলা)

---

[১২১] জুনাবুল ইসলামের সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদন ফরম ও সংযুক্তি পত্রসমূহ, তারিখ : ১৯ এপ্রিল ১৯৮৫, ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ; *বাংলাদেশ সমকালীন চারুকলা সিরিজ ৫৮ : জুনাবুল ইসলাম*, সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ২৩

[১২২] অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার এবং অধ্যাপক আব্দুস শাকুর শাহ্‌র সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২৯.৪.২০২০ এবং ২১.৫.২০২০; আব্দুস সাত্তার জানিয়েছেন, ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে ভর্তির পর তিনি নির্মাণাধীন ভবনে ক্লাস শুরু করেন। এ সময় জুনাবুল ইসলাম এসে ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব পাশের একটি ছোট রুমে বসতেন। সে সময় তিনি নিজে টুকটাক কাজ করতেন এবং ছাত্রদেরও শেখাতেন; শিল্পী শাকুর শাহ্ এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন

ছিল শিক্ষণীয়। কারুকলা শিক্ষা সেখানে গুরুত্ব পায়নি। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা মেকানিকস ইনস্টিটিউট, ডিজাইন স্কুল ইত্যাদি নামে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানকার শিক্ষাক্রমে কারুকলার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণীয় করা হয়। তবে তা ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। এ সময় থেকেই শিল্পশিক্ষা ও চর্চা চারুকলা ও কারুকলা নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে সমাজে দুই শ্রেণির শিল্পীর উদ্ভব হয়, যাদের মধ্যে একদল শহরের অভিজাত বিত্তবানদের নান্দনিক রুচির পরিতৃপ্তির জন্য শিল্প সৃষ্টি করে; আরেক দল ব্যবহারিক প্রয়োজনে যন্ত্রের সমকক্ষ নকশা ও শিল্প তৈরি করে। চারুকলার শিল্পীরা এ সময় সমাজের অভিজাত বিত্তবানদের দ্বারা অধিক সমাদৃত হতে থাকেন। এই ব্যবধান ঘোচাতে এবং কারুকলাকে সৃজনশীল শিল্পমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে উনিশ শতকে ইউরোপে বেশ কয়েকটি শিল্প আন্দোলন ও উদ্যোগ সংঘটিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শিল্পী উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪–৯৫) এবং শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক জন রাস্কিনের (১৮১৯–১৯০০) নেতৃত্বে সংঘটিত হয় 'আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ মুভমেন্ট'। তাঁরা চেয়েছিলেন চারু ও কারুকলার সম্মিলনে পুনরায় শিল্পকলাকে পুরনো সামাজিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে। মরিস মনে করতেন, 'ব্যবহারিক উপযোগিতার ভেতর দিয়ে সৌন্দর্যের আস্বাদন লাভ করা যায়, সৌন্দর্য কেবল দেয়ালের ছবিতে বা বাগানের মূর্তিতে থাকে না।'[১২৩] জন রাস্কিন (১৮১৯–১৯০০) এই আন্দোলনের সপক্ষে 'আর্ট অ্যান্ড সোশ্যালিজম' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে শুরু হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চারুকলা ও কারুকলার সমন্বয়ে নতুন যে নকশা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তা 'আর্ট ন্যুভ' নামে পরিচিত। জার্মান স্থপতি ওয়াল্টর গ্রোপিয়াসের নেতৃত্বে জার্মানির ওয়াইমারে প্রতিষ্ঠিত বাউহাউস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারুকলা শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষাক্রমে মূর্তিকলা, সূত্রধর শিল্প, ধাতবশিল্প, মৃৎপাত্র, স্টেইন্ড গ্লাস, ভিত্তি চিত্র অঙ্কন এবং বয়ন কারুশিল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রোপিয়াস অনুভব করেছিলেন, প্রথমত, শিল্পকলাকে বিত্তবানদের অবসরভোগ্য বা সংগ্রহশালার সামগ্রী হিসেবে জনজীবন থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই একাডেমির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, শিল্পীদের অতিসচেতন প্রাতিস্বিকতা ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর আঁতাতের ভেতর দিয়ে চারু ও কারুকলার মধ্যে সামাজিক বিভেদ তৈরি করা হয়েছে, যা কৃত্রিম;[১২৪] তিনি এই কৃত্রিম বিভেদ দূর করার প্রচেষ্টা করেছিলেন বাউহাউসের মাধ্যমে।

---

[১২৩] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০–৪১

[১২৪] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬–৪৮

ভারতের ঐতিহ্যবাহী মৃৎ ও কারুশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটিশরা উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের মাদ্রাজে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ১৯৫১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'গ্রেট এক্সিবিশন'-এ প্রদর্শিত কারুকলার নিদর্শন ইউরোপীয় শিল্পকলা জগতে সাড়া জাগালে লন্ডনের ডিজাইন স্কুলে ভারতীয় আলংকারিক কারুশিল্প অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতায় আর্ট স্কুল গড়ার অনুপ্রেরণা মূলত এখান থেকে এসেছিল। কিন্তু কলকাতা আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ধারায় শিল্পশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প শিক্ষা আর্ট স্কুলে প্রথম পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের যোগদানের (১৮৯৬) পর আর্ট স্কুলের শিক্ষার গতিমুখ পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পরিবর্তে ভারতীয় শিল্পপরম্পরার দিকে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় তিনি স্কুলের শিল্পশিক্ষা ফাইন আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট এই দুই ভাগে ভাগ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেন। কারুশিল্পের শিক্ষণীয় বিষয় এ সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলকাতা আর্ট স্কুল যখন কলেজে উন্নীত হয় (১৯৫১), তখন কারুশিল্পকে একটি 'সিস্টার ইউনিট' করা হয়।[১২৫] যেখানে দুই বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স করার ব্যবস্থা ছিল। এই ইউনিটের মধ্যে টেক্সটাইল, উড, সিরামিক ও লেদার ক্রাফটস্ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে নানা উত্থান-পতনের মধ্যে কারুশিল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকেছে যুগ যুগ ধরে।

জয়নুল আবেদিন কারুশিল্পের প্রতি ছিলেন প্রবলভাবে আগ্রহী। এ কারণে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় তিনি কারুকলা বিভাগের অনুমোদন করিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অভাব, স্থান সংকটসহ নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কারুকলা বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর উদ্যোগে কলেজে লোকশিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে লোকজ কারুশিল্পের নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে; সেখান থেকে কারুশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। এ ছাড়া ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে ১৯৬১ সালে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের অধীনে একটি লোকশিল্প জাদুঘর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় সোনারগাঁয়ে সেটির বাস্তবায়ন করেন।

১৯৬৩ সালে কারুশিল্প বিভাগ মৃৎশিল্প বিভাগের সঙ্গে একীভূত করে 'সিরামিকস অ্যান্ড ক্রাফটস্' বিভাগ নামকরণ হয়। তবে ডিগ্রি পর্যায়ে মৃৎশিল্প বিভাগের পরিপূর্ণ সিলেবাস তৈরি করা হলেও ক্রাফটস্ বিষয়ে কোনো কোর্স সেই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সিলেবাসে ক্রাফটস্ বিভাগকে আলাদা করে ডিগ্রি পর্যায়ে ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়

[১২৫] Bagal Jogesh Chandra, Ibid., p. 5

হলো ‘বাটিক’। জুনাবুল ইসলামের যোগদানের পর ঐচ্ছিক ‘বাটিক’ বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে কারুশিল্প বিভাগের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে কারুশিল্প বিভাগের বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাস অনুমোদিত হয় এবং ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয়। ওই বছর ডিগ্রি প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলেন তৈয়বুর রহমান।

ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর ও শিক্ষক নিয়োগ : ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালের একজন ছাত্র ভর্তির পর পরবর্তী দুই বছর এই বিভাগে কোনো ছাত্র ভর্তি হননি। ১৯৬৮ সালে আব্দুস সাত্তার এই বিভাগে ভর্তি হন। তিনি যখন ভর্তি হন তখন এই বিভাগে কোনো শিক্ষক ছিল না। রশিদ চৌধুরী ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে চাকরিচ্যুত হওয়ায় এবং শফিকুল আমীন ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার কারণে বিভাগটি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে রশিদ চৌধুরীর নিয়োগ, চাকরিচ্যুতি এবং মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁকে পুনর্নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি কারণে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্টস পদে নিয়োগ বিলম্বিত হয়। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে তাঁকে নিয়োগের লক্ষ্যে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হলে ফ্রান্সে থাকার কারণে তিনি ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাঁকে স্থায়ী ভিত্তিতে চাকরিচ্যুত করা হয়।[১২৬] এসব কারণে দীর্ঘদিন বিভাগে শিক্ষকসংকট ছিল। তাঁর চাকরিচ্যুতির পর লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে হাশেম খানকে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাঁকে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে সাময়িকভাবে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তাঁকে উক্ত পদে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।[১২৭] তাঁর যোগদানের পর থেকে প্রাচ্যকলা বিভাগে নিয়মিত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া শুরু হয়।

---

[১২৬] লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগ সংক্রান্ত নথিতে সংরক্ষিত রশিদ চৌধুরীর এডহক ভিত্তিতে যোগদান পত্র, চাকরি থেকে অব্যাহতির নোটিফিকেশন, তাঁর পুনর্নিয়োগে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত; লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগের ইন্টারভিউ কার্ড এবং তাঁর সর্বশেষ চাকরি থেকে অব্যাহতির অফিস আদেশ, প্রাগুক্ত

[১২৭] লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগের জন্য ডিপিআইয়ের কাছে লেখা হাশেম খানের আবেদনপত্র, তারিখ : ২৩ এপ্রিল ১৯৬৮। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ২৪ এপ্রিল উক্ত পত্র ডিপিআইয়ের কাছে প্রেরণ করেন। অগ্রায়ণপত্রে অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন লিখেছেন ‘রশিদ চৌধুরীর চাকরিচ্যুতির পর থেকে হাশেম খানকে অস্থায়ী ভিত্তিতে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগদানের জোর সুপারিশ করা হলো।’ তারিখ : ২৫.১১.৬৮, নথি নং এ-৭১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন দেলোয়ার হোসেন (১৯৩৯–১৯৭৮)।[১২৮] তিনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৯ সালে মাহমুদুল হক (জন্ম : ১৯৪৫) একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে আর্ট কলেজের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন।

চিত্র-৪৩ : শিল্পী হাশেম খানের তত্ত্বাবধানে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম, উৎস : চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০০৪

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে আর্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা : আর্ট কলেজের কার্যক্রম শুধু শিল্পশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতির আন্দোলনের সপক্ষে আর্ট কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা উত্থাপন করলে দেশব্যাপী স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধুসহ বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার, ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতন এবং সংবাদপত্রের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করলে আন্দোলন জোরালো হতে থাকে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আগরতলা 'ষড়যন্ত্র' মামলা করলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে ছয় দফার পক্ষে ছাত্ররা ১১ দফা ঘোষণা করলে ছাত্র-জনতার এক গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এই

[১২৮] বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের Annual Report, তারিখ : ৩১.১২.৭২, Annual Report সম্পর্কিত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢা. বি.

আন্দোলনের ফলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয় পাকিস্তান সরকার। আর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সামরিক বাহিনীর কাছে। এরপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী ও কিছু শিক্ষক তাঁদের শিল্পসত্তা দিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনের সপক্ষে ব্যানার চিত্র, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড এঁকে ও লিখে এবং সংকলন প্রকাশ করে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে চারুশিল্পীদের এসব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে শহিদ মিনার। শহিদ মিনারে আলপনা করার প্রচলন আগে থেকেই ছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে তা নতুন মাত্রা পায়। আলপনা ছাড়াও এ সময় বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে পোস্টার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডও আঁকা হতো। ১৯৬৮ সালে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় বড় বড় ব্যানার চিত্র।[১২৯] ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে শহিদ মিনারে বড় বড় ব্যানার চিত্রসহ অনেক পোস্টার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড আঁকা হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে। এসব ব্যানার চিত্র, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে আঁকা আলপনা, ব্যানার চিত্র, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় ২৬ ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী শহিদ মিনারের পথ, দেয়াল আর স্তম্ভে যা দেখেছি’ শীর্ষক প্রতিবেদনে। পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন—

> ...দেখলাম শহীদ মিনারকে ঘিরে বাংলা শিল্পের অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে। ... শহীদ মিনারের অঙ্গসজ্জা, পোস্টার প্রদর্শনী, সম্মুখে কালো রাজপথে আল্পনা, মিনারের প্রেক্ষাপটে লাল সূর্য, তার বিচ্ছুরিত রশ্মিতে ফুটে উঠেছে সংগ্রাম, শক্তি আর শপথের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। কথায়, রেখায় আর কাহিনী বন্দ-ব্যঞ্জনায় আঁকা প্রাচীর চিত্রগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক) বিভিন্ন কবির গণমুখী বক্তব্য, খ) চিত্রের সাহায্যে অত্যাচার আর নির্যাতনের বিবরণ এবং গ) ব্যঙ্গচিত্রে বিদ্রুপ প্রকাশ।[১৩০]

ওই সময়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি চেতনার সপক্ষে কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হয়েছিল পোস্টারে ও ফেস্টুনে।

---

[১২৯] শাওন আকন্দ, “ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা”, *শিল্পরূপ*, ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৯, পৃ. ৪৯

[১৩০] নিজস্ব সংবাদদাতা, “ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী শহীদ মিনারের পথ, দেয়নি আর স্তম্ভে যা দেখেছি”, *দৈনিক আজাদ* ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ৩

ব্যানার চিত্রে আঁকা হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতির সপক্ষে বার্তাবাহী চিত্র এবং সরকারের নির্যাতন ও দুর্নীতির চিত্র। এই চিত্রের মধ্যে 'একটি বাঁশের আত্মকাহিনী' ও 'দুঃখিনী বর্ণমালা' (মতান্তরে বিক্ষুব্ধ/বিদ্রোহী বর্ণমালা) ছিল অনবদ্য।[১৩১] 'একটি বাঁশের আত্মকাহিনী' চিত্রটি সাতটি প্যানেলে ভাগ করে একটি শিশুর জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠা এবং শিক্ষার জন্য শহরে গিয়ে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়া; অতঃপর পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। 'দুঃখিনী বর্ণমালা' সিরিজে স্বরবর্ণমালার এগারোটি অক্ষরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত শিশুতোষ ছড়াকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য চিত্রকলার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন : 'অ-তে অজগর আসছে তেড়ে'—এখানে আঁকা হয়েছে একটা হিংস্র অজগরকে; যার ওপর আসীন হয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা। অজগরকে ঠেলে সামনে নিয়ে আসছে তাঁর দুজন চ্যালা। আবার 'ঈ-তে ঈগল পাখি পাছে ধরে'—এই ছবিতে দেখানো হয়েছে একটি বড় ঈগল পাখি হিংস্র নখর মেলে আক্রমণে উদ্যত। দুটি তীর পাখিটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। এভাবে পাকিস্তান সরকারের দুরভিসন্ধি ও ভুলত্রুটি এই বর্ণমালা সিরিজচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।[১৩২]
ওই সময়ে আঁকা ব্যঙ্গচিত্র সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

> বর্তমান সরকারের প্রতি জনসাধারণের সে যুগসঞ্চিত বিক্ষোভ তা যেন ফেটে পড়েছে পোস্টারগুলোতে। যেমন কর্ম খালি বিজ্ঞাপনটি, যেখানে বলা হয়েছে প্রদেশের শাসনকর্তার পদটি খালি আছে। অভিজ্ঞতাস্বরূপ চাওয়া হয়েছে প্রার্থী বা তার ছেলে-পেলে ও সাঙ্গো-পাঙ্গদের লাঠিয়াল, খুনী, লুটতরাজে সিদ্ধহস্ত হতে হবে। অগ্রগতির দশ বছর পোস্টারে দেখানো হয়েছে দরিদ্রতা আর দুর্নীতির দশ বছরের ছবি। এ পর্যায়ে কিছু ছবিতে স্থুল ব্যঙ্গরসও পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন বানরের হাতি শাসন, গদি চাই না, প্রাণে বাঁচাও প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্র অন্যতম।[১৩৩]

আর্ট কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় পোস্টার, ব্যানার চিত্র এবং প্ল্যাকার্ড আঁকা ও শহিদ মিনারে উন্মুক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে ব্যানার চিত্র এবং পোস্টার ও ফেস্টুনে আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলো দর্শকগণ দারুণভাবে উপভোগ করেন। আর্ট কলেজের কয়েকজন তরুণ শিক্ষক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী দিনান্ত পরিশ্রম করে এগুলো এঁকেছিলেন। বক্তব্যধর্মী পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার চিত্রের অধিকাংশ আঁকা হতো আর্ট কলেজের হোস্টেলে; কিন্তু কিছু বড় ব্যানার চিত্র (ফ্রেমে মার্কিন কাপড় লাগিয়ে) শহিদ মিনারের সামনেও আঁকা হয়েছিল। শিক্ষক ও শিল্পীদের আঁকা লে-আউট অনুযায়ী

---

[১৩১] শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, ঢাকা, ৯.৫.২০১৯

[১৩২] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ*, ঢাকা, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫, পৃ. ১৫–২০ (এই গ্রন্থে মুদ্রিত 'বাঁশপাতা কাহিনী' ও 'দুঃখিনী বর্ণমালা সিরিজ' চিত্রের প্রতিলিপি দেখে এই ব্যানার চিত্র দুটির বর্ণনা করা হয়েছে)

[১৩৩] নিজস্ব সংবাদদাতা, "ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী শহীদ মিনারের পথ, দেয়াল আর স্তম্ভে যা দেখেছি", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

শিক্ষার্থীরা বড় ব্যানারে ছবিগুলো আঁকতেন। ব্যানার চিত্রের পরিকল্পনা ও লে-আউটের ক্ষেত্রে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার (সাবেক শিক্ষক) ও তরুণ শিক্ষক রফিকুন নবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে হাশেম খানও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। জয়নুল আবেদিনও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং শহিদ মিনারে প্রদর্শনীর জন্য একটি ছবি এঁকে দিতেন।[১৩৪] শিল্পীদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন, নিতুন কুন্ডু, মহিউদ্দীন ফারুক, আনোয়ার হোসেন, গোলাম সারোয়ার প্রমুখ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। এ ছাড়া আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীর মধ্যে শাহাদাৎ চৌধুরী, মঞ্জুরুল হাই, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মন্ডল, প্রফুল্ল রায়, রেজাউল করীম, জি এম এ রাজ্জাক, আবুল বারক আল্‌ভী, আব্দুল মান্নান, মতলুব আলী, বীরেন সোম প্রমুখ এই ছবি আঁকা ও সংলাপ লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন।[১৩৫]

এ সময় আর্ট কলেজ ছাত্রসংসদ থেকে প্রকাশিত হয় 'উনসত্তুরের ছড়া' নামে একটি সংকলন। সংকলনটির পরিকল্পনাসহ ছড়া সংগ্রহ ও সম্পাদনার মূল কাজটি করেছিলেন রফিকুন নবী, হাশেম খান এবং শাহাদাৎ চৌধুরী। সংকলনের অলংকরণে ব্যবহৃত ব্যঙ্গচিত্রগুলো এঁকেছিলেন রফিকুন নবী। এই সংকলনে খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিকসহ আর্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লেখা ছড়া ছাপা হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শওকত ওসমান, সিকান্‌দার আবু জাফর, সুফিয়া কামাল, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, সুকুমার বড়ুয়া, কাজী হাসান হাবীব, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, শাহাদাৎ চৌধুরী, শাহরিয়ার কবীর প্রমুখ।[১৩৬] সংকলনটি ওই সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

আর্ট কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম শুধু একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করে আলপনা, ব্যানার চিত্র, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড আঁকা এবং ছড়ার সংকলন প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আর্ট কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দ যোগদান

[১৩৪] শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, প্রাগুক্ত; শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত; তৎকালীন আর্ট কলেজের সহসভাপতি (১৯৬৯–৭২) জি এম এ রাজ্জাকের সঙ্গে মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ০১.৫.২০২০

[১৩৫] শাওন আকন্দ, "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা", *শিল্পরূপ*, ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; আর্ট কলেজ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি (১৯৬৭–৬৮) রেজাউল করিমের সঙ্গে মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ২৭.৪.২০২০; সহসভাপতি (১৯৬৯–৭২) জি এম এ রাজ্জাকের সঙ্গে মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ০১.৫.২০২০

[১৩৬] *উনসত্তুরে ছড়া*, ঢাকা, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ছাত্রসংসদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৯; রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথ রেখায়*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস্, ২০১৯, পৃ. ১৩৫–৩৬

করেছিলেন। এ ছাড়া ঢাকা শহরে দেয়াল লিখনেও আর্ট কলেজের ছাত্ররা তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৩৭]

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি শিল্পীদের যে দায়বদ্ধতা, সেই উপলব্ধি থেকে তাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠন। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির চেতনাগত আর একটি বিষয় ঘটেছিল। সেটি হলো, ঐতিহ্যবাহী আলপনা ডিজাইনকে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। একসময় আলপনা ছিল একটি ধর্মের অনুষঙ্গ। শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করে আলপনা আঁকার ফলে এ সময় ধর্মনিরপেক্ষ ডিজাইন হিসেবে আলপনা পরিচিত হয়ে ওঠে। মোটা ব্রাশে কংক্রিটের ওপর দ্রুত আঁকার ফলে আলপনা শৈলীগত একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। এভাবে নির্ধারিত শিক্ষা ও পাঠ্যসূচির বাইরে আর্ট কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বাঙালির সাংস্কৃতিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে সংঘটিত স্বাধীনতাসংগ্রামেও তাঁদের এই ভূমিকা অব্যাহত ছিল।

বার্ষিক প্রদর্শনী : ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী হয় কলেজের নিজস্ব গ্যালারিতে। প্রদর্শনীতে কলেজের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর ৫১১টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। এই প্রদর্শনী নিয়ে সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত 'দৈনিক সংবাদ'-এ একটি সমালোচনাধর্মী প্রতিবেদন লেখেন, যা পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশের চিত্রকর্ম : শিল্পী ও শিল্পরূপ' গ্রন্থে সংযোজিত হয়। এই প্রতিবেদনে ওই সময়ের আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রদর্শনীতে নতুনভাবে যুক্ত হয় মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের মৃৎশিল্প, মোজাইক ও টেরাকোটা মাধ্যমের শিল্পকর্ম। এ সকল মাধ্যমে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী এম এ খালিদ, আক্তারুন্নাহার, শিরিন সুলতানা; পঞ্চম বর্ষের এম এ সাত্তার, হামিদা খাতুন, মাহমুদা, এজাজ হোসেন, কামাল ও কাদের। এ ছাড়া রয়েছেন মাজহারুল সিদ্দিক, নাসরিন ও আব্দুর রউফ। কলেজ হওয়ার পর থেকে প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ভাস্কর্য এবং মৃৎশিল্পের চর্চা যে শিক্ষার্থীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছিল তা এই প্রদর্শনী থেকে বোঝা যায়। প্রদর্শনীতে দুজন বিদেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন নেপালি ছাত্র মনোজবাবু মিশ্রা ও ফ্রান্সের ছাত্রী ফ্রঁসিন ক্রশৌ।[১৩৮] ফ্রঁসিন ক্রশৌ আর্ট কলেজের অনিয়মিত ছাত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে সফিউদ্দীন আহমেদের কাছে চার-পাঁচ মাস ছাপচিত্র বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর বাবার চাকরি সূত্রে এ সময়

[১৩৭] ১৯৬৭–৬৮ সময়ের আর্ট কলেজ সংসদের সহসভাপতি রেজাউল করিম এবং ১৯৬৯–৭২ সময়ের সহসভাপতি জি এম এ রাজ্জাকের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, প্রাগুক্ত

[১৩৮] সন্তোষ গুপ্ত, *বাংলাদেশের চিত্রকলা : শিল্পী ও শিল্পরূপ*, ঢাকা, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১২ পৃ. ১৫৩

বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে শুধু আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিল। পূর্বে (আর্ট ইনস্টিটিউট থাকার সময়) বার্ষিক প্রদর্শনীতে শিক্ষক ও সাবেক শিক্ষার্থী শিল্পীদের চিত্রকর্ম স্থান পেত। ১৯৬৩ সালে কলেজ হওয়ার পর সেটা বন্ধ করা হয় ছাত্রদের প্রতিবাদের কারণে।[১৩৯]

অধ্যাদেশ ও প্রবিধান সংশোধন : ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসংক্রান্ত অধ্যাদেশ ও প্রবিধান সংশোধন করে আর্ট কলেজে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা (Supplementary Examination) প্রবর্তন করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৭০ সালের ২২ জানুয়ারির সভার সুপারিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১১ এপ্রিলের সভার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের ১৬ এপ্রিলের সভায় সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় কোনো শিক্ষার্থী প্রিলিমিনারি অথবা বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষায় যদি দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হন, কিন্তু অন্য সব বিষয়ের মোট নম্বর ৪০% থাকে তাহলে অকৃতকার্য হওয়া বিষয়/বিষয় দুটিতে সাপ্লিমেন্টারি প্রিলিমিনারি অথবা বিএফএ পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ৪০% নম্বর পেলে তিনি কৃতকার্য হবেন। প্রিলিমিনারি অথবা বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিগত পরীক্ষার সিলেবাসের মধ্য থেকে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষাপত্র তৈরি করতে হবে। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী অস্থায়ীভাবে প্রিলিমিনারি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিএফএ ডিগ্রিতে ভর্তি হতে পারবেন; তবে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তা নিশ্চিত করা হবে।[১৪০] এই অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সাল থেকে আর্ট কলেজে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা গ্রহণ করা শুরু হয়। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাদেশ-১৯৬১-এর স্ট্যাটিউটস ৪(১) এবং ৪(৩) সংশোধন করা হয়। স্ট্যাটিউটস ৪(১)-এ পূর্বে উল্লেখ ছিল—'Each Faculty other then the Faculty of Education and the Faculty of Fine Arts shall consist of' এটির স্থলে যুক্ত করা হয় 'Each Faculty other than the Faculty of Education, Faculty of Fine Arts and the Faculty of Medicine shall consist of' এই সংশোধনীর মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন অনুমোদিত হয়। স্ট্যাটিউটস ৪(৩) সংশোধন করে ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সদস্য অনধিক ত্রিশজন করা হয়।[১৪১] পূর্বে এ সকল ফ্যাকাল্টি কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল অনধিক পনেরো জন।

[১৩৯] রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[১৪০] Extract from the Minutes of the Syndicate Meeting, held on the 16th April 1970, উৎস : রেকর্ডরুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৪১] চ্যান্সেলরের সচিব মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং ৮০৬, শিক্ষা, তারিখ : ১৪.৭.১৯৭০, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

আব্দুল মতিন সরকার
লেকচারার ইন হিস্টোরি অব সিভিলাইজেশন

বুলবন ওসমান
লেকচারার ইন সোশিওলজি

শিল্পী মনিরুল ইসলাম
শিক্ষক

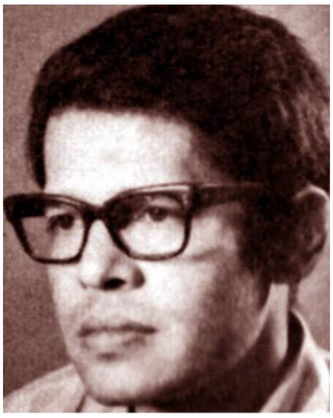

শিল্পী দেলোয়ার হোসেন
শিক্ষক

শিল্পী মাহমুদুল হক
শিক্ষক

শিল্পী হামিদুজ্জামান খান
শিক্ষক

চিত্র-৪৪ : কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে ১৯৬৫–১৯৭০ সালের মধ্যে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষক নিয়োগ : ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে হামিদুজ্জামান খান (জন্ম : ১৯৪৬) স্কাল্পচার বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি আর্ট কলেজের ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে ১৯৬৭ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ওই বছর জানুয়ারি মাসে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত পান। এই অসুস্থতা নিয়েই তিনি বিএফএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষার পর একটি বিদেশি সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। চিকিৎসা শেষে তিনি প্যারিস ভ্রমণে যান। প্রায় ছয় মাস ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি লন্ডন ও প্যারিসের বিখ্যাত মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন করে ইউরোপের সমকালীন শিল্পের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ সময় তিনি ভাস্কর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে তিনি আবদুর রাজ্জাকের কাছে অনানুষ্ঠানিকভাবে ভাস্কর্য শিক্ষা শুরু করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি মডেলিং বিষয়টি ভালোমতো আয়ত্ত করেন। এ কারণে তাঁকে স্কাল্পচার বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[১৪২] ১৯৭০ সালের ২৪ মার্চ ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে রোকেয়া হুমায়ন যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

চিত্র-৪৫ : অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন

অধ্যক্ষ নিয়োগ : ১৯৭০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আর্ট কলেজে স্থায়ী ভিত্তিতে অধ্যক্ষ নিয়োগের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা বিভাগ। তখন আর্ট কলেজে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান এবং শিক্ষক হিসেবেও অভিজ্ঞ। কিন্তু প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে তাঁদের অধিকাংশের অনীহা ছিল। আবার যাঁদের ইচ্ছা ছিল তাঁদের পক্ষে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা কঠিন ছিল। জয়নুল আবেদিনের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শফিকুল আমীনের অবসরে যাওয়ার কারণে আর্ট কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যে অস্থিতিশীল

[১৪২] শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৮ মে ২০২০

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা তখনো দূরীভূত হয়নি। অধ্যক্ষ হওয়ার প্রতি সিনিয়র শিক্ষকদের অনীহার এটিও একটি কারণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিভাগ আর্ট কলেজের একজন যোগ্য অধ্যক্ষ খোঁজার জন্য জয়নুল আবেদিনের শরণাপন্ন হলে তিনি সৈয়দ শফিকুল হোসেনের (১৯২৭–?) নাম উল্লেখ করেন। সৈয়দ শফিকুল হোসেন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান এডুকেশন সেন্টারের স্পেশালিস্ট। একাধারে শিক্ষাবিদ ও শিল্পী। একজন ভদ্রলোক হিসেবে সর্বমহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে ফাইন আর্ট বিষয়ে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্নের (১৯৫৩) পাশাপাশি তিনি ইংরেজি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে যুক্তরাজ্য থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এবং এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে চাকরির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছিল। এসব বিবেচনা করে জয়নুল আবেদিন তাঁকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন। জয়নুলের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগ তাঁকে এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার থেকে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে বদলি করলে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর তিনি সেখানে যোগদান করেন।[১৪৩] যোগদানের পর তিনি দ্রুত সকল শিক্ষকের আস্থা অর্জন করেন এবং আর্ট কলেজের উন্নয়নে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি আর্ট কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএফএ কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেন এবং ভৌত অবকাঠামোগতসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও আর্ট কলেজ : বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধিকার আন্দোলনের মতো মুক্তিযুদ্ধেও আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ এ দেশের চারুশিল্পীরা তাঁদের শিল্পসত্তা দিয়ে এবং সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে জয়নুল আবেদিন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হেলাল-ই-ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহনা শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি এই ভাষণের মাধ্যমে শত্রুদের মোকাবেলার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। এই ভাষণে তিনি বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[১৪৪]

---

[১৪৩] সৈয়দ শফিকুল হোসেনের জীবনবৃত্তান্ত, তারিখ : ১৫.২.১৯৭২, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[১৪৪] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পা.), *সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার সচিত্র ইতিহাস (১২০৪–১৯৭১)*, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ. ১৭১ ও ১৮১

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার শিল্পীরা 'বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে শিল্পীরাই প্রথম স্বাধীনতা শব্দকে বহুল প্রচার এবং আন্দোলন জোরদার করার জন্য 'স্বা ধী ন তা'—এই চারটি বর্ণ বুকে ঝুলিয়ে এবং ব্যঙ্গচিত্র ও স্লোগানসংবলিত অসংখ্য পোস্টার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড সহকারে এক শক্তিশালী ও বিক্ষুব্ধ মিছিলের আয়োজন করেন ১৯৭১ সালে ১৬ মার্চ।[১৪৫] মিছিলটি আর্ট কলেজ থেকে সজ্জিত হয়ে প্রথমে শহিদ মিনারে যায়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পর মূল মিছিলটি শহিদ মিনার থেকে শুরু হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই মিছিলে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, হাশেম খান প্রমুখ।[১৪৬] মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ছিলেন আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী। সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনাকালে আয়োজিত মিছিলটি ছিল একটি সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। মিছিলটি স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

চিত্র-৪৬ : বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্বা ধী ন তা' শীর্ষক মিছিল, ১৬ মার্চ ১৯৭১
উৎস : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত গ্রন্থ *সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা*

[১৪৫] মুর্তজা বশীর, "একটি মিছিলের আত্মকাহিনী", *আমার জীবন ও অন্যান্য*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ. ৫৯–৫৯

[১৪৬] *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. অনুল্লেখ

২৫ ও ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা শহরে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল তার নির্মম শিকার হয়েছিল আর্ট কলেজ ও কলেজের ছাত্রাবাস। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে কলেজের কর্মচারী নোনা মিয়া এবং সিঅ্যান্ডবির এক কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। নির্দয়ভাবে গুলি চালিয়ে চিড়িয়াখানায় থাকা কিছু পশু-পাখি হত্যা করে এবং সেখানে থাকা অধিকাংশ হরিণ তারা খাওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের তৈরি কিছু ভাস্কর্য ও চিত্র ধ্বংস করে।[১৪৭]

২৬ মার্চ সকালে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আর্ট কলেজের ছাত্রাবাসে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র শাহনেওয়াজকে। এ সময় গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র নজরুল ইসলাম এবং তাঁর বন্ধু করিম জাহান। তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলার ৯ নম্বর কক্ষে। শাহনেওয়াজ ১ নম্বর কক্ষে থাকতেন; ওই দিন সকালে একসঙ্গে নাশতা করার জন্য তিনি নজরুলের কক্ষে গিয়েছিলেন। সকাল সাতটার দিকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাঁরা রুমের দরজা বন্ধ করে খাটের নিচে লুকিয়েছিলেন। সেনারা দরজায় এসে আঘাত করতে থাকলে শাহনেওয়াজ খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দেন। এ সময় সাত-আটজন সেনা কক্ষের ভেতরে ঢুকে তাঁদের পরিচয় জানতে চায়। তাঁরা ছাত্র পরিচয় না দিয়ে নিজেদের শিল্পী হিসেবে পরিচয় দেন। নজরুল ইসলাম জানান—

> শিল্পী শুনেই ওদের একজন (উর্দুতে) বলে ওঠে শহীদ মিনার বানাও, ম্যাপ এঁকে ইন্ডিয়ায় পাচার করো, গাদ্দার, বাঙাল। তাদের বুঝাতে চেষ্টা করি, আমরা ওসব করি না। সিন-সিনারী আঁকি। কিন্তু আমাদের কথা তারা শোনেনি। লাইনে দাঁড়াতে বলে। কোনো উপায় না পেয়ে লাইনে দাঁড়াই; এরপর গুলি করে। প্রথমে আমার বন্ধুকে গুলি করে। গুলি খেয়ে সে পড়ে যায়। তার পর শাহনেওয়াজের। গুলি খেয়ে সে খাটের উপর পড়ে যায়। এরপর আমার পালা। দেখলাম একজন আমাকে লক্ষ্য করে রাইফেল কার্ক করছে। গুলির দৃশ্যটা দেখতে চাইনি, তাই ঘাড় ঘুরিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পাঁজরের বাম পাশে আঘাত অনুভব করি। মুহূর্তে আমি খাটের উপর শাহনেওয়াজের গায়ের উপর পড়ে যাই। ক্ষতস্থানে রক্ত ঝরছিল, কিন্তু জ্ঞান হারাইনি। শাহনেওয়াজের শরীরের খিচুনি আমি অনুভব করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ তার গোঙানির শব্দও পাই। একপর্যায়ে দেখলাম তার শরীর শান্ত হয়ে এসেছে। বুঝলাম সে মারা গিয়েছে।[১৪৮]

নজরুল ইসলাম আরো জানান, ওই দিন ছাত্রাবাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট মোহাম্মদ কিবরিয়াও পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছ থেকে তাঁর পুরস্কার গ্রহণের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পাকিস্তান বাহিনী যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটায় সেখানে আর্ট কলেজের ছাত্র অমিত বসাক শহিদ হন।[১৪৯]

---

[১৪৭] *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখ

[১৪৮] কার্টুনিস্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০১৬

[১৪৯] জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ অফিসে সংরক্ষিত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শহিদদের তালিকা

চিত্র-৪৭ : মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা পোস্টার, উৎস : বীরেন সোম রচিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গঠিত (এপ্রিল ১৯৭১) বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন শিল্পী কামরুল হাসান। এই বিভাগের অফিস ছিল কলকাতার সার্কুলার রোডে। এখানে ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মন্ডল ও বীরেন সোম। এখান থেকে প্রকাশিত হতো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পুস্তিকা, পোস্টার, লিফলেটসহ বিভিন্ন প্রকাশনা। এ সকল কাজের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে ও বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এখান থেকে প্রকাশিত পোস্টারের মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কামরুল হাসানের আঁকা 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' (Annihilte the demous) শীর্ষক পোস্টারটি। এই পোস্টারে ইয়াহিয়া খানের দানব আকৃতির প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দানবীয় রূপটি তুলে ধরা হয়েছিল। ডিজাইন বিভাগ থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পোস্টারের মধ্যে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালী', 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'একেকটি বাংলা অক্ষর, অ আ ক খ, একেকটি বাঙালীর জীবন', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' অন্যতম।[১৫০]

[১৫০] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বর্বর অত্যাচার ও গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে শিল্পী কামরুল হাসান ও কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের উদ্যোগে বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিড়লা একাডেমিতে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। প্রদর্শনীতে শিল্পী কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, প্রাণেশ মন্ডল, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, রণজিৎ নিয়োগী, গোলাম মোহাম্মদ, স্বপন চৌধুরী, কাজী গিয়াসউদ্দিন, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, বিজয় সেন ও বরুণ মজুমদারের ছেষট্টিটি চিত্রকর্ম স্থান পায়। কলকাতার পর দিল্লি ও বোম্বেতে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৫১]

ভারতে শরণার্থীশিবিরে থাকা লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এবং যুদ্ধক্যাম্পের যোদ্ধাদের বিনোদনের জন্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার ও স্বপন চৌধুরীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মুস্তাফা মনোয়ার হতাশাগ্রস্ত শরণার্থীদের মুখে হাসি ফোটাতে শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে 'পাপেট শো' করেছিলেন।[১৫২] স্বপন চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংসদের সদস্য। এই শিল্পী সংসদের প্রধান কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতে আয়োজিত যেকোনো সভা-সমাবেশে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনসমাগম ঘটাতে সহযোগিতা করা; মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ও শরণার্থী শিবিরে গিয়ে সংগীত পরিবেশন করে তাদের উজ্জীবিত করা।[১৫৩]

আর্ট কলেজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ও সাবেক ছাত্র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শাহাদৎ চৌধুরী, জি এম এ রাজ্জাক, স্বপন চৌধুরী, হরিহর সরকার, মইনুল হোসেন, সৈয়দ সালাহউদ্দীন চৌধুরী, এম এ খালেদ, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, জি এম খলিলুর রহমান, ইয়াকুব খান, কে এম এ কাইয়ুম, আনিসুল হক, আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, সিরাজউদ্দীন প্রমুখের নাম জানা যায়।[১৫৪] আবুল বার্‌ক আল্‌ভী পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাঁরা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ১৭ নম্বর প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। তিনি শালদা নদীর তীরবর্তী কসবাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এ ছাড়া ঢাকা ও এর আশপাশে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশনের নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বে ১৬ ডিসেম্বর সকালে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে শাহবাগের রেডিও

---

[১৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

[১৫২] শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ৯.৫.২০২০

[১৫৩] শিল্পী স্বপন চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ১০.৫.২০২০

[১৫৪] বীরেন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭, ৫৮

স্টেশনের ছাদ থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তিনি উত্তোলন করেন।[১৫৫] এ ছাড়া ওই সময়ের আর্ট কলেজের ভিপি জি এম এ রাজ্জাক ৭ নম্বর সেক্টরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খাদেমুল বাশারের অধীনে জুনিয়র লিডার হিসেবে যুদ্ধ করেন।[১৫৬]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার প্রেরণা এ দেশের শিল্পশিক্ষা ও চর্চায় নতুন গতি সঞ্চার করে।

ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের শিল্পশিক্ষার মূল্যায়ন (১৯৬৩–৭০)

১৯৬৩ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প ডিগ্রি কলেজ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রচলিত আধুনিক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাক্রম সংস্কার করে এ সময় থেকে শিল্পের ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে তত্ত্বীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে আর্ট কলেজ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পর্যায় থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হওয়ায় আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রম তৈরি এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিদগ্ধ শিক্ষকের মতামত ও পরামর্শ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ বাস্তবায়নের পর অনুমোদিত সকল বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন। এ লক্ষ্যে বিভাগভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হয়। অনুমোদিত ছয়টি বিভাগের মধ্যে পাঁচটি বিভাগের বিএফএ ডিগ্রির পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং সিরামিক অ্যান্ড ক্রাফটস্ বিভাগের মধ্যে সিরামিকসের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু স্থানস্বল্পতা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা এবং কয়েকটি বিভাগে ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির অনাগ্রহের কারণে শুরু থেকে সকল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট ও ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। মৃৎশিল্প বিভাগে তিন বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স ব্যবস্থা চালু করা হয়। স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং এবং গ্রাফিক আর্ট বিভাগের কার্যক্রম এ সময় প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ের বিষয় এবং ডিগ্রি পর্যায়ের ঐচ্ছিক বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবে কলেজ হওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্ট কলেজে বিভিন্ন মাধ্যমের চর্চা শুরু হয়।

[১৫৫] শাহাবুদ্দিন আহমেদ, *আমার মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, অন্য প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৬৮, ৭৬ ও ১১৪

[১৫৬] আর্ট কলেজের সাবেক ভিপি জি এম এ রাজ্জাকের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, প্রাগুক্ত

এ পর্যায়ের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ছিল অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়া। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং তারপর কলেজে উন্নীত করে বহুমুখী শিল্পশিক্ষার বিকাশ যখন ঘটতে শুরু করেছিল, ঠিক সেই সময় তিনি আর্ট কলেজ থেকে অবসরে যান। তিনি অবসরে যাওয়ার ফলে কলেজের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ১৯৬৭–৭০ সময়কালে শফিকুল আমীন (নভেম্বর ১৯৬৭–জুলাই ১৯৬৮) ও আনোয়ারুল হক (জুলাই ১৯৬৮–সেপ্টেম্বর ১৯৭০) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করায় কলেজের স্বার্থে সাহসী কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। ১৯৭০ সালে সৈয়দ শফিকুল হোসেনের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর নতুন উদ্যমে আর্ট কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ১৯৫২ সালে আকরাম খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৫৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে শরিফ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনগুলোর রিপোর্টে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উল্লেখ থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। শরিফ কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের শিক্ষার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১৫৭] কিন্তু জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত আর্ট কলেজে এ সময় ধর্মনিরপেক্ষ ও বাঙালি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছিল।

১৯৬৩–৭১ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল স্বাধিকার আর স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তাল সময়। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতির চেতনা বিকাশের প্রত্যয়ে সংঘটিত হয় বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। আর্ট কলেজের ছাত্র-শিক্ষক তথা শিল্পীরা এই আন্দোলনে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। ছেষট্টির ছয় দফার ভিত্তিতে শুরু হওয়া পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামে আর্ট কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপক সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন এঁকে এবং মিছিল করে আন্দোলন-সংগ্রামের সপক্ষে জনমত গঠনে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ছাড়া আর্ট কলেজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়।

---

[১৫৭] জোৎস্না বিকাশ চৌধুরী ও মুহম্মদ ইবনে ইনাম, *শিক্ষার ইতিহাস-৪*, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৩, পৃ. ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সদ্য স্বাধীন দেশের মুক্ত পরিবেশে আর্ট কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় নব উদ্যমে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ বা বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আর্ট কলেজের ছাত্র শাহনেওয়াজের নামে ছাত্রাবাসের নামকরণ হয় 'শহীদ শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাস'। দেশ স্বাধীনের পরে আর্ট কলেজের বিভাগগুলোর নাম ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় লেখা শুরু হয়। যেমন : ডিপার্টমেন্ট অব ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বাংলায় অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, কমার্শিয়াল আর্ট বাংলায় বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগ বা ব্যবহারিক শিল্প বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রাচ্যকলা বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব স্কাল্পচার ভাস্কর্য বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব সিরামিকস মৃৎশিল্প বিভাগ এবং ডিপার্টমেন্ট অব ক্রাফটস্ কারুশিল্প বিভাগ নামে লিখিত হতে শুরু হয়। তবে গ্রাফিক আর্ট বিভাগের নামের বাংলা প্রতিশব্দ লিখিত হতে দেখা যায় না। অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন এ সময় কলেজের সার্বিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি আধুনিক শিল্পশিক্ষার নিরিখে পাঠ্যক্রম সংশোধন, এমএফএ কোর্স প্রবর্তন এবং অনুমোদিত সকল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষাকে গতিশীল করতে তিনি অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্মাণাধীন ভবনসমূহের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার ও নতুন ভবন তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস আর্ট কলেজের নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ায় আর্ট কলেজে সেশনজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন ১৯৭১ সালে প্রি-বিএফএ ও বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা। দেশ স্বাধীনের পর তিন-চার মাস ক্লাস করিয়ে বিশেষ বিবেচনায় তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭১ সালের প্রি-বিএফএ ও বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে। ১৯৭২ সালের প্রি-বিএফএ ও বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এই বছর জুলাই মাসে। এসব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে।[১৫৮]

---

[১৫৮] বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, নথি নং-সি-৫১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি : ১৯৭২ সালের প্রথম পর্যায়ে আর্ট কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের পদোন্নতি ও নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালে শফিকুল আমীনের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ফলে প্রফেসর অব ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে একটি সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য হয়। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় খাজা শফিক আহমেদ পাকিস্তানে চলে যান এবং ১৯৭২ সালে সেখানে মৃত্যুবরণ করায় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে আর একটি সহকারী অধ্যাপক পদ শূন্য হয়। শূন্য হওয়া এই দুই পদের মধ্যে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে আমিনুল ইসলাম এবং কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কাইয়ুম চৌধুরীকে পদোন্নতি দিয়ে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁরা উক্ত পদে যোগদান করেন।[১৫৯] পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পধারার অনুসারী আমিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে শিক্ষকতা করলেও এ বিভাগে কোনো সহকারী অধ্যাপকের পদ খালি না থাকায় তাঁকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে পদোন্নতি দিয়ে বিভাগীয় প্রধান করা হয়। বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে মোজাইকের ওপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ফ্লোরেন্সে অবস্থানকালে মোজাইক ম্যুরাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

আবুল বার্‌ক আল্‌ভী (জন্ম : ১৯৪৯) ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ গ্রাফিক আর্ট বিভাগে শিক্ষক পদে যোগদান করেন।[১৬০] তিনি ১৯৬৩–৬৫ শিক্ষাবর্ষে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে ১৯৬৮ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। ডিগ্রি পর্যায়ে তার সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল গ্রাফিক আর্ট। ইতোপূর্বে তিনি ফ্লিম অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগে ডিজাইনার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

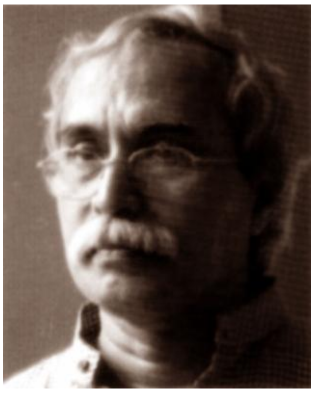
শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভী

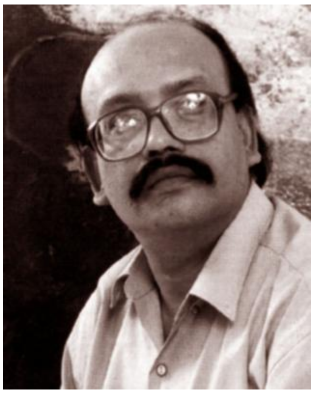
শিল্পী মাহবুবুল আমিন

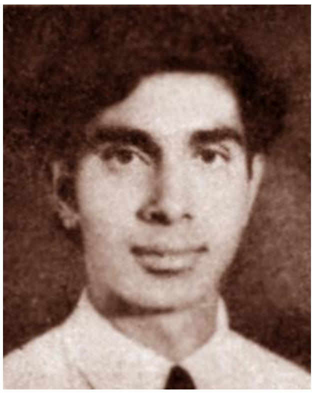
শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দিন

চিত্র-৪৮ : ১৯৭২ সালে আর্ট কলেজে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ

[১৫৯] শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদন ফরম, তারিখ : ২১.৪.১৯৮৫ (আবেদন ফরমের অভিজ্ঞতার স্থলে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির তারিখ উল্লেখ আছে)

[১৬০] অধ্যাপক আবুল বার্‌ক আল্‌ভীর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

আমিনুল ইসলামের পদোন্নতির কারণে লেকচারার ইন ফাইন আর্ট পদে রফিকুন নবীর পদোন্নতি হয় এ বছরের ৩০ মার্চ।[১৬১] ১৯৭০ সালে আর্ট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি উত্তীর্ণ মাহবুবুল আমিন (১৯৪৮–২০০১) ১৯৭২ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১৬২] এ ছাড়া এ বছর অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন কাজী গিয়াসউদ্দিন (১৯৪৯)।[১৬৩] কাজী গিয়াসউদ্দিন ১৯৭০ সালে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে বিএফএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

আর্ট কলেজে উচ্চশিক্ষার কোর্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ : এ বছর আর্ট কলেজে এমএফএ কোর্স প্রবর্তন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য রিসার্চ স্কলারশিপ চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর্ট কলেজে এমএফএ কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ফ্যাকাল্টি সভায় নিম্নলিখিত দুটি সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রথমত, যেহেতু কলেজের শিক্ষার্থীরা এসএসসি অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ভর্তি হয়ে পাঁচ বছরের বিএফএ কোর্স সম্পন্ন করে; তারা দুই বছরের প্রিলিমিনারি কোর্স শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনার্স কোর্সের ন্যায় একটি বিশেষায়িত বিভাগে একটি ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে তিন বছর শিক্ষা লাভ করে; যেহেতু এমএফএ কোর্স হবে এক বছর মেয়াদি। দ্বিতীয়ত, যথা দ্রুত সম্ভব এমএফএ কোর্সের সিলেবাস প্রস্তুত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ডিনের কাছে উপস্থাপনার জন্য কোর্স কমিটিকে অনুরোধ করা হলো।[১৬৪]

এই সভায় আর্ট কলেজের বিএফএ উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের রিসার্চ স্কলারশিপ প্রদানের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। ফ্যাকাল্টি কমিটির এই সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে আর্ট কলেজে মাস্টার্স ইন ফাইন আর্ট ডিগ্রি খোলার অফিশিয়াল প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে রশিদ চৌধুরী ঢাকার আর্ট কলেজের চাকরি হারিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং সেখানে চারুকলা বিভাগ খুলে এমএ ইন ফাইন

---

[১৬১] অধ্যাপক রফিকুন নবীর সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনপত্র, তারিখ : ১৩.৪.১৯৮৫, তাঁর ব্যক্তিগত নথি

[১৬২] মাহবুবুল আমিনের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন ফরম, তারিখ : ১৯ জুন ১৯৯১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[১৬৩] সাদেক খান, বাংলাদেশের সমকালীন চারুকলা সিরিজ-৪৭ : কাজী গিয়াসউদ্দিন, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৩

[১৬৪] বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, প্রাগুক্ত

আর্ট কোর্স চালু করেন ১৯৭০ সালে। এভাবে রশিদ চৌধুরীর মাধ্যমে চারুকলায় উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। এ সময় ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তরা সেখানে গিয়ে ভর্তি হতেন।

চিত্র-৪৯ : গ্রাফিক ডিজাইন ও প্রাচ্যকলা বিভাগের ভবন

চিত্র-৫০ : মৃৎশিল্প বিভাগের ভবন, আলোকচিত্র : দিগন্ত সরকার

ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং নতুন ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু : দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত আর্ট কলেজে অনুমোদিত ছয়টি বিভাগের মধ্যে তিনটি বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হলেও মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য এবং গ্রাফিক আর্ট বিভাগের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল পর্যাপ্ত জায়গা ও শিক্ষকের অভাব। আর্ট কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা শুরুতেই ছিল স্টুডিওভিত্তিক। শিক্ষণীয় অধিকাংশ বিষয় শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে হতো শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। এ ছাড়া বিভাগভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ফলে তাঁদের বসার জন্য আলাদা জায়গার প্রয়োজন পড়ে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে দেশ স্বাধীনের পূর্বেই নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৬১ সালে ক্রাফটস্ উইংয়ের এক্সটেনশন বিল্ডিং, সিরামিক বিল্ডিংসহ আরো কিছু ভবন এবং জীবজন্তু ও পক্ষীশালা নির্মাণের জন্য সিঅ্যান্ডবি বিভাগে প্রস্তাব করা হয়েছিল।[১৬৫] দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর ১৯৬৭–৬৮ সালের মধ্যে ক্রাফটস্ উইংয়ের এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের (বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইন ও ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের ভবন) অধিকাংশ নির্মাণকাজ শেষ হয়। আর সিরামিকস বিল্ডিংয়ের কাজ মুক্তিযুদ্ধের আগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুরোপুরি নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। ১৯৭২ সালের শেষ পর্যায়ে সিরামিকস বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ শেষ হয়।[১৬৬]

[১৬৫] ডিপিআই এম এ রশিদ কর্তৃক সিঅ্যান্ডবির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে লেখা পত্র, প্রাগুক্ত

[১৬৬] শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, প্রাগুক্ত

নির্মাণাধীন এক্সটেনশন ভবনের উত্তর ব্লকের দুটি কক্ষে ১৯৬৮ সালে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছিল। একই বছরে এই ভবনের দক্ষিণ ব্লকের একটি ছোট্ট কক্ষে ক্রাফটস্ বিভাগের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন জুনাবুল ইসলাম। ১৯৭২ সালে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ ব্লকে স্থানান্তরিত হয়।[১৬৭] দক্ষিণ ব্লকে ছোট-বড় তিনটি কক্ষ ছিল। মূল ভবন থেকে কমার্শিয়াল আর্ট স্থানান্তরের ফলে নিচতলায় সিঁড়িঘরের পূর্ব পাশের কক্ষটি খালি হয়ে যায়। জুনাবুল ইসলাম এ সময় এক্সটেনশন ভবনের ছোট্ট কক্ষ ছেড়ে মূল ভবনের খালি হওয়া কক্ষে চলে আসেন। এভাবে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে ক্রাফটস্ বিভাগের কার্যক্রম ভালোমতো শুরু হয়।[১৬৮] এ সময় ক্রাফটস্ বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ঐচ্ছিক বিষয় টাই অ্যান্ড ডাই এবং বাটিক বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনের প্রচেষ্টা ছিল অনুমোদিত সকল বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ভবনের ব্যবস্থা করা। এ জন্য তিনি নির্মাণাধীন সিরামিক ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া এ বছর কারুকলা ও ভাস্কর্য বিভাগের জন্য ভবন নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ভাস্কর্য বিভাগে বিএফএ ডিগ্রির কার্যক্রম শুরু : ১৯৬৪–৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঐচ্ছিক বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে ভাস্কর্য বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে বিএফএ ডিগ্রি কোর্সে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। এ জন্য বিভাগটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমও শুরু হয়নি। আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে একমাত্র শিক্ষার্থী শামীম আরা শিকদারের ভর্তির মাধ্যমে এই বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের সূচনা হয়। তিনি ১৯৬৯–৭০ শিক্ষাবর্ষে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের জন্য সৃষ্ট সেশনজটের কারণে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে।[১৬৯] তিনি ইতিপূর্বে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ফ্রান্সের ভাস্কর সিভিস্কি-র কাছে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এ সময় ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন আবদুর রাজ্জাক (বিভাগীয় প্রধান) ও হামিদুজ্জামান খান।

---

[১৬৭] শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, প্রাগুক্ত

[১৬৮] সৈয়দ শফিকুল হোসেন, "অধ্যক্ষের কথা", *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩

[১৬৯] "বিভাগ সম্পর্কে কিছু কথা", *স্মরণিকা*, ভাস্কর্য বিভাগের ৫৫ বছর (১৯৬৩–২০১৮) পদার্পণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল ১৯৭২ সালে

চিত্র-৫১ : মডেলিং ক্লাস, আলোকচিত্র : নিজাম উদ্দিন খান বাদল

ছাত্রীনিবাস : ১৯৭২ সালের শেষ দিকে আর্ট কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থিত সিঅ্যান্ডবি বিভাগের একটি দ্বিতল ভবন (বর্তমানে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের ভবন) ছাত্রীনিবাস হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। কলেজের ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের জন্য দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ছাত্রসংসদ দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছিল না। দাবির পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৭২** সালের প্রথম দিকে শামীম সিকদার, ফরিদা জামানসহ আর্ট কলেজের চার-পাঁচজন ছাত্রীকে তৎকালীন সমাজকল্যাণ কলেজের ছাত্রীনিবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রীনিবাসটি ছিল আর্ট কলেজ ছাত্রাবাসের সন্নিকটে। কিন্তু আর্ট কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে সমাজকল্যাণের ছাত্রীদের সহাবস্থানে নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় আর্ট কলেজের ছাত্রীরা সেখান থেকে চলে আসেন। এরপর শামীম সিকদার কলেজের ছাত্রনেতাদের সহযোগিতা নিয়ে সিঅ্যান্ডবি বিভাগের ভবনটি দখল করে ফরিদা জামানসহ সাত-আটজন সেখানে থাকতে শুরু করেন। এই ভবনটি একসময় সিঅ্যান্ডবি বিভাগের কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আর্ট কলেজ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে ভবনটি সর্বশেষ সিঅ্যান্ডবির স্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন সপরিবারে এই ভবনের নিচতলায় চলে আসেন। ভবনের ওপর তলায় তিনটি আবাসিক রুম ও একটি স্টাডিরুম ছিল। সেখানে সব মিলিয়ে দশ-এগারো জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। **১৯৮৩** সালে আর্ট কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হলে এখানকার ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[১৭০]

[১৭০] অধ্যাপক ফরিদা জামানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ০৪.৪.২০২০; ভাস্কর শামীম শিকদারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ০১.৯.২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অলংকরণ : ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একটি হাতে লেখা কপি তৈরির জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে দায়িত্ব প্রদান করেন। জয়নুল আবেদিন আর্ট কলেজের শিক্ষক জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, আবুল বারক আল্‌ভী এবং লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত শিল্পী আব্দুর রউফকে নিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। সংবিধানের পুরো অংশ হাতে লেখা হয় এবং প্রতিটি পাতায় নকশা ও অলংকরণ করা হয়। হাতে লেখা সংবিধানটি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন।[১৭১]

আর্ট কলেজের শিক্ষকদের প্রতি জয়নুল আবেদিনের অভিমানের অবসান : জয়নুল আবেদিন স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার সময় থেকে আর্ট কলেজের শিক্ষকদের প্রতি তাঁর যে অভিমান সৃষ্টি হয়েছিল তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তৎপরতার কারণে ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। জয়নুল আবেদিনের প্রতি অধ্যক্ষ শফিকুল হোসেনের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল এবং আর্ট কলেজে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি তাঁর (জয়নুলের) মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। জয়নুল আবেদিনও তাঁকে সহযোগিতা করতেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলাসংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি কলেজের শিক্ষকদের সহযোগিতা নিতেন। তবে তিনি আর্ট কলেজে আসতেন না।

১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিলে আর্ট কলেজের চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্রী ফরিদা জামান, নাইমা হক, সাধনা ইসলাম ও শামীম সিকদারের যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় কলেজের গ্যালারিতে। এই শিক্ষার্থীরা জয়নুল আবেদিনের বাসায় গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি রাজি হন।[১৭২] এই প্রদর্শনীতে আসার মধ্য দিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিমানের অবসান হয়।

১৯৭৩ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জয়নুল আবেদিনকে তিন বছরের জন্য আর্টস বিষয়ে ভিজিটিং প্রফেসর নিয়োগ দেয়। ১৩ এপ্রিল তিনি এই নিয়োগে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে পত্র দেন।[১৭৩] এরপর তিনি মাঝে মাঝে চারুকলাতে আসতেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে চারুকলার সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতেন।

---

[১৭১] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

[১৭২] অধ্যাপক ফরিদা জামানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ০৮.২.২০১৯; ভাস্কর শামীম শিকদারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[১৭৩] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

শিল্পী মরণচাঁদ পাল

শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী

শিল্পী গোপেশ মালাকার

চিত্র-৫২ : মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ এবং বিভাগ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর : ১৯৭২ সালে মৃৎশিল্প বিভাগে দুজন শিক্ষক যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বরে শামসুল ইসলাম নিজামী (১৯৩২–২০০৪) ঢাকার টিসার্চ ট্রেনিং কলেজ থেকে বদলি হয়ে আর্ট কলেজে লেকচারার ইন সিরামিকস পদে যোগদান করেন।[১৭৪] তিনি ১৯৫৮ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৮–৬৯ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যে গিয়ে কলেজ অব এডুকেশনে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্যের বরোনসি লি কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে সিরামিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আর্ট কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। এ বছর ১৬ নভেম্বরে মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন গোপেশ মালাকার (জন্ম : ১৯২৮)। তিনি আর্ট ইনস্টিটিউটের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন এবং মৃৎশিল্প বিভাগের সূচনাকালে ১৯৬১–৬২ সালে মৃৎশিল্প বিষয়ে দুই বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন।[১৭৫] ১৯৬৩ সালের পর থেকে এই বিভাগের কার্যক্রম দুটি ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছিল। প্রথমত, প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে বিকল্প কোর্স হিসেবে এবং ‘এ’ গ্রুপের ঐচ্ছিক কোর্স হিসেবে। দ্বিতীয়ত, বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স হিসেবে। এই সব কোর্সে মীর মোস্তফা আলী ও মরণচাঁদ পাল এত দিন শিক্ষা দিয়েছেন। শামসুল ইসলাম নিজামী এবং গোপেশ মালাকারের যোগদানের ফলে এই বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়।

[১৭৪] শামসুল ইসলাম নিজামীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা থেকে আর্ট কলেজে বদলির Notification, তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৭৫] মৃৎশিল্প বিভাগের সিলেবাস ও বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মূল ভবনের বকুলতলাসংলগ্ন দুটি কক্ষে এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এ সময় একটি কক্ষে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে বিভাগের নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ায় ১৯৭৩ সালে মৃৎশিল্প বিভাগ কলেজের মূল ভবনের উত্তর পাশের বকুলতলাসংলগ্ন কক্ষ ছেড়ে নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে চলে আসে।[১৭৬] বৃহৎ পরিসরে নতুন উদ্যমে এ সময় বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। নিজস্ব ভবনে আসার পর থেকে সার্টিফিকেট কোর্সে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে থাকেন। ১৯৭৩ সালে সার্টিফিকেট কোর্সে দুটি শিক্ষাবর্ষে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র নয়জন। সেখানে ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষে শুধু প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন চৌত্রিশ জন।[১৭৭]

শিল্পী এমদাদুল হক মো. মতলুব আলী

শিল্পী শহিদ কবির

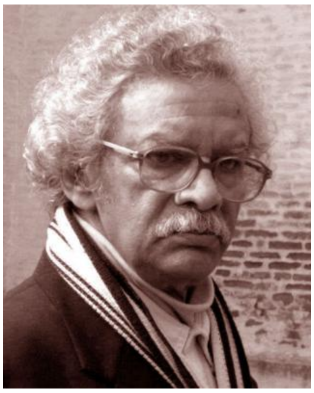

শিল্পী আব্দুস সাত্তার

চিত্র-৫৩ : ১৯৭৩ সালে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ

১৯৭৩ সালে নতুন শিক্ষক নিয়োগ : ১৯৭৩ সালে আর্ট কলেজের কমার্শিয়াল আর্ট, ক্রাফটস্ ও ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগে একজন শিক্ষকের পদোন্নতি ও তিনজন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। কাইয়ুম চৌধুরীর পদোন্নতির কারণে লেকচারার ইন ডিজাইন পদে হেড ডিজাইনার সমরজিৎ রায় চৌধুরী পদোন্নতি পান এ বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি। এ বছর ৬ মার্চ ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এই বিভাগের মেধাবী ছাত্র আব্দুস সাত্তার (জন্ম : ১৯৪৮)। তিনি ১৯৭১ সালে প্রথম বিভাগ পেয়ে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন।[১৭৮] আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক (ড্রাফটসম্যান) সৈয়দ

---

[১৭৬] শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[১৭৭] ১৯৭১–৭২ ও ১৯৭২–৭৩ শিক্ষাবর্ষের সিরামিকস বিভাগের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষার্থীর তালিকা, মীর মোস্তফা আলী স্বাক্ষরিত, তারিখ : ৩০.৫.৭৩ এবং ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষার্থীদের তালিকা, গোপেশ মালাকার স্বাক্ষরিত, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৭৮] অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২৯ এপ্রিল ২০২০

আলী আহসান এ বছর অবসরে গেলে তাঁর শূন্য পদে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন তাঁরই সহোদর সৈয়দ আলী আযম (১৯৪৩–৮১)। আলী আযম আর্ট ইনস্টিটিউটের কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ থেকে ১৯৭১ সালে পাস করা আব্দুল জব্বার (১৯৪৩–২০১১) এ বছরের ৫ জুলাই ক্রাফটস্ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[১৭৯] ১৯৭৩ সালে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে রফিকুন নবী গ্রিস সরকারের বৃত্তি নিয়ে এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টসে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ট্রেনিং কোর্স করার জন্য গ্রিসে যান।[১৮০] এ সময় তিনি দুই বছরের জন্য শিক্ষা ছুটি নিয়েছিলেন। তাঁর ছুটিকালে লেকচারার পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে যোগ দেন এমদাদুল হক মো. মতলুব আলী (জন্ম : ১৯৪৮)। তিনি এ বছরের ৮ ডিসেম্বর যোগদান করেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[১৮১] এ বছর শহিদ কবির (জন্ম : ১৯৪৯) অডিও ভিজ্যুয়াল এডুকেশন সেন্টার থেকে বদলি হয়ে আর্ট কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। মতলুব আলী ও শহিদ কবির আর্ট কলেজের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন।[১৮২]

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব : ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। সে হিসাবে আর্ট কলেজের পঁচিশ বছর পূর্তি হয় ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু এ বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কলকাতা (১-১১ নভেম্বর), দিল্লি (২২-২৯ নভেম্বর) ও বোম্বেতে (১১-১৯ ডিসেম্বর)। প্রদর্শনীতে আর্ট কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকসহ চুয়াল্লিশ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এ সময় ভারতে গিয়েছিলেন। ওই দলে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন, শিক্ষক আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী ও হাশেম খান ছিলেন। মূলত এই প্রদর্শনীর কারণে আর্ট কলেজের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয় ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে।[১৮৩]

---

[১৭৯] সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে আব্দুল জব্বারের করা আবেদন ফরম, সেখানে তাঁর প্রভাষক হিসেবে যোগদানের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ৫.৭.১৯৭৩। তারিখ : ১১.৭.২০০০, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৮০] রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[১৮১] মতলুব আলী, *বন্ধনহীন হৃদয়-নদীর গান* শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১২

[১৮২] শিল্পী শহীদ কবীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২ আগস্ট ২০২০

[১৮৩] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫–৭৬ এবং ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সমকালীন শিল্প প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, ১৯৭৩

১৯৭৪ সালের ১০ মার্চ থেকে আর্ট কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী, পুনর্মিলনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্ট কলেজে আগমন। বঙ্গবন্ধু এই অনুষ্ঠানের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী, এুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ও শিল্পী কামরুল হাসান। এ সময় কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ তাঁর বক্তৃতায় আর্ট কলেজটি যত দ্রুত সম্ভব একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার আহ্বান জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও উপাচার্যের কাছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট করার প্রতিশ্রুতি দেন।[১৮৪]

চিত্র-৫৪ : রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উৎস : স্মরণিকা, রজত জয়ন্তী উৎসব, ১৯৭৩

[১৮৪] বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ইনস্টিটিউট হিসেবে সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার প্রস্তাব পত্র, অধ্যক্ষ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লেখা, তারিখ : ১৬ মে ১৯৭৪ (পত্রে রজত জয়ন্তী উৎসবে উপাচার্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে), নথি নং-এ-৯৯, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। যেখানে আর্ট কলেজের পঁচিশ বছরের স্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনা সচিত্র তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীর বিবরণও তুলে ধরা হয়। স্মরণিকায় রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর বাণী ছাপা হয়। বাণীতে তিনি শিল্পীদের কাছে আশা প্রকাশ করেন, 'চারু ও কারুকলার সৃষ্টিশীলতায় বাঙালির ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা প্রতিবিম্বিত হোক। রুচিশীল ও সংস্কৃতিমান জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের শিল্পীদের সাধনা সার্থক হোক।'[১৮৫] রাষ্ট্রপতির এই প্রত্যাশার মধ্যে জয়নুল আবেদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। জয়নুল আবেদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধারণ করেই এ দেশের শিল্পীরা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবে।

আর্ট কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, যা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ছাপা হয়। আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন এবং লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অধিক সময় ব্যয় তাঁর শিল্পচর্চাকে ব্যাহত করেছে কি না—এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন—

> আমি নিজে শিল্পকর্ম করে যতটা আনন্দ পাই তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে ... । ছবি আঁকার সাফল্যের চেয়ে আমি তৃপ্তি পাই আরো অনেকে ছবি আঁকতে পারবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার প্রচেষ্টায়। কেননা এখান থেকে জন্ম নেবে সুন্দরের নির্মাতারা।[১৮৬]

শিল্পাচার্যের এই বক্তব্যে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মত্যাগী মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে এবং আর্ট কলেজের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা কেমন হবে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য শতভাগ অর্জিত না হলেও শিল্পশিক্ষা সমাজে সম্মানজনক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামেও গড়ে উঠেছিল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। নানা বাধা-বিপত্তি আর সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রবহমান শিল্পশিক্ষার পঁচিশ বছরের এই অর্জন নেহায়েত কম নয়।

---

[১৮৫] "রাষ্ট্রপতির বাণী", *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ৫ মার্চ ১৯৭৪

[১৮৬] নজরুল ইসলাম, "জয়নুল আবেদিনের শিল্প ভাবনা : একটি সাক্ষাৎকার", *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

স্মরণিকায় আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনের 'অধ্যক্ষের কথা' শীর্ষক একটি লেখা ছাপা হয়। এই লেখায় তিনি আর্ট কলেজের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন—

> আমরা উদ্যোগ নিয়েছি বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু পাঠ্যক্রম প্রণয়নের, বিভিন্ন বিভাগের আর্থিক উন্নতিবিধানের, এম,এফ,এ কোর্স প্রবর্তনের, প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের এবং মহাবিদ্যালয়ে যাতে অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রহণ করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের। ... উক্ত বিষয়গুলো যা আমরা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করানোর উদ্যোগ নিয়েছি তার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি। আর এই সঙ্গে আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে চারু ও কারুকলা শিক্ষা, চর্চা ও প্রসারের ব্যাপারে জোরালো সুপারিশ থাকবে।[১৮৭]

আর্ট কলেজের ভর্তি ইচ্ছুক ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবছর প্রায় তিন শতাধিক ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝ থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র চল্লিশ জনকে বেছে নেওয়া হয়। তাই অদূর ভবিষ্যতে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠা করা হোক এ ধরনের আরো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একটি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৪ মার্চ বিকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনানুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধুর আর্ট কলেজে আসা প্রসঙ্গে ওই সময়ের ছাত্রসংসদের সহসভাপতি শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন—

> ... অনুষ্ঠানের ৪ দিন পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু আসেন। খুব সিম্পলভাবে। কোন ইনফরমেশন ছাড়াই। সঙ্গে তাঁর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীসহ আরো দু-একজনকে নিয়ে। তখন শিক্ষকদের কেউ কলেজে ছিলেন না। পিছনে প্রিন্সিপাল সাহেব থাকতেন। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত চলে এলেন। ... বঙ্গবন্ধু সামনের গ্যালারি দুটো ঘুরে দেখেন। তিনি 'গুরু' [শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন] কেমন আছেন জানতে চেয়েছিলেন। ... প্রিন্সিপাল বঙ্গবন্ধুকে বিনয়ের সঙ্গে বলছিলেন একটু আগে জানতে পারলে সবাইকে খবর দিতে পারতাম। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন আত্মার শান্তির জন্য এখানে এসেছি— পাবলিসিটির জন্য আসিনি।[১৮৮]

[১৮৭] সৈয়দ শফিকুল হোসেন, "আমার কথা", *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩, প্রাগুক্ত

[১৮৮] শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ২৪ মে ২০২০

বঙ্গবন্ধুর এই কথোপকথনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং আর্ট কলেজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আর্ট কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব আয়োজন যথার্থই সার্থক হয়েছিল। আর্ট কলেজের পঁচিশ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছিল এই উৎসবের মাধ্যমে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিবর্গের আগমনের ফলে তাঁদের কাছে আর্ট কলেজের সুবিধা-অসুবিধাসহ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল। আগত অতিথিবৃন্দ আর্ট কলেজের সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যেমন : রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধনের দুই মাসের মধ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ কলেজটিকে একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করলে ওই বছর ১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট হিসেবে অধিভুক্তির জন্য প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্য বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। এরপর দ্রুতগতিতে চলতে থাকে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে গ্রহণের প্রক্রিয়া।

শিক্ষক পদসমূহ লেকচারার পদে রূপান্তর : আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় তিনটি শিক্ষক পদ অনুমোদিত হয়। দেশ স্বাধীনের সময় পর্যন্ত এই শিক্ষক পদ বর্ধিত হয়ে বারোটি হয়। প্রি-ডিগ্রি কোর্স চালু থাকায় কলেজ বাস্তবায়নের পরও শিক্ষক পদগুলো রাখা হয়েছিল। এই শিক্ষক পদগুলো 'আপগ্রেড' করে লেকচারার পদ করার জন্য এ সময় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় শিক্ষক পদগুলোর মধ্যে মৃৎশিল্প বিভাগের একটি শিক্ষক পদ বাদে অন্য এগারোটি শিক্ষক পদ আপগ্রেড করে লেকচারার পদে রূপান্তর করা হয়।[১৮৯] এরপর শিক্ষক পদে নিয়োজিতদের (শিক্ষক মরণচাঁদ ব্যতীত) লেকচারার পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৯৭৪ সালে আর্ট কলেজের পরীক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা এবং প্রিলিমিনারি বিএফএ কোর্সের সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন বিধিমালা ও সিলেবাস প্রবর্তন করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৭৪ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি নীতি অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। নীতিমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট

---

[১৮৯] শিল্পী মাহমুদুল হকের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৯.৫.২০২০

সভায় অনুমোদনের পর আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ৮ মে বিজ্ঞপ্তি আকারে বিষয়টি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবগত করেন।

পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা : 'Rules regarding internal and University examinations' শীর্ষক বিধিমালাটি ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষের প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বর্ষ থেকে কার্যকর হয়। বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়—

১. ক) চারু ও কারুকলা প্রধানত ব্যবহারিক বিষয়ক, এ জন্য একটি পরীক্ষা গ্রহণ করতে এক মাসেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়, বিধায় অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য একটিমাত্র বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যার নম্বর বিভাজন হবে—১) পরীক্ষা ৫০% এবং ২) ক্লাসের কাজ ৫০%

খ) নম্বরের এই বিভাজন ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় উভয় বিষয়ে প্রযোজ্য হবে।

দ্রষ্টব্য : ১. তত্ত্বীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভাজন হবে; টিউটরিয়াল-৩০ এবং মৌখিক-২০

২. মৌখিক পরীক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষার্থী থাকবে।

সভার '১/গ' থেকে 'ছ' পর্যন্ত সিদ্ধান্তে ক্লাসের কাজের মূল্যায়ন এবং নম্বর সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

২. সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার বিধিমালা (১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর) : পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে অবশ্যই সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৩. ঐচ্ছিক বিষয় নির্ধারণের পর কোনো শিক্ষার্থী বিএফএ ডিগ্রির তিন বছরের মধ্যে আর পরিবর্তন করতে পারবে না।[১৯০]

এই নীতিমালায় পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পরীক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম বিচ্ছিন্নভাবে অনুমোদিত হয়। এই নীতিমালায় পরীক্ষা ও ক্লাস নম্বরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। পূর্বে ব্যবহারিক বিষয়ে পরীক্ষার ৫০% এবং সেশনাল (ক্লাস) ৫০% নম্বর থাকলেও তত্ত্বীয় বিষয়ের সেশনাল নম্বর ২৫% ছিল। যার মধ্যে টিউটরিয়াল ১৫% এবং মৌখিক ১০% নম্বর করা হয়। এই নীতিমালায় সেটি পরিবর্তন করে উভয় ক্ষেত্রেই ৫০% করা হয়েছে। ক্লাসের কাজের মূল্যায়ন এবং ক্লাস নম্বর সংরক্ষণের নিয়ম পূর্বের মতো বহাল রাখা হয়। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দুই মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম পূর্বেও ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতো না। এ কারণে দুই

---

[১৯০] Notice, Rules regarding internal and University examinations, by Principal, Bangladesh College of Arts And Crafts, Dacca, Date : 8.5.1975. File no. 99-A, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

মাসের মধ্যে 'অবশ্যই' অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় পরিবর্তনের ব্যাপারে পূর্বে কোনো নির্দেশনা ছিল না।

প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস : ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৭৪ সালের ১৫ মের সভার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ২২ জুনের সভায় প্রিলিমিনারি বিএফএ কোর্সের পরিবর্তিত সিলেবাস অনুমোদিত হয়। এই সিলেবাস কার্যকর হয় ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে।

Syllabus for Pre-Degree Course (2 Years)[১৯১]

01.	Free hand drawing	100	Marks
02.	Model drawing (study of Light and Shade with the help of objects)	100	``
03.	Perspective (Monochrome)	100	``
04.	Still Life (study in water colour)	100	``
05.	Basic Design	50	``
06.	Lettering	50	``
07.	Sketch (with pencil or pen & ink)	100	``
08.	(a) Print Making (Graphic Art)	50	``
	(b) Modelling	50	``
	(c) Ceramics	50	``
	(d) Crafts	50	``
	B. Theoretical		
09.	History of Civilisation	100	``
10.	(a) English or	100	``
	(b) Literature & culture of Bangladesh		
	Total	1000	Marks

নতুন সিলেবাসে শিক্ষণীয় বিষয় ও মান বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। পূর্বের সিলেবাসে আটটি কোর্সে মোট ৮০০ নম্বর ছিল; নতুন সিলেবাসে সেখানে তেরোটি বিষয়ে ১০০০ নম্বর করা হয়। নতুন করে ৫০ নম্বরের ছয়টি কোর্স যুক্ত করা হয়। সিলেবাসে নতুন করে যুক্ত হয়, ফ্রিহ্যান্ড ড্রইং (১০০ নম্বর), আলো-ছায়া সহকারে মডেল ড্রইং (১০০ নম্বর), বেসিক ডিজাইন (৫০ নম্বর), লেটারিং (৫০

[১৯১] Syllabus for Pre-Degree Course (2 years), 1974, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

নম্বর) এবং ক্রাফটস্ (৫০ নম্বর)। মডেলিং ও সিরামিকস কোর্স আলাদা করে ৫০ নম্বরের দুটি স্বতন্ত্র বিষয় করা হয়। এ ছাড়া শুধু সাধারণ ইংরেজির স্থলে ইংরেজি অথবা 'বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামে একটি নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়।

এই সিলেবাসে নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত কোর্সসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহও অনুমোদিত হয়। যেমন : গ্রাফিক আর্টে প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষণীয় করা হয় ১. স্টিল লাইফ, ২. উডকাট মাধ্যমে ফুল-ফল, লতাপাতা এবং ৩. লিথোগ্রাফ। মডেলিং কোর্সের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয় কাদা-মাটির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন : ১. নাক, ২. কান, ৩. মাথা, ৪. পা এবং ৫. বেসিক ফর্ম তৈরি। সিরামিকস কোর্সে শিক্ষণীয় বিষয় করা হয় ১. পিঞ্চ প্রসেস (কাদা-মাটি টিপে বিভিন্ন আকার তৈরি), ২. সয়েল প্রসেস, ৩. স্লাব প্রসেস এবং ৪. কাদা-মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি। ক্রাফটস্ কোর্সে প্রথম বর্ষে শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয় টাই অ্যান্ড ডাই ও ব্লক প্রিন্টিং এবং দ্বিতীয় বর্ষে বাটিক।

সিলেবাসে নতুন যুক্ত হওয়া 'বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বিষয়টি তিনটি ভাগে ভাগ করে সিলেবাসে তুলে ধরা হয়। ক) শিল্প-২৫ নম্বর, খ) সাহিত্য-৫০ নম্বর এবং গ) সংস্কৃতি-২৫ নম্বর। শিল্প বিভাগে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং লোকশিল্পের কয়েকটি উপাদান, যেমন : নকশিকাঁথা, লক্ষ্মী সরা, পুতুল, বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প, আলপনা, ধাতব গহনা ও বিভিন্ন নকশা, তাঁতশিল্প, মাটির পাত্র এবং শিকা পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাহিত্য বিভাগে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের আদিম যুগ, মধ্যযুগ, অন্ত যুগ (১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত), পাকিস্তানি যুগ (১৯৪৭–১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত) এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগ। সংস্কৃতি বিভাগে পাঠ্য করা হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান। যেমন : রীতি-প্রথা, ধর্মীয় নানা পার্বণ, আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়—বাউল, বৈষ্ণব, নাথ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং সংগীত।[১৯২] বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক নরেণ বিশ্বাসকে খণ্ডকালীনভাবে নিযুক্ত করা হয়।

মৃৎশিল্প বিভাগে বিএফএ কোর্স এবং ডিপ্লোমা ইন সিরামিকস কোর্স চালু : ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মৃৎশিল্প বিভাগে বিএফএ কোর্সের কার্যক্রম শুরু হয় আখতারুন্নাহার ও আলাউদ্দীন আহাম্মেদের

[১৯২] Syllabus for Pre-Degree Course (2 years), 1974, Appendix-I, II, III, উৎস : প্রাগুক্ত

ভর্তির মধ্য দিয়ে।[১৯৩] মৃৎশিল্প বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মীর মোস্তফা আলী বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারিত করতে। এ ক্ষেত্রে শামসুল ইসলাম নিজামী, গোপেশ মালাকার এবং মরণচাঁদ পাল তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিনি সার্টিফিকেট কোর্স বন্ধ করে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সিরামিকস কোর্স চালু করেন। মীর মোস্তফা আলী লন্ডন থেকে সিরামিকস বিষয়ে ডিপ্লোমা করেছিলেন। ডিপ্লোমা কোর্সের সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই কোর্স চালু করেন। ডিপ্লোমা কোর্সে ড্রইং, হুইলের কাজ, মডেল এবং কাস্টিং তৈরি, মৃৎ ভাস্কর্য, চুল্লি ব্যবস্থাপনা, ফিগার ড্রইং, গ্লেজ তৈরি, স্কেচ, সভ্যতার ইতিহাস এবং মৃত্তিকার রসায়ন শিক্ষণীয় ও পাঠ্য ছিল।[১৯৪] ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫–৭৬) শিক্ষার্থী ছিলেন শিশির রঞ্জন বণিক, আফসার উদ্দিন আহ্মদ প্রমুখ। দ্বিতীয় ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলেন আবু সাঈদ তালুকদার, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, সিরাজুল ইসলাম নিজামী প্রমুখ।[১৯৫] ১৯৭৭ সালে ডিপ্লোমা কোর্সটি বন্ধ করার জন্য জনশিক্ষা বিভাগ থেকে পত্র দেয়।[১৯৬] কিন্তু ডিপ্লোমা কোর্সটি চালু রাখার জন্য মীর মোস্তফা আলীর চেষ্টা এবং ছাত্র আন্দোলনের পর ১৯৭৯ সালে সরকার এই কোর্সের কোনোরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেবে না শর্তে চালু রাখার অনুমতি দেয়।[১৯৭] ১৯৭৯–৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিরামিকস ইন ডিপ্লোমা কোর্সে ন্যূনতম ৫০% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সিরামিকস বিষয়ে বিএফএ ডিগ্রিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়।[১৯৮] মীর মোস্তফা আলীর প্রচেষ্টায় মৃৎশিল্প বিভাগে আধুনিক পায়ে চালিত হুইল স্থাপন এবং ফায়ারিংয়ের জন্য ফার্নেস তৈরি করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বিভাগে গ্লেজ মিক্সিং যন্ত্রসহ সিরামিকস শিল্পসহায়ক কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংগ্রহ করা হয়।

---

[১৯৩] মৃৎশিল্প বিভাগের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের হাজিরা খাতা, অক্টোবর ১৯৭৪ থেকে অক্টোবর ১৯৭৭ পর্যন্ত, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডিগ্রি প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী আখতারুন্নাহার ও আলাউদ্দীন আহাম্মেদের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ ০৪.৩.২০২০ এবং ০৮.১২.২০২০

[১৯৪] মৃৎশিল্প বিভাগের বিএফএ পরীক্ষা ১৯৭৭/৭৮-এর টেবুলেশন শিট, শামসুল ইসলাম নিজামী ও মীর মোস্তফা আলী স্বাক্ষরিত, তারিখ : ১৯.৩.৮১, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৯৫] ডিপ্লোমা ইন সিরামিকসের হাজিরা খাতা, আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১৯৬] জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক কর্তৃক বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে প্রদত্ত পত্র, পত্র নং-৪৪৮৪/৪-সি, তারিখ : ০৯.৮.১৯৭৭

[১৯৭] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা কর্তৃক জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে লিখিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে 'ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস' কোর্স প্রবর্তন সম্পর্কিত পত্র। পত্র নং-শাঃ ৪/২ সি-১২৫/৭৮/১৪, তারিখ : ১৩.০১.১৯৭৯

[১৯৮] 'ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস' কোর্সের শিক্ষার্থীদের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির অফিস নির্দেশনামা, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, তারিখ : ০৭.০২.১৯৮০, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিন্টমেকিং বিভাগে বিএফএ কোর্স চালু : ১৯৭৭–৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রিন্টমেকিং বিভাগে বিএফএ কোর্সে প্রথম পাঁচজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তাঁরা হলেন রোকেয়া সুলতানা, গোলাম ফারুক বেবুল, সাবিনা হালিম, জামিল হোসেন ও আজিজুল হক।[১৯৯] এ সকল শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে বিভাগটির পূর্ণাঙ্গভাবে যাত্রা শুরু হয়। এ সময় বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন সফিউদ্দীন আহমেদ (বিভাগীয় প্রধান), মোহাম্মদ কিবরিয়া, হবিবুর রহমান, মাহমুদুল হক ও সৈয়দ আবুল বারক্ আল্‌ভী।

আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের চারুকলার শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কিন্তু আর্ট কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ও উচ্চতর গবেষণার সুযোগ না থাকায় ঢাকার শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং বিদেশে, বিশেষ করে ভারত, জাপান ও চীনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে চারুকলা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হলেও সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় মূলত দেশ স্বাধীনের পরে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকার আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এমএ কোর্সে ভর্তি হন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, কাজী গিয়াসউদ্দিন, আব্দুস শাকুর শাহ্‌, আনসার আলী, রফিকুল আলম, চন্দ্র শেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করিম, বনিজুল হক, কে এম এ কাইয়ুম, শাহরিয়ার তালুকদার, অলোক রায় প্রমুখ।

দেশ স্বাধীনের পর আর্ট কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান আমলে শিল্পকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ থেকে যেসব বৃত্তির সুযোগ আসত তার অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীরা যৎসামান্য সুযোগ পেতেন। দেশ স্বাধীনের পর প্রথমে ভারত এবং পরবর্তীকালে জাপান, চীনসহ বিভিন্ন দেশের সরকার এ দেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির সুযোগ দেয়। এই সুযোগে এ দেশের চারুকলার অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার্থে ওই সব দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে শুরু করেন। এ সময় ভারত সরকারের আইসিসিআর (Indian Council for Cultural Relations) বৃত্তি নিয়ে চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বরোদার এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৭৩ থেকে ৮০ সালের মধ্যে এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হামিদুজ্জমান খান (১৯৭৪, ভাস্কর্য), রফিক আহমেদ (১৯৭৪, পেইন্টিং); ফরিদা জামান (১৯৭৫, পেইন্টিং), আব্দুস শাকুর

[১৯৯] "প্রিন্টমেকিং বিভাগ পরিচিতি", *চারুকলা ইনস্টিটিউট*, মোহাম্মদ ইউনুস (সম্পা.), ঢাকা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ২০

শাহ্ (পেইন্টিং), অলোক রায় (১৯৭৬, ভাস্কর্য), রঞ্জিত দাস (১৯৭৮, পেইন্টিং) প্রমুখ। আশির দশকে এখানে ভর্তি হন নাইমা হক (অ্যাপ্লাইড আর্ট), নাসরিন বেগম (প্রিন্টমেকিং), আবুল মনসুর (শিল্পকলার ইতিহাস), তন্দ্রা দত্ত (শিল্পকলার ইতিহাস), নাহীদ আখতার (শিল্পকলার ইতিহাস), এনামুল হক (ভাস্কর্য), শিশির ভট্টাচার্য (পেইন্টিং) প্রমুখ। আইসিসিআর বৃত্তি নিয়ে সত্তরের দশকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন আব্দুস সাত্তার (প্রিন্টমেকিং, ১৯৭১) এবং শওকাতুজ্জামান (পেইন্টিং, ১৯৭৪)। আশির দশকে ভর্তি হন রোকেয়া সুলতানা (ছাপচিত্র, ১৯৮১), নিসার হোসেন (পেইন্টিং), লালা রুখ সেলিম (ভাস্কর্য, ১৯৮৭) প্রমুখ। এভাবে আইসিসিআর বৃত্তির অধীনে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে সেখানকার আধুনিক শিল্পচর্চার সঙ্গে এ দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সরাসরি সংযোগ ঘটে।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের শিল্পশিক্ষার অনুকরণে। এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারা ছিল ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘ চব্বিশ বছর এ ক্ষেত্রে একটা বিচ্ছিন্নতা ছিল। দেশ স্বাধীনের পর সেই বিচ্ছিন্নতা কাটাতে দুই দেশের সরকার যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আইসিসিআর বৃত্তির সুযোগ দেওয়া। দেশ স্বাধীনের পর জাপান সরকার বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য মনবুশো (Monbusho) বৃত্তির সুযোগ দেয়। চারুকলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই সুযোগে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করেন। এই সুযোগে চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য দেশ স্বাধীনের পর প্রথমে জাপানে যান কাজী গিয়াসউদ্দিন। তিনি ১৯৭৯ সালে টোকিও ন্যাশনাল লিবারাল আর্টস ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ ডিগ্রি এবং ১৯৮৫ সালে চারুকলায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর আশির দশকে এই বৃত্তি নিয়ে জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান মাহমুদুল হক (প্রিন্টমেকিং, ১৯৮১–৮৪), জামাল আহমেদ (পেইন্টিং, ১৯৮২–৮৩), আবুল বার্‌ক আল্‌ভী (রিসার্চ, ১৯৮৩-৮৪), শেখ আফজাল হোসেন (পেইন্টিং, ১৯৮৯–৯৩) এবং টোকিওর তামা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান মোহাম্মদ ইউনুস (পেইন্টিং, ১৯৮৪–৮৭)। আশির দশকে চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে বেইজিংয়ের সেন্ট্রাল একাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন গোলাম ফারুক (পেইন্টিং), তৌফিকুর রহমান (ভাস্কর্য), ওয়াকিলুর রহমান (পেইন্টিং), আবু সাঈদ তালুকদার (সিরামিকস) প্রমুখ।

ভারত ও জাপানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এ সকল শিল্পীর অধিকাংশ ঢাকার আর্ট কলেজে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন অথবা পরবর্তীকালে নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-

উত্তর বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ায় তাঁদের তত্ত্বাবধানেই গড়ে ওঠেন এ দেশের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা।

বৃত্তি নিয়ে অথবা নিজ খরচে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল। আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃহৎ অংশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। ফলে ঢাকার শিল্পশিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্রুত আর্ট কলেজে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার দাবি প্রবল হতে থাকে। আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট হিসেবে একীভূত হওয়ার যে প্রক্রিয়া অধ্যক্ষ শফিকুল হোসেনের তৎপরতায় শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেই প্রক্রিয়া ঝিমিয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ আর্ট কলেজকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

ছাত্র আন্দোলন : আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করাসহ কলেজ ও ছাত্রাবাসে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে ১৯৭৭ সালে শিক্ষার্থীরা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনে নামেন। তাঁরা সতেরো দফার একটি দাবিনামা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পেশ করেন। এই দাবির কপি তাঁরা জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালকের কাছেও প্রেরণ করেন। দাবিনামার ১ নম্বর দাবি ছিল অবিলম্বে আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। ২ নম্বরে ছিল মৃৎশিল্প বিভাগে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেওয়া। এ ছাড়া অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল শিক্ষা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান এবং শিল্পীদের চাকরির মর্যাদা বৃদ্ধি করা, কলেজ থেকে করমুক্ত শিল্প-উপকরণ সরবরাহ করা, বৃত্তির টাকা বৃদ্ধি করা, সকল শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসের অভাব দূর করা, ছাত্রাবাসের আসন বৃদ্ধি করা এবং পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক সমস্যার সমাধান করা; কলেজে চলমান নির্মাণকাজ তরান্বিত করা, গ্যালারির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, বার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য আরো অর্থ বরাদ্দ করা, লাইব্রেরিতে শিল্পকলাসংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ বৃদ্ধি করা ও ক্লাসরুমের অভাব দূর করা। এ ছাড়া কলেজের সৌন্দর্য রক্ষায় আরো যত্নবান হওয়া, নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করা, ছাত্র মিলনায়তন ও অডিটরিয়ামের ব্যবস্থা করা এবং চিড়িয়াখানার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া।[২০০]

[২০০] অধ্যক্ষের কাছে পেশকৃত "চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবিদাওয়া", তারিখ : ০৭.৫.১৯৭৭, নথি নং-এ-৯৯, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সকল দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষার্থীরা তীব্র আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে তাঁরা কলেজের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। এই আন্দোলনের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ওই সময়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায়, আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাঁচজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ ইউনুস, সালাউদ্দীন বুলবুল, রেজাউল হক, মতিউর রহমান প্রমুখ। এরপর ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং দাবি আদায়ের জন্য অনশন শুরু করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। অনশনের একপর্যায়ে তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।[২০১]

আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কলেজের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭৭ সালের ২ জুন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে তাঁর সামরিক আইন বিষয়ক প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অফিসের মার্শাল ল বিষয়ক পরিচালক, ডিপিআই, প্রধান প্রকৌশলী (ইমারত), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ইমারত), আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিব এবং আর্ট কলেজের দুজন শিক্ষক। সভায় ১৯৭৭ সালের ৭ মে কলেজের শিক্ষার্থীদের পেশকৃত দাবিনামার ১ থেকে ১৭ ক্রমিকের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সংক্রান্ত ১ নম্বর দাবি সম্পর্কে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্ট কলেজকে বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু করার নেই। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট কলেজেও ভবিষ্যতে বিএফএ (সম্মান) ও এমএফএ কোর্স খোলা যাবে, তবে তার আগে সেখানে উচ্চশিক্ষার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। উচ্চশিক্ষা কোর্স চালু করার জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা আছে সে বিষয়ে আর কী কী করণীয় বাকি আছে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ৩০ জুনের মধ্যে প্রদানের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হয়।[২০২]

---

[২০১] আর্ট কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী (শিক্ষাবর্ষ ১৯৭২–৭৩) ও বর্তমান শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ১২.৭.২০২০; বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক ডিজাইনার সালাউদ্দীন বুলবুলের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ ১৩.৭.২০২০

[২০২] কলেজ অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের সমস্যাসংক্রান্ত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২ জুন ১৯৭৭, নথি নং-এ-৯৯, প্রাগুক্ত

এই ছাত্র আন্দোলনের ফলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে আর্ট কলেজে উচ্চশিক্ষা চালু করার বিষয়টি আবারও গুরুত্ব পায়। এই আন্দোলনের পর অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনকে আর্ট কলেজ থেকে বদলি করা হয়। এরপর অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয় প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রধান আমিনুল ইসলামকে। শিক্ষার্থী আর শিক্ষকদের তৎপরতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর্ট কলেজে উচ্চশিক্ষা চালু করার বিষয়ে সম্মত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে আর্ট কলেজে প্রচলিত প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্স পদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখে ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুই বছরের স্নাতকোত্তর এমএফএ কোর্স চালু করা হয়। এভাবে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর পর সেখানে উচ্চ শিল্পশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। আর্ট কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একীভূত করে একটি ইনস্টিটিউট করার প্রচেষ্টা তখনো অব্যাহত ছিল।

কারিকুলাম ও সিলেবাস পুনর্গঠন এবং এমএফএ ডিগ্রি কোর্স চালু

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএফএ কোর্স চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকার শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলা এবং সেখানে এমএ ইন ফাইন আর্টস কোর্স খোলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে চারুকলায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে বিএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে ভর্তি হতেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে বিএফএ অনার্স কোর্স, এমএফএ কোর্স এবং একাধিক বছরের গবেষণা কোর্স চালু করার বিষয়ে আলোচনা হয়।[২০৩] এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত কোর্সসমূহ চালু করার বিষয়ে আর্ট কলেজ থেকে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (১) তিন বছরের বিএফএ, (২) দুই বছরের এমএফএ কোর্স এবং (৩) একাধিক বছরের গবেষণা কোর্স চালু করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০৪] বিএফএ সম্মান এবং এমএফএ কোর্সের সিলেবাস তৈরির জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় শিল্পশিক্ষার সার্বিক উন্নতির কথা বিবেচনা করে ১৯৭৪ সালে মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ইনস্টিটিউট করার বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের রজত

[২০৩] ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৭২ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সভায় কার্যবিবরণী, নথি নং-সি-৫১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২০৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং উপাচার্যের উপস্থিতিতে অধ্যক্ষ শফিকুল হোসেন তাঁর বক্তব্যে বিষয়টি উত্থাপন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে চারুকলা মহাবিদ্যালয়কে দ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর এ ব্যাপারে অফিশিয়াল প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একীভূত করার জন্য এর অধ্যক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন ১৯৭৪ সালের ১৬ মে।[২০৫] এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ১ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে একত্রীকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মহাবিদ্যালয়কে একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এই কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন এবং জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালককে সদস্য করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় এ সংক্রান্ত একাডেমিক বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি একাডেমিক সাবকমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি এবং চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনকে কমিটির সদস্যসচিব করা হয়।[২০৬] কমিটির সদস্য করা হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের চেয়ারম্যান রশিদ চৌধুরী এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রাফিক আর্ট বিভাগের প্রধান সফিউদ্দীন আহমেদকে। প্রস্তাবিত আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রত্যাশিত শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করে দ্রুত একটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির কাছে উপস্থাপনের জন্য একাডেমিক সাবকমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হয়।[২০৭]

একাডেমিক সাবকমিটি ১৯৭৪ সালে আগস্ট মাস থেকে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের মধ্যে পাঁচটি সভা করে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর প্রস্তাবিত আর্ট ইনস্টিটিউটের কোর্স ডিজাইন ও কারিকুলামের রূপরেখাসহ

---

[২০৫] বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রেরিত 'The Bangladesh College of Arts & Craft becoming an Institute under the direct control of the University of Dacca' শীর্ষক প্রস্তাব পত্র; পত্র নং ৬১৪, তারিখ ১৬ মে ১৯৭৪, নথি নং : এ-৯৯, উৎসস্থান ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২০৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কমিটির ১৯৭৪ সালের ১ জুনের সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, পত্র নং কাউন্সিল/৩০৩৭, তারিখ ৮ জুন ১৯৭৪, নথি নং-এ-৯৯, উৎস : প্রাগুক্ত

[২০৭] চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণের শিক্ষা, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটির ১৯৭৪ সালের ১১ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, নথি নং-এ-৯৯, উৎস : প্রাগুক্ত

একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে চারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়। প্রতিবেদনে তিনটি স্তরে বিভক্ত করে মোট সাত বছর মেয়াদি শিক্ষাক্রমের কোর্স ডিজাইন করা হয়।

১) দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি কোর্স

২) তিন বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স এবং

৩) দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স

প্রতিবেদনে প্রচলিত প্রি-ডিগ্রি কোর্স এবং ডিগ্রি পর্যায়ে সাতটি বিভাগের উল্লেখ করা হয়।[২০৮]
ইতোমধ্যে একাডেমিক সাবকমিটি একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করেন। যার সদস্য ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল ইসলাম, মীর মোস্তাফা আলী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক ও জুনাবুল ইসলাম। তাঁরা বিএফএ সম্মান ও এমএফএ সিলেবাসের খসড়া তৈরি করে একাডেমিক সাবকমিটির কাছে পেশ করেন। সাবকমিটি ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের সভায় চূড়ান্তভাবে সিলেবাস যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত করে। প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করা হয়, ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে কার্যক্রম শুরু করবে। ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিলে একাডেমিক সাবকমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মতিন চৌধুরীর কাছে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনের কপি অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছেও প্রেরণ করা হয়।[২০৯]

এভাবে চারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে ঘটে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মহাবিদ্যালয়টি আর্ট ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। এরপর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। ১৯৭৭ সালে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের পর সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার বিষয়ে গুরুত্ব

২০৮ Report of the sub-committee formed to make recommendation on academic affairs for merger of the Bangladesh college of Arts and Crafts with the University of Dhaka, Dated 9th April, 1972, File no.: A-99, উৎস : প্রাগুক্ত

২০৯ একাডেমিক সাবকমিটির ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের সভার কার্যবিবরণী, নথি নং; এ-৯৯, উৎস : প্রাগুক্ত

আরোপ করে। তবে মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট হিসেবে একীভূত করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

এমতাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে দুই বছর মেয়াদি এমএফএ কোর্স চালু করা হয়। এ সময় চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা হয় নিম্নরূপ :

১) দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি কোর্স, ২) তিন বছর মেয়াদি বিএফএ কোর্স এবং ৩) দুই বছর মেয়াদি এমএফএ কোর্স

১৯৭৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভায় বিএফএ ডিগ্রি এবং এমএফএ ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস অনুমোদিত হয়।[২১০] এ পর্যায়ের সিলেবাসে বিভাগ বিভাজন ও নামকরণে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সিরামিকস এবং ক্রাফটস্ বিভাগ আলাদা করে সিরামিকস এবং ক্রাফটস্ নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্বের ছয়টি বিভাগের স্থলে সাতটি বিভাগ করা হয়। এ ছাড়া কমার্শিয়াল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট এবং মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার বিভাগের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে গ্রাফিক ডিজাইন, প্রিন্টমেকিং এবং স্কাল্পচার করা হয়। এ পর্যায়ে সাতটি বিভাগ হলো :

১) ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বা অঙ্কন ও চিত্রায়ণ

২) গ্রাফিক ডিজাইন

৩) প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্র

৪) ওরিয়েন্টাল আর্ট বা প্রাচ্যকলা

৫) সিরামিক বা মৃৎশিল্প

৬) স্কাল্পচার বা ভাস্কর্য এবং

৭) ক্রাফটস্ বা কারুশিল্প

এই সাতটি বিভাগের মধ্যে প্রথম ছয়টি বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৮২ সালে কারুশিল্প বিভাগের সিলেবাস অনুমোদিত হয় এবং ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএফএ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এ ছাড়া ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস বহাল রাখা হয়।

---

[২১০] ১৯৭৮ সালে প্রণীত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রি কোর্সের অনুমোদিত সিলেবাস, উৎস : প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিএফএ ডিগ্রি সিলেবাস (১৯৭৮) : এই সিলেবাসে প্রতিটি বিভাগে ১০০ নম্বরের দশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিন বছর শিক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে আটটি অঙ্কন ও নির্মাণ এবং দুটি তত্ত্বীয় বিষয়ক। তত্ত্বীয় বিষয় দুটি হলো শিল্পকলার ইতিহাস (History of Art) এবং সমাজতত্ত্ব (Sociology), যা পূর্বের সিলেবাসেও পাঠ্য ছিল। তত্ত্বীয় বিষয় দুটি সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করা হয়। প্রতিটি বিভাগের চরিত্র অনুযায়ী আটটি অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয় শিক্ষণীয় করা হয়। এর মধ্যে সাতটি বিষয় ছিল আবশ্যিক এবং একটি ঐচ্ছিক। শিক্ষার্থীদের প্রচলিত বিভাগগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল। পরীক্ষা ও ক্লাস নম্বর বিভাজনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়ম অপরিবর্তিত রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার নম্বর ৫০% এবং ক্লাস নম্বর ৫০% করা হয়। তত্ত্বীয় বিষয়ের ৫০% ক্লাস নম্বরের মধ্যে ২০% মৌখিক এবং ৩০% টিউটোরিয়াল করা হয়। নতুন অনুমোদিত সিলেবাসের বিভাগভিত্তিক অঙ্কন ও নির্মাণসংক্রান্ত আবশ্যিক বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

১) অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ (Department of Drawing and Painting)

1. Drawing (Full Figure)
2. Still Life (Water Colour, Tempera and oil)
3. Portrait painting (with oil Colour)
4. Figure Painting from Life
5. Sketch
6. Figure Composition
7. Landscape painting with oil colour
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

এখানে উল্লেখ্য যে, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের এই সিলেবাসে নতুন করে Landscape বিষয়টি যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া পূর্বের সিলেবাসের Painting (Oil) বিষয়টি পরিমার্জন করে Figure Painting from Life করা হয়।

২) গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ (**Department of Graphic Design**

1. Poster Art (Basic design, Show card, Book jacket, Calendar)
2. Advertising Art (Press Layout, Sign design, Direct mail design, Packaging with three dimensional design)
3. Visual communication through design (Expression through pictorial design of a given subject, its materials condition perception quality, etc. For mass communication practical and theoretical)
4. Illustration (Book, Magazine, Fashion)
5. Figure Drawing
6. Typography
7. Sketch
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

গ্রাফিক ডিজাইনের সিলেবাসে পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সিলেবাসে কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের পরিবর্তিত নাম লেখা হয় গ্রাফিক ডিজাইন। সিলেবাসে নতুন করে যুক্ত করা হয় Communication through design এবং Typography বিষয় দুটি। পূর্বের সিলেবাসের Calendar Design or Package Design ও Poster Design বিষয় দুটি একত্র করে Postar Art এবং Life study বিষয়টির নাম পরিবর্তন করে Figure Drawing করা হয়।

৩) প্রাচ্যকলা বিভাগ (**Department of Oriental Art**)

1. Figure Drawing (Pencil, Pen and Brush)
2. Composition with figure in oriental style
3. Calligraphy and Design
4. Study (One of the different oriental styles)
5. Mural Painting
6. Figure Painting (Tempera, Oil, Water Colour, Wash)
7. Sketch
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

প্রাচ্যকলা বিভাগের এই সিলেবাসে নতুন করে Calligraphy and Design এবং Mural Painting বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া পূর্বের Outdoor Study (Landscape & Figure) বিষয় পরিবর্তন করে Figure Painting করা হয়।

৪) প্রিন্টমেকিং বিভাগ (Department of Printmaking [Graphic Art)

1. Lithography (Still Life, Head study, Model study and outdoor study in Black and white colour)
2. Etching and Dry Point (Landscape, Human study and still Life in black and white colour)
3. Composition with human figure (Mixed Media)
4. Wood cut (Outdoor study, Figure study and Still Life in black and white)
5. Engraving (Still Life, Landscape in black and white)
6. Figure Drawing
7. Sketch
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

প্রিন্টমেকিং বিভাগের পূর্বের বিএফএ সিলেবাসের নতুন সিলেবাসের তুলনা করলে দেখা যায় এখানে Composition with human figure (mixed media) এবং Figure Drawing বিষয় দুটি নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া Commercial Art (Publicity Design) বিষয়টি সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫) মৃৎশিল্প বিভাগ (Department of Ceramic)

1. Glaze mixing and application on a ceramic object
2. Ceramic Sculpture
3. Mosaic, Tile making
4. Design
5. Making utensils and free shapes (earthen ware, stone ware and porcelain)
6. Figure drawing (with pen, pencil, crayon and charcoal)
7. Chemistry of clay glaze and other ceramic materials.
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

মৃৎশিল্প বিভাগের বিএফএ সিলেবাসে নতুন করে Mosaic, Tiles making এবং Chemistry বিষয় দুটি যুক্ত করা হয়। পূর্বের সিলেবাসের Packing and Unpacking of kiln and Firing বিষয়টি নতুন সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়। পূর্বের Decoration এবং Sketch-এর স্থলে Design এবং Figure drawing বিষয় যুক্ত করা হয়।

৬) ভাস্কর্য বিভাগ (Department of Sculpture and Modelling)

1. Drawing (Human figure, animal in pen, pencil, charcoal, crayon etc)
2. Modelling (Head, figure, animal with clay, plaster and allied materials)
3. Carving (Head, figure, animal with wood, cement and stone)
4. Casting (Different moulds, Casting plaster and metal)
5. Antique study (Museum study, copy old masters, terracotta with clay and plaster)
6. Composition (Human figure, animal with plaster cement and stone)
7. Relief (Figurative, non-figurative with wood, cement, plaster, clay)
8. Any one subject from other Department (Subsidiary)

ভাস্কর্য বিভাগের এই সিলেবাসে নতুন করে Antique study বিষয়টি যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া পূর্বের সিলেবাসের Terracotta এবং Sketch-এর স্থলে Relief এবং Drawing বিষয় দুটি যুক্ত করা হয়।

৭) কারুশিল্প বিভাগ (Department of Crafts)

1. Batique
2. Block Printing
3. Screen Printing
4. Simple weaving
5. Tapestry
6. Design
7. Wood work
8. Any one subject from othe Department (Subsidiary)[২১১]

কারুশিল্প বিভাগের এই সিলেবাস অনুমোদিত হয় ১৯৮২ সালে। এই সিলেবাসের আলোকে ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিভাগে বিএফএ কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। কারুশিল্প বিভাগের বিএফএ প্রথম ব্যাচে ওই বছর একমাত্র ছাত্র তৈয়বুর রহমান ভর্তি হন। ১৯৮২ সালে এই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন আব্দুস শাকুর শাহ্। তিনি ইতোপূর্বে প্রি-ডিগ্রি ক্লাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

[২১১] ১৯৮২ সালে প্রণীত কারুশিল্প বিভাগের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস, উৎস : কারুশিল্প বিভাগ (ফারুক আহম্মদ মোল্লা, সহযোগী অধ্যাপক) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এমএফএ কোর্সের সিলেবাস

১৯৭৮ সালে প্রণীত এমএফএ কোর্সের সিলেবাস আধুনিক কোর্স পদ্ধতিভিত্তিক করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগকে একেকটি গ্রুপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দুই বছর মেয়াদি এই কোর্সের প্রথম পর্বে (বর্ষে) ৪০০ নম্বর এবং দ্বিতীয় পর্বে ৬০০ নম্বর ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বিএফএ ডিগ্রি কোর্সে তিন বছর শিক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। এ কারণে শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়গুলো সিলেবাসে উল্লেখ থাকত। কিন্তু এমএফএ কোর্সের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় বছরভিত্তিক শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করে। প্রতি বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এমএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত হবে। ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই সিলেবাস চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে কার্যকর হয়।

M.F.A Course Syllabus (1978)

(Syllabus at a glance)

PART-I (First year)

A. Theoretical		Full marks
301.	History of Western Art (Renaissance to 19th century)	50
302.	Islamic and Far Eastern Art	50
303.	South Asian Art	50
304.	History of Art of the 20th century (World Art)	50
305.	Study of materials and techniques and their use (In respective field of study of the students)	50
306.	Aesthetics and Art appreciation	50
	Total	300

B. Practical		
307.	Composition with figures (In respective field of study of the students)	100
	Total of theoretical and practical portions	400

PART-II (Second year)

A. Theoretical

401.	History of Art of Bangladesh (20th century)	50
	Thesis (Written portion)-75,Viva-25	100
407.	Viva voce (all papers)	50
	Total	200

B. Practical

402.	Experimental Composition	100
403.	Subject in students respective field of study	100
404.	Subject in students respective field of study	100
405.	Subject in students respective field of study	100
Total of theoretical and practical portions		600

- অভিসন্দর্ভের মৌখিক পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হবে ।
- সকল পত্রের মৌখিক পরীক্ষা পরিচালিত হবে পরীক্ষা কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞ দ্বারা ।

এমএফএ কোর্সের এই সিলেবাস অনুমোদনের পর সিলেবাসের কোর্স ও নম্বর কিছুটা সংশোধন করা হয় । প্রথম পর্বের ৪০০ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বর বাড়িয়ে ৪৫০ নম্বর করা হয় । এ ক্ষেত্রে ৩০৫ ক্রমিকের ৫০ নম্বরের তত্ত্বীয় কোর্স study of materials and techniques-এর পরিবর্তে ১০০ নম্বরের অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক কোর্স যুক্ত করা হয় । দ্বিতীয় পর্বে একটি ১০০ নম্বরের অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক কোর্স পরিবর্তন করে ৫০ নম্বরের তত্ত্বীয় কোর্স study of materials and techniques অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এ কারণে দ্বিতীয় পর্বের মোট নম্বর ৬০০ থেকে ৫০ কমে ৫৫০ নম্বর হয় । এ পর্যায়ে এমএফএ কোর্সের নম্বর বণ্টন হয় নিম্নরূপ :

প্রথম পর্ব : তত্ত্বীয় ২৫০ নম্বর + অঙ্কন ও নির্মাণ ২০০ নম্বর = মোট ৪৫০ নম্বর

দ্বিতীয় পর্ব : তত্ত্বীয় ২৫০ নম্বর + অঙ্কন ও নির্মাণ ৩০০ নম্বর = মোট ৫৫০ নম্বর

প্রথম পর্ব ৪৫০ নম্বর + দ্বিতীয় পর্ব ৫৫০ নম্বর = সর্বমোট ১০০০ নম্বর । পরীক্ষার নম্বর বিভাজন করা হয়, পরীক্ষা ৫০% নম্বর, ক্লাস ২৫% নম্বর এবং সাবমিশন ২৫% নম্বর

এমএফএ প্রথম পর্বের কোর্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তত্ত্বীয় বিষয়সমূহ

৩০১ : পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস (History of Western Art) এই কোর্সে রেনেসাঁ থেকে বিশ শতকের শিল্পকলার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

ক) ইতালির আরলি রেনেসাঁ এবং হাই রেনেসাঁ

খ) ইতালির বাহিরে রেনেসাঁ : ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, হল্যান্ড, স্পেন ইত্যাদি

গ) ইতালি ও ইতালির বাহিরে ম্যানারিজন

ঘ) বারক-রকোক্কো

ঙ) ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্পকলায় তার প্রভাব

চ) প্রি-র‍্যাফেলাইটস

ছ) রোমান্টিসিজম এবং নিও-ক্লাসিজম

জ) পোস্ট ইম্প্রেশনিজম

৩০২ : ইসলামিক ও দূর প্রাচ্যের শিল্প (Islamic and Far Eastern Art) ইসলামিক, চাইনিজ এবং জাপানিজ শিল্পকলার ইতিহাস এই কোর্সে পাঠ্য করা হয় ।

ক) ইসলামিক আর্ট : ইসলামের জাগরণ পর্যায়ে উমাইয়া, আব্বসীয় যুগ; পারস্য, তুর্কি, মিশরীয়, স্পেন এবং ভারতের মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাস ।

খ) চাইনিজ আর্ট : চৌ রাজবংশের (Chou dynasty) শাসনামলের প্রথম পর্যায় থেকে পরবর্তী ছয়টি রাজবংশের সময়ের শিল্পকলার ইতিহাস ।

গ) জাপানিজ আর্ট : আর্কাইক যুগ : নারা যুগ (Nara period), হেয়ান যুগ (Heyan period), কামাকুরা যুগ (Kamakura period) এবং মোরোমাছি যুগের (Moromachi period, 1392–1568) শিল্পকলার ইতিহাস ।

৩০৩ : দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পকলা (South Asian Art)

এই কোর্সে পাঠ্য বিষয় করা হয়—

ক) সিন্ধু সভ্যতা, খ) পৌরাণিক যুগ, গ) মৌর্য যুগ, ঘ) অন্ধ, ঙ) পাহাড় কেটে মন্দির বা অভয়াশ্রম, চ) কুশান যুগ : গান্ধারা ও মথুরা, ছ) গুপ্ত যুগ : শিল্পশিক্ষার স্বর্ণযুগ, জ) বিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পকলা, ঝ) শ্রীলঙ্কা, ঞ) কম্বোডিয়া, ট) থাইল্যান্ড, ঠ) বার্মা এবং ড) জাভার শিল্পকলার ইতিহাস ।

৩০৪ : বিশ শতকের শিল্পের ইতিহাস (History of Art of the 20th century) এই কোর্সে বিশ শতকের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

ক) ফবিজম, খ) কিউবিজম, গ) সুপারম্যাটিজম, অফিজম, কনস্ট্রাকটিবিজম, দাদাইজম, ফিউচারিজম, ঘ) অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম এবং ইম্প্রেশনিজম, ঙ) পপ আর্ট, চ) অপ আর্ট, ছ) বিশ শতকের উপমহাদেশীয় শিল্পকলার ইতিহাস ।

৩০৬ : নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প উপচয় (Aesthetics and Art appreciation) এই কোর্সের পাঠ্য বিষয় হলো—

ক) নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং সমাজে এর ভূমিকা

খ) বিভিন্ন যুগের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা

গ) শিল্প উপচয় সম্পর্কিত ধারণা

ঘ) দৃশ্যশিল্পের মৌলিক নীতি সম্পর্কে ধারণা, যেমন : ঐক্য, সাদৃশ্য, গতি, বৈপরীত্য, ভারসাম্য, ছন্দ ইত্যাদি ।

অঙ্কন ও নির্মাণ কোর্সসমূহ

৩০৭ এবং ৩০৫ নম্বর কোর্স হলো অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক; বিভাগের নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক শিল্পমাধ্যমে কম্পোজিশন অঙ্কন বা নির্মাণ করা ।

ক) অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ

307-Figure composition (Oil on Canvas)

305-Landscape (Oil on Canvas)

খ) প্রাচ্যকলা বিভাগ

307-Composition with figure

305-Drawing and design from natures

গ) গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ (কমার্শিয়াল আর্ট)

307-Composition with figure (Creating poster in any medium)

305-Typography (Creation of new faces)

ঘ) ভাস্কর্য বিভাগ

307-Composition with figure (any medium)

305-Composition with figure (Carving)

ঙ) প্রিন্টমেকিং বিভাগ

307-Composition with figure (any medium)

305-Etching

চ) মৃৎশিল্প বিভাগ

307-Composition with figure (Mosaic and tiles, 2-d)

305-Composition with figure (Terracotta, 3-d)

এমএফএ দ্বিতীয় পর্বের কোর্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তত্ত্বীয় কোর্সসমূহ

৪০১-বিশ শতকের বাংলাদেশের শিল্পকলা (History of Art of Bangladesh in 20th century) : এই কোর্সে পাঠ্য করা হয় ।

৪০৪-শিল্প-উপকরণ ও করণ-কৌশল (Materials and Techniques) : এই কোর্সে সকল বিভাগের নিজস্ব শিল্পমাধ্যমের শিল্প-উপকরণ ও করণ-কৌশল সম্পর্কে তত্ত্বীয় ও হাতে-কলমে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এই কোর্স ডিজাইন করা হয় প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব শিল্প-উপকরণ ও করণ-কৌশলের আলোকে ।

৪০৬-অভিসন্দর্ভ (Thesis) : শিল্পকলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী অভিসন্দর্ভ রচনা করা । অভিসন্দর্ভের নম্বর বণ্টন ছিল ৭৫ নম্বর লিখিত এবং ২৫ নম্বর মৌখিক ।

৪০৭-মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) : এমএফএ কোর্সে বিভাগের পাঠ্য বিষয়ের ওপর ৫০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষা । পরীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ দ্বারা মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হবে ।

অঙ্কন ও নির্মাণ কোর্সসমূহ

ক) অঙ্কন চিত্রায়ণ বিভাগ

402-Experimental Composition (Oil on Canvas)

403-Experimental Figure Drawing

404-Experimental Figure Painting

খ) প্রাচ্যকলা বিভাগ

402-Experimental Composition

403-Painting in Oriental style

404-Mural Painting

গ) গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ (কমার্শিয়াল আর্ট)

402-Experimental Composition (Creating Poster)

403-Publicity Campaign

404-Illustration and Design

ঘ) ভাস্কর্য বিভাগ

402-Experimental Composition (any media)

403-Experimental Composition (Casting)

404-Experimental Compositing (Mixed Media)

ঙ) প্রিন্টমেকিং বিভাগ

402-Experimental Composition

403-Wood cut

404-Lithography

চ) মৃৎশিল্প বিভাগ

402-Experimental Composition

403-Design (utility ware for daily use and Industrial Purposes)

404-Experimental Ceramics[212]

সিলেবাসের বৈশিষ্ট্য

চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের এমএফএ ডিগ্রির এই সিলেবাস ছিল কোর্সভিত্তিক। এই পর্যায়ে অঙ্কন ও নির্মাণ এবং তত্ত্বীয় বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ অঙ্কন ও নির্মাণ এবং ৫০০ নম্বর ছিল তত্ত্বীয় বিষয়ের। সমগ্র সিলেবাসের অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মানব অবয়ব অঙ্কন ও নির্মাণ প্রাধান্য পেয়েছে।

---

[২১২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের এমএফএ কোর্সের সিলেবাস, সিলেবাসটি ১৯৭৮–৭৯ সাল থেকে কার্যকর হয়, উৎস : প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই সিলেবাসের মাধ্যমে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী শিক্ষার সূচনা হয়। অঙ্কন ও নির্মাণ কোর্সগুলোতে মাধ্যম ও শৈলীগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ফুটিয়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তত্ত্বীয় বিষয়েও গবেষণাধর্মী অভিসন্দর্ভ রচনা আবশ্যিক বিষয় করা হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার প্রাগ্রসরতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অন্যান্য সিলেবাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা : সিলেবাস কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের ক্ষেত্রে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের এমএফএ কোর্সের সিলেবাস ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিল। ঢাকার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা, শ্রেণি ও সাবমিশনের নম্বরের ভিত্তিতে এমএফএ ডিগ্রির ফলাফল নির্ধারণ করার নিয়ম ছিল। কিন্তু বরোদা ও শান্তিনিকেতনে দুই বছর শিক্ষা শেষে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষা, সাবমিশন এবং টিউটরিয়ালে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হতো। ঢাকার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে এমএফএ কোর্সের সর্বমোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে তত্ত্বীয় ৫০০ এবং অঙ্কন ও নির্মাণ ৫০০ নম্বর ছিল। এ ক্ষেত্রে বরোদা ছিল ২৬০০ নম্বর, যার মধ্যে তত্ত্বীয় ৬০০ এবং অঙ্কন নির্মাণ ২০০০ নম্বর।[২১৩] এ ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এম ফাইনে মোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বর ছিল তত্ত্বীয় বিষয়ে এবং ৭০০ ছিল অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ে।[২১৪]

সিলেবাসের কাঠামোগত ও নম্বর বিভাজনে কিছুটা অমিল থাকলেও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীল চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সহযোগিতা করা। শান্তিনিকেতনে ও বরোদার সিলেবাসে শিল্পচর্চায় অধিক স্বাধীনতার সুযোগ ছিল; কিন্তু ঢাকার সিলেবাসে এ ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন বরোদা ও শান্তিনিকেতনের সিলেবাসে অঙ্কন নির্মাণ বিষয়গুলো শুধু Practical শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু ঢাকার সিলেবাসে প্রথম পর্বে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় একধরনের সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যেমন : ফিগার কম্পোজিশন, ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি। তবে দ্বিতীয় পর্বের সিলেবাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু আর নির্দিষ্ট থাকেনি।

---

[২১৩] অধ্যাপক ফরিদা জামানের এমএ (ফাইন আর্ট) পরীক্ষার নম্বরপত্র, ৬-৬-১৯৭৮ তারিখে মহারাজা শোয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা, ভারত থেকে ইস্যুকৃত, উৎস : তাঁর ব্যক্তিগত নথি, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[২১৪] অধ্যাপক লালা রুখ সেলিমের এম ফাইন পরীক্ষার নম্বরপত্র, ৩-৭-১৯৮৯ তারিখে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে ইস্যুকৃত, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এমএফএ প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী : ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষে এমএফএ কোর্সে প্রথম ব্যাচে মোট তিনজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে জাকিয়া আজিজ, প্রাচ্যকলা বিভাগে আব্দুস সাত্তার এবং মৃৎশিল্প বিভাগে আখতারুন্নাহার আইভী।[২১৫] আব্দুস সাত্তার ছিলেন প্রাচ্যকলা বিভাগের লেকচারার। তিনি জনশিক্ষা বিভাগ থেকে অনুমতি নিয়ে এমএফএ কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে ১৯৭৯–৮০ শিক্ষাবর্ষে এমএফএ কোর্সে প্রথম ভর্তি হন এফ এম কায়সার, এস এম শামসুদ্দীন, মোজাহারুল হক ডালিমসহ সাতজন।[২১৬] এর পাঁচ বছর পরে ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভাস্কর্য এবং প্রিন্টমেকিং (গ্রাফিক আর্ট) বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রির কার্যক্রম শুরু হয়। এ বছর ভাস্কর্য বিভাগে শ্যামল চৌধুরী, মুকুল মকসুদ্দিন রানা ও হিমাংশু কুমার সিংহ[২১৭] এবং গ্রাফিক আর্ট বিভাগে আনোয়ারুল করিম ও নুজহাত জামাল ভর্তি হন।[২১৮] এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভাগগুলোতে এমএফএ ডিগ্রি কোর্সের কার্যক্রম শুরু হয়।

অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ে প্রথম নারী শিক্ষক নিয়োগ : আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পর ১৯৫৪ সালে প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে এখানে মেয়েদের শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। এর পর থেকে অনেক ছাত্রী এখানে ভর্তি হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মেধার পরিচয় দিয়ে ভালো ফলাফল করে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কলেজ থেকে উত্তীর্ণের পর তাঁদের অধিকাংশই নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিল্পচর্চায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। এঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে চারুকলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সকল শিল্পীর মধ্যে অন্যতম হলেন ফরিদা জামান; যিনি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার একত্রিশ বছর পর অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ের প্রথম নারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৭৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিএফএ ডিগ্রি (১৯৭৪ সালে) লাভ করেন। এরপর ভারত সরকারের আইসিসিআর বৃত্তি নিয়ে গুজরাটের বরোদা এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ে (The Maharaja Sayajirao University of Baroda) পেইন্টিং বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিতে ভর্তি হন এবং ১৯৭৮ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি.

[২১৫] অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২১৬] অধ্যাপক এফ এম কায়সারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ ১৬ অক্টোবর ২০২০

[২১৭] "বিভাগ সম্পর্কে কিছু কথা", *ক্যাটালগ*, প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছর, ভাস্কর্য বিভাগ, পুনর্মিলন ও প্রাক্তনী সমাবেশে, ২০১৮, পৃ. অনুল্লেখ

[২১৮] শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, "জয়নুলের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাপচিত্র চর্চা", অধ্যাপক নিসার হোসেন (সম্পা.), *জয়নুল জন্মশতবর্ষ প্রবন্ধাবলি*, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, পৃ. ৫৩

ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে ভারতের বরোদার এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে পেইন্টিংয়ে প্রথম পুরস্কার এবং ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত চতুর্থ নবীন শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নবীন শিল্পকলা পুরস্কার (স্বর্ণপদক) লাভ করেন।

ফরিদা জামান, প্রভাষক অঙ্কন ও চিত্রায়ণ

শামীম আরা সিকদার, প্রভাষক ভাস্কর্য

নাজমা বেগম, প্রভাষক, শিল্পকলার ইতিহাস

চিত্র-৫৫ : আর্ট কলেজে নিযুক্ত কয়েকজন নারী শিক্ষক

অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ে দ্বিতীয় নারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৮০ সালে ভাস্কর্য বিভাগে যোগদান করেন শামীম আরা সিকদার (জন্ম : ১৯৫৩)।[২১৯] তিনি ফরিদা জামানের সহপাঠী ছিলেন। ১৯৮০ সালের ৫ মার্চ নাজমা বেগম (জন্ম : ১৯৪৯) শিল্পকলার ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।[২২০]

এ বছর আব্দুস শাকুর শাহ্ (জন্ম : ১৯৪৬) চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বদলি হয়ে প্রভাষক পদে আর্ট কলেজে যোগদান করেন। তিনি আর্ট কলেজের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে বিএফএ ডিগ্রি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে এবং বরোদা এমএস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করেন। এখানে নিয়োগের পর প্রথম দুই বছর তিনি প্রি-ডিগ্রির শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কারুশিল্প বিভাগে ডিগ্রি কোর্স খোলার প্রাক্কালে ১৯৮২ সালে তাঁকে কারুশিল্প বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তিনি এই বিভাগের ডিগ্রির সিলেবাস প্রণয়নের জন্য ভারত ও জাপানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিলেবাস সংগ্রহ করেন এবং সিলেবাস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[২২১]

---

[২১৯] "Sclupture Coming From Heaven : A. Picturesque Book on Sclupture", *Scluptor Shamim Sikder*, Dhaka, S.S. Printing & Publications, 2000, P. 156

[২২০] অধ্যাপক নাজমা বেগমের সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনপত্র, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২২১] অধ্যাপক আবদুস শাকুর শাহ্‌র সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২০

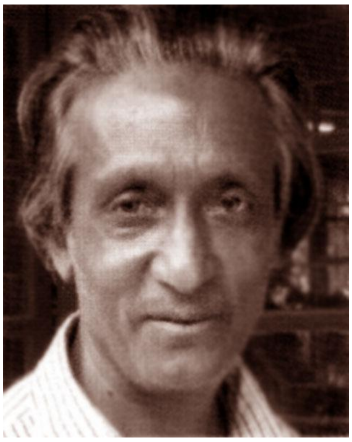

চিত্র-৫৬ : শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ
প্রভাষক, কারুশিল্প বিভাগ

সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে এমএফএ কোর্স চালু হওয়ায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী চারুকলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এখানে শিক্ষার্থীরা চারুকলার তত্ত্বীয় এবং অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল চর্চার সুযোগ পান। ১৯৭৮–৭৯ থেকে ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত আর্ট কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমএফএ কোর্স চালু ছিল। আধুনিক ও সৃজনশীল শিল্পশিক্ষার ধারাকে আরো উন্নতর করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট হিসেবে আর্ট কলেজ একীভূত করে অনার্স কোর্স খোলার দীর্ঘদিনের দাবি আশির দশকের শুরুতে আবারও চাঙ্গা হয়ে ওঠে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তৎপরতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮৩ সালের জুলাই থেকে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস নামে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে।[২২২]

কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের বিশ বছরের শিক্ষার পর্যালোচনা : ১৯৬৩ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প একটি ডিগ্রি কলেজ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কলকাতার ধারবাহিকতায় চলা শিক্ষাক্রম সংস্কার করে এ সময় থেকে শিল্পের ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে তত্ত্বীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যায়ে পূর্বের পাঁচ বছরের কোর্স পরিবর্তন করে বিএফএ ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। যার প্রথম দুই বছর ছিল প্রি-ডিগ্রি এবং পরবর্তী তিন বছর বিএফএ ডিগ্রি পর্যায়।

---

[২২২] "Sculpture coming from Heaven : A picturesque Book on Sculpture", *Sculptor Shamim Sikder*, Ibid, P. 156

কলেজ বাস্তবায়নের সময় এখানে বিভাগের সংখ্যা বাড়িয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ সময় আর্ট কলেজে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট, ওরিয়েন্টাল আর্ট, প্রিন্টমেকিং, স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং এবং সিরামিকস অ্যান্ড ক্রাফটস্—এই ছয়টি বিভাগ অনুমোদিত হয় এবং ড্রাফটম্যানশিপ ও ড্রইং মাস্টার্স কোর্স বাদ দেওয়া হয়। প্রচলিত বিভাগগুলোর পাশাপাশি অনুমোদিত অন্য বিভাগগুলো চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিভাগভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদ সৃষ্টি করে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া তত্ত্বীয় বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগ করা হয়। কলেজ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে (১৯৬৩–৬৪) ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, কমার্শিয়াল আর্ট, ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি কোর্স এবং মৃৎশিল্প বিভাগে সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হয় এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের কোর্স শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে মৃৎশিল্প বিভাগ ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষে, স্কাল্পচার অ্যান্ড মডেলিং বিভাগ ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে এবং প্রিন্টমেকিং বিভাগ ১৯৭৭–৭৮ সালে বিএফএ ডিগ্রিতে শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালে জুনাবুল ইসলাম যোগদানের পর থেকে ক্রাফটসের বাটিক বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু হয়। ক্রাফটস্ একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৮২–৮৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। কলেজ বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে এখানে বহুমুখী শিল্পশিক্ষার পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে পূর্বের সিলেবাস পরিবর্তন করে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ের সমন্বয়ে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। সেখানে প্রি-ডিগ্রিতে ৮০০ নম্বরের আটটি বিষয় এবং ডিগ্রিতে একটি ঐচ্ছিক বিষয়সহ ৯০০ নম্বরের নয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সিলেবাসে প্রি-ডিগ্রিতে ইংরেজি অথবা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ে প্রতিটি ব্যবহারিক বিষয়ে ৫০% এবং তত্ত্বীয় বিষয় ২৫% সেশনাল মার্কস প্রবর্তন করা হয়।

১৯৬৭ সালে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়া ছিল একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাঁর অবসরে যাওয়ার ফলে আর্ট কলেজের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এরপর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে শফিকুল আমীন ও আনোয়ারুল হক। ১৯৭০ সালে এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন সৈয়দ শফিকুল হোসেন। ওই সময়ে সংঘটিত হয় বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম। যেমন : ছেষট্টি সালের ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তর সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ। এ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে আর্ট কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বাংলার চারুশিল্পীরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের শিল্পসত্তা দিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হন

কলেজের শিক্ষার্থী শাহনেওয়াজ, অমিত বসাক ও কর্মচারী লোনা মিয়া। এ ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে সমুন্নত রাখতে আর্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথা শিল্পীরা এ সময় আন্দোলন করেছেন; যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী পর্যায়েও অব্যাহত আছে।

দেশ স্বাধীনের পর কলেজটির পরিবর্তিত নামকরণ হয় বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস বা বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর শিল্পচর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ দেশের শিল্পীদের মনোজগতে প্রবলভাবে রেখাপাত করেছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে। স্বাধীন দেশের নতুন সরকার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত সরকারের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরে চারুকলা শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।[২২৩] এই পর্যায়ে (১৯৭৪ সালে) প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস পরিবর্তন করে ১০০০ নম্বরের সিলেবাস করা হয়। এখানে ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষণীয় সকল বিষয়কে এই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ ছাড়া তত্ত্বীয় ইংরেজির স্থলে ইংরেজি অথবা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি করা হয়। এদিকে দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে শিল্পী রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে চারুকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএ (ফাইন আর্টস) কোর্স চালু হয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে এখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন ঢাকার আর্ট কলেজ থেকে বিএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। এভাবে দেশ স্বাধীনের পর ঢাকার আর্ট কলেজের ডিগ্রি উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাড়ি জমাতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে আর্ট কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্ট কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু করার। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে আর্ট কলেজে এমএফএ কোর্স চালু করা হয়। এমএফএ শিক্ষা চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা রীতিবদ্ধতার বাইরে গিয়ে শিল্পের বিষয় ও করণ-কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব শিল্পচিন্তা প্রকাশের সুযোগ পান। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার বিষয়টিও যুক্ত হয়; যা আধুনিক শিল্পকলা বিকাশে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল।

কলেজ পর্যায়ের বিশ বছরে এখান থেকে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী চরুকলার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। এর মধ্যে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে

[২২৩] শরিফা খাতুন, *তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব [দ্বিতীয় খণ্ড]*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ. ১৮৯

প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের হামিদুজ্জামান খান, মাহমুদুল হক, আবুল বারক আল্‌ভী, আব্দুল মান্নান, মিজানুর রহিম, রেজাউল করিম, শহিদ কবির, মতলুব আলী, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, বীরেন সোম, খুশী কবীর, কাজী গিয়াস উদ্দিন, মাহবুবুল আমীন, আব্দুস শাকুর শাহ্, সৈয়দ লুৎফুল হক, অলোকেশ ঘোষ, আবুল মনসুর, রফিকুল আলম, কাজী হাসান হাবীব, বনিজুল হক, চন্দ্র শেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, আসেম আনসারী, কে এম এ কাইয়ুম, মো. ইব্রাহিম, মনসুর-উল করিম, মোমিনুল রেজা, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, অলক রায়, নাসিম আহমেদ নাদভী, ফরিদা জামান, নাইমা হক, সাধনা ইসলাম, টি এ কামাল কবির, রণজিৎ দাস, মাহাবুব আকন্দ, জাকিয়া বেগম, তরুন ঘোষ, জামাল উদ্দিন আহমেদ, মো. আলমগীর, মোস্তাফিজুল হক, শাহাদাত হোসেন, তাজউদ্দিন আহমেদ, খুরশিদ আলম সেলিম, চৈতন্য মল্লিক, আবু তাহের বাবু, রেজাউন নবী, বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাস, মো. নজিব আহমেদ, আহমেদ শামসুদ্দোহা, নিসার হোসেন, শেখ আফজাল, আজিজ শরাফী, সিদ্ধার্থ শঙ্কর তালুকদার, ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা, রুহুল আমিন কাজল, নাহিদা আক্তার, শিশির ভট্টাচার্য্য, আতিয়া ইসলাম এ্যানি, মো. মনিরুজ্জামান, মোর্শেদা আরজু আলপনা, মাসুদুল হাসান, জাহিদ মুস্তফা, খালিদ মাহমুদ মিঠু, কনকচাঁপা চাকমা, ইফতেখার উদ্দীন আহমদ, সমীরন চৌধুরী, শামীম সুব্রানা, নজরুল ইসলাম অঘ্রাণী, জি এস কবীর, মোহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ।

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের উল্লেখযোগ্য হলেন—সুদীপ বশাক, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইউনুস, এফ এম কায়সার, মানিক দে, ফারুক জামাল, মুস্তাফা কামাল ভূইয়া, শামসুদ্দীন আহমেদ, শফিকুল ইসলাম, মো. রমিজউদ্দিন, মোজাহারুল হক ডালিম, আবুল হাশেম, শফিকুল ইসলাম, কাজী রফিকুল আলম প্রমুখ। ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের আব্দুস সাত্তার, লক্ষ্মণ কুমার সূত্রধর, রফিক আহমেদ, শওকাতুজ্জামান, নাসরিন বেগম, ফৌজিয়া ইয়াসমিন, হেলেনা খানম ইরানী, নাজমা আক্তার প্রমুখ; ভাস্কর্য বিভাগের শামীম আরা সিকদার, মুজিবুর রহমান, সৈয়দ জুলফিকার আলী, মনি মন্ডল, এনামুল হক, আক্তার জাহান আইভী, মৃণাল হক, মুকুল মকসুদ্দীন রানা, শ্যামল চৌধুরী, তৌফিকুর রহমান, লালা রুখ সেলিম, মো. রেজাউজ্জামান, মোস্তফা শরীফ আনোয়ার, শেখ সাদী ভূঞা প্রমুখ। মৃৎশিল্প বিভাগের আখতারুন্নাহার আইভী, আবু সাঈদ তালুকদার, শিশির বণিক, স্বপন কুমার সিকদার প্রমুখ এবং প্রিন্টমেকিং বিভাগের গোলাম ফারুক বেবুল, রোকেয়া সুলতানা, মোখলেসুর রহমান, মুসলিম মিঞা, মো. রফি হক, হাবীবুর রহমান, ফারেহা জেবা, সাইদুল হক জুইস, আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী, রশীদ আমীন প্রমুখ শিল্পী হিসেবে বা নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদেশ থেকে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

উল্লিখিত শিল্পীদের মধ্যে বৃহৎ অংশ শিক্ষা শেষে বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের (পরবর্তীকালে চারুকলা ইনস্টিটিউটে) শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সময় যোগদান করেন; অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে মাহমুদুল হক (প্রি-ডিগ্রি কোর্সে; পরে প্রিন্টমেকিং বিভাগে) শহিদ কবির, কাজী গিয়াসউদ্দিন, মতলুব আলী, মাহবুবুল আমীন, ফরিদা জামান, জামালউদ্দিন আহমেদ, মোস্তাফিজুল হক, শাহাদত হোসেন, নিসার হোসেন, আজিজ শরাফী, শিশির ভট্টাচার্য্য, শেখ আফজাল হোসেন, মোর্শেদা আরজু আল্পনা এবং মোহাম্মদ ইকবাল। গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে নাইমা হক, এম এফ কায়সার এবং মোহাম্মদ ইউনুস; প্রাচ্যকলা বিভাগে আব্দুস সাত্তার, শওকাতুজ্জামান ও নাসরিন বেগম; মৃৎশিল্প বিভাগে আবু সাঈদ তালুকদার ও স্বপন কুমার সিকদার; ভাস্কর্য বিভাগে হামিদুজ্জামান খান, এনামুল হক, লালা রুখ সেলিম; প্রিন্টমেকিং বিভাগে আবুল বার্ক আল্‌ভী ও রোকেয়া সুলতানা; কারুশিল্প বিভাগে আব্দুস শাকুর শাহ্‌ ও আব্দুল জাব্বার এবং শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে ড. রফিকুল আলম ও নাহিদ আক্তার যোগদান করেন।

ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের শিক্ষকদের নেতৃত্বে সত্তরের দশক থেকে ঢাকার বাহিরে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেখানে তাঁর সহকর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, মুর্তজা বশীর এবং মিজানুর রহিম। রশিদ চৌধুরীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকা থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত একদল উদ্যমী তরুণ চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী হিসেবে। তাঁদের একটি বড় অংশ শিক্ষা শেষে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে। চারুকলা বিভাগে যোগদান করেন আবুল মনসুর, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী, মনসুর-উল করিম, অলক রায় প্রমুখ চারুকলা কলেজে যোগদান করেন চন্দ্র শেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, কে এম এ কাইয়ুম, বনিজুল হক, রণজিৎ দাস প্রমুখ। ঢাকা চারুকলার সাবেক শিক্ষার্থী এবং চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের তরুণ শিক্ষক বনিজুল হকের অধ্যক্ষতায় সত্তরের দশকের শেষার্ধে রাজশাহী আর্ট কলেজের যাত্রা শুরু হলে সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন শিল্পী তরুন ঘোষ, গোলাম ফারুক বেবুল, সিদ্ধার্থ শংকর তালুকদার, ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা প্রমুখ। আশির দশকের প্রথম পর্যায়ে ড. রফিকুল আলমের অধ্যক্ষকতায় খুলনা আর্ট কলেজের কার্যক্রম শুরু হলে সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন শাহরিয়ার তালুকদার, বিমানেশ বিশ্বাস, চৈতন্য মল্লিক প্রমুখ। এভাবে সত্তরের দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার যে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়েছিল, তা আশির দশকের মধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় বিস্তৃত হয় মূলত ঢাকা চারু ও কারুকলা কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে এ সকল শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চায়ও তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যান্য আর্ট কলেজ

বাংলাদেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের একমাত্র আর্ট কলেজ ছিল ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ শুরু হয় স্নাতকোত্তর শিক্ষার মধ্য দিয়ে। সেখানে স্নাতক উত্তীর্ণ সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিল্পশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্ট কলেজে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছিল। কিন্তু প্রতিবছর ব্যাপক সংখ্যক ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষার্থী ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতেন। অন্যরা চারুকলা বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পূর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক মনোভাবের কারণে এ সকল বর্ধিত শিক্ষার্থীর জন্য নতুন আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। দেশ স্বাধীনের পর একটি মুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও তৎকালীন সরকার সৃজনশীল ও আত্মনির্ভরশীল যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে চারুকলা ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিক্ষার সকল স্তরে চারু ও কারুকলা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় স্কুল-কলেজে চারুকলা শিক্ষার্থীদের অধিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এসব কারণে দেশ স্বাধীনের পর শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্ট কলেজে ভর্তির আগ্রহ বাড়তে থাকে। এই বর্ধিত শিক্ষার্থীদের শিল্পশিক্ষা দানের জন্য নতুন আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ছাড়া যুদ্ধ-পরবর্তীকালে মেধাবী বেকার শিল্পীদের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। এসব কারণে সত্তরের দশক থেকে কয়েকটি বিভাগীয় শহরে আর্ট কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সকল উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চাকরিপ্রার্থী তরুণ শিল্পী, চারুকলার কতিপয় শিক্ষক এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে ঢাকার বাইরে দেশের দ্বিতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ এবং এই দশকের শেষ পর্যায়ে দেশের তৃতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আশির দশকের প্রথমার্ধে খুলনায় গড়ে ওঠে খুলনা আর্ট কলেজ। এরপর পর্যায়ক্রমে জেলা সদরগুলোতেও আর্ট কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। এই গবেষণার সময়কালের (১৯৪৮–৮৭) মধ্যে উল্লিখিত তিনটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে চারুকলা কলেজ চট্টগ্রাম, রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং খুলনা আর্ট কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম

রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার পর এখানে শিক্ষার্থী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (ফিডিং ইনস্টিটিউট) হিসেবে চট্টগ্রামে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি কোর্স প্রদানকারী একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা; যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং যেখান থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান কোর্সে ভর্তি হবেন।[২২৪] তাঁর এই পরিকল্পনায় সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম শহরের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত শ্রেণি ও ব্যবসায়ীরা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। চট্টগ্রাম শহরে একটি আর্ট কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই অধ্যাপক আবুল ফজলের বাসভবনে শহরের সর্বস্তরের নাগরিক প্রতিনিধিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আর্ট কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আর্ট কলেজের পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়; পরিষদের সভাপতি আবুল ফজল, সহসভাপতি ড. আনিসুজ্জামান ও রশিদ চৌধুরী, সম্পাদক সবিহ্-উল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ করা হয় ড. এ এফ এম ইউসুফকে। এ ছাড়া বিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই পরিষদের সদস্য করা হয়। চট্টগ্রামে আর্ট কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও এ কে খানের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল।[২২৫] কলেজটির নামকরণ হয় 'চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম'। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন সবিহ্-উল আলম (জন্ম : ১৯৪০)। তিনি ১৯৬৩ সালে লাহোর মেয়ো স্কুল অব আর্টস থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের যাত্রা শুরু হয় বাদশা মিয়া সড়কে প্রায় পরিত্যক্ত ডিস্ট্রিক্ট আর্ট কাউন্সিল ভবনে। আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট। প্রথম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন একুশ জন।[২২৬] প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলেন আহমেদ নেওয়াজ, প্রণব দাস, রফিক সিদ্দিকী, মো. শাহরিয়ার, শিবনাথ দত্ত, স্বপন আশ্চার্য প্রমুখ।[২২৭] প্রতিষ্ঠা বছরে উপ-অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন আবুল মোমেন এবং শিক্ষক হিসেবে আখতার আলী।[২২৮] ১৯৭৪ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

[২২৪] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা", *কালি ও কলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[২২৫] "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ১৯৭৯, পৃ. অনুল্লেখ

[২২৬] সবিহ্-উল আলম, "চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ : জন্মকথা", সুব্রত বড়ুয়া রনি, দেওয়ান মামুন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সৃজন স্বজন সম্মিলন* '০৩, চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন, ২০০৩, পৃ. অনুল্লেখ

[২২৭] চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী স্বপন আচার্যের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ: ০৫.০৭.২০২১

[২২৮] "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ১৯৭৯, প্রাগুক্ত

মাস্টার্স ডিগ্রির শিক্ষার্থী হাসি চক্রবর্তী, চন্দ্র শেখর দে, মনসুর-উল করিম ও এনায়েত হোসেন। প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী ও আবুল মনসুর এখানে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। এ ছাড়া অ্যানাটমি বিষয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জিয়াউর রহমান এবং ড্রাফটিং বিষয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যন্ত্র প্রকৌশলী কামালউদ্দীন আহমেদ প্রথম পর্যায় থেকে যুক্ত ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে সার্বক্ষণিক শিক্ষক ছিলেন অধ্যক্ষ সবিহ্-উল আলম এবং আবুল মোমেন; অন্যরা ছিলেন খণ্ডকালীন অথবা ভিজিটিং। প্রথম পর্যায়ে বাংলা পাঠদান করতেন অধ্যাপক আখতার আলী, ইংরেজি আবুল মোমেন ও তপন জ্যোতি বড়ুয়া, সমাজতত্ত্ব অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অ্যানাটমি জিয়াউর রহমান; শিল্পকলার ইতিহাস রশিদ চৌধুরী, ড্রইং চন্দ্র শেখর দে, এনায়েত হোসেন; ড্রাফটিং কামাল উদ্দিন আহমেদ, ভাস্কর্য সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, ডিজাইন সবিহ্-উল আলম এবং নন্দনতত্ত্ব আবুল মোমেন। ১৯৭৫ সালে এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন বনিজুল হক ও জিয়াউর রহমান।

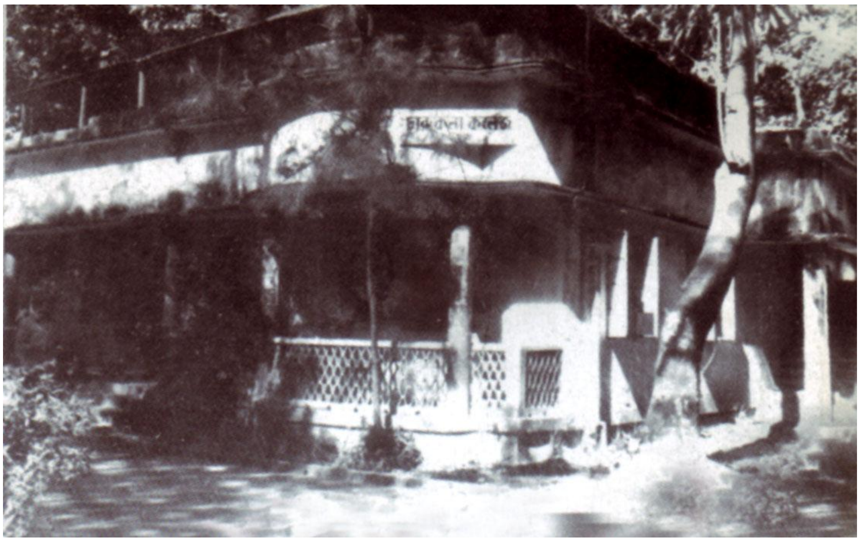

চিত্র-৫৭ : চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম, উৎস : স্মরণিকা, সৃজন স্বজন সম্মিলন

১৯৭৫ সালের ১৮ জুন চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত (Affiliated) হয়।[২২৯] প্রথমে দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি কোর্স অনুমোদন হয়; যেখানে দুই বছর শিক্ষা শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় প্রি-ডিগ্রি চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ সময় চারুকলা কলেজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ফুলকি' নামে একটি শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ বছর সার্বক্ষণিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বনিজুল হক ও জিয়াউর রহমান।

[২২৯] "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, প্রাগুক্ত

রশিদ চৌধুরীর যে পরিকল্পনা নিয়ে কলেজটি গড়ে তোলা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দাবি তোলেন এটিকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ করার। এই দাবির পেছনে যুক্তি ছিল, কলেজে শুধু প্রি-ডিগ্রি কোর্স চালু থাকলে একে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে কলেজটি পূর্ণাঙ্গ চারুকলা কলেজ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।[২৩০] বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় তিন বছর মেয়াদি বিএফএ ডিগ্রি (পাস) চালু করা হয়। অর্থাৎ ঢাকার মতো দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি ও তিন বছরের বিএফএ প্রোগ্রাম চালু করা হয়। এর ফলে কলেজটি ফিডিং ইনস্টিটিউটের চরিত্র হারিয়ে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ বছর কলেজে সার্বক্ষণিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে সদ্য মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করা ফয়েজুল আজিম, শাহরিয়ার তালুকদার ও নাজলী লায়লা মনসুর। এ বছর একটি বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর ছবি ও বিখ্যাত শিল্পীদের প্রদত্ত ছবির বিক্রয়লব্ধ টাকা এবং শিল্পপতি এ কে খানের আর্থিক অনুদান দিয়ে কলেজের ভবন সম্প্রসারণ ও একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর্থিক সংকটের মধ্যে ছিল। শিক্ষার্থীদের সামান্য টিউশন ফি এবং ব্যক্তি আর্থিক অনুদানে এটি পরিচালিত হয়েছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর জমির মালিকানা নিয়ে মামলা হলে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ ছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে কলেজের পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সালের আগস্টে অধ্যক্ষ সবিহ্-উল আলম কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নেন। এরপর অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন উপ-অধ্যক্ষ আবুল মোমেন। কিন্তু মাত্র চার মাস পরে তিনি স্বেচ্ছায় অধ্যক্ষের পদ থেকে সরে দাঁড়ালে এই দায়িত্ব বর্তায় পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষক চন্দ্র শেখর দের ওপর। চন্দ্রশেখর দে কয়েক মাস পর এই দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষক হাসি চক্রবর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৩১] এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে বনিজুল হক চারুকলা কলেজের শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান।[২৩২]

ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন শওকাতুজ্জামান, তপন জ্যোতি বড়ুয়া, দিল আফরোজ বেগম ও নুরুজ্জামান। সরকার এ বছর কলেজের উন্নয়ন অনুদান হিসেবে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে। এই টাকায় একটি স্টুডিও নির্মাণ এবং গ্রাফিক মেশিন, প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় এবং প্রয়োজনীয়

---

[২৩০] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা", *কালি-কলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[২৩১] হাসি চক্রবর্তী, *রেখা ও লেখায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[২৩২] শিল্পী বনিজুল হকের সহধর্মিণী সামশুন নাহারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২১.০৩.২০২২

যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। এ ছাড়া ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বিএফএ (পাস) ডিগ্রি পাস করে বের হন। এ বছর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন কে এম এ কাইয়ুম, অলক রায়, আহমদ নেওয়াজ, কাজী তৌফিক ও শুক্লা সেনগুপ্তা। এ বছর কলেজে আলোকচিত্র বিভাগ খুলে সেখানে শিক্ষক হিসেবে মৃণাল সরকারকে নিযুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮১ সালে শিক্ষক হিসেবে রণজিৎ দাস এবং ১৯৮৩ সালে যোগদান করেন নাসিমা আক্তার রুবি, সৌমেন কান্তি দাস ও শাহারুল হায়দার।[২৩৩] ১৯৮৪ সালে চন্দ্র শেখর পুনরায় কলেজে যোগদান করেন। এ পর্যায়ে তিনি কলেজে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন।[২৩৪]

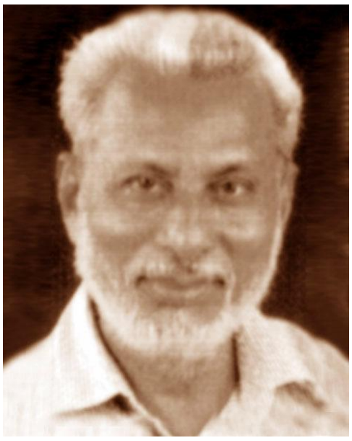

শিল্পী সবিহ্-উল আলম
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ (১৯৭৩–৭৭)

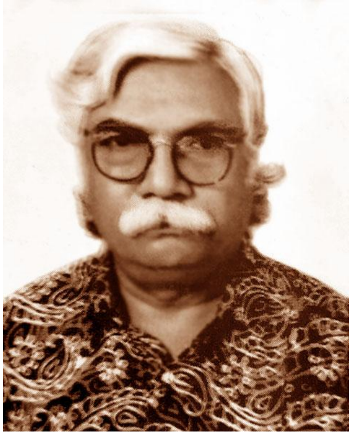

শিল্পী হাসি চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ (১৯৭৮–১৯৮৮)

চিত্র-৫৮ : সত্তর ও আশির দশকের চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ

হাসি চক্রবর্তী ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ এবং ১৯৮৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধ্যক্ষ মেয়াদের প্রথম দিকে ব্যাপক আর্থিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আর্ট কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে একীভূত করে একটি ইনস্টিটিউট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষ হাসি চক্রবর্তী এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনার খসড়া তৈরি করেছিলেন রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রস্তাবনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় শিল্পীর আপত্তির কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। এরপর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কলেজটি জাতীয়করণের জন্য। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর চারুকলা কলেজ চট্টগ্রাম

[২৩৩] অধ্যাপক নাসিমা আক্তারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ২ মার্চ ২০২২
[২৩৪] নিসার হোসেন, "কথোপথন : শিল্পী চন্দ্র শেখর দে ও শিল্পী নিসার হোসেন", *শিল্পরূপ*, ঢাকা, পৃ. ৩৯

জাতীয়করণ হয়; তবে এ সংক্রান্ত ঘোষণা আসে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।[২৩৫] এ পর্যায়ে কলেজটির নামকরণ হয় 'সরকারি চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম'।

চারুকলা কলেজটি জাতীয়করণের ফলে শিক্ষকরা নতুন উদ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। জাতীয়করণের পর কলেজের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অনটন দূর হয় এবং অবকাঠামোগত উন্নতি হয়। ১৯৮৯ সালে কলেজের দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন, আধুনিক আর্ট গ্যালারি এবং প্রশাসনিক ভবন তৈরি হয়।

চিত্র-৫৯ : জাতীয়করণের পর নির্মিত চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ ভবন, আলোকচিত্র : গবেষক

কলেজ জাতীয়করণের পর এখান থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ তত্ত্বীয় শিক্ষক বদলি হয়ে অন্য সরকারি কলেজে চলে যান এবং তাঁদের স্থলে সাধারণ সরকারি কলেজ থেকে নতুন শিক্ষক বদলি হয়ে আসেন। চারুকলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের স্থলে সাধারণ কলেজের সিনিয়র শিক্ষকদের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগের ধারাবাহিকতা ইনস্টিটিউট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। বদলি হয়ে আসা এ সকল অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের মধ্যে অনেকেরই চারুকলা বিষয়ের প্রতি পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ফলে তাঁদের সঙ্গে শিল্পী শিক্ষকের একধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয়করণের পূর্বে আর্থিক অনটনের কারণে চন্দ্র শেখর দে, বনিজুল হকসহ বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক কলেজ ছেড়ে চলে যান। জাতীয়করণের পর ১৯৮৮ সালে রণজিৎ দাস টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বদলি হয়ে চলে যান। এ সকল শূন্যপদে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ বিলম্ব হওয়ায় ওই সময়ে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়।

[২৩৫] হাসি চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত

তবে শিক্ষক সংকট থাকলেও কলেজ ক্যাম্পাসে চারুকলা উপযোগী একটি নিজস্ব মনোরম পরিবেশ ছিল। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকলেও সেখানে পরিবেশগত কিছু সমস্যা ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভবনে চারুকলা বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো, সেটি সাধারণ বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। চারুকলা শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত শ্রেণিকক্ষ, গ্যালারি, সর্বোপরি চারুকলা উপযোগী নিজস্ব পরিবেশ সেখানে ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান শহর থেকে দূরে হওয়ায় শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে একধরনের জনবিচ্ছিন্নতা ছিল। এ ছাড়া স্বল্প দূরত্বে একই বৈশিষ্ট্যের দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সঙ্গে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও মানের দিকটিও বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল। এ সকল কারণে উভয় পক্ষের কাছে চারুকলা বিভাগ ও চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে একটি আর্ট ইনস্টিটিউট করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আর্ট কলেজের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় চারুকলা বিভাগ ও চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে একটি ইনস্টিটিউট করার জন্য।

আর্ট ইনস্টিটিউট বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদেরও শরণাপন্ন হন। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৯৭ সালের ১৯ আগস্ট চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট করার জন্য তৎকালীন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রীকে একটি পত্র দেন। মেয়রের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি দেন ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২১তম সিন্ডিকেট সভার ২ নম্বর সিদ্ধান্তে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি চারুকলা ইনস্টিটিউট করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৩৬] এ সময় পিপি (প্রজেক্ট প্রফর্মা) তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। চার সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি করা হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলী ইমাম খানকে এবং সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মিজানুর রহিম, অধ্যাপক আবুল মনসুর ও ড. অনুপম সেন। পিপি তৈরির ক্ষেত্রে অধ্যাপক মিজানুর রহিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫তম সিন্ডিকেট সভায় 'চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক পিপি উপস্থাপন করা হলে সেটি

[২৩৬] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২১তম সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, উৎস : মো. জসিম উদ্দিন, অধ্যাপক চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুমোদিত হয়।[২৩৭] ১৯৯৯ সালের ১১ মার্চ চারুকলা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হয়।[২৩৮]

চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব এসেছিল আর্ট কলেজের শিক্ষক ও চট্টগ্রাম মেয়রের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান চারুকলা বিভাগের একাডেমিক কমিটির কোনো মতামত গ্রহণ না করে মেয়রের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় চারুকলা বিভাগের একজন অধ্যাপক এই প্রক্রিয়াগত ত্রুটির জন্য এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। এই মামলার কারণে গেজেট হওয়া সত্ত্বেও চারুকলা কলেজ ইনস্টিটিউট করার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। ২০০২ সালের ১০ জুলাই এই মামলার রায় হয় আর্ট ইনস্টিটিউট করার পক্ষে। কিন্তু রায় হওয়ার পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত কলেজকে ইনস্টিটিউট করার বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ২০০৯ সালে অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের পর তিনি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মামলাটি গেজেটের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চারুকলা বিভাগের মতামত নিয়ে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে চারুকলা কলেজকে ইনস্টিটিউট করার।[২৩৯] অবশেষে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ০২.৮.২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত এক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে চারুকলা ইনস্টিটিউট (Institute of Fine Arts) করা হয়।[২৪০] এ সময় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ বারোজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা, বিশজন কর্মচারী এবং ১.০৫৩৬ একর জমি, ছয়টি ভবন, একটি উন্মুক্ত মঞ্চসহ যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়।

১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ থেকে চার শতাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রিতে ভর্তি হয়েছিলেন। অন্য শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি উত্তীর্ণের পর জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছেন। এই সময়কালের মধ্যে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়াদের মধ্যে যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষাক্ষেত্রে

---

[২৩৭] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫তম সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, উৎস : প্রাগুক্ত

[২৩৮] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট : একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", *ক্যাটালগ*, চারুকলা ইনস্টিটিউটের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ২০১১, পৃ. অনুল্লেখ

[২৩৯] অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিনের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, তারিখ : ৪ এপ্রিল ২০১৭

[২৪০] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পত্র, স্মারক নং ও এম-১০৬ সি-১/২০০৯/১৩২৯০/১৩, তারিখ : ০২.৮.২০০৯, উৎস : চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ও কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহাম্মদ ইউনুস, আহমেদ নেওয়াজ, বাণী ভট্টাচার্য, স্বপন কান্তি আচার্য, প্রণব কুমার দাস, চন্দ্র শেখর সাহা, কাজী রকিব, শামিনা শারমিন, ফারজানা খান, আমিনা আখতার বেবী, সুব্রত বড়ুয়া রণি, রমেশ রায়, রওশন আরা রোশনা, চন্দন দেব রায়, ঢালী আল মামুন, শক্তি কাম সিনহা, মোস্তাফিজুর রহমান বাদশা, কামরুল হাসান চৌধুরী, প্রবীর দাস গুপ্ত, মাইনুল আলম, ফৌজুল আজিম, দিলারা বেগম জলি, গুলনাহার বেগম, সুলতান শাহরিয়ার, মঈনুদ্দিন ভূঁঞা, শাহাদাৎ হোসেন সান্টু, সৈয়দা সাজিয়া সুলতানা, দীপক দত্ত, তড়িৎ বড়ুয়া, বিজয় চন্দ, বাবু লাল ভৌমিক, মালিক দাদ খান, পল্লব দাস, আবরারুর রহমান, ফারজানা খান, অজয় সেন চৌধুরী, শিশির মল্লিক, শওকত জাহান, শফিকুল কবির নন্দন, সুনীল কুমার মালো, রেজাউল ইসলাম লাভলু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকে প্রি-ডিগ্রি বা বিএফএ ডিগ্রি পাসের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন।

এ সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্ট কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ঢালী আল মামুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী আহমেদ নেওয়াজ এই কলেজে যোগদান করেন ১৯৭৮ সালে। এই কলেজের তরুণ শিক্ষক বনিজুল হকের নেতৃত্বে রাজশাহীতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগদান করেন কাজী রকিব, প্রণব কুমার দাস প্রমুখ।

কারিকুলাম ও সিলেবাস : চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ। এই কলেজের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন—সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। এখানে দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি এবং তিন বছর মেয়াদি বিএফএ (পাস) ডিগ্রিসহ মোট পাঁচ বছরের কোর্স চালু ছিল। এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রি-ডিগ্রি ভর্তি হতে পারতেন। প্রি-ডিগ্রি উত্তীর্ণরা সরাসরি বিএফএ ডিগ্রিতে ফাইন আর্টস অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতেন। তিন বছর শিক্ষা শেষে বিএফএ ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। বিএফএ উত্তীর্ণের পর এখানকার শিক্ষার্থীদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ইন ফাইন আর্টে ভর্তির সুযোগ ছিল।

প্রি-ডিগ্রি সিলেবাস (১৯৭৫–১৯৭৬) : চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের প্রি-ডিগ্রি প্রোগ্রামে দশটি পত্র শিক্ষণীয় ছিল। প্রতিটি পত্রের মান ১০০ নম্বর অর্থাৎ সর্বমোট ১০০০ নম্বর; এর মধ্যে তিনটি তত্ত্বীয় বিষয়ে ৩০০ নম্বর এবং সাতটি ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ে ৭০০ নম্বর।

তত্ত্বীয় বিষয়ের মধ্যে পাঠ্য ছিল :

প্রথম পত্র : সাহিত্য (বাংলা ও ইংরেজি)

বাংলা সাহিত্যে পাঠ্য ছিল : ক. নির্বাচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা

খ. রচনা (সাময়িক ঘটনা ও বস্তুনির্ভর) এবং

গ. ব্যাকরণ

ইংরেজিতে পাঠ্য ছিল : a. Prose and Poetry

b. Essay/Story,

c. Translation

দ্বিতীয় পত্র : মানব সভ্যতার ইতিহাস : ১. প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও শিল্পকলা,

২. প্রাচীন সভ্যতাসমূহ (মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিক, রোমান, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, খ্রিস্টান সভ্যতা ও শিল্পকলা, আদি খ্রিস্টান, বাইজেন্টাইন এবং গথিক), ৩. ইতালীয় রেনেসাঁ, ৪. ইসলামিক সভ্যতা ও শিল্পকলা এবং ৫. শিল্প বিপ্লব।

তৃতীয় পত্র : সমাজতত্ত্ব : সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা, পরিধি ও প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহ, সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক, সমাজ রূপায়ণে ভৌগোলিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্বের মূল প্রত্যয়সমূহ, সামাজিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিবর্তন ও কার্যাবলি, সামাজিক স্তর ও বিভাগ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক কাঠামো, আদিম সমাজব্যবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহ।

ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ে শিক্ষণীয় ছিল :

চতুর্থ পত্র : ড্রইং ও অ্যানাটমি; পঞ্চম পত্র : পেইন্টিং (জলরং); ষষ্ঠ পত্র : গ্রাফিক (কাঠ খোদাই); সপ্তম পত্র : ভাস্কর্য (কাদামাটি); অষ্টম পত্র : মিউজিয়াম স্টাডি; নবম পত্র : নকশা এবং দশম পত্র : ড্রাফটিং।

ড্রইং ও অ্যানাটমি বিষয়ে পেনসিল, কালি কলম, কালি তুলি, চারকোল ইত্যাদি মাধ্যমে মডেল থেকে হেড স্টাডি, ফিগার, প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস, জড়বস্তু ইত্যাদির অনুশীলন করানো হতো। জলরং মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ, সি-স্কেপ, স্টিল লাইফ শেখানো হতো পেইন্টিং বিষয়ে। গ্রাফিক বিষয়ে সাধারণত ফুল, লতাপাতা, স্টিল লাইফ কাঠ খোদাই মাধ্যমে শেখানো হতো। ভাস্কর্য বিষয়ে কাদামাটি দিয়ে গোলক, বিভিন্ন আকারের বস্তু ও মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুশীলন শিক্ষণীয় ছিল। জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন

নির্দশন, যেমন—ভাস্কর্য, রিলিফ ওয়ার্ক, চিত্রকলা ইত্যাদি অনুশীলন করানো হতো মিউজিয়াম স্টাডি বিষয়ে। পেনসিল, কালি তুলি, কালি কলম ও পেপার কাটিং মাধ্যমে নকশা শিক্ষণীয় ছিল নকশা বিষয়ে। ড্রাফটিং বিষয়ে প্ল্যান, এলিভেশন, সেকশন, পারস্পেকটিভ, কালার রেনডিং ও শ্যাডো কাস্টিং শেখানো হতো।[২৪১]

এই সিলেবাস তৈরির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। সুতরাং এই সিলেবাসের গঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অনুরূপ ছিল। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রি-ডিগ্রি ছিল না। প্রি-ডিগ্রি ছিল ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজে। ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের সিলেবাসের সঙ্গে এই কলেজের সিলেবাসের গঠনগত পার্থক্য থাকলেও বিষয়ের অনেক মিল রয়েছে। ১৯৭৪ সালে প্রণীত ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের সিলেবাসের সঙ্গে চট্টগ্রাম কলেজের সিলেবাসের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

ক. ঢাকা ও চট্টগ্রামের উভয় চারুকলা কলেজের প্রি-ডিগ্রির সিলেবাসের মানবণ্টন সমান ছিল, অর্থাৎ ১০০০ ছিল। ঢাকা অপেক্ষা চট্টগ্রামে তত্ত্বীয় বিষয় বেশি ছিল। ঢাকার দুটি তত্ত্বীয় বিষয়ে মোট ২০০ নম্বর ছিল। আর চট্টগ্রামে তিনটি তত্ত্বীয় বিষয়ে ৩০০ নম্বর ছিল।

খ. ঢাকায় প্রি-ডিগ্রিতে সভ্যতার ইতিহাস এবং ইংরেজি অথবা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পাঠ্য ছিল। চট্টগ্রামে ছিল সাহিত্য শীর্ষক কোর্সের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয় শিক্ষণীয়। এই বিষয়ে মূলত মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ্য ছিল। কিন্তু ঢাকায় 'বাংলা' বিষয়ে সাহিত্য ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি পাঠ্য ছিল। চট্টগ্রামে প্রি-ডিগ্রিতে সমাজতত্ত্ব পাঠ্য ছিল। কিন্তু ঢাকার বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাসে সমাজতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গ. অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ক কোর্সগুলোর শিরোনামের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ই কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল ছিল। ওই সময় ড্রাফটিং বিষয়টি চট্টগ্রামে ছিল, কিন্তু ঢাকায় ছিল না। এ ছাড়া ঢাকায় প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে সিরামিকস ও ক্রাফটস শীর্ষক ৫০ নম্বরের দুটি বিষয় ছিল, যেটি চট্টগ্রামে ছিল না।

বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস (১৯৭৫–৭৬) : বিএফএ ডিগ্রি (পাস) প্রোগ্রামের সিলেবাসে মোট দশটি পেপার বা পত্র ছিল, যার প্রতিটির মান ১০০ অর্থাৎ দশটি পত্রের সর্বমোট মান ১০০০। এর মধ্যে চারটি তত্ত্বীয় বিষয়ে ছিল ৪০০ এবং ছয়টি ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ে ৬০০।

[২৪১] চারুকলা কলেজের ডিগ্রি পাস পরীক্ষার (১৯৭৮), সিলেবাস, শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫–৭৬, উৎস : প্রাগুক্ত

তত্ত্বীয় বিষয়ে পাঠ্য ছিল, প্রথম পত্রে—'শিল্পকলার ইতিহাস' (পাশ্চাত্য), দ্বিতীয় পত্রে 'শিল্পকলার ইতিহাস' (প্রাচ্য ও ভারতীয় উপমহাদেশ), তৃতীয় পত্রে 'শিল্প মাধ্যম' এবং চতুর্থ পত্রে 'সৌন্দর্য তত্ত্ব'। শিল্পকলার ইতিহাসে প্রথম পত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল শিল্পকলার উদ্ভব, প্রাচীন ও মধ্যযুগীর শিল্প, ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও পরবর্তীকাল এবং ইউরোপীয় সাম্প্রতিক শিল্প (কিউবিজম পর্যন্ত) এবং দ্বিতীয় পত্রে ছিল প্রাচ্য শিল্পসমূহ, উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পকলা। 'শিল্প মাধ্যম'-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল, শিল্প নির্মাণ প্রক্রিয়া ও শিল্প মাধ্যমের গুরুত্ব, রং ও পিগমেন্ট, চিত্রপট তৈরির কৌশল, চিত্রকলা, ছাপচিত্র ও ভাস্কর্যের মাধ্যমসমূহ। 'সৌন্দর্য তত্ত্বের' মধ্যে ছিল, শিল্পতত্ত্ব ও সৌন্দর্য তত্ত্ব, শিল্প ও মানব, শিল্প বিশ্লেষণ ও শিল্প সমালোচনা। ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ক দশটি পত্র ছিল, যার মধ্যে 'গ্রাফিক ও ড্রইং' এবং 'নকশা' অবশ্যই শিক্ষণীয়সহ যেকোনো ছয়টি পত্র শিক্ষণীয় ছিল।

কোর্সগুলো হলো : ক. পেইন্টিং, খ. গ্রাফিক ও ড্রইং, গ. ডেকোরেশন, ঘ. নকশা, ঙ. ভাস্কর্য অথবা মৃৎশিল্প, চ. ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ছ. কমার্শিয়াল আর্ট, জ. কমিউনিকেশন থ্রু আর্ট, ঝ. পোর্ট্রেট আর্ট এবং ঞ. কম্পোজিশন। ব্যবহারিক বিষয়গুলোর মধ্যে 'পেইন্টিং' বিষয়ে জলরং ও তেলরং মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ, সি-স্কেপ, স্টিল লাইফ ইত্যাদি অনুশীলন। 'গ্রাফিক ও ড্রইং' বিষয়ে শেখানো হতো মানুষ, জড় জীবনসহ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ড্রইং, উডকাট, লিথোগ্রাফসহ ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে অনুশীলন। 'ডেকোরেশন'-এ শেখানো হতো সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ সজ্জা। 'নকশা' বিষয়ে শেখানো হতো অর্গানিক ও জ্যামিতিক ফর্মে কালি কলম, কালি তুলি, পোস্টার কালার ও পেপার কাটিং মাধ্যমে নকশা করা। 'ভাস্কর্য' বিষয়ে কাদামাটি, সিমেন্ট, কাঠ ইত্যাদি মাধ্যমে মানুষ, জীবজন্তুর ভাস্কর্য তৈরি এবং 'মৃৎশিল্প' বিষয়ে বিভিন্ন আকৃতি মৃৎপাত্র, টেরাকোটা, মাটি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি শিক্ষণীয় ছিল। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এ প্রোডাকশন ডিজাইন, ফার্নিচার ডিজাইন, টেক্সটাইল ডিজাইন ও হস্তশিল্প এবং 'কমার্শিয়াল আর্ট'-এ ইলাস্ট্রেশন, বুক-কভার, শো-কার্ড, ডিজাইন, পোস্টার ও মনোগ্রাম তৈরি শিক্ষণীয় ছিল। 'পোর্ট্রেট আর্ট' বিষয়ে মানুষের আবক্ষ অথবা পূর্ণ দেহ প্রতিকৃতি, পেনসিল, জলরং এবং তেলরং মাধ্যমে শিক্ষণীয় ছিল। 'কম্পোজিশন' বিষয়ে শিক্ষণীয় ছিল মূর্ত বা বিমূর্ত কম্পোজিশন চিত্র আঁকা। পরবর্তীকালে এই সিলেবাসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।[২৪২]

এই সিলেবাসে ব্যবহারিক শিল্প বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কমার্শিয়াল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, নকশা, ডেকোরেশন ও

[২৪২] চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষার (১৯৭৭) সিলেবাস, শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫–৭৬, উৎস : কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কমিউনিকেশন থ্রু আর্ট। ব্যবহারিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই কলেজের প্রসপেক্টাস থেকে। এর ভূমিকায় লেখা হয়েছে, 'ব্যবহারিক জীবনে শিল্পী যাতে পর্যুদস্ত না হয়, সে জন্য চারুকলা কলেজে ব্যবহারিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।'[২৪৩]

চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের ১৯৭৫–৭৬ সালের প্রি-ডিগ্রি এবং ডিগ্রি সিলেবাসের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পরবর্তীকালে তত্ত্বীয় বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকলেও ব্যবহারিক বিষয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ড্রইং ও অ্যানাটমি বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে ১৯৮১–৮২ সিলেবাসে ড্রইং করা হয়েছে; পূর্ববর্তী সিলেবাসের নকশা ও ড্রাফটিং বিষয় দুটি ১৯৮১–৮২ সালের সিলেবাসে একটি কোর্সভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৭৫–৭৬ সালের সিলেবাসে উল্লিখিত ব্যবহারিক বিষয়ের দশটি পত্রের মধ্যে 'কমিউনিকেশন থ্রু আর্ট' বিষয়টি পরবর্তীকালে বাদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া 'গ্রাফিক ও ড্রইং' বিষয় থেকে গ্রাফিক্স বিষয়টি বাদ দিয়ে ১৯৮১–৮২ সালের সিলেবাসের দশম পত্রে ভাস্কর্য, সিরামিক ও গ্রাফিক্স, ডেকোরেশন বিষয়গুলো বিকল্প বিষয় হিসেবে রাখা হয়। এই সময়ের সিলেবাসের কম্পোজিশন বিষয়ে মূর্ত ও বিমূর্ত চিত্রের সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কম্পোজিন কোর্সের মাধ্যমে ডিগ্রি পর্যায়ে নিরীক্ষামূলক চিত্রচর্চার সুযোগ তৈরি হয়, যা ইতিপূর্বে ছিল না। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পশিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পশিক্ষার সুযোগ ছিল না। ১৯৮১–৮২ সালে সিলেবাসে আলোকচিত্র ও মুদ্রণ শিল্প শিরোনামে একটি নতুন কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। চারুকলা বিভাগের মূল লক্ষ্য ছিল সৃজনশীল শিল্পী সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে এখানে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ভাস্কর্য এবং ছাপচিত্র, যেগুলো সমকালীন আধুনিক শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম। এখানে শিল্পচর্চার স্বাধীনতা ছিল, যা আধুনিক শিল্পশিক্ষার জন্য অপরিহার্য। পক্ষান্তরে চারুকলা কলেজে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিষয়ে। সিলেবাসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, নকশা, ডেকোরেশন, কমিউনিকেশন থ্রু আর্ট, মুদ্রণ শিল্প, ড্রাফটিং— এ সকল ব্যবহারিক বিষয়ের আধিক্য থেকে সেটি বোঝা যায়।[২৪৪]

---

[২৪৩] "ভূমিকা", *প্রসপেক্টাস*, চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম, সময়কাল ও পৃষ্ঠা অনুল্লেখ

[২৪৪] "ভূমিকা", *প্রসপেক্টাস*, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ, প্রাগুক্ত

ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের বিএফএ ডিগ্রি সিলেবাসের সঙ্গে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের বিএফএ কোর্সের সিলেবাসের তুলনা করলে দেখা যায়, ঢাকা অপেক্ষা চট্টগ্রামের সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয়ের আধিক্য ছিল। ঢাকায় ১৯৬৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিএফএ পর্যায়ে দুটি তত্ত্বীয় কোর্স ছিল। কিন্তু এপর্যায়ে চট্টগ্রামে চারটি তত্ত্বীয় কোর্স রাখা হয়। আধুনিক শিল্পশিক্ষার জন্য অপরিহার্য 'শিল্প মাধ্যম' ও 'সৌন্দর্য তত্ত্ব' কোর্স দুটি চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সিলেবাসে ব্যবহারিক ও কারুশিল্প, চারুকলা এবং তত্ত্বীয় বিষয়—সব ধরনের বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছিল। যেখানে চারুকলা ও কারুকলার বাস্তবানুগ একাডেমিক এবং নিরীক্ষামূলক শিক্ষার সুযোগ ছিল। এ ছাড়া শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমের পরিচিত ও করণ-কৌশল এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে নান্দনিক বোধসম্পন্ন সৃজনশীল শিল্পী তৈরিতে সহায়ক ছিল এই সিলেবাস। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সিলেবাস ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থী প্রদানের একটি প্রি-ডিগ্রি কলেজ হিসেবে। কিন্তু শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যে কলেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। অনেক চড়াই-উতরাই, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালে কলেজটি সরকারি আর্ট কলেজে রূপান্তরিত হওয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে কলেজের মর্যাদা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটলেও শিক্ষকদের বদলিজনিত কারণে সৃষ্ট শিক্ষক সংকট, শিল্পী-অধ্যক্ষ না থাকা ইত্যাদি কারণে কলেজটি শিল্পশিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন সংকটের মধ্যে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি আর্ট ইনস্টিটিউট করা হয়।

শিল্পী রশিদ চৌধুরী যে স্বপ্ন নিয়ে চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছিল চারুকলা বিভাগ ও চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট হওয়ার মধ্য দিয়ে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম আধুনিক শিল্পের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়

বাংলাদেশের তৃতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। ইতিপূর্বে ঢাকা ও চট্টগ্রামে যে আর্ট কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রাজশাহীতে আর্ট কলেজ গড়ে উঠেছিল একজন স্বপ্নবাজ, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী তরুণ শিল্পী-শিক্ষক, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন চারুকলার একজন দুরন্ত ছাত্র আর সংস্কৃতিমনা একজন সাংবাদিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে। এই কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তরুণ শিল্পী এবং চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সাবেক শিক্ষক বনিজুল হক (১৯৪৮–২০১৮)। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজশাহী আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সমর্থন আদায় করার কঠিন কাজটি করেছিলেন চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের ছাত্র রাজশাহী নিবাসী মো. আসাদুল ইসলাম। আর আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠায় স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। রাজশাহীতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শুরু থেকে শামিল হয়েছিলেন শিল্পী তরুন ঘোষ (জন্ম : ১৯৫৩) ও শিল্পী কাজী রকিব (জন্ম : ১৯৫৫)।

রাজশাহীর প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এই অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। যার মাধ্যমে এই অঞ্চলে শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল। রাজশাহী অঞ্চল প্রাচীনকালে পুণ্ড্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান রাজশাহী শহরের অদূরে নওগাঁয় অষ্টম শতকের শেষভাগ থেকে নবম শতকের প্রথমভাগে গড়ে ওঠা সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে শিল্পচর্চা ছিল নিষ্কাম ধর্মসেবা। এ কারণে বৌদ্ধযুগে গড়ে ওঠা বিহার-মহাবিহারগুলোতে জ্ঞান ও শিল্পচর্চার ব্যবস্থা ছিল।[২৪৫] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ১৯১০ সালে রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো প্রাচীন মূর্তি, চিত্রকর্মসহ আলংকারিক শিল্প নিদর্শন। ব্রিটিশ আমলে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয় বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮২৮) মাধ্যমে; স্কুলটি কলেজিয়েট স্কুলে (১৮৩৬) উন্নীত হওয়ার পর এখানে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই স্কুলে চারুকলার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন দীনেশ সান্যাল।

---

[২৪৫] "ভূমিকা", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. xvi

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে এখানে চারুকলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে চিত্রকলা ও কারুশিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত ফজলুর রহমান। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে স্কুলের বারান্দায় সপ্তাহে এক দিন শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন শেখাতেন।[২৪৬] এরপর রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৯৫৫) পর সেখানে চারুকলা বিষয়ের প্রভাষক পদে যোগদান করেন ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস-এর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী আমিনুর রহমান। দেশ স্বাধীনের পূর্বে রাজশাহী প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ইন্‌স্ট্রাক্টর হিসেবে যোগদান (১৯৬৯) করেন আশফাকুল আশেকীন। এ ছাড়া আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এম এ কাইউম, তফাজ্জল হোসেন প্রমুখ শিল্পীর অবস্থান ছিল রাজশাহীতে। এ সকল শিল্পীর উদ্যোগে রাজশাহীতে শিল্পকলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়। রাজশাহীতে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।

১৯৬৮ সালে রাজশাহীতে শিল্পী এম এ কাইউম ও শিল্পী আশফাকুল আশেকীনের যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।[২৪৭] এখানে অবস্থিত শিল্পীদের শিল্পকলা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজশাহীতে শিল্পচর্চার ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই শিল্পীরা রাজশাহীতে একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়টি অনুভব করেছিলেন, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে দেশ স্বাধীনের পূর্বে সেটি সম্ভব হয়নি।

দেশ স্বাধীনের পর মুক্ত পরিবেশে শিল্পশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আর্ট কলেজ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কয়েকজন তরুণ শিল্পী; যাঁদের মধ্যে বনিজুল হক অন্যতম। তিনি চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন ১৯৭৫ সালে। সেখানে কর্মরত ছিলেন ১৯৭৮ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। সেখানে থাকা অবস্থায় ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে রাজশাহীতে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেন এবং তাঁর ছাত্র আসাদুল হককে রাজশাহীতে পাঠান সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সমর্থন আদায় করার জন্য। এ সময় চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের কতিপয় সহকর্মীর সঙ্গে বনিজুল হকের মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আর্ট কলেজ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৮ সালের মে/জুন মাসে তিনি চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের চাকরি ছেড়ে ঢাকায় এসে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি গ্রহণ করেন।[২৪৮] ঢাকায় এসে তিনি আর্ট কলেজের শিক্ষক ও সদ্য পাস করা কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে নতুন আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করলে তাঁরা সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রাজশাহীতে আর্ট

[২৪৬] আশফাকুল আশেকীন, "ধূসর স্মৃতির আখ্যান", *সোনার দেশ*, রাজশাহী সংখ্যা, ২০২২, পৃ. ১০৬
[২৪৭] আশফাকুল আশেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
[২৪৮] শিল্পী বনিজুল হকের সহধর্মিণী সামশুন নাহারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ২১.৩.২০২২

কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর সহযাত্রী হতে রাজি হন ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে পাস করা উদীয়মান শিল্পী তরুন ঘোষ এবং চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ থেকে পাস করা কাজী রকিব।[২৪৯] এ প্রসঙ্গে কাজী রকিব স্মৃতিচারণামূলক এক লেখায় উল্লেখ করেছেন,

> সময়টা ১৯৭৮ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর হবে। অফিস শেষ করে নিয়মিত আড্ডা তরুণ, নজরুলের সঙ্গে ঢাকা আর্ট কলেজে, মোল্লার দোকানে চা খাওয়া রাত ৯টা অবধি। তরুণ, নজরুলকে জানালাম বণিজ ভাইয়ের প্রস্তাব। আমরা তিনজনেই উৎসাহী। কয়েকদিন পর বণিজ ভাই এলেন আর্ট কলেজে আমার সঙ্গে। ইতোমধ্যে আমার কাছ থেকে তিনি জেনে গেছেন তরুণ, নজরুলের আগ্রহের কথা। বণিজ ভাই উদ্দীপ্ত। আমাদের তিনি এই নতুন সংগ্রামের সাথী হিসেবে পেয়ে আনন্দিত।[২৫০]

অন্যদিকে আসাদ রাজশাহীতে গিয়ে শহরের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজশাহী শহরের কিছু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন; যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দৈনিক বার্তার সম্পাদক কামাল লোহানী। এ প্রসঙ্গে কামাল লোহানী এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, "এমনি একদিনে আসাদ এলেন এবং বললেন, 'বনিজ স্যার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন রাজশাহী আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ নিয়ে।' ওকে নিরুৎসাহিত করতে চাইলাম প্রথমে কিন্তু আসাদ নাছোড়বান্দা।"[২৫১]

এরপর কামাল লোহানীর উদ্যোগে সোনাদীঘির পাড়ের বরেন্দ্র একাডেমির ছোট একটা কক্ষে শহরের সাংবাদিক, অধ্যাপক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং শিল্পানুরাগী সংস্কৃতিকর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয় ১৯৭৮ সালের ৮ নভেম্বর।[২৫২] সভায় রাজশাহীতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কামাল লোহানীকে সভাপতি এবং এম এ কাইউমকে সম্পাদক করে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির পরবর্তী সভা বসে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পাঠাগারে ড. মোখলেসুর রহমানের তত্ত্বাবধানে। রাজশাহী শহরের আরো কয়েকজন সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদসহ গুণীজন সম্পৃক্ত হন এই উদ্যোগের সঙ্গে। এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৭৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনে আর্ট কলেজ

---

[২৪৯] শিল্পী তরুন ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ১৫.৩.২০২২

[২৫০] কাজী রকিব, "শিল্পের ফেরিওয়ালা শিল্পী বনিজুল হক", আবুল আসিফ মার্শাল (সম্পা.), *প্রতিভাস*, ঢাকা, শিল্পী বনিজুল হক স্মরণ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "নজরুলের একটু দ্বিধা ছিল। কারণ নজরুল তখন ঢাকাতে ভালো চাকরি করতেন। এ কারণে তিনি পরে রাজশাহীতে যাওয়ার মত পরিবর্তন করেন।"

[২৫১] কামাল লোহানী, "চারুকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ শিল্পী বনিজুল হক" আবুল আসিফ মার্শাল (সম্পা.), *প্রতিভাস*, ঢাকা, শিল্পী বনিজুল হক স্মরণ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪

[২৫২] মনিরুল ইসলাম নান্টু, "এক নজরে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়", মোস্তারুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, এ্যারাসেস, ২০০১, পৃ. ১৪

উদ্বোধন করা হবে। সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরবর্তী সভা রাজশাহী পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আর্ট কলেজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক করণীয় সবার সামনে তুলে ধরা হবে।[২৫৩]

ইতিমধ্যে বনিজুল হক ঢাকা থেকে রাজশাহীতে চলে আসেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালার পরিচালক মনসুর আহমদ খান ও শিল্পী এম এ কাইউমের সহযোগিতায় কলেজের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক করণীয় নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত দিনে পৌর মিলনায়তনে সভা অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভার চেয়ারম্যান এমরান আলী সরকারের সভাপতিত্বে। এই সভায় প্রতিষ্ঠিতব্য কলেজ পরিচালনার জন্য একটি গভর্নিং বডি গঠন করা হয় এবং বনিজুল হককে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গভর্নিং বডির সভাপতি হলেন কামাল লোহানী, সম্পাদক এম এ কাইউম, কোষাধ্যক্ষ মীর্জা আব্দুর রশীদ, সহসভাপতি অধ্যাপক একরামুল হক ও অ্যাডভোকেট মোহসীন খান; সদস্য শিল্পপতি মকবুল আহমেদ, অধ্যক্ষ এলতাসউদ্দীন, ড. মোখলেসুর রহমান, অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান, বদিউজ্জামান টুনু, কলেজ পরিদর্শক (কলেজ) শামসুল হক কোরায়শী ও অধ্যাপক রওশন আরা। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে ২৯ ডিসেম্বরে আর্ট কলেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।[২৫৪] এ উপলক্ষ্যে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সেমিনার এবং দেশের বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

বনিজুল হক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর কলেজের রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেন। কলেজের কারিকুলাম, সিলেবাস কেমন হবে, শিক্ষক হিসেবে কাদের নিয়োগ দেওয়া যাবে সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী আবুল বার্‌ক আল্‌ভী তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন।

২৯ ডিসেম্বর বিকেলে এক আনন্দঘন পরিবেশে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে এসেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে একদল শিক্ষক-শিল্পী ও শিল্প সমালোচক রাজশাহীতে এসেছিলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিল্পী জুনাবল ইসলাম, হাশেম খান, রফিকুন নবী, কেরামত মাওলা, আলী আযম, আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, মাহবুবুল আমীন, আব্দুস সাত্তার; তত্ত্বীয় শিক্ষক বুলবন ওসমান, আব্দুল

---

[২৫৩] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", মোস্তারুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, এ্যারাসেস, ২০০১, পৃ. ১৯

[২৫৪] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মতিন সরকার; শিল্প সমালোচক নজরুল ইসলাম প্রমুখ। একই সঙ্গে এসেছিলেন তরুন ঘোষ ও কাজী রকিব।[২৫৫]

চিত্র-৬০ : রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান, উৎস : আবুল আসিফ মার্শাল

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত করতে এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের আর্ট টিচার আমিনুর রহমান, রেশম শিল্প কর্পোরেশনের শিল্পী সৈয়দ ফজলুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আর্ট টিচার তফাজ্জল হোসেন, পুস্তক ব্যবসায়ী ও শিল্পী আবু তাহের, নওগাঁ পিটিআইয়ের আর্ট টিচার আশফাকুল আশেকীন এবং ঢাকা আর্ট কলেজের সিনিয়র ছাত্র আবু তাহের প্রমুখ।

রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কামাল লোহানী তাঁর সাগরপাড়ার শিবতলার বাসার একটি কক্ষ ছেড়ে দেন। সেখানে অবস্থান করে বনিজুল হক কলেজের প্রস্তুতিমূলক কাজ করতেন। উদ্বোধন ঘোষণার পর ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে এখানে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন কাজী রকিব ও তরুন ঘোষ। যোগদানের কয়েক দিন পর তরুন ঘোষ ঢাকায় ফিরে যান তাঁর পূর্ববর্তী চাকরি 'হিড বাংলাদেশ' থেকে চূড়ান্ত ইস্তফা

[২৫৫] কামাল লোহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১, ২২

প্রদানসহ যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এ সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে তিনি রাজশাহীতে চলে আসেন জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে।[২৫৬]

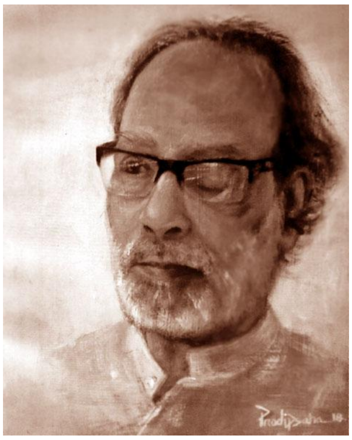

শিল্পী বনিজুল হক
অধ্যক্ষ

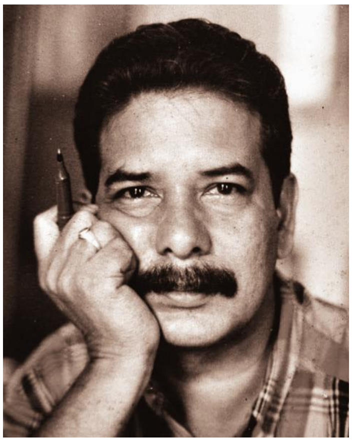

শিল্পী তরুন ঘোষ
প্রভাষক

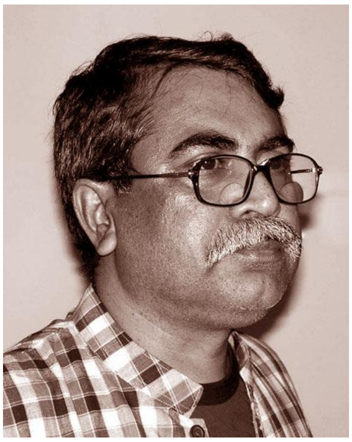

শিল্পী কাজী রকিব
প্রভাষক

চিত্র-৬১ : রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও প্রভাষকবৃন্দ

বনিজুল হকের অধ্যক্ষতায় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের এমএড ভবনের দুটি কক্ষে। তৎকালীন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ এলতাসউদ্দীনের বদান্যতায় কক্ষ দুটি সাময়িক বরাদ্দ পাওয়া যায়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের চারু ও কারুকলা বিভাগের কিছু শিক্ষা সরঞ্জামও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেখানে চারজন শিক্ষক এবং ত্রিশজন শিক্ষার্থী (পাঁচজন ছাত্রীসহ) নিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি কলেজের প্রথম ক্লাস শুরু হয়।[২৫৭] প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন কাজী রকিব। প্রতিষ্ঠাকালীন এই চারজন শিক্ষক হলেন অধ্যক্ষ বনিজুল হক, প্রভাষক তরুন ঘোষ, কাজী রকিব এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক মনসুর আহমদ খান। দুই মাস পরে প্রভাষক হিসেবে আরো যোগদান করেন ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে বিএফএ উত্তীর্ণ সমীর কুমার দত্ত।[২৫৮] এ বছর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন রাজশাহী রেশম শিল্প কর্পোরেশন থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শিল্পী সৈয়দ ফজলুর রহমান এবং

---

[২৫৬] শিল্পী তরুন ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত; শিল্পী কাজী রকিবের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০২২

[২৫৭] কাজী রকিব, "শিল্পের ফেরিওয়ালা শিল্পী বনিজুল হক", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[২৫৮] শিল্পী কাজী রকিবের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, প্রাগুক্ত; শিল্পী তরুন ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক সুরাইয়া বেগম।[২৫৯] সৈয়দ ফজলুর রহমান শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে কারুশিল্পের ওপর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এ সময় শাহাদাত আলী বাদশাকে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়ক এবং উমাপদ রায়কে অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন মো. আসাদুল ইসলাম, কিবরিয়া কাজী, মাসুদা কাজী, মুস্তারুল ইসলাম, হায়দার আলী, শামসুল হক আজাদ প্রমুখ।[২৬০] ১৯৭৮–৭৯ শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রায় ছয় মাস পরে কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে এখানে ভাস্কর্য বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে প্রণব কুমার দাস যোগদান করেন।[২৬১] তিনি চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ১৯৮১ সালে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত (Affilited) হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে প্রথম ব্যাচের প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[২৬২]

চিত্র-৬২ : রাজশাহী বি.এড কলেজ ভবন; এই ভবনের নিচতলায় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়, উৎস : আবুল আসিফ মার্শাল

---

[২৫৯] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", প্রাগুক্ত পৃ. ২৫। তিনি উল্লেখ করেছেন 'প্রতিষ্ঠার পর মনসুর আহমেদ খানকে বাংলা ও সুরাইয়া বেগমকে ইংরেজি সাহিত্যের দায়িত্ব দেয়া হলো'; কাজী রকিবের সঙ্গে গবেষকের টেলিফোন আলাপ, তারিখ : ২৪ মার্চ ২০২২, তিনি জানিয়েছেন তাঁদের যোগদানের পরে ওই বছরই খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে সৈয়দ ফজলুর রহমান যোগদান করেন।

[২৬০] রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী কিবরিয়া কাজীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, তারিখ : ০৪.৩.২০২২; আবুল আসিফ মার্শালের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ২৫.৩.২০২২

[২৬১] প্রণব কুমার দাস, "আমার শিক্ষক", আবুল আসিফ মার্শাল (সম্পা.) *প্রতিভাস*, শিল্পী বনিজুল হক স্মারক সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩৫

[২৬২] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", প্রাগুক্ত পৃ. ২৭

১৯৮১–৮২ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজে বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ডিগ্রি কোর্সে এখানে ছয়টি বিভাগ অনুমোদিত হয়। বিভাগগুলো হলো : ১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ২. বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক শিল্প, ৩. প্রাচ্যকলা, ৪. ভাস্কর্য, ৫. গ্রাফিক আর্ট, ৬. কারুশিল্প ও মৃৎশিল্প।[২৬৩] পর্যায়ক্রমে এই বিভাগগুলো চালু করা হয়। এ সকল বিভাগে ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় বিষয় (নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও শিল্পকলার ইতিহাস) শিক্ষাদানের জন্য আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সময় বেশ কয়েকজন খণ্ডকালীন শিক্ষক তত্ত্বীয় বিষয়ে পাঠদান করেছেন। তাঁরা হলেন নন্দনতত্ত্বে অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, ইতিহাসে অধ্যাপক নূরুল হোসেন চৌধুরী ও অধ্যাপক ফারুক-উজ-জামান, সমাজবিজ্ঞানে ফরিদা বেগম রোজী প্রমুখ।[২৬৪] ১৯৮২ সালের ২৮ আগস্ট এখানে ছাপচিত্র বিভাগের প্রভাষক হিসেবে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পান মো. গোলাম ফারুক।[২৬৫] তিনি ঢাকায় চারু ও কারুকলা কলেজের প্রিন্টমেকিং বিভাগ থেকে ১৯৮০ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। যোগদানের পর তিনি বৃত্তি নিয়ে চীনে গিয়ে বেইজিংয়ের দ্য সেন্ট্রাল একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৫ সালে তিনি ছাপচিত্র বিষয়ে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন।

কলেজে শ্রেণিকক্ষের সংকট তৃতীয় ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পর চরম আকার ধারণ করে। শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে এ সময় দুটি কক্ষই শিক্ষার্থীদের ক্লাসের জন্য ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকরা বারান্দায় বসে অফিসের কাজ পরিচালনা করতেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অধ্যক্ষ এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে কলেজটি স্থানান্তরের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ভবন ভাড়া বা নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর কলেজের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান পায় কলেজ কর্তৃপক্ষ।[২৬৬] এরপর উদ্যোগ গ্রহণ করে জমি ক্রয় ও ভবন তৈরির। রাজশাহী শহর ও শহরতলির বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করে পছন্দনীয় স্থানে অধিক পরিমাণ জমি পাওয়া না যাওয়ায় অবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয় তারা। বিশ্বস্ত সূত্রে তারা জেনেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন রেললাইনের পাশে মেহেরচণ্ডী গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ জমি সুইজারল্যান্ডভিত্তিক একটি সংস্থাকে অ্যাগ্রিকালচার প্রজেক্টের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

---

[২৬৩] "সিলেবাস", চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, রাজশাহীর ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষ, উৎস : অধ্যাপক ড. এস এম জাহিদ হোসেন, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[২৬৪] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[২৬৫] শিল্পী মো. গোলাম ফারুকের রাজশাহী চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ছাপচিত্র বিষয়ে এডহকভিত্তিক সার্বক্ষণিক প্রভাষক পদে যোগদান পত্র, অধ্যক্ষ বনিজুল হক কর্তৃক স্বাক্ষরিত, তারিখ : ২৮.৮.১৯৮২

[২৬৬] কামাল লোহানী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬

প্রজেক্ট শেষ হওয়ায় জায়গাটি খালি পড়ে আছে।[২৬৭] উল্লিখিত জায়গা থেকে দশ বিঘা জমি আর্ট কলেজের নামে বরাদ্দের জন্য আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী জমি বরাদ্দ করে। জমিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এ রকিব, উপ-রেজিস্ট্রার নাজিম মাহমুদসহ বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও কর্মকর্তা সহযোগিতা করেছিলেন।[২৬৮] ১৯৮৩/৮৪ সালে সেখানে কলেজের নিজস্ব একতলা ভবন নির্মিত হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে নিজস্ব ভবনে নব উদ্যমে আর্ট কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।[২৬৯]

চিত্র-৬৩ : রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন (বর্তমান অবস্থা)
আলোকচিত্র : অধ্যাপক আব্দুস সোবহান হীরা

আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম তিন-চার বছর নিদারুণ আর্থিক সংকট থাকায় প্রথম পর্যায়ে এখানে নিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কলেজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান; কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়ে ফিরে এসে আর কলেজে যোগদান করেননি অথবা যোগদান করলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো চাকরি পাওয়ায় অন্যত্র চলে যান। সমীর কুমার দত্ত ১৯৮১ সালে এবং তরুন ঘোষ ১৯৮২ সালে ভারত সরকারের আইসিসিআর বৃত্তির অধীনে গুজরাটের বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। তরুন ঘোষ এমএফএ ডিগ্রি এবং দুই বছরের রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে লোকশিল্প বিষয়ে গবেষণা শেষে ১৯৮৭ সালে ফিরে আবার রাজশাহী আর্ট কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালে আর্ট কলেজ ছেড়ে

---

[২৬৭] শিল্পী তরুন ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২৬৮] মুহম্মদ এলতাসউদ্দীন, "বিন্দু থেকে বৃত্ত", মোস্তারুল ইসলাম (সম্পা.), *রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, এ্যারাসেস, পৃ. ৩১

[২৬৯] মনিরুল ইসলাম নান্টু, "এক নজরে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। এ ছাড়া এই সময়ের মধ্যে কলেজ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান প্রণব কুমার দাস।[২৭০] ইতিমধ্যে রাজশাহী ছেড়ে ১৯৮০ সালে ঢাকায় চলে যান কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম সংগঠক এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কামাল লোহানী। তিনি চলে যাওয়ার পর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার।

বিএফএ ডিগ্রি পর্যায়ে বিভাগভিত্তিক শিক্ষা চালু হওয়ায় এবং নতুন ভবনে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পর শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আরো শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় নতুন করে কিছু প্রভাষক পদ সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়া কয়েকজন শিক্ষক কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় কয়েকটি প্রভাষক পদ শূন্য হয়। এ সকল পদে ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে নয়জন শিক্ষক যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন চিত্রকলা বিষয়ে আবু তাহের (জন্ম : ১৯৫৬), প্রাচ্যকলায় উত্তম কুমার দে এবং প্রিন্টমেকিংয়ে নীরু পারভীন।[২৭১] ১৯৮২ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত গোলাম ফারুক চীন থেকে ফিরে একই সঙ্গে প্রভাষক পদে স্থায়ী ভিত্তিতে যোগদান করেন। এ পর্যায়ে যোগদানকৃত সকলেই ছিলেন ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে বিএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তাঁদের মধ্যে আবু তাহের যোগদানের কয়েক মাস পর ১৯৮৫ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে গুজরাটের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান এমএফএ ডিগ্রি করার উদ্দেশ্যে। এমএফএ ডিগ্রি লাভের পর তিনি ১৯৮৭ সালে আবার কলেজে যোগদান করেন। ১৯৮৪–৮৫ সালে প্রভাষক পদে যোগদান করেন ফয়েজ আহমেদ এবং তত্ত্বীয় (সমাজতত্ত্ব) প্রভাষক ফরিদা বেগম। পরবর্তীকালে তাঁরা কলেজ ছেড়ে চলে যান। ১৯৮৫ সালে ভাস্কর্য বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে আমানউল্লাহ এবং প্রিন্টমেকিং বিষয়ে গুলনাহার বেগম যোগদান করেন। তাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ থেকে বিএফএ অনার্স এবং এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। আমানউল্লাহ ১৯৮৮ সালে কলেজের চাকরি ছেড়ে চলে যান।[২৭২] ১৯৮৫/৮৬ সালের মধ্যে যোগদান করেন তত্ত্বীয় (শিল্পকলার ইতিহাস) প্রভাষক আমিনুল ইসলাম এবং মো. মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া প্রথম পর্যায়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সুরাইয়া বেগম চলে গেলে এখানে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করেছেন যথাক্রমে অধ্যাপক আলী আনোয়ার ও নাজিম মাহমুদ।

---

[২৭০] কামাল লোহানী, "রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং আজকের আয়োজন", প্রাগুক্ত পৃ. ২৮; শিল্পী তরুন ঘোষের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২৭১] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক আবু তাহেরের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, তারিখ : ২৩.৩.২০২২

[২৭২] শিল্পী আমানউল্লাহ এবং অধ্যাপক ড. গুলনাহার বেগমের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, যথাক্রমে তারিখ : ০৭.৪.২০২২ এবং ০৬.৪.২০২২

১৯৮৪ সালের দিকে কলেজটি চরম আর্থিক ও স্থান সংকট কাটিয়ে যে সময় একটু স্বস্তিদায়ক অবস্থানে উপনীত হয়, ঠিক তখন থেকে শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে আর্ট কলেজের শিক্ষকতা ছেড়ে চলে যান প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক কাজী রকিব।[২৭৩] আশাহতের বেদনা আর একরাশ হতাশা নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বনিজুল হক আর্ট কলেজ থেকে বিদায় নেন ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে।[২৭৪] ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন গোলাম ফারুক। প্রায় তিন বছর ভারপ্রাপ্ত থাকার পর অধ্যক্ষ পদে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।[২৭৫]

১৯৮৮–৮৯ সালে আর্ট কলেজে বেশ কয়েকজন শিক্ষক যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালের ৯ জুলাই মৃৎশিল্প বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে আব্দুল মতিন তালুকদার (জন্ম : ১৯৫৮) এবং তত্ত্বীয় প্রভাষক হিসেবে টি এম এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী (মাসুদ চৌধুরী, জন্ম : ১৯৬১) যোগদান করেন। মতিন তালুকদার ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ সালে মৃৎশিল্প বিষয়ে ডিপ্লোমা; পরবর্তীকালে চীনের বেইজিংয়ের Tsinghua University থেকে মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিষয়ে বিএফএ এবং ভারতের বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিষয়ে পোস্ট-ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে চিত্রকলা বিষয়ে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন।[২৭৬]

১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারি আর্ট কলেজে পাঁচজন প্রভাষক যোগদান করেন। তাঁরা হলেন : চিত্রকলা বিষয়ে সিদ্ধার্থ শঙ্কর তালুকদার (জন্ম : ১৯৫৭) ও ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা (জন্ম : ১৯৬১); ভাস্কর্য বিষয়ে মোস্তফা শরীফ আনোয়ার, বাণিজ্যিক বিভাগে এস এম জাহিদ হোসেন (জন্ম : ১৯৬২) এবং আজাদী পারভিন (জন্ম : ১৯৬৩)। এই পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকই ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর তালুকদার

---

[২৭৩] শিল্পী কাজী রকিবের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, প্রাগুক্ত

[২৭৪] শিল্পী বনিজুল হকের সহধর্মিণী সামশুন নাহারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[২৭৫] রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে শিল্পী মো. গোলাম ফারুকের যোগদান পত্র, স্মারক নং ৫৪৭ (৪), তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮

[২৭৬] প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন তালুকদার এবং প্রফেসর টি এম এম নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : যথাক্রমে ০৫-০৪-২০২২ এবং ০৬-০৪-২০২২

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী থেকে এবং মোস্তফা শরীফ আনোয়ার ও এস এম জাহিদ হোসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[২৭৭]

কলেজের পরিচালনা পরিষদসহ সংশ্লিষ্টরা এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাদানকল্প (Constituent) কলেজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রাজশাহীতে এলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসকের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রাজশাহী সার্কিট হাউসে এক বৈঠক করেন। সেখানে মন্ত্রী কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের ১৭০তম সভায় রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ করার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিত ১৯৮৯ সালের ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৮২তম সভায় আর্ট কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে অনুমোদিত হয়; সিদ্ধান্ত হয় তেরো সদস্যবিশিষ্ট একটি গভর্নিং বডি কলেজ পরিচালনা করবে।[২৭৮] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি, উপ-উপাচার্যকে সহসভাপতি এবং কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্যসচিব করে গভর্নিং বডি গঠন করা হয়। 'আর্ট কলেজের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আট কোটি সত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শ তিয়াত্তর টাকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠালে ১৯৮৯–৯০ অর্থবছরের আবর্তক খাত হতে কলেজের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনকে পনেরো লক্ষ টাকা বরাদ্দের নির্দেশনা দেয়। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশন কলেজের জন্য মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করে।[২৭৯] চাহিদার তুলনায় এত স্বল্প বরাদ্দের ফলে কলেজটি আবারও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। উপাদানকল্প কলেজ হওয়ার পরও কলেজের আর্থিক সংকট ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। কলেজের চাহিদা অনুযায়ী তখনো বরাদ্দ পাওয়া যেত না। আর্ট কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এ সময় আর্ট কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ইনস্টিটিউট করার দাবি ওঠে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

---

[২৭৭] অধ্যাপক ড. মোস্তফা শরীফ আনোয়ার, অধ্যাপক এস এম জাহিদ হোসেন ও অধ্যাপক ঋতেন্দ্র কুমার শর্মার কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, তারিখ : যথাক্রমে : ৬.৪.২০২২, ১২.৫.২০২২ এবং ১৩.৩.২০২২

[২৭৮] মনিরুল ইসলাম নান্টু, "এক নজরে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়", প্রাগুক্ত পৃ. ১৪–১৫

[২৭৯] মনিরুল ইসলাম নান্টু, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫

কলেজকে ইনস্টিটিউট না করে বিভাগ হিসেবে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সরাসরি অধীনে চলে আসে।

কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে রূপান্তরের ফলে এখানে উন্নত ও আধুনিক শিল্পশিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়। কলেজের অর্থনৈতিক সংকট দূরীভূত হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসিক সংকটের সমাধান হয়। এরপর চারুকলা বিভাগে স্নাতক সম্মান কোর্স এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএফএ কোর্স চালুসহ উচ্চতর পর্যায়ে এমফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা শুরু হয়। ২০১৫ সালে বিভাগটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র অনুষদে রূপান্তরিত হয়। এই পর্যায়ে চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ; মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগ এবং গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সমন্বয়ে চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস

রাজশাহী আর্ট কলেজের কোর্স কারিকুলাম ঢাকা এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের অনুরূপ ছিল। পাঁচ বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স। প্রথম দুই বছর প্রি-ডিগ্রি এবং পরবর্তী তিন বছর বিএফএ ডিগ্রি। বিএফএ ডিগ্রিতে ছয়টি বিভাগ অনুমোদিত ছিল।

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ২. বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক শিল্পকলা, ৩. প্রাচ্যকলা, ৪. ভাস্কর্য, ৫. গ্রাফিক আর্ট (ছাপচিত্র), ৬. কারুশিল্প ও মৃৎশিল্প। পরবর্তীকালে কারুশিল্প ও মৃৎশিল্প বিভাগ বিভক্ত করে স্বতন্ত্র বিভাগ করা হয়।

প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস

ক. তত্ত্বীয় :	১. (ক) বাংলা	- ৫০	১০০ নম্বর
	(খ) ইংরেজি	- ৫০	
	২. সভ্যতার ইতিহাস		১০০ নম্বর
			২০০ নম্বর

খ. ব্যবহারিক বিষয় (অঙ্কন ও নির্মাণ) :

১. মুক্ত হস্তাঙ্কন	১০০ নম্বর
২. আলোছায়া পর্যবেক্ষণ (বিভিন্ন মাধ্যম)	১০০ নম্বর
৩. পরিপ্রেক্ষিত	১০০ নম্বর

৪. জলরং (জড়জীবন, দৃশ্য এবং কম্পোজিশন)	১০০ নম্বর
৫. স্কেচ (পেনসিল এবং কালি কলম)	১০০ নম্বর
৬. বেসিক ডিজাইন ও লেটারিং (৫০+৫০)	১০০ নম্বর
৭. (ক) ছাপচিত্র (কাঠ খোদাই)	৫০ নম্বর
(খ) ভাস্কর্য	৫০ নম্বর
(গ) মৃৎশিল্প	৫০ নম্বর
(ঘ) কারুকলা	৫০ নম্বর
	৮০০ নম্বর

ক. তত্ত্বীয় ২০০ নম্বর + খ. ব্যবহারিক ৮০০ নম্বর = সর্বমোট ১০০০ নম্বর

১৯৮৫ সালের পর সিলেবাসের মানবণ্টনে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। ৭/(ক) ছাপচিত্র ও (খ) ভাস্কর্য বিষয়ে ৫০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর করে সর্বমোট ১২০০ নম্বর করা হয়।

রাজশাহী আর্ট কলেজের প্রি-ডিগ্রির এই সিলেবাস ছিল ঢাকায় আর্ট কলেজের প্রি-ডিগ্রির সিলেবাসের অনুরূপ।

বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাস

ক) তত্ত্বীয় : (সকল বিভাগের জন্য আবশ্যিক)

১. শিল্পকলার ইতিহাস (১ম পত্র)	১০০ নম্বর
২. শিল্পকলার ইতিহাস (২য় পত্র)	১০০ নম্বর
৩. সমাজতত্ত্ব	১০০ নম্বর
৪. নন্দনতত্ত্ব	১০০ নম্বর
	৪০০ নম্বর

খ. ব্যবহারিক : (অঙ্কন ও নির্মাণ)

৫. (ক) ড্রইং - ৫০ (সকল বিভাগের জন্য আবশ্যিক)	১০০ নম্বর
(খ) স্কেচ - ৫০ (সকল বিভাগের জন্য আবশ্যিক)	
বিভাগীয় ব্যবহারিক পাঁচটি বিষয়	৫০০ নম্বর

ক. তত্ত্বীয় ৪০০ নম্বর + ব্যবহারিক ৬০০ নম্বর = সর্বমোট ১০০০ নম্বর[২৮০]

[২৮০] "সিলেবাস", চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত, প্রাগুক্ত

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের বিষয়গুলো হলো স্কেচ, স্টিল লাইফ, কম্পোজিশন, ফিগার পেইন্টিং, পোর্ট্রেট স্টাডি ও ল্যান্ডস্কেপ; বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক চিত্রকলা বিভাগের নিজস্ব বিষয় হলো বুক কভার, লেটারিং, পোস্টার ডিজাইন, ইলাস্ট্রেশন, মনোগ্রাম, টেক্সটাইল ডিজাইন, প্যাকেজ ডিজাইন এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মধ্যে যেকোনো পাঁচটি বিষয়; কারুকলা বিভাগের নিজস্ব বিষয় ছিল ড্রাই প্রিন্টিং, বাটিক প্রিন্টিং, লেদার হোডিং, বেসিক ডিজাইন এবং টেক্সটাইল ডিজাইন। মৃৎশিল্প বিভাগের নিজস্ব বিষয় ছিল পটারির উপাদান, পটারি ডিজাইন—হুইল, গ্লেজিং ও ফায়ারিং, সিরামিক ভাস্কর্য ও বেসিক ডিজাইন। এ ছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় ছিল অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, গ্রাফিক ডিজাইন, ভাস্কর্য, প্রিন্টমেকিং, প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প এবং কারুকলা।[২৮১]

রাজশাহী আর্ট কলেজের সিলেবাস তৈরি হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের সিলেবাসের সংমিশ্রণে। রাজশাহী আর্ট কলেজের বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাসের সঙ্গে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের সিলেবাসের গঠন ও বিষয়ের সঙ্গে অধিক মিল রয়েছে। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের সিলেবাস ছিল বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত সিলেবাস, রাজশাহীতেও অনুরূপ। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাসের মতো রাজশাহীর সিলেবাসেও চারটি তত্ত্বীয় বিষয় ছিল। এ ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়েও চট্টগ্রামের সিলেবাসের সঙ্গে রাজশাহীর বিএফএ সিলেবাসের অধিক মিল রয়েছে। অন্যদিকে ঢাকার প্রি-ডিগ্রির সিলেবাসের অনুরূপ ছিল রাজশাহী আর্ট কলেজের প্রি-ডিগ্রির সিলেবাস। তবে বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজনে কিছুটা পার্থক্য ছিল।

রাজশাহী আর্ট কলেজ বাংলাদেশের তৃতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজটির উন্নয়ন হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে। ১৯৮৯ সালে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজে এবং ১৯৯৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এখানে স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিএফএ কোর্স চালুসহ উচ্চতর পর্যায়ে এমফিল ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ২০১৫ সালে বিভাগটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র অনুষদে রূপান্তরের মাধ্যমে সমকালীন আধুনিক শিল্পশিক্ষার একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিল্পশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল শিল্পচর্চা, শিল্পের শিক্ষকতা, ব্যবহারিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে, যা রুচিশীল সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

---

[২৮১] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ১৯৮৪ সালের প্রি-ডিগ্রির নম্বরপত্র এবং বিএফএ ডিগ্রির ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ সালের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের, ১৯৯০ সালের বাণিজ্যিক চিত্রকলা বিভাগের, ১৯৮৯ সালের কারুশিল্প বিভাগের এবং ১৯৯৪ সালের মৃৎশিল্প বিভাগের নম্বরপত্র

খুলনা আর্ট কলেজ

খুলনা আর্ট কলেজ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বর্তমান বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের স্মৃতি। ক্ষয়িষ্ণু মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের আশির দশকে আর্ট কলেজটি গড়ে ওঠে। কলেজটি প্রথমে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শশিভূষণ পালের নামে শুরু করা হয়। প্রাথমিক কার্যক্রম শুরুর দুই মাস পরে কলেজের নাম পরিবর্তন করে খুলনা আর্ট কলেজ রাখা হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে দৌলতপুরে বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্দু একাডেমি, মহসিন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, চতুষ্পাঠী, গুরু ট্রেনিং স্কুল, আয়ুর্বেদ স্কুল, মক্তব প্রভৃতি।[২৮২] ১৯০৪ সালে দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশায় শিল্পী শশিভূষণ পাল একটি আর্ট স্কুল গড়ে তোলেন; যার নাম দেন মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস। তাঁর নেতৃত্বে স্কুলটি দীর্ঘ একচল্লিশ বছর (১৯০৪–১৯৪৫) সুনামের সঙ্গে চলেছিল। তাঁর মৃত্যুর (১৯৪৬) পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরূপ পরিবেশের কারণে স্কুলটির ক্রমাবনতি শুরু হয়। দেশবিভাগের পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে স্কুলটি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। দেশ স্বাধীনের পর স্কুলটির দৈন্যদশা দেখে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক ব্যথিত হয়েছেন; স্কুলটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের তাগিদ অনুভব করেছেন।[২৮৩] কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। স্কুলটির সর্বশেষ অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. রফিউল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৩ সালে স্কুলটির স্থলে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[২৮৪] ১৯৮৩ সালের ৮ এপ্রিল মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের স্থলে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

---

[২৮২] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং ২০০১ [প্র. প্র ১৯১৪] পৃ. ৯৯

[২৮৩] মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অগ্রাণী, "মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস (১৯০৪–১৯৮৩)", টোকন ঠাকুর (সম্পা.), *ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী*, খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, ২০০৫, পৃ. অনুল্লেখ

[২৮৪] মো. শেখ সাদী ভূঁঞা, "খুলনা আর্ট কলেজকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পটভূমি", মো. শেখ সাদী ভূঞা (সম্পা.), *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ*, খুলনা চারুকলা স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ. ১৯৮

খুলনার জেলা প্রশাসক আব্দুর রহিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের স্থলে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আর্ট কলেজ বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও স্কুলের অধ্যক্ষকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির ১৫ মে তারিখের সভায় প্রস্তাবিত আর্ট কলেজের নাম 'শশিভূষণ আর্ট কলেজ' করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ড. রফিকুল আলমকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। ৩০ মের সভায় শশিভূষণ আর্ট কলেজে ১৯৮৩–৮৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত এবং শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রথমে একজন অধ্যক্ষ, দুজন প্রভাষক এবং তত্ত্বীয় বিষয়ের দুজন খণ্ডকালীন শিক্ষক নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৮৫]

ড. রফিকুল আলম
অধ্যক্ষ

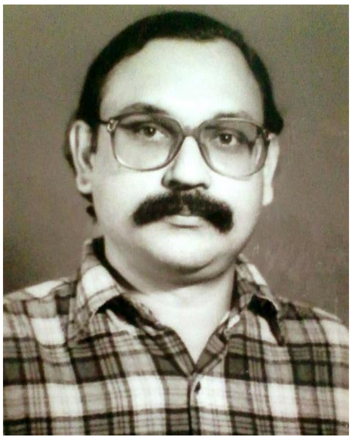

ফাউজুল কবির
প্রভাষক

চিত্র-৬৪ : খুলনা আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও প্রভাষক

এই সিদ্ধান্তের আলোকে আর্ট কলেজে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে ড. রফিকুল আলম এবং প্রভাষক হিসেবে ফাউজুল কবির যোগদান করেন। এ ছাড়া আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ এ সময় প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ড. রফিকুল আলম ছিলেন বাংলাদেশের চারুকলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভকারী। তিনি ১৯৭০ সালে ঢাকার সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি, ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৮৩ সালে ভারতের বেনারস হিন্দু কলেজ

[২৮৫] মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অঘ্রাণী, "মহেশ্বর পাশা স্কুল অব আর্টস (১৯০৪–১৯৮৩)", টোকন ঠাকুর (সম্পা.) *ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী*, খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ, ২০০৫, পৃ. অনুল্লেখ

থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[২৮৬] ফাউজুল কবিরও ঢাকার সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি খুলনার অধিবাসী ছিলেন এবং কিশোর বয়সে (১৯৬৪–৬৫ সালে) মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস থেকে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষে ফাউজুল কবির পাবনা ক্যাডেট কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্বে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তিনি ক্যাডেট কলেজের চাকরি ছেড়ে খুলনায় এসে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[২৮৭] আমিনউদ্দিন আহমেদ ১৯৫২–৫৬ সময়কালে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়ে ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাস থেকে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ভবনে শশিভূষণ আর্ট কলেজের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজের প্রচারপত্রে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

> দেশের শিল্প-সংস্কৃতির রূপায়ণই হলো সেই দেশের পরিচয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা প্রবহমান। ঐতিহ্যের বিন্যাসে প্রাচ্যের এই দেশের ঐতিহ্য শুধু বিশ্বের মানচিত্রেই নয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবগোষ্ঠীর মনেও সমানভাবে জাগ্রত। শিল্পক্ষেত্রে ঐতিহ্যের এই ধারার গতিকে ত্বরান্বিত করতে এবং চিরঞ্জীব করতে এগিয়ে এসেছিলেন শিল্পের অতন্দ্র প্রহরী—রায়বাহাদুর শশিভূষণ পাল। স্থাপন করেছিলেন ভৈরব নদীর তীরে একখানি ছোট গোলপাতার ঘরে চিত্রশিল্প বিদ্যালয়। প্রচুর সুখ্যাতি ও সাহায্য গোলপাতার ঘরকে উন্নীত করলো পাকা ভবনে। ... নাম হলো মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস। কালের যাত্রায় শুরু হলো এর মহাযাত্রা সেই ১৯০৪ সাল থেকে। কালের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে এবারে জন্ম নিল নতুন প্রতিষ্ঠান 'শশিভূষণ আর্ট কলেজ'। সোনালি সূর্যের প্রদীপ্ততায় ভাস্বর আর অনাগত কালের দাবির প্রতিজ্ঞায় অটল এই শশিভূষণ আর্ট কলেজ।[২৮৮]

প্রচারপত্রে শশিভূষণ আর্ট কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার রফিউল করিম এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আজাদ রহমান, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. এলতাসউদ্দীন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দ জাহাঙ্গীর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের নাম উল্লেখ করা হয়।[২৮৯] পরবর্তী সাংগঠনিক সভায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শিল্পী এস এম সুলতান

---

[২৮৬] ড. রফিকুল আলমের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে সংগৃহীত তথ্য, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[২৮৭] খুলনা আর্ট কলেজের সাবেক প্রভাষক ফাউজুল কবিরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা ১৫ মে ২০২২

[২৮৮] "প্রচার পত্র", শশিভূষণ আর্ট কলেজ, খুলনা, উৎস : অধ্যাপক সুশান্ত কুমার অধিকারী, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা আর্ট কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী।

[২৮৯] শেখর মন্ডল, "সময়ের প্রলাপ" টোকন ঠাকুর (সম্পা.), *ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী*, খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, ২০০৫, পৃ. ১৯০

এবং বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুখলেসুর রহমানকে যুক্ত করা হয়। খুলনার জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে আর্ট কলেজের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাস থেকে মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস ভবনে কলেজের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ আগস্ট থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়।[২৯০] ১৯৮৩ সালের ২৯ আগস্ট আর্ট কলেজের সাংগঠনিক কমিটির বিশেষ সভায় শশিভূষণ আর্ট কলেজের নাম পরিবর্তন করে খুলনা আর্ট কলেজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, ব্যক্তিগত নামে কলেজ চালু থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও অন্যান্য অসুবিধা হতে পারে। তবে শশিভূষণের কীর্তিকে অম্লান রাখার জন্য ভবিষ্যতে শশিভূষণ আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পূর্বনির্ধারিত ১ অক্টোবরের পরিবর্তে ঈদ-উজ-জোহার পর কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ক্লাস শুরু হবে। মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের স্বল্প পরিসরে কলেজ পরিচালনা করা কঠিন হওয়ায় এর পার্শ্ববর্তী ইস্পাহানী গ্রুপের কাছ থেকে আরো দশ বিঘা জমি দান হিসেবে নেওয়ার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠন করা হয়।[২৯১] কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী ইস্পাহানী গ্রুপের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পাওয়ায় কলেজটি বিকল্প কোনো স্থানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। অবশেষে বিভাগীয় কমিশনারের প্রচেষ্টায় গল্লামারীতে অবস্থিত খুলনা বেতারের পরিত্যক্ত ভবনে কলেজের কার্যক্রম স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর কলেজটি গল্লামারীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর এখানে কলেজটির উদ্বোধন করেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার রফিউল করিম।[২৯২] আর্ট কলেজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

> সময়ের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে শিল্পকলার কেন্দ্র, আর্ট স্কুল, কলেজ ও গবেষণামূলক আর্ট সেন্টার। আমাদের দেশে ৬টি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিপূর্বে দেশের অন্যান্য বিভাগে ৩টি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩ অক্টোবর আমাদের খুলনায় আর্ট কলেজটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে।[২৯৩]

---

[২৯০]. "প্রথমে শশিভূষণ আর্ট কলেজ : পরবর্তীতে রূপান্তরিত খুলনা আর্ট কলেজ নামকরণের প্রস্তাবনা", মো. শেখ সাদী ভূঞা (সম্পা.), *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত

[২৯১] "খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক খুলনা আর্ট কলেজের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন", মাযহারুল হান্নান (সম্পা.), *স্মরণিকা*, খুলনা আর্ট কলেজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ১৯৮৩, পৃ. অনুল্লেখ

[২৯২] প্রাগুক্ত

[২৯৩] খুলনা আর্ট কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী শেখর মণ্ডলের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : ৭ নভেম্বর ২০১৪; প্রতিষ্ঠাতা প্রভাষক ফাউজুল কবিরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

গল্লামারীর পরিত্যক্ত বেতার ভবনের একাংশে প্রথমে ক্লাস শুরু করা হয়। উদ্বোধনের পূর্বে ও পরে প্রথম ব্যাচে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশজনে।[২৯৪] প্রথম ব্যাচে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন শেখর মণ্ডল, ফাল্গুনী গাইন, সুশীল অধিকারী, ফিরোজ আহমেদ, মিতা চৌধুরী, জোহরা আক্তার, শামসুল আলম ফারুখ, লিয়াকত আলী, হবিবুর রহমান, ওবায়দুল হক, কামরুল হোসেন, শামীম আহমেদ কামাল, মো. মোহসীন, আলীমুজ্জামান তালুকদার, রোজিনা আনিস, শংকর বিশ্বাস প্রমুখ। দ্বিতীয় ব্যাচের চৌত্রিশ জন শিক্ষার্থীর নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন—অসিত কুমার মুখার্জী, অমিত কুমার দাশ, আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, আফসার উদ্দিন, আফরোজা বেগম, আফসানা পারভীন, উত্তর কুমার মণ্ডল, এ কে ফজলুল হক, এস এম মুরাদ হোসেন, কাজী রুবিনা খানম, কীরিটি রঞ্জন বিশ্বাস, কিশোর কুমার হালদার, খাজা জিয়াউদ্দিন আল-আজাদ, পরমানন্দ অধিকারী, অরুণ কুমার মিস্ত্রি, তপন কুমার রায়, দীপক কুমার মৃধা, দীলিপ কুমার মণ্ডল, নাসিমা হক, নিজামউদ্দিন, নিহার রঞ্জন ভদ্র, প্রশান্ত কুমার দাশ, প্রণব বিশ্বাস, প্রতিভা রাণী রায়, ভবতোষ মণ্ডল, মো. মুস্তাফিজুর রহমান, মো. মোস্তফা হামীম, মো. রফিকুল্লাহ্, রফিকুল ইসলাম, লায়লা বিলকিস বানু, শিবরঞ্জন মিস্ত্রি, সন্দীপ কুমার দে, প্রশান্ত কুমার গোলদার এবং স্বপন কুমার রায়।[২৯৫]

চিত্র-৬৫ : খুলনা রেডিও স্টেশনের পরিত্যক্ত ভবন, ১৯৮৩–১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানে খুলনা আর্ট কলেজের কার্যক্রম চলেছে, উৎস : শেখর মণ্ডল

---

[২৯৪] "খুলনা আর্ট কলেজ এবং মহেশ্বরপাশা স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের তালিকা", শেখ সাদী ভূঁঞা (সম্পা.) *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২৯৫] খুলনা আর্ট কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা, উৎস : চৈতন্যকুমার মল্লিক, সাবেক সহকারী অধ্যাপক, ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্লাস শুরু হওয়ায় পর এখানে প্রভাষক হিসেবে আরো যোগদান করেন ঢাকা থেকে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত রওশন আরা শামস জোৎস্না। শ্যামল কুমার দেবনাথ এবং পূর্ণানন্দ সরকারকে যথাক্রমে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাস পাঠদানের জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে ফাউজুল কবির ও রওশন আরা আর্ট কলেজের চাকরি ছেড়ে চলে গেলে নতুন প্রভাষক নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। ১৯৮৪ সালে এখানে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাস। কলেজটি প্রথম দুই-তিন বছর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে।[২৯৬] কলেজটি ১৯৮৪ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে কিছু আর্থিক অনুদান লাভ করে। কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় রাজশাহী আর্ট কলেজে প্রচলিত কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস এখানে প্রযোজ্য হয়। রাজশাহী আর্ট কলেজের মতো এখানে পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স চালু করা হয়। যার প্রথম দুই বছর প্রি-ডিগ্রি এবং পরবর্তী তিন বছর বিএফএ ডিগ্রি। বিএফএ ডিগ্রিতে ছয়টি বিভাগ অনুমোদিত হয়। বিভাগগুলো হলো—১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ২. বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক চিত্রকলা, ৩. প্রাচ্যকলা, ৪. ভাস্কর্য, ৫. গ্রাফিক আর্ট, ৬. কারুশিল্প ও মৃৎশিল্প বিভাগ।[২৯৭] শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যার কারণে প্রথম পর্যায়ে সকল বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রথম পর্যায়ে এখানে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ব্যবহারিক শিল্প এবং ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৮৬ সালের মধ্যে এখানে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত শাহানুর আলম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রিপ্রাপ্ত খন্দকার বদরুল ইসলাম; ১৯৮৭ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন বেবী সুলতানা, চৈতন্য কুমার মল্লিক এবং নিখিল রঞ্জন মিত্র। ওই বছর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ছাত্র অসন্তোষের কারণে ড. রফিকুল আলম অধ্যক্ষের চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। এরপর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বেবী সুলতানা। ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে ড. শাহরিয়ার তালুকদার অধ্যক্ষ হিসেবে আর্ট কলেজে যোগদান করেন। তিনি ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প ও আর্ট কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে পড়ে

---

[২৯৬] খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চারুকলা স্কুল'-এর সহকারী অধ্যাপক বেবী সুলতানার কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, তারিখ ১৪ জুলাই ২০২১; সাবেক সহকারী অধ্যাপক বিমানেশ চন্দ্র বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য, তারিখ : ১৯ মার্চ ২০২২

[২৯৭] "সিলেট", চারু ও কারুকলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩–৮৪, ১৯৮৪–৮৫, উৎস : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা আর্ট কলেজ ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে গেলে আবারও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বেবী সুলতানা।[২৯৮] এরপর ১৯৯১ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন মোহাম্মদ ইউনুস।

১৯৮০–৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে নানা প্রতিকূলতার কারণে নিয়মিত বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯০ সালের মধ্যে খুলনা আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৯০ সালে আয়োজিত দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার (শশিভূষণ রায় সাহেব পুরস্কার) : শেখর মন্ডল, নীহার রঞ্জন ভদ্র, বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, বিপ্লব সরকার, নাজমুল ইসলাম, সুশান্ত অধিকারী, মাহফুজুর রহমান, এম এ আজিজ; সান্ত্বনা পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন : বিপ্লব সরকার, ননী গোপাল রায়, সীমা রায় চৌধুরী; বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন সুশীল কুমার বিশ্বাস এবং রহিমা খাতুন। প্রদর্শনীটি ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল।[২৯৯]

খুলনা আর্ট কলেজ গল্লামারী ক্যাম্পাসে বেশ ভালোই চলছিল। খুলনা বেতারের বিস্তীর্ণ জায়গা থেকে আট একর সম্পত্তি আর্ট কলেজকে প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালে গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেতারের জায়গা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। খুলনার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্ট কলেজ বয়রাতে অবস্থিত রেসিডেন্সিয়াল ইংলিশ স্কুলের পরিত্যক্ত ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়, খুলনা আর্ট কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অ্যাক্ট, ৩১ জুলাই ১৯৯০ তারিখে প্রকাশিত ৫৪ নং আইন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯০-তে চারুকলা ইনস্টিটিউটের নাম যুক্ত করা হয়।[৩০০] এমন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গল্লামারী ক্যাম্পাস ছেড়ে আর্ট কলেজ বয়রাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯০ সালের ১১ আগস্ট গল্লামারীতে নতুনভাবে আর্ট কলেজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ।[৩০১]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯১ সালের নভেম্বর থেকে চারটি ডিসিপ্লিন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অবকাঠামোগত স্বল্পতাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে খুলনা আর্ট কলেজকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট হিসেবে গ্রহণের বিলম্বের কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষ দানা

---

[২৯৮] ক্যাটালগ, বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৯০, খুলনা আর্ট কলেজ, ১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০

[২৯৯] মো. তরিকত ইসলাম, "পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী শশিভূষণ পাল : বাংলাদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার স্বপ্নদ্রষ্টা" শেখ সাদী ভূঁঞা (সম্পা.), *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৬

[৩০০] মো. তরিকত ইসলাম, প্রাগুক্ত

[৩০১] "সম্পাদকীয় কথন", শেখ সাদী ভূঁঞা (সম্পা.), *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

বাঁধতে থাকে। আর্ট কলেজকে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট করার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলন চলেছে সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী ও প্রকাশনার মাধ্যমে। নানা প্রক্রিয়া শেষে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২০তম সিন্ডিকেট সভায় খুলনা আর্ট কলেজকে চারুকলা ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে ২০০৯ সালের ২২ মার্চ খুলনা আর্ট কলেজকে আত্তীকরণ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়। ইনস্টিটিউট হওয়ার পর থেকে এখানে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, প্রিন্টমেকিং এবং ভাস্কর্য—এই তিনটি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি বিএফএ অনার্স কোর্স এবং স্নাতকোত্তর এমএফএ কোর্স চালু করা হয়। সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসার মাধ্যমে এখানে সমকালীন গবেষণামূলক তত্ত্বীয় ও নিরীক্ষাধর্মী ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিল্পী শশিভূষণ পাল শতবর্ষেরও আগে মহেশ্বরপাশার নিভৃত পল্লীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার যে সূচনা করেছিলেন, সেই পুণ্যভূমিতে তার মৃত্যুর আটত্রিশ বছর পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমকালীন শিক্ষার পুনরুত্থান ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি কলেজ পর্যায়ের (১৯৮৩–২০০৯) ছাব্বিশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শক্তিশালী শিল্পশিক্ষার ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছেন। শিল্পকলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খুলনা শহরসহ এ অঞ্চলে মানুষের মাঝে শিল্পকলা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানকার শিক্ষার্থীর মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠে চারুকলার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন; তাঁরা সমকালীন সৃজন শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এ ছাড়া আর্ট কলেজ, আর্ট স্কুল এবং সাধারণ স্কুল-কলেজে শিল্পের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত থেকে শিল্পশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। কেউ কেউ বিজ্ঞাপনী সংস্থা, মুদ্রণশিল্পসহ ব্যবহারিক বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে রুচিশীল পণ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখছেন। আর্ট কলেজটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি অধীনে গিয়ে ইনস্টিটিউট, অতঃপর চারুকলা স্কুলে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমকালীন আধুনিক শিক্ষার সর্বোত্তম ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল দেশবিভাগের পর গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি আর্ট কলেজে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ দেশে কলেজ পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠানটি দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে শিল্পশিক্ষা ও সকল শিল্পান্দোলনে একক নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি আর্ট কলেজ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ; ১৯৭৮ সালে

তৃতীয় আর্ট কলেজ হিসেবে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং ১৯৮৩ সালে চতুর্থ আর্ট কলেজ হিসেবে খুলনা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ স্বাধীনের পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে ওঠা আর্ট কলেজগুলোর মাধ্যমে শিল্পশিক্ষা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে যায়। এখান থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার্থে ঢাকায় এবং বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ঢাকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ সকল কলেজে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছেন; পক্ষান্তরে বিভাগীয় শহরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতায় যোগদান করেছেন। জাতীয় স্বার্থে বা শিল্পীদের স্বার্থে সংঘটিত যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্যোগকে অন্য প্রতিষ্ঠান স্বাগত জানিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট। এভাবে আর্ট কলেজগুলোর পরস্পরের সঙ্গে একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। কলেজগুলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে উন্নত ও যুগোপযোগী করেছে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের শিক্ষা পদ্ধতি, কারিকুলাম ও সিলেবাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।

আর্ট কলেজগুলোর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একই ধরনের। তবে আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষকদের দক্ষতা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কারণে প্রতিটি কলেজের শিল্পচর্চায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের শিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কলেজগুলো তাদের শিল্পশিক্ষার সার্বিক উন্নতির জন্য এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউট অথবা চারুকলা বিভাগে পরিণত হয়েছে। এভাবে আশির দশকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজগুলো বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে সমকালীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার তৃতীয় পর্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষা

বাংলাদেশে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার পথ প্রসারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা বিভাগ বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সরাসরি চারুকলা শিক্ষার সূচনা হয়। এর তেরো বছর পর বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আর্ট ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি চারুকলা শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আরো কয়েকটি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০২১ সাল পর্যন্ত আটটি পাবলিক ও দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই গবেষণার সময়কাল ১৯৪৮–১৯৮৭ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এই অধ্যায়ে শুধু 'চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামে শিল্পশিক্ষার পটভূমি : দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে ১৯৭০ সালে রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা হয়। মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মধ্য দিয়ে এ দেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার সঙ্গে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চার বিষয়টি যুক্ত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিডিং ইনস্টিটিউট হিসেবে ১৯৭৩ সালে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে একীভূত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটে পরিণত হয়। চারুকলা বিভাগ ও আর্ট কলেজকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দশকের মধ্যে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশ আমলের শেষ পর্যায়ে চট্টগ্রামে কলেজিয়েট স্কুল ও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে অঙ্কন বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষ্ণলাল দাস ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে 'ড্রইং টিচার' পদে যোগদান করেন; একই বছরের আগস্ট মাসে তিনি চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুলে (প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৮) বদলি হন। দেশবিভাগের সময় তিনি ভারতে চলে গেলে তাঁর স্থলে আনোয়ারুল হক যোগদান করেন। ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার পর তিনি সেখানে যোগদান করেন। তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদে কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিন্তাহরণ মালো যোগদান করেন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিডস স্কুলে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে অঙ্কন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী প্রণব রায়।[১] শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁরা স্বল্পবিস্তর শিল্পচর্চাও করতেন। এসব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগে শিল্পশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা হয়েছিল, তবে শিক্ষার্থীর অভাবে তা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে ময়নুল আলমের উদ্যোগে কাজীর দেউড়ির দ্বিতীয় লেনের একটি বাসায় মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী নিয়ে চিটাগাং আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর অভাবে শুরুর চার-পাঁচ মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।[২]

---

[১] হাসি চক্রবর্তী, "চট্টগ্রামে শিল্পকলা ও শিল্পচর্চা", *রেখা ও লেখায়*, ঢাকা, মুক্তধারা, ২০১৩, পৃ. ৩৪–৩৫

[২] মোঃ জসিম উদ্দিন, "চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা চর্চার পঁয়তাল্লিশ বছর", *সেতু (ক্যাটালগ)*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পেইন্টিং গ্রুপ ও বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রিন্টমেকিং বিভাগের শিক্ষা ও শিল্প বিনিময় কার্যক্রম-২০১৩-এর চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, ভারত, নন্দন আর্ট গ্যালারি, ২০১৬

এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল এ অঞ্চলের অনেকের।

দেশবিভাগের আগে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন শিল্পী ভারতের বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী যোগেশ রায়, সুধীর খাস্তগীর (১৯০৭–৭৪), সোমনাথ হোড় (১৯২১–২০০৬) অন্যতম। সুধীর খাস্তগীর ভারতে লখনউ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন (যোগদান ১৯৫৬)।[৩] বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যের পথিকৃৎ ভাস্কর নভেরা আহমেদের (১৯৩৯–২০১৫) জন্ম চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে। তাঁরা সকলেই কর্মসূত্রে বা শিল্পচর্চার স্বার্থে চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তবে তাঁদের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি এ অঞ্চলের শিল্পানুরাগীদের অনুপ্রাণিত করত।

দেশবিভাগের আগে ও পরে চট্টগ্রামে শিল্পচর্চা ছিল মূলত বাণিজ্যনির্ভর। দেশবিভাগের আগে বাণিজ্যিক বা ব্যবহারিক শিল্পের চাহিদা মেটাতেন কৌলিক শিল্পীরা। দেশবিভাগের পর দ্রুত নগরায়ণের ফলে ব্যবহারিক শিল্পের রকমারি চাহিদা মেটাতে শহরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমার্শিয়াল আর্টিস্টের আগমন ঘটতে থাকে। ১৯৫৩ সালে আহমদ আলী নামে কলকাতা নিবাসী একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টের আগমন ঘটে চট্টগ্রামে। তিনি মূলত বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ফরমায়েশি কাজ, বিশেষ করে সিনেমার বিশাল আকৃতির হোর্ডিং এঁকে সর্বসাধারণের মাঝে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ফরমায়েশি কাজের অবসরে প্রকৃতি ও জনজীবনের ওপর কিছু সৃজনশীল চিত্রও এঁকেছিলেন।[৪] আহমদ আলীর সমগোত্রীয় আরো কয়েকজন তখন চট্টগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী সবিহ্-উল আলম লাহোরের ন্যাশনাল কলেজ অব আর্ট থেকে ১৯৬৩ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে ফিরে একটি প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠানে আর্ট ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তিনি বইপুস্তকের প্রচ্ছদ অঙ্কন, অলংকরণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মীদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি সৃজনশীল শিল্পচর্চাও করেছেন। চট্টগ্রামে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা।[৫]

---

[৩] হাসি চক্রবর্তী, রেখা ও লেখায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা-চর্চা", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, ঢাকা, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১০৬

[৫] ফয়েজুল আজিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

দেশ স্বাধীনের পূর্বে এখানে সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান ছিল, যার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঢাকার চারুশিল্পীদের। শিল্পানুরাগী এ সকল সংস্কৃতিকর্মী ও স্থানীয় সুধীজনদের সহযোগিতায় দেশ স্বাধীনের আগে চট্টগ্রামে একাধিক প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে চার দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়, সেখানে ঢাকা আর্ট গ্রুপের একটি চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।[৬] ১৯৬৮ সালে ঢাকার তরুণ শিল্পী গ্রুপ কারিকার একটি প্রদর্শনী হয় চট্টগ্রাম ক্লাবে। এই প্রদর্শনীর পর চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন একটি বাড়িতে চিটাগাং আর্ট সোসাইটি নামে একটি গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেটি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে শিল্পশিক্ষার সান্ধ্যকালীন কোর্সও চালু করা হয়েছিল।[৭] শিল্পবিষয়ক এ সকল কর্মকাণ্ড চট্টগ্রামের সচেতন নাগরিকদের চারুশিল্পের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিল; যা চট্টগ্রামে চারুশিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষার সূচনা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষার সূচনা হয় বাংলা বিভাগের সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত এখানে শুধু পাস কোর্সে মাস্টার্স ডিগ্রিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮–৬৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে স্নাতক সম্মান কোর্স চালু করা হলে সেখানে সাবসিডিয়ারি বিষয় পাঠ্য করা হয়। এ সময় বাংলা বিভাগে সম্মান কোর্স খোলা হলে সেখানে চারুকলা সাবসিডিয়ারি বিষয় করা হয়। এই চারুকলা বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ তত্ত্বীয়; এখানে নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার ইতিহাস পাঠ্য ছিল।[৮] চারুকলা বাংলা বিভাগের ঐচ্ছিক বিষয় করা সম্পর্কে অধ্যাপক ফয়েজুল আজিম বলেন, 'তখন কলা অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর জামাতা মাহমুদ শাহ কোরেশী ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক। তাঁরা দু'জনই ছিলেন শিল্পানুরাগী। চারুকলা বিষয় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের ইনফ্লুয়েন্স ছিল।'[৯] চারুকলা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য চারুকলা/নাট্যকলা শীর্ষক সিনিয়র লেকচারারের পদ সৃষ্টি করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের আগ্রহ এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে

---

[৬] সৈয়দ আজিজুল হক, জয়নুল আবেদিন, *সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[৭] হাসি চক্রবর্তী, "চট্টগ্রামে শিল্পকলা ও শিল্পচর্চা", *রেখা ও লেখায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৮] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা", *কালি ও কলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[৯] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ফয়েজুল আজিমের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, তারিখ: ১২ জুন ২০১৬

১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে শিল্পী রশিদ চৌধুরী সিনিয়র লেকচারার পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন ।[১০]

রশিদ চৌধুরী একটি দুঃখজনক ঘটনার শিকার হয়ে ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে চট্টগ্রামে এসেছিলেন । তিনি ১৯৬৪ সালে ফ্রান্স থেকে ফিরে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে ঢাকার আর্ট কলেজে এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত হন ।[১১] তাঁকে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই সময় তাঁর ফরাসি স্ত্রী থাকার বিষয়টি সরকারি মহলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁকে লেকচারার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় । কিন্তু জয়নুল আবেদিন তাঁর পুনর্নিয়োগের জন্য শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আবেদন করলে বিষয়টি পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয় (তারিখ : ৯ আগস্ট ১৯৬৭) এবং উক্ত পদে অন্য কোনো যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে রশিদ চৌধুরীকে নিয়োগদানে কোনো বাধা নেই মর্মে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় ।[১২] এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে তাঁকে পুনরায় এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং স্থায়ী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয় । এমন অবস্থার মধ্যে তিনি ১৯৬৭ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে প্যারিসে যান । কিন্তু তিনি যথাসময়ে না ফিরে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আরো এক মাসের ছুটি চেয়ে আবেদন করেন । ইতিমধ্যে তাঁর আবেদনকৃত লেকচারার নিয়োগের ইন্টারভিউ ডাকা হয় ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারিতে । কিন্তু তিনি তখন প্যারিসে থাকায় ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত হতে পারেননি । এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বিভাগ তাঁকে ১৯৬৭ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে এডহকভিত্তিক লেকচারার পদ হতে অব্যাহতি দেয় । তাঁর অব্যাহতির খবর তিনি প্যারিসে থাকাকালে শুনে ভীষণ ব্যথিত হয়েছিলেন । এ ঘটনার পর তাঁর আর কোনো সরকারি চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না । অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী ছিলেন রশিদ চৌধুরীর বন্ধু; তাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য একই সময়কালে (১৯৬৩–১৯৬৪) প্যারিসে ছিলেন । তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, রশিদ চৌধুরী এই দুঃখজনক ঘটনাটি প্যারিসে অবস্থানকালে তাঁকে (মাহমুদ শাহ কোরেশী) এবং প্যারিসের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের অবহিত করেন । ঘটনা শুনে তাঁরা রশিদ

---

[১০] ড. ফয়েজুল আজিম, “চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউট : একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস”, *ক্যাটালগ*, প্রদর্শনী চারুকলা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

[১১] Appointment of Mr. Rashid Hussain Choudhury as Lecturar in Oriental Arts, East Pakistan College of Arts & Crafts, Dhaka শীর্ষক নথি, তারিখ : ১ মার্চ ১৯৬৫, নথি নং এ-৭১, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[১২] ৯ আগস্ট ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্ট অংশ সংবলিত পত্র, কেবিনেট সেক্রেটারি রিয়াজউদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত, তারিখ : ১৪ জুলাই ১৯৬৭, উৎস : প্রাগুক্ত; উক্ত নথিতে রশিদ চৌধুরীর লেকচারার পদ থেকে চূড়ান্ত অব্যাহতির পত্র সংরক্ষিত আছে ।

চৌধুরীর নতুন কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর মাহমুদ শাহ কোরেশী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে প্যারিস থেকে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। রশিদ চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর কোরেশী কলা অনুষদের ডিন সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেন এবং বাংলা বিভাগের অধীনে একটি সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে 'চারুকলা' অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১৩] এভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে চারুকলা যুক্ত হয় এবং রশিদ চৌধুরী সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

রশিদ চৌধুরী ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত একজন মেধাবী শিল্পী। চিত্র, ভাস্কর্য, ট্যাপিস্ট্রি, মেজাইকসহ শিল্পকলার বিচিত্র মাধ্যমে তাঁর দক্ষতা ছিল। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নতুন পথের সন্ধান করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে শিক্ষা নেওয়ার (১৯৪৯–৫৪) পর ১৯৫৬–৫৭ সময়কালে স্পেন সরকারের বৃত্তি নিয়ে মাদ্রিদের সেন্ট্রাল এস্কুলা দেস বেলিয়াম আর্টি দ্য সান ফার্নান্দো থেকে ভাস্কর্যে এবং ১৯৬০–৬৪ সময়কালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিসের একাডেমি অব জুনিয়র অ্যান্ড বোজ আর্ট থেকে ফ্রেসকো, ভাস্কর্য ও ট্যাপিস্ট্রি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৮–৬০ এবং ১৯৬৫–৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষক ও প্রভাষক পদে ঢাকার আর্ট কলেজে কর্মরত ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় যে সকল তরুণ শিক্ষক ও শিল্পী ইউরোপ-আমেরিকায় শিল্পশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে পাশ্চাত্য আধুনিক ধারায় শিল্পচর্চার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক চিত্রকলার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রশিদ চৌধুরী। তাঁর সমসাময়িক অন্য শিল্পীরা তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে প্রধানত চিত্রকলা বেছে নিলেও রশিদ চৌধুরী ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। চিত্রকলার পাশাপাশি অবহেলিত কারুকলার কষ্টসাধ্য বয়নশিল্প বা ট্যাপিস্ট্রিকে বেছে নিয়েছিলেন চর্চার জন্য। তিনি কারুকলার বয়নশিল্পকে চারুকলার সৃজনশীল শিল্পের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

---

[১৩] অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশীর সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ৫ জুন ২০২০

চারুকলা বিভাগ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর রশিদ চৌধুরী উপলব্ধি করেন শুধু চারুকলার তত্ত্বীয় শিক্ষার মাধ্যমে চারুশিল্পের প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব হবে না। তত্ত্বীয় শিক্ষার সঙ্গে চারুকলার ব্যবহারিক শিক্ষারও প্রয়োজন। এ জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চারুকলা বিভাগ খোলার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা বিভাগের সহকর্মীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বাংলা বিভাগে তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭–২০২০), ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, নাট্যকার জিয়া হায়দার (১৯৩৬–২০০৮)-এর মতো সৃজনশীল শিক্ষকদের। এ ছাড়া সৈয়দ আলী আহসানের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ছিল। তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। তিনিও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৭০ সালের ১৭ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের তৎকালীন ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলা অনুষদের সভায় চারুকলা বিষয়ে 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট' কোর্স খোলার একটি সিদ্ধান্ত হয়। একই বছরের ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চারুকলা বিভাগ খোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৪] ১৯৭০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রশিদ চৌধুরী চারুকলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।[১৫] ওই বছরের নভেম্বর মাস থেকে তাঁর নেতৃত্বে চারুকলা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় কলাভবনের বাংলা বিভাগ সংলগ্ন একটি কক্ষে।[১৬] বিভাগ চালুর কিছুকাল পরে বাংলা বিভাগের নিচতলার ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষে বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয়। এ সময় জিয়া হায়দারও চারুকলা বিভাগে চলে আসেন। শুরুতে কেবল দুই বছর মেয়াদি এমএ ইন ফাইন আর্টস কোর্স চালু করা হয়। এর মধ্যে প্রথম বছর এমএ প্রিলিমিনারি এবং দ্বিতীয় বছর ছিল এমএ ফাইনাল। প্রথমে এখানে আর্ট কলেজ থেকে বিএফএ ডিগ্রি এবং সাধারণ কলেজ থেকে যেকোনো বিষয়ে ডিগ্রি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ ছিল। আর্ট কলেজ থেকে পাস করা পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের এখানে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে এমএ প্রথম পর্বে প্রিলিমিনারি কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[১৭] ১৯৭৪ সাল থেকে এখানে চারুকলায় বিএ সম্মান ডিগ্রি চালু হওয়ার পর সম্মান ডিগ্রি উত্তীর্ণদের জন্য এক বছরের এমএ কোর্স চালু করা হয়। সমগ্র বাংলার মধ্যে (বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রথমে এমএ ডিগ্রি চালু করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম চারুকলা বিষয়ে এমএফএ ডিগ্রি চালু করা হয়েছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৫৫ সালে।

---

[১৪] ড. ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট : একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", *ক্যাটালগ*, প্রাগুক্ত

[১৫] ড. শামসুল আলম, "অভিনন্দন চাটিগাঁর চারুকলা", সোমেন কান্তি দাস (সম্পা.), *স্মরণিকা*, চট্টগ্রাম চারুকলার ৪০ বছর উদযাপন পরিষদ, ২০১২

[১৬] ড. ফয়েজুল আজিম, প্রাগুক্ত

[১৭] শিল্পী মনসুর-উল করিমের সঙ্গে গবেষকের মুখোমুখি আলাপ, ঢাকা, তারিখ : ৯ জুন ২০২০

চিত্র-৬৬ : শিল্পী রশিদ চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ

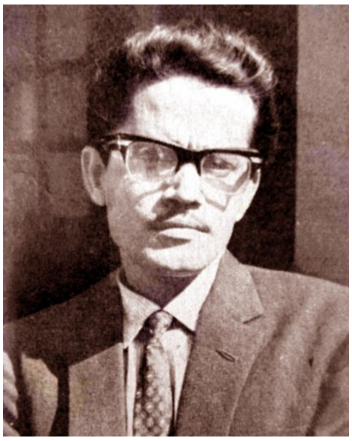

শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী

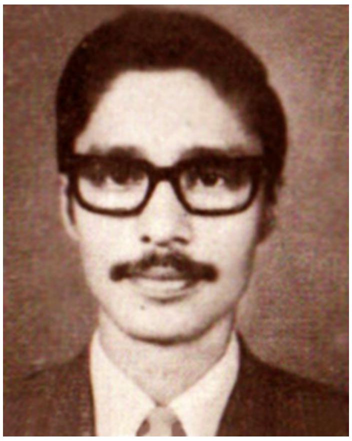

শিল্পী মিজানুর রহিম

শিল্পী মুর্তজা বশীর

চিত্র-৬৭ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে এখানে সিনিয়র লেকচারার পদে দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩–২০০৮) এবং লেকচারার পদে মিজানুর রহিম (১৯৪৬) যোগদান করেন।[১৮] দেবদাস চক্রবর্তী ১৯৫৬ সালে ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। একই প্রতিষ্ঠানের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ থেকে মিজানুর রহিম ১৯৬৮ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন সত্তরের দশকের অন্যতম প্রতিভাধর ছাপাই শিল্পী। ১৯৮০ সালে বেলজিয়ামের 'Royal Academy of Fine Arts' থেকে তিনি ছাপচিত্র বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মুর্তজা বশীর (১৯৩২–২০২০) চারুকলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন রশিদ চৌধুরীর সহপাঠী ও বন্ধু। ১৯৫৪ সালে তিনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ফাইন আর্ট বিভাগ থেকে পাঁচ বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ওই বছর তিনি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে পাঁচ মাসের আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করেন। ১৯৫৬–৫৮ সময়কালে ইতালির ফ্লোরেন্সের একাডেমি-দ্য-বেল আর্টি থেকে সার্টিফিকেট কোর্স করেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শিল্পচর্চার পাশাপাশি তিনি গল্প ও কবিতা লিখেছেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চারুকলা বিভাগে দুই-তিন বছরের মধ্যে বহুগুণে গুণান্বিত কয়েকজন শিক্ষকের আগমন ঘটেছিল। ১৯৭৪ সালে এখানে তত্ত্বীয় বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত আবুল মনসুর (১৯৪৭)। এ ছাড়া আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন নাট্যকার কামাল উদ্দিন নিলু।

চারুকলা বিভাগে প্রথম ব্যাচে সতেরোজন (মতান্তরে তেরোজন) শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন; যাঁদের মধ্যে তিনজন সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রি উত্তীর্ণ এবং অন্যরা ঢাকা চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে বিএফএ ডিগ্রি উত্তীর্ণ। আর্ট কলেজ থেকে এসেছিলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, কাজী গিয়াসউদ্দীন, মো. আনসার আলী, রফিকুল আলম, এনায়েত হোসেন, খায়রুল মোমেনিন, তাজুল ইসলাম, ফণীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ এবং সাধারণ কলেজ থেকে নাসিম বানু, শফিকুল ইসলাম, খালিকুজ্জামান প্রমুখ। শিক্ষার্থী ভর্তিসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে চারুকলা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের প্রথম পর্যায় থেকে। কিন্তু মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধের সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় বন্ধ ছিল। ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২–৭৩ শিক্ষাবর্ষে চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করিম, বনিজুল হক, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ ভর্তি হন। মুক্তিযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সেশনজটের কারণে চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করিমসহ

[১৮] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মিজানুর রহিমের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ৯ জুন ২০২০

ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে সদ্য ডিগ্রি উত্তীর্ণ আরো কয়েকজন ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে এসে ১৯৭২–৭৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন রশিদ চৌধুরীর সহযোগিতায়। ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত আব্দুস শাকুর শাহ, কে এম এ কাইয়ুম, শাহরিয়ার তালুকদার, অলক রায় এবং সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত নাজলী লায়লা মনসুর (তিনি এক বছর আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন), ফয়েজুল আজিম প্রমুখ।[১৯] তাঁদের মধ্যে অলক রায় ভর্তির দুই-তিন মাস পর আইসিসিআর বৃত্তি নিয়ে ভারতে চলে যান। ঢাকায় তখন চারুকলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্যে দুর্গম পরিবেশে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে ভর্তির ক্ষেত্রে রশিদ চৌধুরীর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আস্থা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। রশিদ চৌধুরী ছিলেন ঢাকা আর্ট কলেজের সাবেক শিক্ষক। তাঁর সাবেক শিক্ষার্থীদের তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন চট্টগ্রামে এসে নবগঠিত চারুকলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য। তখন ঢাকার চারু ও কারুকলা কলেজ দেশের একমাত্র আর্ট কলেজ হওয়ায় সেটিই ছিল প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী পাওয়ার একমাত্র স্থান। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে যেকোনো শিক্ষাবর্ষে পাস করা শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হতে পারতেন।

চিত্র-৬৮ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, এই ভবনে চারুকলা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়
আলোকচিত্র : অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন

প্রথম পর্যায়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসা এ সকল তরুণের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মেধাবী ও স্বাধীনচেতা। একাডেমিক ধারার বাইরে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চায় তাঁরা উদ্যোগী ছিলেন।

[১৯] ড. ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ : তথ্যপঞ্জি", সুব্রত বড়ুয়া রনি (সম্পা.), *সৃজন স্বজন সম্মিলন (স্মরণিকা)*, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন ২০০৩, পৃ. অনুল্লেখ। এখানে চারুকলা বিভাগের প্রথম ব্যাচে মোট ১৭ জন শিক্ষার্থীর উল্লেখ করা হয়েছে; আনসার আলী, "যাদুর কাঠি", সুব্রত বড়ুয়া রনি (সম্পা.), *সৃজন স্বজন সম্মিলন (স্মরণিকা)*, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন ২০০৩, পৃ. অনুল্লেখ। এখানে চারুকলা বিভাগের প্রথম ব্যাচে মোট ১৩ জন শিক্ষার্থীর উল্লেখ করা হয়ছে। উল্লেখ্য, আনসার আলী প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দ্রশেখর দে, কে এম এ কাইয়ুম, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করিম, বনিজুল হক প্রমুখ। তাঁরা ঢাকাকেন্দ্রিক 'পেইন্টার্স গ্রুপ' গঠন করেন এবং ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা চারু ও কারুকলা কলেজের গ্যালারিতে শিল্পী পাবলো পিকাসোর স্মরণে প্রদর্শনী করেন। প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তাঁরা উল্লেখ করেন, 'সকলের খুশি করার দায়িত্ব শিল্পীর নয়, উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর উপলব্ধি সাময়িকভাবে দুর্বোধ্য হতে পারে। তাই বলে তাকে গণমুখী নয় অথবা জনগণের শিল্পকলা নয় বলে অপবাদ দেওয়া যাবে না।'[২০] এই বক্তব্য ও প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত ধারার চিত্রে তাঁদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল।

রশিদ চৌধুরী চট্টগ্রামে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, সেখানে ইউরোপীয় আধুনিক সৃজনশীল শিক্ষার সঙ্গে লোকজ ও কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বয় ঘটেছিল। সেখানে তাঁর ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা, উদার মানসিকতা আর সহকর্মীদের অভিজ্ঞতারও সমন্বয় ঘটে। শিল্পশিক্ষাকে গবেষণাধর্মী শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে এখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক ছাত্র শিল্পী কে এম এ কাইয়ুম বলেন, 'এখানে শিক্ষকরা আমাদের স্বাধীনতা দিলেন এবং নিজস্ব স্টাইল তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তত্ত্বীয় বিষয়ের ওপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শিল্পকলার ইতিহাস, বেসিক ডিজাইন, নন্দনতত্ত্ব, নাট্যকলার ইতিহাস ছাড়াও ১০০ নম্বরের একটি গবেষণাধর্মী রচনা লিখতে হতো।'[২১] বেসিক ডিজাইন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বীয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শিল্পকলা সম্পর্কে সঠিকভাবে ভাবতে শেখায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল মনসুর বলেন, 'বেসিক আর্ট বিষয়টি রশিদ চৌধুরী শেখাতেন। সকল আর্ট যে একটি ডিজাইন; তার ফোকাল পয়েন্ট কী, লাইন কেমন হবে, রঙের ব্যাখ্যা ইত্যাদি; চিত্র যে একটা স্পেসের সমন্বয়, সেই জিনিসটা তিনি নানাভাবে শিক্ষার্থীদের বোঝাতেন।'[২২] নাট্যকলার তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয়ে ক্লাস নিতেন নাট্যকার জিয়া হায়দার। নাট্যকলা সংক্রান্ত অনেক বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নাট্যকলার ইতিহাস এবং নাটকের সেট ডিজাইন ও কস্টিউম ডিজাইনের ওপর মূলত শিক্ষা দেওয়া হতো।

প্রথম পর্যায়ে দূর-দূরান্ত থেকে যাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওই সময়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায়,

---

[২০] "ভূমিকা", *ক্যাটালগ*, পেইন্টার্স গ্রুপের পিকাসো স্মরণে চিত্র প্রদর্শনী, ঢাকা, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় গ্যালারি, তারিখ : ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৩

[২১] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শিল্পী কে এম এ কাইয়ুমের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, তারিখ : ১৩ জুন ২০১৬

[২২] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আবুল মনসুরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, তারিখ : ১৩ জুন ২০০৬

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা না থাকায় চট্টগ্রাম শহরে বেশ কষ্ট করে থাকতে হতো। চট্টগ্রামে ছবি আঁকার উপকরণ ছিল দুষ্প্রাপ্য। শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর বিশেষ সুযোগ ছিল না এবং লাইব্রেরিতে শিল্পকলা বিষয়ক বই ও জার্নালের সংগ্রহ ছিল সামান্য। চারুকলা বিভাগে পর্যাপ্ত তহবিল, স্থান এবং যন্ত্রপাতির অভাবের কারণে সিলেবাসভুক্ত অনেক বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতো না। যেমন—ম্যুরাল গ্রুপের ফ্রেসকো, মোজাইক, স্টেইন্ড গ্লাস, ট্যাপিস্ট্রি এবং প্রিন্টমেকিং গ্রুপের লিথোগ্রাফ, এচিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম দিকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে চারুকলা বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও প্রথম পর্যায়ে ভর্তি হওয়া বেশ কয়েকজন ছাত্র অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, কাজী গিয়াসউদ্দীন, চন্দ্র শেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর-উল করিম, আনসার আলী, কে এম এ কাইয়ুম, অলক রায় প্রমুখ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদ ১৯৭৩–৭৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে চারুকলা বিভাগে তিন বছর মেয়াদি বিএ (সম্মান) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়।[২৩] সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সম্মান কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে। সম্মান কোর্সের প্রথম ব্যাচে তিনজন শিক্ষার্থী ভর্তি হন। তাঁরা হলেন কাজী মাহমুদুর রহমান, সুমিতা আচার্য্য ও পরেশ মণ্ডল। সম্মান কোর্স উত্তীর্ণদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রির মেয়াদ ছিল এক বছর।[২৪] ১৯৭০ সাল থেকে প্রচলিত দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি (প্রিলিমিনারি) তখনো চালু ছিল। এই কোর্সে আর্ট কলেজ থেকে বিএফএ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এসে ভর্তি হতেন।

সম্মান কোর্সে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভর্তির সুযোগ ছিল। শিল্পী রশিদ চৌধুরীর পরিকল্পনা ছিল সম্মান কোর্সে চারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী ভর্তি করা। এ কারণে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরে একটি প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ের চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (১৯৭৩), যেখান থেকে প্রি-ডিগ্রি উত্তীর্ণের পর শিক্ষার্থীরা চারুকলা বিভাগের অনার্স কোর্সে ভর্তি হবেন। কিন্তু শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজটি প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ডিগ্রি আর্ট কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে সেই পরিকল্পনা পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয়নি।[২৫]

---

[২৩] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা বিভাগ : তথ্যপঞ্জি", *সৃজন স্বজন সম্মিলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখ

[২৪] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাসিমা আক্তারের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, চট্টগ্রাম, তারিখ : ১ মার্চ ২০২২

[২৫] ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা", *কালি ও কলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

সম্মান কোর্সে শিক্ষার্থীদের চারটি তত্ত্বীয় পত্র এবং ছয়টি ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) পত্র শিক্ষণীয় ছিল। তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস, প্রাচ্যশিল্পের ইতিহাস, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্পমাধ্যম এবং ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ভাস্কর্য ও ছাপচিত্রের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণীয় ছিল।

সম্মান কোর্সে সাবসিডিয়ারি বিষয়সমূহ ছিল—বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ইসলামের ইতিহাস।[২৬] প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার্থী স্বল্পতা ও স্থান সংকটের কারণে একত্রে ক্লাস হতো, বিষয়ভিত্তিক আলাদা ডিসিপ্লিন বা শাখায় শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করা হয়নি। ১৯৯৮–৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্মান কোর্স চার বছর মেয়াদি করা হয়। চার বছর মেয়াদি সম্মান কোর্স চালু হওয়ার পর বিভাগবহির্ভূত তত্ত্বীয়সমূহ বাদ দিয়ে চারুকলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো বিষয় সাবসিডিয়ারি হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রথম পর্যায়ে ভর্তি হওয়া বেশ কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সঙ্গে মাস্টার্স ডিগ্রি উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ও চট্টগ্রাম আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৫–৮০ সালে এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ (১৯৪৫–২০২০), আনসার আলী, মনসুর-উল করিম (১৯৫০–২০২১), নাসিম বানু ও শফিকুল ইসলাম।

হাসি চক্রবর্তী, চন্দ্র শেখর দে, বনিজুল হক, শাহরিয়ার তালুকদার, কে এম এ কাইয়ুম, ফয়েজুল আজিম, অলক রায় ও নাজলী লায়লা মনসুর প্রমুখ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে। চারুকলা কলেজের অনেক শিক্ষক পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে যোগদান করেন। যেমন অলক রায় ১৯৮০ সালে এবং ফয়েজুল আজিম ১৯৮১ সালে চারুকলা বিভাগে যোগদান করেন।[২৭] পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন সৈয়দ সাইফুল কবীর, মো. আল-মামুন (ঢালী আল-মামুন) ও ড. শাহরিয়ার তালুকদার। এ সকল শিক্ষকের কয়েকজন স্বল্প সময়ের মধ্যে উদীয়মান শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের প্রায় সবাই চট্টগ্রামে এসেছিলেন ঢাকার আর্ট কলেজ থেকে। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একাডেমিক শিক্ষার ভিত্তি আর চট্টগ্রামে এসে রশিদ চৌধুরীর দিকনির্দেশনা; যেখানে মুখ্য ছিল 'শিল্পচর্চার স্বাধীনতা' তাঁদের শিল্পী হিসেবে উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২৬] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের বিএ (সম্মান) কোর্সের সিলেবাস, শিক্ষাবর্ষ ১৯৭৫–৭৬, উৎস : কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৯১

[২৭] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক ড. ফয়েজুল আজিমের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

শিল্পী আবুল মনসুর

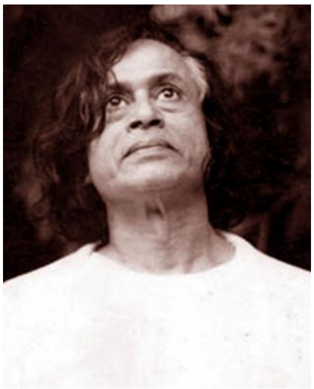

শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

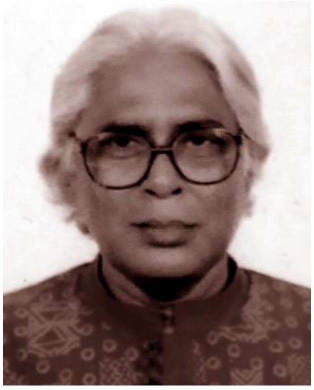

শিল্পী মনসুর-উল-করিম

শিল্পী শাহ মো. আনসার আলী

শিল্পী নাসিম বানু

শিল্পী ফয়েজুল আজিম

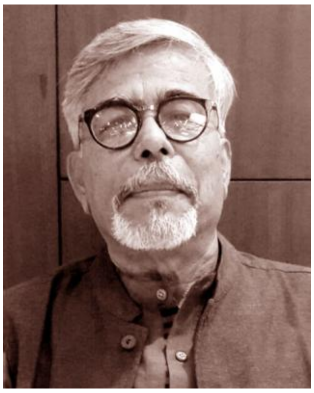

শিল্পী অলক রায়

চিত্র-৬৯ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে সত্তর ও আশির দশকে নিযুক্ত কয়েকজন শিক্ষক

সত্তরের দশক জুড়ে বাংলাদেশের নবীন শিল্পীদের মধ্যে তাঁদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। এ সময়ে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রদর্শনীতে অনেক পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁদের এই অবস্থানকে প্রমাণ করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে হাসি চক্রবর্তী চিত্রকলা মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, চন্দ্র শেখর দে ও মনসুর-উল করিম সম্মান পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে কে এম এ কাইয়ুম সম্মান পুরস্কার; ১৯৭৭ সালে হাসি চক্রবর্তী সকল বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং মনসুর-উল করিম সম্মান পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে জাতীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে মনসুর-উল করিম যথাক্রমে সম্মান পুরস্কার ও চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া ভাস্কর্য মাধ্যমেও তাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চট্টগ্রাম নিবাসী শিক্ষক ও শিল্পীদের মধ্যে অলক রায় টেরাকোটা ভাস্কর্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে ১৯৮৭ সালে সম্মান পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এ ছাড়া শাহ মো. আনসার আলী, নাজলী লায়লা মনসুর, বনিজুল হক প্রমুখ সৃজনশীল শিল্পচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।

চারুকলা বিভাগ ও চট্টগ্রাম আর্ট কলেজকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে চারুকলা সংক্রান্ত কার্যক্রম বৃদ্ধি পায় এবং সেখানকার নাগরিকদের মধ্যে শিল্প সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে সৃজনশীল শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও শিক্ষকতার সূত্রে চট্টগ্রামে অবস্থান করায় তাঁদের অধিকাংশের শিল্পকর্মে চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রচ্ছন্ন ছাপ পড়ে। তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন চট্টগ্রামের শিল্পী হিসেবে। মূলত এ সকল শিল্পীর কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশে আধুনিক চারুশিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে দেশ স্বাধীনের পরবর্তী এক দশকের মধ্যে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে তত্ত্বীয় বিষয় বেশ গুরুত্ব সহকারে পড়াতেন অধ্যাপক আবুল মনসুর ও অধ্যাপক ফয়েজুল আজিম। শিল্পের তাত্ত্বিক আলোচনা ও শিল্পবিষয়ক রচনার মাধ্যমে তাঁরা বাংলাদেশের শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

আশির দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়ে যে সকল কৃতী শিক্ষার্থী শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন পরেশ মণ্ডল, নাসিমা আক্তার, ঢালী আল মামুন, সৌমেন কান্তি দাস, রফিক সিদ্দিকী, মিনাক্ষী দে, নিলুফার চামান, দিলারা বেগম জলি, ওসমান পাশা, বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, দীপক দত্ত, সঞ্জীব দত্ত, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সুফিয়া বেগম, প্রণব মিত্র, জাহেদ আলী, সুদীপ্ত মল্লিক সুইডেন, শায়লা শারমিন, তাসাদ্দুক হোসেন দুলু, উত্তম কুমার বড়ুয়া প্রমুখ। শিল্পচর্চার পাশাপাশি শিল্পসংক্রান্ত তত্ত্বীয় বিষয়ক আলোচনা ও শিল্পবিষয়ক লেখালেখিতে চট্টগ্রামের শিক্ষকদের অবদান কম নয়।

রশিদ চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামে আধুনিক শিল্পচর্চার প্রধান পুরুষ। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর মতামতের বিপরীতে ভিন্ন মতাবলম্বী একটি গ্রুপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল চারুকলা বিভাগ ও বিভাগের বাইরে। এ কারণে তাঁর শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। প্রথমত আর্ট কলেজকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিডিং ইনস্টিটিউট হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পারেননি। দ্বিতীয়ত চারুকলা বিভাগকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে সেখানে আর্ট কলেজকে একীভূত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অসহযোগিতা এবং নানা বিপর্যয়ের ফলে সেটিও সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে তিনি ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ঢাকায় চলে যান।[২৮] তিনি ১৯৭০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর ও ১৯৭২ সালের ১ জুন থেকে ১৯৭৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৭৪ সালের ১ মে থেকে ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অবসরের আগেই দেবদাস চক্রবর্তী ১৯৭৭ সালে পোল্যান্ড সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ওয়ার্শো গিয়ে আর চট্টগ্রাম চারুকলা বিভাগে যোগদান করেননি।

চিত্র-৭০ : চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, আলোকচিত্র : গবেষক

রশিদ চৌধুরীর পর চারুকলা বিভাগের সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মুর্তজা বশীর। তিনি ১৯৭৭ সালের ১ মে থেকে ১৯৮০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর

[২৮] ড. ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রামে চারুকলা চর্চা", *কালি ও কলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

পর্যায়ক্রমে বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জিয়া হায়দার (১ মার্চ ১৯৮০–৫ অক্টোবর ১৯৮২), মিজানুর রহিম (৬ অক্টোবর ১৯৮২–৩১ আগস্ট ১৯৮৫), সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ (১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫–৩১ আগস্ট ১৯৮৮), আবুল মনসুর (১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮–১৯ জুলাই ১৯৮৯) প্রমুখ।[২৯] মুর্তজা বশীর, মিজানুর রহিম, আবুল মনসুর প্রমুখ সভাপতি আর্ট কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সমন্বয়ে একটি ইনস্টিটিউট করার চেষ্টা চালিয়ে যান। এ ব্যাপারে ১৯৮৩ সালের দিকে মুর্তজা বশীর ও আবুল মনসুর যৌথভাবে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।[৩০] অবশেষে ১৯৯৭ সালে চারুকলা বিভাগ ও চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে একটি ইনস্টিটিউট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারি প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির কথা বলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক উচ্চ আদালতে মামলা করায় এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনসহ নানা কারণে চারুকলা ইনস্টিটিউট বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। অবশেষে চট্টগ্রামে আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পী রশিদ চৌধুরীর আরাধ্য স্বপ্ন ধারণ করে ২০১০ সালের ২ আগস্ট থেকে চট্টগ্রাম শহরের প্রাক্তন সরকারি আর্ট কলেজের স্থানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট নব-উদ্যমে যাত্রা শুরু করে।[৩১]

এমএ (প্রিলিমিনারি) কোর্সের সিলেবাস : ১৯৭০ সালে চারুকলা বিভাগের মাস্টার্স ডিগ্রির ১৯৭০–৭১, ১৯৭১–৭২ শিক্ষাবর্ষের জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। সিলেবাসে পাঁচটি পত্র বা কোর্স শিক্ষণীয় ছিল। প্রতিটি পত্রের মান ছিল ১০০ অর্থাৎ প্রতিটি বর্ষে মোট নম্বর ৫০০। শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষে প্রমোশন দেওয়ার জন্য প্রথম বর্ষে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। প্রথম বর্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের প্রাপ্ত নম্বর বা ফলাফল যুক্ত হতো না। দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ডিগ্রি প্রদান করা হতো।

শিক্ষণীয় কোর্সগুলো হলো :

I. Survey of Visual Art
II. Oriental Art
III. Art Technique and their Development
IV. Dramatics এবং
V. Design (Applied)

প্রথম পত্র Survey of Visual Art-এ ৭৫ নম্বর ছিল ইতিহাসে এবং ২৫ নম্বর আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনে। এই পত্রে প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন এবং অন্যান্য এশিয়ান ও ইউরোপিয়ান সভ্যতার ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[২৯] বিভাগীয় প্রধান ও সভাপতিবৃন্দের নামের তালিকা বোর্ড, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উৎস : চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[৩০] শিল্পী মুর্তজা বশীরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৩১] ড. ফয়েজুল আজিম, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউট; একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখ

দ্বিতীয় পত্র Oriental Art-এ ইতিহাস ও আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ২৫ নম্বর ছিল। এখানে চীন, ইরান, তুর্কি, ইন্দো-পাক (মুঘল, রাজপুত্র, কাংরা, বাসুলি) এবং জাপানের শিল্পকলার ইতিহাস শিক্ষণীয় ছিল। আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনে দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব শিক্ষণীয় ছিল।

তৃতীয় পত্র Art Technique and their Development-এ পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ম্যুরাল শিল্পের করণ-কৌশলের তত্ত্বীয় ও স্টুডিওতে হাতে-কলমে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে তিনটি গ্রুপ ছিল :

১. পেইন্টিং গ্রুপের মধ্যে জলরং, তেলরং ও টেম্পারা; ২. প্রিন্টমেকিং গ্রুপের মধ্যে উডকাট, এচিং ও লিথোগ্রাফ এবং ৩. ম্যুরাল গ্রুপের মধ্যে ফ্রেসকো, মোজাইক, স্টেইন্ড গ্লাস ও ট্যাপিস্ট্রি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ পর্যায়ে পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ম্যুরাল যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতে হতো।

চতুর্থ পত্র Dramatics-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল; যার প্রতিটি ভাগে ৫০ নম্বর ছিল।

ক) স্টেজ এবং টেলিভিশন সেট ডিজাইন (ব্যবহারিক)

খ) স্টেজ ও অডিটরিয়াম সেট ডিজাইন এবং কস্টিউম, মেক-আপ, লাইটিং এবং বিভিন্ন ধরনের নাট্যমঞ্চের ডিজাইন।

পঞ্চম পত্র ছিল Design (Applied)। এখানে ডিজাইনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে তত্ত্বীয় ও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো।[৩২]

দ্বিতীয় বর্ষে Survey of Visual Art-এ সভ্যতার ইতিহাসের স্থলে গবেষণাধর্মী রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে রচনা লেখায় ছিল ৭৫ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ছিল ২৫ নম্বর। অন্যান্য কোর্স পূর্বের মতো ছিল। সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয়ের প্রাধান্য ছিল এবং ব্যবহারিক বিষয়গুলোর ওপর সামগ্রিক শিক্ষা দেওয়া হতো। স্থান, উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও অর্থাভাবে ফ্রেসকো, মোজাইক স্টেইন্ড গ্লাস ও ট্যাপিস্ট্রি শিক্ষা আলোর মুখ দেখিনি। একই অবস্থা ছিল প্রিন্টমেকিংয়ের ক্ষেত্রে, শুধু উডকাট বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দেশ স্বাধীনের পর মডেলিং বিষয়টি সিলেবাসে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে এসে সৃজনশীল কম্পোজিশনে গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রথম পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীই পেইন্টিং মাধ্যমে কম্পোজিশন করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো। শিক্ষকগণ আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন রেফারেন্স এবং নিজের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরে তাঁদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটাতে সহযোগিতা করতেন। এই

[৩২] Syllabus for Masters Degree in Fine Arts (1970–71, 1971–72), Syllabus University of Chittagong, Published by : University of Chittagong, Chittagong, 1970

সিলেবাস প্রণয়নে রশিদ চৌধুরীর চিন্তাধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। তবে সিলেবাস কমিটির সদস্য হিসেবে সৈয়দ আলী আহসান ও জিয়া হায়দারের পরামর্শও গুরুত্ব পেয়েছিল।[৩৩]

এ প্রসঙ্গে শিল্পী মনসুর-উল করিমের কাছ থেকে জানা যায়, ‘ওই সময়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের সক্ষমতা অনুযায়ী মাস্টার্স কোর্সে পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। যেমন : রশিদ চৌধুরী ট্যাপেস্ট্রিতে দক্ষ ছিলেন বলেই ট্যাপেস্ট্রি এবং নাট্যকলার জিয়া হায়দার ছিলেন বলে নাট্যকলা বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’[৩৪] এমন উদ্যোগের পেছনে বাউহাউসের শিক্ষাদর্শের প্রতি রশিদ চৌধুরীর আগ্রহের বিষয়টি কাজ করেছিল বলে মনে করেন শিল্প সমালোচক আবুল মনসুর।[৩৫]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ইন ফাইন আর্টসের সিলেবাসের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে ওই সময়ের মধ্যে গুজরাটের বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫০ সালে এবং লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা হয়। বরোদা, পাঞ্জাব ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের মাস্টার্স ডিগ্রির সিলেবাস সারণির মধ্যে পাশাপাশি তুলে ধরে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

M.S University of Baroda Master of Arts (Fine) (1974–1988)[36]		Panjab University M.A in Fine Arts (1961)[37]		University of Chittagong M.A in Fine Arts (1971–72) (Preliminary)[38]	
Subject	Marks	Subject	Marks	Subject	Marks
1. Philosophy of Art	200	1. History of European Art	100	1. Survey of Visual Art	100
2. Modern Art	200	2. Muslim Art	100	(History - 75	
3. History of Painting/	200	3. Muslim Architecture	100	Art appreciation - 25)	
Sculpture/Others		4. Muslim And Indo Pakistan Art	100	2. Oriental Art	100
4. Creative Painting/	1650	5. Technical Methods:		(History- 75	
Sculptor /Others		a) Painting (Mural, Painting,	100	Art appreciation - 25)	
5. Viva-Voce	150	Fresco Tempora, Oil Painting		3. Art technique and	100
6. Dissertation	200	and Water Colour) or		their Development	
		b) Drawing (Pastel,		a) Painting	
		Etching Dry point, Copper		b) Print Making	
		Engraving, Aquatint etc) or		c) Mural/Modeling	
		c) Sculpture (Modeling,		4. Dramatics	100
		Metal Casting)		5. Design (Applied)	100
Total	2600		500		500

[৩৩] অধ্যাপক মিজানুর রহিমের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, প্রাগুক্ত

[৩৪] শিল্পী মনসুর-উল করিমের সঙ্গে গবেষকের মুঠোফোনালাপ, তারিখ : ০৭.০৬.২০২০

[৩৫] আবুল মনসুর, *আর্ট অব বাংলাদেশ, সিরিজ-৫ : রশিদ চৌধুরী*, সুবীর চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০১, পৃ. ২৫

[৩৬] সত্তর ও আশির দশকে বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্যুকৃত ক্রিয়েটিভ পেইন্টিং/ভাস্কর্য/অ্যাপ্লাইড আর্ট বিভাগের মাস্টার অব আর্টস (ফাইন)-এর মার্কশিট অবলম্বনে সিলেবাসের উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৭] “Punjab University Art Department”, Jalal Uddin Ahmed (Ed.), *Contemporary Arts in Pakistan,* Editor:, Vol: 11, No: 3, Autumn 1961, p. 5–6

[৩৮] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ইন ফাইন আর্টসের ১৯৭১–৮৭ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস (প্রিলিমিনারি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত

উল্লিখিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রির সিলেবাসের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রির সিলেবাসের কোর্সের নামকরণ, গঠন, নম্বর বিভাজন ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অধিক মিল রয়েছে। পাঞ্জাব ও চট্টগ্রাম উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ১০০ নম্বরের মোট পাঁচটি পত্র রয়েছে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কন ও নির্মাণ পত্রের মধ্যে ১. পেইন্টিং, ২. ড্রইং (প্রিন্টমেকিংয়ের বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং ৩. মডেলিং ছিল; এর মধ্যে যেকোনো একটি শিক্ষণীয় ছিল। চট্টগ্রামেও অনুরূপ ছিল; তবে প্রথম পর্যায়ে মডেলিংয়ের স্থলে চট্টগ্রামে ম্যুরাল ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে ম্যুরাল পরিবর্তিত হয়ে মডেলিং যুক্ত হয়। এভাবে পাঞ্জাবের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার মাস্টার্স ডিগ্রির কারিকুলাম ও সিলেবাসের মিল পাওয়া যায়। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় বিষয়ের পাঠ্যক্রমে নিজস্বতা ছিল।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় বিষয়গুলো হলো History of Europeun Art, Muslim Art, Muslim Architecture এবং Muslim and Indo Pakistan Art[39] আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় বিষয়গুলো হলো Survey of Visual Art এবং Orintal Art. এ ছাড়া Dramatic ও Design বিষয় ছিল ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় শিক্ষার সমন্বিত পত্র।

এখানে লক্ষ করা যায়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর মধ্যে ইউরোপীয় শিল্পকলার ইতিহাস বাদে উপমহাদেশীয়, ইন্দো-পাকিস্তান, দূরপ্রাচ্য ইত্যাদি অঞ্চলের শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসকে ধর্মের ভিত্তিতে নামকরণ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে রশিদ চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীরা এ সকল বিষয়কে ওরিয়েন্টাল আর্ট হিসেবে সিলেবাসে উপস্থাপন করেছেন।

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের পুরনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও সিলেবাসের কাঠামো গ্রহণ করলেও সেই কাঠামোর মধ্যে নিজেদের মতো করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সাজিয়েছিলেন রশিদ চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীরা। সিলেবাস সাজানোর ক্ষেত্রে তিনি বাউহাউসের শিল্পাদর্শ ও শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪০] ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস (১৮৮৩–১৯৬৯) জার্মানির ওয়াইমারে বাউহাউস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৯৭৯) নির্মাণ সহায়ক কারুশিল্প ও ডিজাইনকে প্রাধান্য দিয়ে। বাউহাউসের উদ্দেশ্য ছিল স্থাপত্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্য গণ্য করে চিত্রকলা, মূর্তিকলাসহ অন্যান্য কলাকে স্থাপত্য নির্মাণের অঙ্গ হিসেবে দেখা। চারুকলা ও কারুকলার ভেদাভেদ দূর করা। এখানে মূর্তিকলা,

---

[৩৯] *Punjab University Art Department*, 'Contemporary Arts in Pakistan', Karachi, Ibid, p. 6

[৪০] আবুল মনসুর, *আর্ট অব বাংলাদেশ*, *সিরিজ-৫ : রশিদ চৌধুরী*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০১, পৃ. ২৫

সূত্রধর শিল্প, ধাতব শিল্প, মৃৎপাত্র, স্টেইন্ড গ্লাস, ভিত্তি চিত্র অঙ্কন, বয়ন শিক্ষণীয় ছিল। এ ছাড়া Composition, Theory of space, Theory of Colour, Theory of Design পাঠ্য ছিল।[৪১] বাউহাউসের ন্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সিলেবাসে রশিদ চৌধুরী ট্যাপিস্ট্রি, স্টেইন্ড গ্লাস, ফ্রেসকো, মোজাইক ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করেন। তিনি নিজে যেমন ট্যাপিস্ট্রি, মোজাইক ইত্যাদি বিষয় চর্চার মাধ্যমে একটি আধুনিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলেন, তেমনি চারুকলার উচ্চশিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কারুকলাকে সৃজনশীল শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মূলত বাউহাউসের অনুকরণে তিনি এখানে বেসিক ডিজাইনের মতো তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করেছিলেন। এ ছাড়া শিল্পশিক্ষার ইতিহাস বিষয়কে History ও Art Appreciation—এই দুটি ভাগে ভাগ করে Art Appreciation বিভাগে দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিএ (সম্মান) কোর্সের সিলেবাস : ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত চারুকলা বিভাগের সিলেবাস থেকে জানা যায়, চারুকলায় বিএ সম্মান কোর্সের সিলেবাসে দশটি বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। এর মধ্যে চারটি ছিল তত্ত্বীয় বিষয়, চারটি অঙ্কন ও নির্মাণ, একটি মৌখিক ও সেশনাল এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয়। প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বর করে মোট ১০০০ নম্বর ছিল। প্রতিটি ব্যবহারিক বিষয়ের ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর ছিল সেশনাল এবং ৫০ নম্বর পরীক্ষার।

Syllabus For BA (Honours) in Fine Arts (1974–75)

THEORETICAL

1st Paper - History of Fine Arts (Prehistoric Medieval) - 100 Marks
2nd Paper - Oriental Art - 100 Marks
3rd Paper - Renaissance Art - 100 Marks
4th Paper - Aesthetics, Art Appreciation & Medium of Art - 100 Marks

PRACTICAL

5th Paper - Painting (Still Life and Landscape) - 100 Marks
6th Paper - Painting (Figure Study and Composition) - 100 Marks
or
5th Paper - Sculpture (Figure Study and Composition in different medium) - 100 Marks
6th Paper - Sculpture (Relief in different medium) - 100 Marks
7th Paper - Drawing and Basic Design 50+50 = 100 Marks
8th Paper - Graphics (Wood Cut, Lithograph, Etching and Drypoint) - 100 Marks

[৪১] শোভন সোম, *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

VIVA AND SESSIONAL

9th Paper - Viva and Sessional 50+50 = 100 Marks

SUBSIDIARY SUBJECT

a) Anthropology, b) Sociology, c) History, d) Bengali, e) English, f) Philosophy and g) Islamic History[42]

প্রথম পত্র History of Fine Art (Prehistoric Medieval) পাঠ্য ছিল : ক) প্রাগৈতিহাসিক শিল্প ও সংস্কৃতি, খ) মিশরীয় শিল্প, গ) পাশ্চাত্য এশিয়ার শিল্পকলা (মেসোপটেমীয়, ব্যাবিলিয়ান, আসেরীয়), ঘ) যাযাবর (Nomad), প্রাক-কলম্বিয়ান, প্রাগৈতিহাসিক শিল্প, ঙ) গ্রিক শিল্প, চ) রোমান শিল্প, ছ) এট্রুস্কান শিল্প, জ) বাইজেন্টাইন শিল্প, ঝ) প্রাথমিক খ্রিষ্টান শিল্প, ঞ) রোমানেস্ক শিল্প ও ট) গথিক শিল্প।

দ্বিতীয় পত্রে পাঠ্য ছিল : ক) চায়নিজ শিল্প, খ) জাপানিজ শিল্প, গ) পার্শিয়ান শিল্প, ঘ) মুসলিম শিল্প, ঙ) ভারতীয় শিল্প এবং চ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান শিল্প।

তৃতীয় পত্র Renaissance Art-এ পাঠ্য ছিল : ক) প্রাথমিক রেনেসাঁ শিল্প, খ) রেনেসাঁ শিল্প, গ) রেনেসাঁ-পরবর্তী শিল্প (ম্যানারিস্ট, বারোক, রকোক্কো)।

চতুর্থ পত্র Aesthetics, Art Appreciation & Medium of Art-এর মধ্যে Aesthetics & Art Appreciation-এ পাঠ্য ছিল : ক) শিল্পের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু, খ) শিল্পের উদ্দেশ্য, গ) নন্দনতত্ত্বের মূলনীতি এবং ঘ) শিল্প সমালোচনার মৌলিক নীতি।

Medium of Art-এ ক) পেইন্টিং, খ) ভাস্কর্য, গ) গ্রাফিক, ঘ) ম্যুরাল, ঙ) সিরামিকস ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যম ও করণ-কৌশল তত্ত্বীয় ও হাতে-কলমে শিক্ষণীয় ছিল।

ব্যবহারিক বিষয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র ছিল বিশেষ বিষয়ভিত্তিক। যে সকল শিক্ষার্থী চিত্রকলা বিষয়ে অনার্স করতে আগ্রহী তাদের জন্য পঞ্চম পত্রের Painting (Still Life and Landscape) এবং ষষ্ঠ পত্রের Painting (Figure Study and Composition) শিক্ষণীয়; আর যারা ভাস্কর্য বিষয়ে অনার্স করতে আগ্রহী তাদের জন্য Sculpture (Figure Study and Composition in Different medium) এবং Sculpture (Relief in different medium) শিক্ষণীয় ছিল। সপ্তম পত্রের Drawing and Basic Design এবং অষ্টম পত্রের Graphics (Wood Cut, Lithograph, Etching and Drypoint) সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয়।

---

৪২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের বিএ (সম্মান) কোর্সের ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস, উৎস : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

সম্মান কোর্সের সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল : ক) নৃতত্ত্ব, খ) সমাজতত্ত্ব, গ) ইতিহাস, ঘ) বাংলা, ঙ) ইংরেজি, চ) দর্শন এবং ইসলামের ইতিহাস।

বিএ সম্মান কোর্স ছিল তিন বছর মেয়াদি। উল্লিখিত সিলেবাস অনুযায়ী তিন বছর শেষে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ফাইনাল পরীক্ষার সময় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এই সিলেবাসে কিছু কিছু সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে।

বাংলাদেশে চারুকলা বিষয়ে প্রথম সম্মান কোর্স চালু হয়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে। এ ক্ষেত্রে শিল্পী রশিদ চৌধুরীসহ তাঁর সহকর্মীরা দূরদরর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ঢাকার বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা কলেজ। যেখান থেকে রশিদ চৌধুরীসহ তাঁর অন্য সহকর্মীরা স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ঢাকার আর্ট কলেজের শিক্ষাক্রমের প্রভাব চট্টগ্রামের চারুকলা বিভাগের সিলেবাসে পড়াটা স্বাভাবিক ছিল। এ ক্ষেত্রে পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরস্পরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল থাকলেও সিলেবাসের গঠন প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ছিল ব্যতিক্রম। ঢাকায় আর্ট কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সিলেবাসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

চট্টগ্রাম চারুকলা বিভাগের অনার্স কোর্স এবং ঢাকার আর্ট কলেজের বিএফএ ডিগ্রি কোর্স উভয়ই তিন বছর মেয়াদি। অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে তিন বছর শিক্ষা শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও সেশনাল নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হতো। উভয় সিলেবাসে দশটি বিষয় শিক্ষণীয় ছিল এবং মোট নম্বর ছিল ১০০০।

চারুকলা বিভাগের সম্মান কোর্সের সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয়ের প্রাধান্য ছিল। মোট ১০০০ নম্বরের দশটি বিষয়ের মধ্যে ঐচ্ছিক বিষয়সহ সর্বমোট ৫০০ নম্বরের পাঁচটি তত্ত্বীয় বিষয় ছিল। আর ঢাকা আর্ট কলেজের সিলেবাসে অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ের প্রাধান্য ছিল। ঢাকায় মোট আটটি অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয় এবং দুটি তত্ত্বীয় বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। তত্ত্বীয় বিষয় দুটি হলো শিল্পকলার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। কিন্তু চট্টগ্রামে এসব তত্ত্বীয় বিষয় ছাড়াও Aesthetics, Art Appreciation & Medium of Art শীর্ষক একটি কোর্স পাঠ্য ছিল; বিষয়টি ছিল শিল্পের ব্যাকরণস্বরূপ। শিল্পের সংজ্ঞা, পরিধি, গঠন, শিল্পের সমঝদারিসহ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের সুযোগ ছিল এই বিষয় অধ্যয়ন ও হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে। চট্টগ্রামের সম্মান কোর্সের সিলেবাস ছিল সমন্বিত। এই সিলেবাসে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও

ছাপচিত্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ঢাকায় সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে বিভাগভিত্তিক। প্রচলিত বিভাগের জন্য আলাদা সিলেবাস ছিল। তবে প্রতিটি বিভাগে অভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয় পাঠ্য ছিল।

চট্টগ্রামে আধুনিক চারুশিল্প শিক্ষার পথিকৃৎ ছিলেন রশিদ চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ খুলে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষায় প্রথম উচ্চশিক্ষার সূচনা করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে চারুকলা বিভাগের ফিডিং ইনস্টিটিউট হিসেবে চট্টগ্রামে একটি আর্ট কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন এবং চারুকলা বিভাগে অনার্স কোর্স চালু করেন। তাঁর নেতৃত্বে স্বল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামে শিল্পশিক্ষার একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা থেকে একদল মেধাবী ছাত্রের আগমন এবং তাঁদের অধিকাংশের শিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ও আর্ট কলেজে যোগদান চট্টগ্রামের আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এখানে আরো কিছু মেধাবী শিক্ষক যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ সাইফুল কবীর, মো. আল মামুন, জাহেদ আলী চৌধুরী, মো. আলপ্তগীন তুষার, মো. জসিম উদ্দিন, শায়লা শারমিন প্রমুখ। স্বল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামে আধুনিক চারুশিল্পের উত্থান সম্ভব হয়েছিল রশিদ চৌধুরীর পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ও আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে। তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী একুশ শতকের সূচনাতে আর্ট কলেজটি চারুকলা বিভাগের সঙ্গে একীভূত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হিসেবে নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিল্পী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পশিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে, যা বাংলাদেশের চারুশিল্প আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউট হিসেবে একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ দেশে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইনস্টিটিউট হওয়ার মধ্য দিয়ে অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার পথ সুগম হয়।

দেশ স্বাধীনের পর থেকে আর্ট কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ইনস্টিটিউট করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। আর্ট কলেজটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একীভূত করে একটি ইনস্টিটিউট করার জন্য ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সে বছরের ১ জুলাই অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই যাচাই-বাছাই কমিটি ১৯৭৪ সালের ১১ জুলাই প্রস্তাবিত আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি একাডেমিক সাবকমিটি গঠন করে।[৪৩] একাডেমিক সাবকমিটি প্রস্তাবিত আর্ট ইনস্টিটিউটের সিলেবাস ও কারিকুলামের রূপরেখাসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পেশ করে। এই প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করা হয় ১৯৭৫–৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে আর্ট কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে কার্যক্রম শুরু করবে।[৪৪] কিন্তু ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বিষয়টি গতিহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষকদের অব্যাহত প্রচেষ্টা আর ইনস্টিটিউটের সপক্ষে ছাত্র আন্দোলনের ফলে ১৯৭৭ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টির ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করে। তবে আর্ট কলেজটিকে সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট হিসেবে যুক্ত না করে ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে আর্ট কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএফএ কোর্সের অনুমোদন দেয়। তবে আর্ট কলেজকে ইনস্টিটিউট করার প্রচেষ্টা তখনো অব্যাহত ছিল। ১৯৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণের বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় উত্থাপিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি এবং কলেজ থেকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের সকল শর্ত

---

[৪৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী, তারিখ ১ জুন ১৯৭৪, প্রাগুক্ত

[৪৪] একাডেমিক সাবকমিটির রিপোর্ট, তারিখ : ৯ এপ্রিল ১৯৭৫, প্রাগুক্ত

পূরণ করায় এই মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট করার উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট একাদশ স্ট্যাটিউটস পাস করে। যার শিরোনাম Statutes reagarding the establishment of The Institute of Fine Arts Dhaka University.[৪৫]

একাদশ স্ট্যাটিউটসে ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের উদ্দেশ্য, বোর্ড অব গভর্নরস গঠন ও ক্ষমতা, কোর্স ও সিলেবাস, বাজেট কমিটি গঠন, সিলেকশন বোর্ড গঠন ও ক্ষমতা, পরিচালক নিয়োগ, নন-টিচিং স্টাফ নিয়োগ এবং ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের ১৮ আগস্ট মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট করা সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়।[৪৬] এই গেজেটের মাধ্যমে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে স্থানান্তরিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মচারী তাঁদের পূর্বের পদ অনুযায়ী কিছু শর্ত সাপেক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হন। সর্বশেষ ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার কর্তৃক লিখিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়—

> এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং তারিখ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। এখন হইতে উক্ত মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট (Institute of Fine Arts) হিসেবে গণ্য করা হইবে।[৪৭]

এভাবে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসে রূপান্তরিত হয়।

মহাবিদ্যালয়টি ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়ে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী বডি হলো বোর্ড অব গভর্নরস। ইনস্টিটিউটের প্রধানের পদ হলো পরিচালক। বোর্ড অব গভর্নরসের সভাপতি হলেন উপাচার্য এবং সম্পাদক হলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক। বোর্ড

---

[৪৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; একাদশ স্ট্যাটিউটসের কপি, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৪৬] The Bangladesh Gazette, Extra, 21 August 1983, No. SVIII/IU-38/83, 1723-Edn. Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh

[৪৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, স্মারক নং-শাখা-৪/১৬৮২৭-৯২৬, তারিখ : ২ অক্টোবর ১৯৮৩

অব গভর্নরসে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভা থেকে।

ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি কমিটি হলো একাডেমিক কমিটি এবং কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিঅ্যান্ডডি)। ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক নিয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হতো। সিঅ্যান্ডডি কমিটি গঠিত হতো জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ইনস্টিটিউটের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক নিয়ে। ছাত্র ভর্তি, সিলেবাস ও কোর্স অব স্টাডিজ, পরীক্ষা, শিক্ষাদান এবং সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বিষয়ে একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। সিঅ্যান্ডডি কমিটির প্রধান কাজ ছিল ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ ছাড়া বার্ষিক আয়-ব্যয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছিল বাজেট কমিটি। এ সকল কমিটির প্রধান ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক। এ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ স্ট্যাটিউটসে উল্লিখিত সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে। অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য গঠিত বোর্ডের সভাপতি ছিলেন উপাচার্য এবং সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন উপ-উপাচার্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। অনুশীলনধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক বোধ প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়া। সারা বিশ্বের সমকালীন শিল্পের প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়তা করা এবং দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ স্ট্যাটিউটসে আর্ট ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে :

ক) স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য চারুকলা ও ব্যবহারিক শিল্পের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা ও সহায়তা করা।

খ) ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস, মাস্টার্স অব ফাইন আর্টস এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন ফাইন আর্টসের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

গ) শিল্পকলা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করা।

ঘ) সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা পেশাগত কর্মের সঙ্গে জড়িত শিল্পী এবং বিভিন্ন সংগঠনে কর্মরত শিল্পীদের জন্য স্বল্পমেয়াদি কোর্স বা কর্মশালার আয়োজন করা।

ঙ) চারুকলা, কারুকলা এবং ডিজাইনের ওপর গবেষণার ব্যবস্থা করা।

চ) বিভিন্ন প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স এবং প্রকাশনার মাধ্যমে চারু ও কারুকলার প্রচার, প্রসার ও নান্দনিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

ছ) সারা বিশ্বে শিল্প সৃষ্টিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি, শৈলী এবং উপকরণের পাশাপাশি দেশীয় শিল্প-ঐতিহ্য ও উপকরণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ করে চারুকলা, কারুকলা ও ডিজাইনের প্রসার ঘটানো ।

জ) ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা ।

বিভাগসমূহ : আর্ট ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য, গঠন ও কর্মপরিধির উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ স্ট্যাটিউটসে । এই স্ট্যাটিউটসে চারুকলা অনুষদের বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই । তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে রক্ষিত ওই সময়ের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত বিভাগগুলোকে কার্যকর রাখা হয়েছে এবং সেখানে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্য থেকে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গঠিত একাডেমিক সাব-কমিটির ১৯৭৫ সালের রিপোর্টে প্রচলিত সাতটি বিভাগ নিয়ে ইনস্টিটিউট গঠনের প্রস্তাব করেছিল । বিভাগগুলো হলো :

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, ২. গ্রাফিক ডিজাইন, ৩. প্রাচ্যকলা, ৪. প্রিন্টমেকিং (গ্রাফিক আর্ট), ৫. ভাস্কর্য, ৬. মৃৎশিল্প এবং ৭. কারুশিল্প । এই সাতটি বিভাগ নিয়েই আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল । বিভাগের শিক্ষকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ইনস্টিটিউটের সিঅ্যান্ডডি ও একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদি বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করতেন পরিচালক । এ সময় বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা থাকত, 'বিভাগীয় প্রধানের এই দায়িত্বটি চারুকলা ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ।'[৪৮]

কারিকুলাম ও সিলেবাস : আর্ট ইনস্টিটিউট বাস্তবায়নের সময় নতুন করে কোনো কারিকুলাম বা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়নি । কলেজ পর্যায়ে প্রচলিত দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি, তিন বছর মেয়াদি বিএফএ ডিগ্রি কোর্স এবং দুই বছর মেয়াদি এমএফএ কোর্স এ সময় অপরিবর্তিত রাখা হয় । এই ডিগ্রির সঙ্গে এ সময় উচ্চতর গবেষণার বিষয়টি যুক্ত হয় । কলেজ পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রি-ডিগ্রির

[৪৮] মৃৎশিল্প বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলামের উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান পত্র, পত্রটি পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত, পত্র নং-৭৮৭, তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০০৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেবাস এবং ১৯৭৮ সালে প্রণীত বিএফএ ডিগ্রি ও এমএফএ ডিগ্রির সিলেবাস দিয়ে ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউটে বিএফএ সম্মান কোর্স চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সিলেবাস কার্যকর ছিল। সম্মান কোর্স চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কারিকুলাম এবং সিলেবাসের আমূল পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ইনস্টিটিউটের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা হয়। এই গবেষণার নির্ধারিত সময়কালের (১৯৪৮–১৯৮৭) পাঁচ বছর পরে ইনস্টিটিউটের সম্মান কোর্স চালু হয়েছিল। তবে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে অনার্স কোর্সের কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

বিএফএ সম্মান কোর্স : শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে সম্মান কোর্স চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আশির দশকের শেষভাগে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটে ম্যাট্রিকুলেশন বা এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছেন। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থাকাকালে (১৯৪৮–১৯৬৩ পর্যন্ত) এখানে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল; কলেজে রূপান্তরের পর তা পরিবর্তন করে পাঁচ বছরের বিএফএ ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়; যার প্রথম দুই বছর প্রাক-বিএফএ কোর্স এবং পরবর্তী তিন বছর বিএফএ কোর্স। কোর্সের মানোন্নয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রক্ষার্থে আর্ট ইনস্টিটিউটে সম্মান কোর্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের ১৯৯০ সালের ৯ অক্টোবরের সভায় বিএফএ সম্মান কোর্স খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এই কোর্স চালু করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে বিএফএ সম্মান কোর্সের সিলেবাস অনুমোদনের জন্য একাডেমিক পরিষদে পেশ করা হলে ১৯৯৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারির একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সিলেবাস অনুমোদিত হয়। এই সিলেবাসের আলোকে ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএফএ সম্মান কোর্স চালু হয়।

বিএফএ সম্মান কোর্স চার বছর মেয়াদি; সম্মান-পরবর্তী এমএফএ কোর্স দুই বছর মেয়াদি। বিএফএ অনার্স কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় এইচএসসি উত্তীর্ণ। একজন শিক্ষার্থী ভর্তির পর এখান থেকে চার বছরের বিএফএ সম্মান এবং দুই বছরের এমএফএ ডিগ্রির সুযোগ পাবেন। বিএফএ সম্মান কোর্স হচ্ছে সমন্বিত (ইন্টিগ্রেটেড); ফলে কোনো সাবসিডিয়ারি বিষয় রাখা হয়নি।

প্রচলিত সাতটি বিভাগের জন্য প্রতিবর্ষে শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা ৬০ নির্ধারণ করা হয়। বিভাগগুলো হলো অঙ্কন ও চিত্রায়ণ (Drawing and Painting), গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design), ছাপচিত্র (Print Making), ভাস্কর্য (Sculpture), প্রাচ্যকলা (Oriental Art), মৃৎশিল্প (Ceramics) এবং কারুশিল্প (Crafts)।

চার বছরের বিএফএ সম্মান কোর্সের নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ : কোর্সে পূর্ণ নম্বর : ২২০০

ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ের নম্বর : ১৭০০

তত্ত্বীয় বিষয়ের নম্বর : ৫০০

প্রথম বর্ষ : ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) ৫০০+তত্ত্বীয় ২০০ মোট : ৭০০

দ্বিতীয় বর্ষ : ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) ৪০০+তত্ত্বীয় ১০০ মোট : ৫০০

তৃতীয় বর্ষ : ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) ৪০০+তত্ত্বীয় ১০০ মোট : ৫০০

চতুর্থ বর্ষ : ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) ৪০০+তত্ত্বীয় ১০০ মোট : ৫০০

পরীক্ষার নম্বর বিভাজন হলো ব্যবহারিক (অঙ্কন ও নির্মাণ) বিষয়ে অনুশীলন, পরীক্ষা ৫০% এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা ৫০% নম্বর এবং তত্ত্বীয় বিষয়ে অনুশীলনী পরীক্ষা ১৫%, মৌখিক পরীক্ষা ১০% এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৭৫% নম্বর।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় উভয় ক্ষেত্রে অনুশীলনী ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাস করতে হবে। সম্মান কোর্সে ভর্তি ও কোর্স কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমত সম্মান কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় এইচএসসি পাস। দ্বিতীয়ত পূর্বের দুই বছর মেয়াদি প্রি-ডিগ্রি কোর্স তুলে দিয়ে পাঁচ বছরের স্থলে চার বছরের বিএফএ সম্মান কোর্স করা হয়। প্রি-ডিগ্রি কোর্সের স্থলে ইনস্টিটিউটে সকল শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য সমন্বিত পাঠ্যক্রমের আওতায় প্রথম বছর ভিত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়। সেজন্য প্রথম বর্ষে বিভাগভিত্তিক ভর্তি না করে একত্রে ভর্তি করার নিয়ম করা হয়। প্রথম বর্ষে অধ্যয়নকালে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী এবং ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগভিত্তিক ভর্তির নিয়ম করা হয়। পরবর্তী তিন বছর যার যার বিভাগে সংশ্লিষ্ট থেকে বিএফএ সম্মান কোর্স সম্পন্ন করবে।[৪৯]

[৪৯] বিএফএ সম্মান ও এমএফএ কোর্সের পাঠ্যক্রম, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর

স্নাতক পর্যায়ে সর্বাধুনিক ও সমকালীন কোর্স হলো সম্মান কোর্স। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে বিএফএ সম্মান কোর্স চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে এখানকার শিক্ষা সর্বাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি : চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট হিসেবে একীভূত হওয়ার সময় এখানে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মচারী তাঁদের কর্মরত পদে ইনস্টিটিউট তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ দুটো এ সময় সহযোগী অধ্যাপক পদে রূপান্তর করা হয়। ১৯৮৩ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন সহকারী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। ১৯৮৬ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত তিনি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পরিচালক নিযুক্ত হন মীর মোস্তফা আলী। ইনস্টিটিউট হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে এখানে নিয়োজিত শিক্ষকদের পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আর্ট ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কার্যক্রম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদের থেকে ব্যতিক্রম। এখানে নিয়োজিত শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুল অথবা ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থেকে ছয় অথবা পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স করা। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রচলিত নীতিমালার আলোকে এ সকল শিক্ষকের নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, প্রদর্শনী, পুরস্কারসহ শিল্পকলা ক্ষেত্রে অবদানকে বিবেচনায় এনে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট একটি নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা তৈরি করে। সেই নীতিমালার আলোকে আর্ট ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পদোন্নতির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের ১৯৮৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভায় আটজন সহকারী অধ্যাপককে তাঁদের পদ আপগ্রেড করে সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং চৌদ্দজন প্রভাষককে পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন আবদুর রাজ্জাক, মীর মোস্তফা আলী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুল মতিন সরকার, মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাজী আবদুল বাসেত, জুনাবুল ইসলাম ও রফিকুন নবী। সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন শামসুল ইসলাম নিজামী, হাশেম খান, বুলবন ওসমান, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, মাহমুদুল হক, হামিদুজ্জামান খান, আবদুস শাকুর শাহ, এমদাদুল হক মো. মতলুব আলী, মাহবুবুল আমীন, সৈয়দ আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, ফরিদা জামান, দিল আফরোজ কাদির, নাজমা বেগম ও শামীম

শিল্পী নাইমা হক

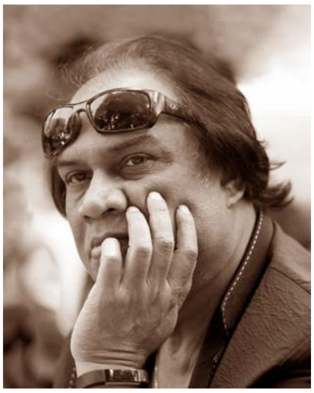

শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ

শিল্পী এফ এম কায়সার

শিল্পী আবু সাইদ তালুকদার

শিল্পী রোকেয়া সুলতানা

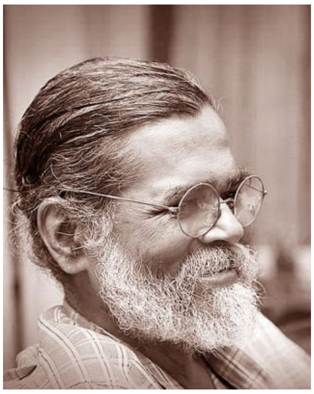

শিল্পী নিসার হোসেন

সৈয়দ আজিজুল হক

চিত্র-৭১ : ১৯৮৭ সালে চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত কয়েকজন প্রভাষক, আলোকচিত্র : রূপম চৌধুরী ও রবিউল ইসলাম

আরা সিকদার।[৫০] এ বছর প্রাচ্যকলা বিভাগের প্রভাষক আবদুস সাত্তার ও কারুশিল্প বিভাগের আব্দুল জব্বারও পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্ট এই আটটি সহযোগী অধ্যাপক পদ এবং ষোলোটি সহকারী অধ্যাপক পদ আর্ট ইনস্টিটিউটে স্থায়ী পদ হিসেবে বহাল থাকবে মর্মে ১৯৮৬ সালের ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরসের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫১]

চৌদ্দজন প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ায় প্রভাষক পদগুলো শূন্য হয়ে যায়। এসব শূন্যপদে নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। ১৯৮৭ সালের ১৭ এপ্রিল প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[৫২] সংশ্লিষ্ট সিলেকশন বোর্ড বিভিন্ন বিভাগ ও কোর্সের মোট নয়জন প্রভাষক নিয়োগের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের ১৯৮৭ সালের ১০ মে অনুষ্ঠিত সভায় এই নয়জন প্রভাষক নিয়োগ অনুমোদন করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ১১ জুন আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। এ সময় নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে জামাল উদ্দিন আহমেদ (জন্ম : ১৯৫৫), গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে এফ এম কায়সার (জন্ম : ১৯৫৫) ও নাইমা হক (জন্ম : ১৯৫৩); প্রিন্টমেকিং বিভাগে রোকেয়া সুলতানা (জন্ম : ১৯৫৮), সিরামিক বিভাগে মো. আবু সাইদ তালুকদার (১৯৫৪–২০০৫); প্রি-ডিগ্রির জন্য নিসার হোসেন (জন্ম : ১৯৬১), আজিজ শরাফী (জন্ম : ১৯৫৬) ও মো. শাহাদাত হোসেন (জন্ম : ১৯৫৫) এবং প্রি-ডিগ্রির বাংলা কোর্সের জন্য সৈয়দ আজিজুল হক (জন্ম : ১৯৫৯)।[৫৩]

পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালের ২৫ জানুয়ারি চারুকলা ইনস্টিটিউটে আরো পাঁচজন প্রভাষক যোগদান করেন। তাঁরা হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য (জন্ম : ১৯৫৭), মুর্শিদা আরজু আল্পনা (জন্ম : ১৯৬১), গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে মোহাম্মদ ইউনুস (জন্ম : ১৯৫৪), প্রাচ্যকলা বিভাগে মো. শওকাতুজ্জামান (১৯৫৩–২০০৫) এবং শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে নাহিদ আখতার (জন্ম : ১৯৫৬)।[৫৪] শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এডহক ভিত্তিতে এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে প্রি-ডিগ্রি কোর্সে নিয়োজিত ছিলেন।

---

[৫০] আর্ট ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[৫১] আর্ট ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৬, প্রাগুক্ত

[৫২] ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের নির্বাচনী কমিটির সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৭ এপ্রিল ১৯৮৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[৫৩] ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের বোর্ড অব গভর্নরসের ৫তম সভার কার্যবিবরণী; তারিখ : ১০ মে ১৯৮৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

[৫৪] চারুকলা ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরসের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী, তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ সময় আর্ট ইনস্টিটিউটে অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকই ছিলেন ঢাকার আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শাহাদাত হোসেন ও এফ এম কায়সার ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া অন্য শিক্ষকগণ ছিলেন জাপান ও ভারতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। এ পর্যায়ে নিযুক্ত জামাল আহমেদ, মোহাম্মদ ইউনুসসহ ইতিপূর্বে নিযুক্ত মাহমুদুল হক ও কাজী গিয়াসউদ্দিন ছিলেন জাপানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। জামাল উদ্দিন আহমেদ ১৯৮৬ সালে ও মোহাম্মদ ইউনুস ১৯৮৭ সালে মনবুশো বৃত্তি নিয়ে যথাক্রমে জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় ও তামা আর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রকলায় এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। কাজী গিয়াসউদ্দিন টোকিও জাতীয় লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রকলা বিষয়ে ১৯৭৯ সালে এবং মাহমুদুল হক সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্টমেকিং বিষয়ে ১৯৮৬ সালে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। এঁরা সকলেই জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি নিয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এ সকল শিক্ষকের উচ্চশিক্ষার্থে জাপানে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অনুপ্রেরণা এসেছিল মোহাম্মদ কিবরিয়ার কাছ থেকে; যিনি ষাটের দশকের শুরুতে জাপানের টোকিও চারুকলা ও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেইন্টিং ও প্রিন্টমেকিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার আধুনিক শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের প্রভাব ছিল। যার দ্বারা জাপানে শিক্ষা গ্রহণকারী বাংলাদেশি শিল্পীরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাপানের ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও তার দ্বারা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বিশেষ আকৃষ্ট হননি। তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত টেকনিক, টেকচার আর বিন্যাসে এবং ছাপচিত্রের লিথোগ্রাফ, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, মেৎসৌটিন্ট, কলোগ্রাফ ইত্যাদি মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধারায় বিমূর্ত ও আধা-বিমূর্ত চিত্রচর্চা করেছেন। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পান্দোলন এবং শিল্পশিক্ষা বিকাশে জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

অন্যদিকে দেশ স্বাধীনের পর ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী চারুকলার শিক্ষকগণ হলেন বরোদা এমএস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হামিদুজ্জামান খান (ভাস্কর্য : ১৯৭৬), ফরিদা জামান (পেইন্টিং : ১৯৭৮), আব্দুস শাকুর শাহ (পেইন্টিং : ১৯৯৭), নাইমা হক (অ্যাপ্লায়েড আর্ট : ১৯৯৬), নাসরিন বেগম (প্রিন্টমেকিং : ১৯৮৩), শিশির ভট্টাচার্য্য (পেইন্টিং : ১৯৮৭) প্রমুখ। আর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা হলেন আব্দুস সাত্তার (প্রিন্টমেকিং : ১৯৭৩), শওকাতুজ্জামান (ম্যুরাল : ১৯৯০), রোকেয়া সুলতানা (প্রিন্টমেকিং : ১৯৮৩) এবং নিসার হোসেন (পেইন্টিং : ১৯৮৫)। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক অলক রায় (ম্যুরাল : ১৯৭৮) ও আবুল মনসুর (শিল্পকলার ইতিহাস) বরোদা এমএস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ইন ফাইন আর্ট ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতে অবস্থানকালে তাঁরা কয়েকজন বিশ্বমানের শিক্ষক-শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বরোদা এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কে জি সুব্রহ্মণ্যন (১৯১৪–২০১৬) ও গোলাম মোহাম্মদ শেখ (জন্ম : ১৯৩৭)। কে জি সুব্রহ্মণ্যন ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী আর গোলাম মোহাম্মদ শেখ ছিলেন তত্ত্বীয় শিক্ষক, চিত্রশিল্পী ও শিল্প সমালোচক। সুব্রহ্মণ্যন ১৯৮০ সালে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে চিত্রকলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য ও বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, ম্যুরাল ইত্যাদি মাধ্যমে স্বতন্ত্র শিল্পধারা সৃষ্টি করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন আইডিয়া এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন। তার চিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশি ঐতিহ্য সচেতনতা। তিনি শিক্ষার্থীদেরও এ ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তত্ত্বীয় বিষয় গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হতো। শিল্পকলার ইতিহাস, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের দর্শন ইত্যাদি বিষয় স্লাইড সহকারে পড়ানো হতো।[৫৫]

সত্তর ও আশির দশক জুড়ে সেখানে 'ভারতীয় ন্যারেটিভ স্কুল'-এর পুনরুত্থান চলছিল।[৫৬] নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আর পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে একধরনের বক্তব্যধর্মী চিত্রচর্চার প্রবণতা চলেছিল সে সময় ভারতীয় আধুনিক শিল্পে।[৫৭] ভারতে পড়তে যাওয়া এ দেশীয় শিল্পীরা এ সকল শিল্পপ্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের ওপর পড়েছিল কে জি সুব্রহ্মণ্যনের বিশেষ প্রভাব। এ দেশীয় শিক্ষার্থীরা শিল্পের ভাষা, নান্দনিক বোধ, করণ-কৌশল বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন সেখানকার বিদগ্ধ শিক্ষকদের কাছ থেকে। এ সকল শিক্ষার আলোকে তাঁরা আধুনিক শিল্পচর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন। ইতিপূর্বে তাঁদের অনেকেই আধুনিক চিত্রচর্চা শুরু করেছিলেন মূলত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অনুকরণের মাধ্যমে। কী আঁকছেন, কেন আঁকছেন সে বিষয়ে তাঁদের অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। বরোদা ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্তদের এ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ হয়েছিল।[৫৮] শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে তাঁরা অর্জিত শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে সচেষ্ট হন। এ সময় চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত আবু সাইদ তালুকদার চীনের বেইজিং সেন্ট্রাল একাডেমি অব অ্যাপ্লায়েড আর্ট থেকে ব্যাচেলর অব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৮৬ সালে। এ ছাড়া সত্তর ও আশির দশকে আরো কয়েকজন শিক্ষক বিদেশ থেকে উচ্চ

[৫৫] অধ্যাপক ফরিদা জামান ও অধ্যাপক শিল্পী অলক রায়ের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ (যথাক্রমে) : ১৯ জানুয়ারি ২০২২ ও ১০ নভেম্বর ২০২১

[৫৬] অধ্যাপক অলক রায়ের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

[৫৭] অধ্যাপক নিসার হোসেনের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ২০২২

[৫৮] অধ্যাপক নিসার হোসেনের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত

শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। রফিকুন নবী ১৯৭৩ সালে প্রিন্টমেকিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য গ্রিক সরকারের বৃত্তি নিয়ে এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়েছিলেন (১৯৭৩)। তিনি সেখানে রঙিন উডকাট প্রিন্টে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে আব্দুস সাত্তার আমেরিকান সরকারের ফুলব্রাইট গ্রান্টে মনোনীত হয়ে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত প্রাট ইনস্টিটিউট থেকে ছাপচিত্র বিষয়ে এমএফএ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি সেখানে এচিং, লিথোগ্রাফ, সিল্ক স্ক্রিন মাধ্যমে প্রাচ্যধারাকে প্রাধান্য দিয়ে ফিগারেটিভ এবং নন-ফিগারেটিভ কাজ করে প্রশংসিত হন। দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত উল্লিখিত শিক্ষকগণ এ দেশের শিল্পশিক্ষা ও সমকালীন শিল্পচর্চার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

চারুকলা ইনস্টিটিউটে দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অনুশীলন ও নিরীক্ষাধর্মী শিক্ষা যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছিল। কাজী আবদুল বাসেত, রফিকুন নবী, মাহবুবুল আমীন, মতলুব আলী, ফরিদা জামান, জামাল উদ্দিন আহমেদ, নিসার হোসেন, শিশির ভট্টাচার্য্য প্রমুখের তত্ত্বাবধানে বাস্তবভিত্তিক এবং সমকালীন সৃজনশীল চিত্রকলার যুগান্তকারী চর্চা চলেছে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগে। চারুকলা ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার পর যে তিনটি বিভাগে প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ। এখানে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার মধ্য দিয়ে নিরীক্ষাধর্মী সৃজনশীল চিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়েছিল বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে। শিক্ষার্থীরা এ সময় নতুন নতুন সৃজনশীল শিল্পচর্চায় মেতে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের চিত্রকর্মও তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে। আশির দশকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে আসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের বিচিত্র শিল্পমাধ্যম ও শিল্পধারা এ দেশের তরুণ শিল্পীদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সত্তর ও আশির দশক জুড়ে উন্নত বিশ্বে নিউমিডয়া আর্ট চর্চার যে জোয়ার শুরু হয়েছিল, এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তা বাংলাদেশে এসেছিল। জাপানি শিল্পীদের বৃহৎ স্থাপনা শিল্পকর্ম নির্মাণে সহকারী হিসেবে ঢাকা চারুকলার শিক্ষার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আসা বিদেশি শিল্পীদের গাইড হিসেবে কিছু শিক্ষার্থী দায়িত্ব পালন করায় ওই সকল শিল্পীর সঙ্গে মতবিনিময় এবং তাঁদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মশালা ও আর্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ সকল প্রদর্শনী, কর্মশালা, আর্ট ক্যাম্প এবং সমকালীন আর্ট জার্নাল ও বই থেকে দেশি-বিদেশি শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক ধারার শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

শুরু থেকে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হলেও শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেশ স্বাধীনের পূর্বে এই বিভাগে ফটোল্যাব, ডার্করুম ইত্যাদি তৈরি করা হলেও তা চালু করা হয়নি। অনুদান হিসেবে একটি অফসেট প্রেস পেয়েছিল; কিন্তু সেটি স্থাপন করা হয়নি। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাইয়ুম চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, এফ এম কায়সার, মোহাম্মদ ইউনুস প্রমুখের প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক-শিল্পে, বিশেষ করে বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ, পোস্টার ডিজাইন, বাণিজ্যিক পণ্যের মোড়ক ইত্যাদি নতুন মাত্রা পেয়েছে। আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাইরের ডিজাইন প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন কাজ করেছেন। নব্বইয়ের দশকে বিভাগের শিক্ষকগণ কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে ইনস্টিটিউট থেকে প্রদত্ত দুটি কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হয়।[৫৯] কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজে নতুন যুগের সূচনা হয়। অঙ্কন দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি আর কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়ে পোস্টার, বুক কভার, ইলাস্ট্রেশন, প্রচার মাধ্যমের বিভিন্ন কাজ (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া), পণ্যের মোড়ক, হোর্ডিং, ব্যানারসহ গ্রাফিক ডিজাইনের যাবতীয় কাজ নান্দনিক ও দর্শনীয় হয়ে ওঠে।

মোহাম্মদ কিবরিয়া, মাহমুদুল হক, আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, রোকেয়া সুলতানা প্রমুখের প্রচেষ্টায় একসময়ের ব্যবহারিক শিল্পের অন্যতম মাধ্যম ছাপচিত্র সৃজনশীল আধুনিক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই পর্যায়ে রফিকুন নবী রঙিন উডকাট প্রিন্টে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে এ দেশের উডকাট প্রিন্টে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। হাশেম খান, আব্দুস সাত্তার, শওকাতুজ্জামান ও নাসরীন বেগমের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যকলা বিভাগে শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার। ঐতিহ্যবাহী এই চিত্রধারাটি তাঁদের প্রচেষ্টায় সমকালীন সৃজনশীল শিল্পের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়। বিশেষ করে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার পর প্রাচ্যধারার রীতিবদ্ধতা অতিক্রম করে চিত্রকলার যেকোনো মাধ্যমে নিরীক্ষাধর্মী সৃজনশীল চিত্রচর্চা শুরু হয় এই বিভাগে। এই বিভাগ থেকে প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রি লাভকারী শিক্ষার্থী আব্দুস সাত্তার গোয়াশ, মিশ্র মাধ্যম এবং ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে নিরীক্ষাধর্মী চিত্রচর্চার মাধ্যমে এ দেশের প্রাচ্যশিল্পকে একটি নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেন। এই পর্যায়ে আবদুর রাজ্জাক, হামিদুজ্জামান খান, শামীম শিকদার প্রমুখ ভাস্কর্যকে শুধু অনুশীলননির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, উন্মুক্ত নগর ভাস্কর্যের বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিণত করেন। হামিদুজ্জামানের হাতে এ দেশের ভাস্কর্য নির্মাণশৈলী ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিকতার অনন্য

[৫৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস এবং সহযোগী অধ্যাপক মো. মাকসুদুর রহমানের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ : যথাক্রমে ৭ জুলাই ২০২১ এবং ২৫ জুন ২০২২

উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প বিভাগ মূলত ব্যবহারিক ও লোকজ শিল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এখানে সৃজনশীল আধুনিক চর্চার সূচনা হয়। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মীর মোস্তফা আলী ও আবু সাইদ তালুকদার মৃৎশিল্পের মাধ্যম, গড়ন এবং উপস্থাপনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেন; আর ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের শুদ্ধ চর্চা চলেছে মরণচাঁদ পালের হাতে। আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে এই বিভাগে মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটতে থাকে। মীর মোস্তফা আলীর প্রচেষ্টায় মৃৎশিল্প বিভাগে শিল্পসহায়ক বিভিন্ন মেশিন এবং যন্ত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে বিভাগটি। মাটি প্রস্তুতের জন্য 'পাগমিল', গ্লেজ তৈরির জন্য 'বলমিল', মৃৎপাত্র তৈরির জন্য একাধিক 'প্যাডেল হুইল' এবং কাঠ ও গ্যাসচালিত চুল্লি স্থাপিত হয়েছে মৃৎশিল্প বিভাগে।[৬০] জুনাবুল ইসলাম ও আব্দুস শাকুর শাহর তত্ত্বাবধানে কারুশিল্পের বাটিক, টাইডাই, স্ক্রিনপ্রিন্ট বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আর আব্দুল মতিন সরকার, বুলবন ওসমান, রফিকুল আলম, নাজমা বেগম প্রমুখের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিল্পকলার ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং দার্শনিক শিক্ষা লাভ করেন।

তত্ত্বীয় শিক্ষক ও শিক্ষা : গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস কলেজে উন্নীত হওয়ায় পর ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে তত্ত্বীয় শিক্ষা যুক্ত করা হয়। তখন প্রি-ডিগ্রিতে মোট ৮০০ নম্বরের আটটি বিষয়ের মধ্যে ২০০ নম্বরের দুটি কোর্স ছিল তত্ত্বীয়, তা হলো সাধারণ ইংরেজি ও সভ্যতার ইতিহাস। আর বিএফএ ডিগ্রিতে মোট ৯০০ নম্বরের নয়টি বিষয়ের মধ্যে ২০০ নম্বরের দুটি তত্ত্বীয় পাঠ্য ছিল; তা হলো শিল্পকলার ইতিহাস এবং শিল্পের সমাজতত্ত্ব। ১৯৭৪ সালের প্রি-ডিগ্রির সংশোধিত পাঠ্যক্রমে সাধারণ ইংরেজির বিকল্প বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিরোনামে একটি নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। ১৯৭৮ সালে এমএফএ ডিগ্রি খোলার সময় বিএফএ ও এমএফএ প্রোগ্রামের জন্য নতুন আঙ্গিকে সিলেবাস প্রণয়ন করা হলে সেখানে বিএফএ ডিগ্রি পর্যায়ে পূর্বের তত্ত্বীয় বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু নতুন প্রবর্তিত মাস্টার্স ডিগ্রির সিলেবাসে শতকরা ৫০ ভাগ তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হয়। মাস্টার্স ডিগ্রির প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস, ইসলামিক ও দূরপ্রাচ্যের শিল্প, দক্ষিণ এশীয়ার শিল্প, বিশ শতকের শিল্পকলার ইতিহাস, শিল্প উপকরণ ও করণ-কৌশল এবং নন্দনতত্ত্ব পাঠ্য করা হয়। আর দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস (বিশ শতক) এবং অভিসন্দর্ভ রচনা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিল্পশিক্ষার আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বীয় শিক্ষার কোর্সের সংখ্যা বেড়েছে।

[৬০] মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দেবাশীষ পালের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ৮ জুন ২০২২

এ সকল বিষয়ে পাঠদানের জন্য দেশ স্বাধীনের পূর্বে আব্দুল মতিন সরকার (শিল্পকলার ইতিহাস), বুলবন ওসমান (সমাজতত্ত্ব), দিল আফরোজ কাদের (ইংরেজি) এবং নাজমা বেগম (শিল্পকলার ইতিহাস) আর্ট কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর থেকে আশির দশকের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হন রফিকুল আলম (শিল্পকলার ইতিহাস), সৈয়দ আজিজুল হক (বাংলা) এবং নাহিদ আক্তার (শিল্পকলার ইতিহাস)। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের চারুকলা ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন খণ্ডকালীন বা চুক্তিভিত্তিক থেকে তত্ত্বীয় বিষয়ের এক বা একাধিক কোর্সে পাঠদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা জাদুঘরের সাবেক পরিচালক এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজয় দাস প্রমুখ। শিক্ষকগণ পাঠদান এবং শিক্ষাভ্রমণের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়সমূহে শিক্ষাদান করেছেন। ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ ছিল। কিন্তু ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে শিল্পকলার ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের যে সকল বই সংগৃহীত ছিল, তার অধিকাংশ ছিল ইংরেজিতে লেখা। এ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলায় লেখা বইয়ের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। বাংলা মাধ্যমে পড়ে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য ওই সব ইংরেজিতে লেখা বই পড়ে আত্মস্থ করা কঠিন ছিল। এ কারণে প্রথম পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী তত্ত্বীয় বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়তেন। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য বিষয়গুলো সহজবোধ্য করার জন্য এ সকল শিক্ষক শিল্পকলার ইতিহাস, শিল্পের করণ-কৌশল ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দেশ স্বাধীনের পর শিক্ষক ও শিল্প সমালোচকদের মাঝে শিল্পকলা বিষয়ে লেখালেখির প্রবণতা বাড়তে থাকে। চারুকলার ব্যবহারিক বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষকও এ সময় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং খ্যাতিমান শিল্পীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাঁদের অন্যতম হলেন মতলুব আলী, আব্দুস সাত্তার, ফরিদা জামান, নিসার হোসেন, লালা রুখ সেলিম প্রমুখ।

প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত তত্ত্বীয় শিক্ষকদের মধ্যে বুলবন ওসমান ছিলেন গবেষক ও সুলেখক। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭৩ সালে। তিনি সমাজতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো 'আদিম সমাজ' (১৯৭৫), 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব' (১৯৭৭), 'শিল্প-শিল্পী ও সমাজ' (১৯৭৭), 'বিশ্বশিল্পের ইতিহাস' (২০০২), 'নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা' (২০০৯) ইত্যাদি। গ্রন্থগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে সমাজতত্ত্ব, শিল্প সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব সহজবোধ্য করেছিল। আব্দুল মতিন সরকার পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস ও ইসলামি শিল্পকলা সম্পর্কে পাঠদান করতেন। এ সকল বিষয় নিয়ে তিনি পত্রপত্রিকা ও জার্নালে নিবন্ধ-

প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি নব্বইয়ের দশকে 'চারুকলা' নামে শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাজমা বেগম ইসলামি শিল্পকলা বিষয়ে পাঠদান করতেন। তিনি এ বিষয়ে মাঝে মাঝে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন।

চারুকলা ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার প্রথম পর্যায়ে সৈয়দ আলী আহসান নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে পাঠদান করতেন। তাঁর লেখা নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর (১৯৭৬) পর তাঁকে নিয়ে গবেষণার আগ্রহ বাড়ে চারুকলার শিক্ষক ও শিল্প সমালোচকদের মধ্যে। তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'জয়নুলের জিজ্ঞাসা' (১৯৯০); মতলুব আলীর 'আমাদের জয়নুল' (১৯৮৫); 'জয়নুল স্মৃতি' (১৯৯৪) 'জয়নুলের জলরঙ' (১৯৯৬); নজরুল ইসলামের 'জয়নুল আবেদিন (Art of Bangladesh Series-1, 1994)' এবং সৈয়দ আজিজুল হকের 'জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র' (২০১৫)। বাংলাদেশের আরো কয়েকজন খ্যাতিমান শিল্পীর জীবন ও কর্ম নিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন; যার মধ্যে অন্যতম হলো 'কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম' (১৯৯৮) এবং 'সফিউদ্দীন আহমেদ' (২০১৩)। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস, শিল্প সমালোচনা, সমাজতত্ত্ব, শিল্পের করণ-কৌশল ও লোকশিল্প বিষয়ে আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'বাংলাদেশের শিল্পকলা' (১৯৮২), 'চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের' (১৯৮০), 'সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৯৮০); আব্দুস সাত্তারের 'শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি' (১৯৮৯), নজরুল ইসলামের 'সমকালীন শিল্প ও শিল্পী' (১৯৯৫) ড. ফরিদা জামানের 'আধুনিক চিত্রকলায় লোকশিল্পের প্রভাব' (১৯৯৮) এবং মইনুদ্দীন খালেদের 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্প' (২০০০)। শিল্পকলার ইতিহাসের শিক্ষক ড. রফিকুল আলম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস বিষয়ের বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'উপমহাদেশের শিল্পকলা' (১৯৯৩), 'পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস' (১৯৯৪), 'কিউবিজম ও অনুষঙ্গ' (২০০০), 'বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা' (২০০১)। এ ছাড়া রফিকুন নবী শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন; তরুণ শিক্ষকদের মধ্যে নিসার হোসেন ও লালা রুখ সেলিম লোকশিল্প ও বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হন। লালা রুখ সেলিম বিশ শতকের আশির দশকে *Art* নামে একটি ত্রৈমাসিক শিল্পকলাসংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর অন্যতম গবেষণাকাজ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'চারু ও কারুকলা' (২০০৭) গ্রন্থের সম্পাদনা করা। এখানে দেশের স্বনামধন্য ও তরুণ গবেষকগণ বাংলাদেশের শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক আবুল মনসুর ও ফয়েজুল আজিমও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তাঁরা শিল্পকলাসংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত লিখছেন পত্রপত্রিকা ও গবেষণাধর্মী জার্নালে। আবুল মনসুরের রচিত গ্রন্থ 'জয়নুল আবেদিন' (২০১৩) এবং ফয়েজুল আজিমের 'চারুকলার ভূমিকা' (১৯৯২)। এ সকল শিক্ষক ও শিল্প সমালোচকদের লেখনীর মাধ্যমে দেশ স্বাধীনের পর শিল্পকলাসংক্রান্ত তত্ত্বীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পকলাসংক্রান্ত অধিকাংশ বই ছিল বিদেশি লেখক ও গবেষকদের ইংরেজি ভাষায় লিখিত। দেশ স্বাধীনের পর এ সকল লেখকের বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ শিক্ষার্থীদের কাছে শিল্পকলার ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের পাঠ সহজবোধ্য করেছে।

প্রদর্শনী : শিল্পশিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ হলো প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথা শিল্পীদের শিল্পকর্ম সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের বাছাইকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে প্রায় নিয়মিত বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগভিত্তিক ও শিল্পমাধ্যম অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকায় প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বার্ষিক প্রদর্শনী সাধারণত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিবস ২৯ ডিসেম্বরে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে, চারুকলার বিশেষ আয়োজনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের সাহায্যার্থে এবং রাজনৈতিক সংকটময় সময়ে জনসচেতনা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর চারুকলায় আয়োজিত প্রদর্শনীর মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৭৪ সালে তৎকালীন আর্ট কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগমন ঘটে চারুকলা ইনস্টিটিউটে (তৎকালীন আর্ট কলেজে)। এ ছাড়া ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একক বা দলীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, বিদেশি দূতাবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে চারুকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৯৭৫ সাল থেকে জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ও নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করলে এ দেশের শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। দেশে সৃজনশীল শিল্পচর্চার বিকাশে এই প্রদর্শনী দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চারুকলার শিক্ষার্থীরা এসব প্রদর্শনী থেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখে তাঁদের শিল্পের করণ-কৌশল, শৈলী ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন; যা তাঁদের সৃজনশীল শিল্প সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের সমকালীন চুয়াল্লিশজন শিল্পীর যে প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম চারুকলার আটাশজন সাবেক ও তৎকালীন শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, মোহাম্মদ কিবরিয়া, জুনাবুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, কাইয়ুম চৌধুরী, কাজী আবদুল বাসেত, শামসুল ইসলাম নিজামী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মাহমুদুল হক, মরণচাঁদ পাল, মিজানুর রহিম, হামিদুজ্জামান খান, শহিদ কবীর, আবুল বার্‌ক আল্‌ভী, মাহবুবুল আমীন, আব্দুস সাত্তার ও কাজী গিয়াস উদ্দিন।[৬১]

সত্তরের দশকের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং ওই দশকের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পচর্চা শুরু হয়। এ সময় থেকে শিক্ষার্থীদের সমকালীন শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটি এর পর থেকে নিয়মিত আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে বিশ্বের সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। মূলত এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বের নিউমিডিয়া আর্টসহ সমকালীন শিল্পপ্রবণতার সঙ্গে এ দেশের অধিকাংশ শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছেন। বিশেষ করে জাপানি শিল্পীদের কনসেপচুয়াল আর্ট, ইনস্টলেশন আর্ট স্থানীয় শিল্পীদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জাপানি শিল্পীদের বৃহৎ ইনস্টলেশন আর্ট নির্মাণকাজে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা সহকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[৬২] ফলে এ সকল শিল্পপ্রবণতার প্রতি তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আশির দশকে কয়েকজন তরুণ শিল্পীর (হামিদুজ্জামান খান, অলক রায়, কালিদাস কর্মকার প্রমুখ) শিল্পকর্মে এ সকল নতুন শিল্পপ্রবণতার লক্ষণ দেখা যায়। তরুণ শিল্পীদের নিয়ে সত্তরের দশকে গড়ে ওঠা 'ঢাকা পেইন্টার্স' গ্রুপ এবং আশির দশকে গড়ে ওঠা 'সময়' গ্রুপের শিল্পীদের শিল্পকর্মের বক্তব্য ও উপস্থাপনায় কনসেপচুয়াল আর্টের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে নব্বইয়ের দশকে চারুকলা ইনস্টিটিউটে কনসেপচুয়াল আর্ট ও ইনস্টলেশন আর্টের প্রাথমিক চর্চা শুরু হয় কয়েকজন শিক্ষার্থীর মাধ্যমে; যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অভিজিৎ চৌধুরী, মাহাবুবুর রহমান,

---

[৬১] "ক্যাটালগ", *বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলা প্রদর্শনী*, ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিনিময় প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত, কলকাতায় ১–১১ নভেম্বর, দিল্লিতে ২২–২৯ নভেম্বর, বোম্বে ১১–১৯, ডিসেম্বর ১৯৭৩

[৬২] শিল্পী তরুন ঘোষ ও শিল্পী অভিজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ (যথাক্রমে) : ১৫.০৩.২০২২ এবং ২৮.০৫.২০২২

তৈয়বা বেগম লিপি প্রমুখ।[৬৩] এভাবে আশির দশক থেকে বাংলাদেশে নিউমিডিয়া আর্টের যে নতুন শিল্পপ্রবণতা শুরু হয়েছিল—সেখানে দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে আসা জাপানি শিল্পীদের শিল্পকর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল। শিল্পের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ এ দেশের ব্যাপক সংখ্যক শিল্পী এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পুরস্কৃত হন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন আব্দুস সাত্তার (১৯৮১ : শ্রেষ্ঠ), রাসা (১৯৮৩ : শ্রেষ্ঠ), অলক রায় (১৯৮৫ : সম্মান, ১৯৮৯ : শ্রেষ্ঠ), জি এস কবীর (১৯৯১ : শ্রেষ্ঠ), রনজিৎ দাস (১৯৯১ : সম্মান, ১৯৯৫ : শ্রেষ্ঠ), মনসুর-উল করিম (১৯৯৩ : শ্রেষ্ঠ), মাহমুদুল হক (১৯৯৩ ও ১৯৯৫ : সম্মান), মাহবুবুর রহমান (১৯৯১, ১৯৯৫ : সম্মান ও ১৯৯৯ : শ্রেষ্ঠ), তরুন ঘোষ (১৯৯৭ : শ্রেষ্ঠ), রোকেয়া সুলতানা (১৯৯১ : সম্মান) প্রমুখ।[৬৪] এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী এ দেশের চারুকলা শিক্ষার্থীদের সমকালীন বিশ্বের শিল্পপ্রবণতার সঙ্গে পরিচিত করেছিল এবং নতুনতর শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। প্রদর্শনীতে তাঁদের শিল্পকর্ম স্থান পাওয়া বা পুরস্কৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, তা শিল্পী হিসেবে তাঁদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

গবেষণা ও প্রকাশনা : চারুকলা ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার পর এখানে গবেষণাধর্মী শিক্ষার সূচনা হয়। মাস্টার্স ডিগ্রির সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত 'অভিসন্দর্ভ' রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে গবেষণার ভিত্তি গড়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট হওয়ার পর এখানে তত্ত্বীয় গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ইনস্টিটিউটে অঙ্কন ও নির্মাণ বিষয়ের প্রাধান্য থাকায় এখানে শিক্ষার্থীরা তত্ত্বীয় গবেষণার দিকে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। এ কারণে চারুকলা ইনস্টিটিউটকালে (১৯৮৩–২০০৮) এখানে এমফিল বা পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে আশি ও নব্বইয়ের দশকে চারুকলা ইনস্টিটিউটের কয়েকজন সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রফিকুল আলম, কাজী গিয়াসউদ্দিন, ফরিদা জামান প্রমুখ। রফিকুল আলম ভারত সরকারের বৃত্তির অধীনে বেনারস হিন্দু কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে, কাজী গিয়াসউদ্দিন জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে টোকিও জাতীয় চারুকলা ও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে, ফরিদা জামান ভারত সরকারের বৃত্তির অধীনে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

[৬৩] নাসিমুল খবির, "সাম্প্রতিক দৃশ্যশিল্পে ধারণা প্রধান নতুন প্রবণতা", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ২৩৮–২৪২

[৬৪] *ক্যাটালগ*, দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৯৮১, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯ সাল

চারুকলা ইনস্টিটিউট ২০08 সালে অনুষদে রূপান্তরিত হওয়ার পর এখানে পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ২০০৯–১০ শিক্ষাবর্ষে মলয় বালা প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রথম পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হন। ঢাকার আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তি হন জেসমিন আক্তার ২০০5–০৬ শিক্ষাবর্ষে। এ দুজনই প্রথম সফলভাবে পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন।

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে আশির দশক পর্যন্ত এখান থেকে কোনো গবেষণাধর্মী সাময়িকী ও গ্রন্থ প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ও অন্যান্য শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, প্রসপেক্টাস, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্মরণিকা, রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের সপক্ষে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে এবং গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'-এর প্রথম (১৯৫১) এবং দ্বিতীয় (১৯৫২) প্রদর্শনীর ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে ১৯৬১ সালে আয়োজিত বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ক্যাটালগ এবং ১৯৬৫ সালে আয়োজিত তৎকালীন আর্ট কলেজের ১৬ জন শিক্ষকের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ক্যাটালগ সম্পর্কে জানা যায়। ১৯৬৫ সালে আর্ট কলেজের উদ্যোগে 'Prospectus of the East Pakistan College of Arts and Crafts' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের সপক্ষে 'উনসত্তরে ছড়া' শীর্ষক রম্য ছড়ার সংকলন প্রকাশিত হয় আর্ট কলেজের ছাত্রসংসদের উদ্যোগে।

দেশ স্বাধীনের পর থেকে আশির দশকের মধ্যে ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হলো ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণিকা। এই স্মরণিকায় ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তৎকালীন কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, প্রসপেক্টাস, ছড়ার সংকলন ও স্মরণিকা সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর বার্ষিক প্রদর্শনী প্রায় নিয়মিত হলেও সকল প্রদর্শনীর ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত ক্যাটালগগুলোর মধ্যে ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮২–৮৩ সালের প্রদর্শনীর ক্যাটালগের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সকল প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে বিভাগভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা থেকে ওই সময়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জানা যায়। ক্যাটালগের ভূমিকা ও আহ্বায়কের বক্তব্যের মধ্যে চারুকলা ইনস্টিটিউটের তৎকালীন অবস্থা, কার্যক্রম, সুবিধা ও অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় দাবিদাওয়া তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অবদান : ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী সুনামের সঙ্গে শিক্ষা নিয়েছেন এবং শিক্ষা শেষে শিল্পচর্চা ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বৃহৎ একটি অংশ চারুকলা বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট (পরবর্তীকালে অনুষদ), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে (পরবর্তীকালে ইনস্টিটিউট) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ (পরবর্তীকালে অনুষদ) এবং বিভিন্ন আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত হন মাকসুদুর রহমান (গ্রাফিক ডিজাইন), ফারুক আহাম্মদ মোল্লা (কারুশিল্প), নাসিমা হক মিতু (ভাস্কর্য), মোহাম্মদ ইকবাল আলী (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ), এ এ এম কাওসার হাসান (ভাস্কর্য), দেবাশীষ পাল (মৃৎশিল্প), মো. আনিসুজ্জামান (প্রিন্টমেকিং), আজহারুল ইসলাম শেখ (মৃৎশিল্প), সাবরিনা শাহনাজ (শিল্পকলার ইতিহাস) এবং দুলাল চন্দ্র গাইন (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে নিযুক্ত হন আলপ্তগীন তুষার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে মইনুল ইসলাম পল (ভাস্কর্য), ফজলুল করিম (মৃৎশিল্প), আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী (প্রিন্টমেকিং), হাসান আশিক (শিল্পকলার ইতিহাস), শেখ মনির উদ্দিন (শিল্পকলার ইতিহাস; পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত), মুকুল কুমার বাড়ৈ (ভাস্কর্য; পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত), আব্দুস সুবহান হীরা (প্রিন্টমেকিং) ও সুশান্ত কুমার অধিকারী (প্রাচ্যকলা; পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে নিযুক্ত), খুলনা আর্ট কলেজে (পরবর্তীকালে আর্ট ইনস্টিটিউট) নিযুক্ত হন নজরুল ইসলাম অঘ্রাণী (চিত্রকলা) এবং শেখ সাদী খান (ভাস্কর্য)।

চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে এবং অংশগ্রহণে নব্বইয়ের দশক থেকে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরে বেশ কয়েকটি আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। যেমন সমিরণ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালে নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট এবং হেলেনা খান ইরানীর অধ্যক্ষতায় ১৯৯৮ সালে বগুড়া আর্ট কলেজ এবং জয়নাল আবেদিন তরফদারের নেতৃত্বে ২০০৪ সালে ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে। আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা অনেক শিক্ষার্থী এ সকল আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

একুশ শতকের সূচনাকালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ চালু করে; ২০০২ সালে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (UODA) ও ২০০৩ সালে শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে চারুকলা অনুষদ খোলা হলে সেখানে চারুকলা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ঢাকা চারুকলাসহ অন্যান্য শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে একুশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে নিয়োজিত এ সকল শিক্ষক বাংলাদেশের সমকালীন শিল্প আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। চারুকলার বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থী সাধারণ স্কুল-কলেজে চারুকলার শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়ে এবং আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাঝে শিল্পশিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সমকালীন শিল্পচর্চায় এবং কর্মক্ষেত্রে শিল্পসংক্রান্ত কাজে বিশেষ অবদান রাখছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের গোলাম রব্বানী শামীম, মো. সামসুল আলম আজাদ, সমিরন বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম তন্ময়, সুনীল রঞ্জন হাওলাদার, মাহমুদুর রহমান দীপন, অভিজিৎ চৌধুরী, শাহ্ মুশফিকুর রহমান বিপুল, মাহাবুবুর রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি, অরূপ বড়ুয়া, মো. মিজানুর রহমান, অনুকূল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ; গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে সঞ্জীব দাস অপু, কিরিটী রঞ্জন বিশ্বাস, বিপ্লব সরকার, সুব্রত অধিকারী, সাইমুম রেজা প্রমুখ; মৃৎশিল্প বিভাগের রাশেদুল হুদা, মিনহাজউদ্দিন কর্নেল, হালিমুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন খান, ফাতেমা আক্তার প্রমুখ; প্রাচ্যকলা বিভাগের সুকুমার বাগচী, মো. ইলিয়াস খান, রিয়াজুল ইসলাম সোহেল প্রমুখ; ভাস্কর্য বিভাগে শহিদুজ্জামান শিল্পী, নিয়ামুল বারী, সাখাওয়াত হোসেন, এজাজ এ কবীর প্রমুখ; প্রিন্টমেকিং বিভাগের রফি হক, মো. মনিরুজ্জামান, ফখরুল আলম তোফা প্রমুখ এবং কারুশিল্প বিভাগের শফিকুল কবীর চন্দন, রেজাউল ইসলাম লাভলু, জাহির হাসান নিউটন, শাহীন সোবহান সুরভী প্রমুখ।

এ ছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা, সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, রুচিশীল ফার্নিচার কোম্পানি, ফ্যাশন হাউস, বুটিকসহ ব্যবহারিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারুকলার অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া অনেকেই ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবহারিক চারু ও কারুশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদনে নিয়োজিত থেকে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এভাবে চারুকলার শিক্ষার্থীরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে সৃজনশীল ও রুচিশীল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

চিত্র-৭২ : চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা, আলোকচিত্র : মোহাম্মদ আসাদ

ঐতিহ্য সচেতনতা : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্য সচেতন ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে নানা আয়োজন চলেছে দেশ স্বাধীনের পরেও। এ সকল আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির বিজয় কামনা। ১৯৮৮–৮৯ সালে স্বৈরাচার সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অপশক্তির অবসান ও শুভ শক্তির বিজয় কামনায় চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে (১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল) প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। চারুকলা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সংস্কৃতিকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত হয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা লোকজ ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, যেমন—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, পুতুল (বিশেষ করে টেপা পুতুল), পাখি ইত্যাদির বৃহৎ প্রতিকৃতি এবং মুখোশের মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী এবং সাবেক শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ সকল উপকরণ তৈরি করা হয়। এ সকল মুখোশ ও বিভিন্ন জিনিসের (হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি) বৃহৎ প্রতিরূপ নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৃহৎ শিল্পবস্তু নির্মাণ সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাংলা নববর্ষকে বরণ করার এই আয়োজন ধীরে ধীরে ঐতিহ্য সচেতন সাধারণ মানুষের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। চারুকলা ইনস্টিটিউটের অনুকরণে ধীরে ধীরে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের প্রতিটি প্রান্তে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়। এভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন একটি ধর্মনিরপেক্ষ

উৎসবে পরিণত হয়। ২০১৬ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রা জাতিসংঘের ইউনেসকো কর্তৃক Intangible Cultural Heritage হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে চারুকলার উদ্যোগে জয়নুল উৎসবের আয়োজন করা হয়। জয়নুল উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিল্পশিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জয়নুল সম্মাননা প্রদান এবং লোক ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা। এ ছাড়া চারুকলা ইনস্টিটিউট তথা অনুষদকে ঘিরে চৈত্রসংক্রান্তি আয়োজন, বৈচিত্র্যময় ষড়ঋতু বরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এভাবে বাঙালির ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে চারুকলা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সমকালীন বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং বর্তমান চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প সহায়ক যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে এবং বিভাগ থেকে সেগুলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারুকলায় মাধ্যমগত বৈচিত্র্য এসেছে, শিল্পকলাসংক্রান্ত নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার আবির্ভাব হয়েছে—যা চারুকলার শিক্ষাক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনও ঘটানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা শিক্ষা শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের আধুনিক উচ্চশিক্ষার সঙ্গে এ দেশের শিল্পশিক্ষা যুক্ত হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শুরু হয়েছে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী শিক্ষা। স্নাতক পর্যায়ে অনার্স কোর্স চালু করে কোর্স-কারিকুলাম ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে সমকালীন সর্বাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সময় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্বের সমকালীন অভিনব শিল্পপ্রবণতাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে ধারণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার পর অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন ধারার চর্চা এ সময় ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ব্যবহারিক শিল্পের বিভাগগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ও যন্ত্রের ব্যবস্থা করে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার ফলে সেখানকার শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মতৎপরতায় আশির দশকের মধ্যে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসে চারুকলা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের ফলে এখানে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী চারুশিল্প বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বাস্তবভিত্তিক শিল্পশিক্ষা, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী ব্যবহারিক এবং গবেষণাধর্মী তত্ত্বীয় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে এ দেশে আধুনিক শিল্পের অগ্রযাত্রা আরো গতিশীল হয়েছে।

এই গবেষণার সময়কাল ১৯৪৭–১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের পর আজ আরো পঁয়ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আরো অধিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; শিল্পশিক্ষার সার্বিক উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে আটটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে সাতটি আর্ট কলেজ। এই গবেষণায় আলোচ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, চারুকলা অনুষদে (২০০৮); চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ ও চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সমন্বয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটে (২০১০); রাজশাহী আর্ট কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে (২০১৫) এবং খুলনা আর্ট কলেজে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা স্কুলে (২০১৮) উন্নীত হয়েছে। দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, সুগঠিত আধুনিক সিলেবাস এবং সর্বাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে শিল্পচর্চার অত্যাধুনিক প্রবণতা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর পরও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিল্পশিক্ষাকে আরো গঠনমূলক ও যুগোপযোগী করার জন্য কিছু প্রস্তাবনার উল্লেখ করা হলো।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষাক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন বেসিক শিক্ষা এবং উচ্চতর শিল্পশিক্ষার পর্যায়ক্রমিক বিষয়টি শিক্ষাদানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে। শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বের বেসিক কোর্স তুলে দেওয়া হয়েছে। বেসিক কোর্স পুনরায় চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ স্কুল পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব কম থাকায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী দুর্বল ভিত্তি নিয়ে চারুকলায় অনার্স প্রগ্রামে ভর্তি হয়। বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য চারুকলা শিক্ষায়ও সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। বিশ্বের সকল আধুনিক শিক্ষা বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিক্ষাদান, নিউমিডিয়া আর্ট চর্চা, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগসহ ব্যবহারিক শিল্পের বিভাগগুলোতে শিল্পকর্ম সৃষ্টি ও উপস্থাপনের জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের শিল্প নির্মাণে সহায়ক যন্ত্রপাতি ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সরবরাহ করা। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করার জন্য গবেষণার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, নিয়মিত প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন ও জার্নাল প্রকাশ করা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সাথে আধুনিক শিল্পচর্চার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কারিগরি দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ—এ দুটির মধ্যে ভারসাম্য রেখে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী চারুকলার বিভিন্ন বিষয়ের কৃৎকৌশল অর্থাৎ কারিগরি দিক (যেমন উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং সৃজনশীলতার অর্থাৎ কল্পনা, উদ্ভাবন, চিন্তন ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিশ্বশিল্পের বিভিন্ন প্রবণতার সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল শিল্পকর্ম সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সারা বিশ্বে শিল্পশিক্ষার প্রধান দুটি দিক ছিল : একাডেমিক নিয়ম-কানুন মেনে বিভিন্ন মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক শিল্পচর্চা এবং গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক পর্যন্ত বাস্তবভিত্তিক শিল্পশিক্ষা এবং স্নাতকত্তোর পর্যায়ে স্বাধীনভাবে শিল্পশিক্ষা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা চারুকলায় মৌলিক ধারণা লাভের পর গবেষণাধর্মী আধুনিক শিল্পশিক্ষা শুরু করেন।

মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে আধুনিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অনেকেই আধুনিক সময়কালকে ‘আধুনিক’ বলার চেয়ে বিভিন্ন অভ্যাস, রুচি বা প্রবণতার কালপর্ব হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করে বললে, আধুনিকতা শব্দটি একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, যে সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলো সতেরো থেকে বিশ শতকের পশ্চিমা সমাজে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং মানব ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ‘বলা যায়, শিল্পবিপ্লব-পূর্ব পৃথিবীর শিল্পের প্রকরণ, স্থাপত্য, সাহিত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, বাস্তুতন্ত্র, ভৌগোলিক কাঠামো, প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক সংস্থা ও দৈনন্দিন জীবনের ঐতিহ্যিক ধারাকে অস্বীকার করে নতুন ও বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞাননির্ভর জীবনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই আধুনিকতা।’[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিকতাকে নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে বিচারের চেয়ে এর বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তনের প্রবণতা দিয়ে বিচারের পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।’[২] কখনো কখনো সাম্প্রতিক-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘আধুনিক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণের কাছে আধুনিকতা মানে চলমানতা বা সাম্প্রতিক বা অগ্রসরমাণ অবস্থা। সমকালীন কিছু ভাবনার আলোকে, নতুন দৃষ্টিকোন থেকে শিল্পীর নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকলে তাকে সাধারণভাবে ‘আধুনিক’ বলে মেনে নেওয়া হয়।[৩]

---

[১] মামুন অর রশিদ, *উত্তর-আধুনিকতা*, ঢাকা, সংবেদ, ২০২২ [প্র.প্র. ২০১৯] পৃ. ১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৩] রবীন মণ্ডল “ত্রিকলায় আধুনিকতা” উৎপল সেনগুপ্ত (সম্পা.), *ভারতীয় শিল্পকলায় আধুনিকতা*, পারুল, ২০১৭, পৃ. ২১

আধুনিকতার সময়কাল অঞ্চলভেদে এবং বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। যেমন ইউরোপের আধুনিক যুগের সময়কালের সাথে ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের সময়কালের পার্থক্য রয়েছে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে ১৪৫৩ সাল থেকে। আবার ক্রিশ্চিয়ান রিফর্মেশনের দৃষ্টিতে দেখলে আধুনিক যুগের সূচনা ১৫১৭ সাল থেকে। ইউরোপীয় উপনিবেশের উত্থান ও শিল্পায়িত নগরভিত্তিক সময়টিকেও আধুনিক যুগ বলা হয়। এ বিবেচনায় সতেরো শতককে ইউরোপীয় আধুনিক যুগের সুবর্ণকাল বলা হয়ে থাকে।[৪]

শিল্প-ইতিহাসের আধুনিকতার চূড়ান্ত রূপ উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হয়ে বিশ শতকের প্রথম ভাগে গিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে আকৃতির পরিবর্তন (Distrotion of shapes), বিষয়ের চেয়ে শিল্পের রূপকল্প বা আঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া, শিল্পের স্থান ও কালের সীমা ভেঙে দেওয়া এবং সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধ ভেঙে শিল্পে প্রয়োগ করা। সাধারণ ও প্রাথমিক অর্থের বিচ্যুতি (Dislocation of meaning), ইতিহাস ও পুরাণ আশ্রয় থেকে মুক্তি, অবচেতন মনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, আদর্শ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো প্রভৃতি।[৫] উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের চিত্রের মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের সূচনা হয়। এরপর ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, ফবইজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম এবস্ট্রাক্ট-এক্সপ্রেশনিজম প্রভৃতি শিল্পান্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প পূর্ণতা পায়।

ভারতে আধুনিক শিল্পের সূচনাকাল সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে। যাঁরা স্বদেশ চেতনা ও ঐতিহ্য চেতনায় আস্থাশীল, তাঁরা অবনীন্দ্রনাথকে আধুনিক শিল্পের সূচনাকারী বলে মনে করেন। তাঁদের মতে ভারতে আধুনিককালে ব্যক্তিশিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের শুরু অবনীন্দ্রনাথ থেকেই। আবার আধুনিক জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রতিফলনকেই যাঁরা আধুনিকতার মাপকাঠি বলে ধরে নেন, তাঁরা ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেই মনে করেন আধুনিকতার প্রথম পথিকৃৎ। অনেকে আবার বিশ শতকের চল্লিশের দশকে গড়ে ওঠা 'ক্যালকাটা গ্রুপ' বা মুম্বাইয়ের 'প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ'-এর অন্তর্গত শিল্পীদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সমন্বয়ধর্মী কাজের মধ্যেই আধুনিকতার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে বলে মনে করেন। উনিশ শতকে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিল্পশিক্ষার শুরু হওয়ার সময়কালে আধুনিকতার সূচনা বলে মনে করেন অনেকে। ব্রিটিশ একাডেমির স্বাভাবিকতার (বাস্তবভিত্তিক) রীতির সূচনা হয় সেখান

[৪] মামুন অর রশিদ, *উত্তর-আধুনিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

থেকে। ভারতীয় চিত্রকলার একাডেমিক বাস্তবতার এই বিকাশকে পার্থ মিত্র *Art and Nationalism in Colonial India: 1850–1922* গ্রন্থে ‘The Age of optimism’ বা আশার যুগ বলেছেন।[৬]

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা হয় দেশবিভাগের পর পাশ্চাত্যধারায় শিল্পশিক্ষা শুরুর সময় থেকে। ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন ঘটেছিল জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ প্রমুখ সমকালীন শিল্পীদের। এদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন কলকাতায় অবস্থানকালে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার মাধ্যমে আধুনিক ধারার শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্প এবং দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে আধুনিক শিল্পচর্চা শুরু করেন। মূলত তাঁর অনুগামী ছিলেন উল্লিখিত অধিকাংশ শিল্পীবৃন্দ। পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে দেশে-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল তরুণ শিল্পীর হাতে এ দেশের আধুনিক শিল্পের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে। সত্তরের দশক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারুশিল্পী বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তনের পর এদেশে আধুনিক শিল্পচর্চা বহুধারায় বিকশিত হতে থাকে।

এখানে এলিমেন্টারি ও অ্যাডভান্সড কোর্সে ইউরোপীয় একাডেমিক রীতিতে (ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ বাদে) বাস্তবভিত্তিক অঙ্কন ও নির্মাণ কৌশল হাতে-কলমে শেখানো হতো। ওই সময়ে বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় স্নাতক পর্যায়ে সাধারণত বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইনস্টিটিউটের অ্যাডভান্সড কোর্সের শিক্ষা স্নাতক সমমানের শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রথম পর্যায়ে এখানে ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৫ সালে ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগ খোলা হলেও এ বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভাবে তা বিকাশ লাভ করেনি। উল্লিখিত বিভাগগুলোর মধ্যে সৃজনশীল চর্চার অন্যতম বিভাগ ছিল ফাইন আর্ট। শিক্ষকদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল থেকে ফাইন আর্ট বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিল্পের বেসিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নিজস্ব প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শিল্প থেকে ধারণা নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সৃজনশীল চিত্রচর্চা শুরু করেন।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মধ্য দিয়ে জয়নুল আবেদিনের আধুনিকতার পথে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫১–৫২ সালে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে সেই যাত্রায় তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। বাংলা ভাষা ও

---

[৬] মৃণাল ঘোষ, *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৫, পৃ. ৯৯

সংস্কৃতির আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের যে আন্দোলন চলেছিল তার প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপ (লন্ডন) ভ্রমণকালে সেখানকার বিভিন্ন জাদুঘরে রক্ষিত দেশীয় ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও সমাদরে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারুশিল্পের প্রতি তাঁর নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। এ সময় সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। লোক-ঐতিহ্য ও দেশজ বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবিত জ্যামিতিক ফর্ম ও উজ্জ্বল রঙের সমন্বয়ে আধাবিমূর্ত ধারায় আঁকা চিত্রকর্মের মাধ্যমে তিনি একটি স্বতন্ত্র চিত্রধারা সৃষ্টি করেন। শিল্প সমালোচক নজরুল ইসলাম যাকে 'আধুনিক বাঙালি' রীতি বলে অভিহিত করেছেন। এই চিত্রকর্মগুলো দেখে ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক রিচার্ড উইলসন ১৯৫৫ সালে লিখেছেন, এক হিসেবে বলতে হয় তাঁর এ সকল কাজ পাক-ভারতীয় চিত্রকলাকে আধুনিক যুগে উত্তরণের সূচনা করেছে।[৭] এভাবে জয়নুল আবেদিনের চিত্রের মাধ্যমে এ দেশে আধুনিক চিত্রচর্চার সূচনা হয়। তাঁর ঐতিহ্য সচেতন মনোভাব এবং 'আধুনিক বাঙালি' রীতির কাজের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন কামরুল হাসান। ওই সময়ের তরুণ শিল্পীদের চিত্রেও জয়নুলের প্রভাব ছিল। কামরুল হাসানের চিত্র ছিল বাংলার লোকশিল্প দ্বারা প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের সময় পটচিত্র আঁকার অভিজ্ঞতা, জয়নুলের কাজের প্রভাব এবং যামিনী রায়ের চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে কাজ করেছিল। ষাটের দশকে এসে 'বাংলার লোকশিল্পের সরাসরি অনুসরণ ও যামিনী রায়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠে তিনি বিভিন্ন নিরীক্ষায় রত হন—দেশজ উপাদানের সাথে মিলিত করেন পিকাসো, মাতিস প্রমুখের রেখাচিত্রের সংক্ষিপ্ত নিশ্চিত, অতিরঞ্জন ও রূপান্তরন, কিংবা কিউবিজম সদৃশরূপে বস্তুকে একই চিত্রতলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার উপস্থাপনা।'[৮] বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কামরুল হাসান প্রথাবদ্ধ আদর্শ গ্রামীণ দৃশ্যপট পরিবর্তন করে হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশি সমসাময়িক ও সমাজ সচেতন। সফিউদ্দীন আহমেদ প্রথম প্রজন্মের অন্যতম সৃজনশীল শিল্পী। তাঁর চিত্র ও ছাপচিত্রকর্মের প্রধান বিষয় ছিল জল, মাছ ও নৌকা এবং প্রতীকায়িত চোখ। ক্রমশ তিনি জ্যামিতিক বিন্যাসে আধাবিমূর্ত চিত্রের দিকে ঝুঁকেছেন এবং সেই সাথে তিনি লোকশিল্পের নানা দিকে তাঁর চিত্রে সম্পৃক্ত করেছেন। আনোয়ারুল হক ও খাজা শফিক আহমেদের চিত্রে গ্রামবাংলার দৃশ্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, উৎসব প্রভৃতি তাঁদের নিজস্ব শৈলীতে সমবাস্তববাদী ধারায় রূপায়িত হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার প্রথম পর্যায়ের শিল্পীদের কাজে দেশীয় ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এমন হওয়ার পিছনে ওই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে ভূমিকা

---

[৭] নজরুল ইসলাম, *আর্ট অব বাংলাদেশ, সিরিজ-১: জয়নুল আবেদিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮] আবুল মনসুর, "ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

রেখেছিল। দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে সমগ্র পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় এ দেশের আধুনিক শিল্পকলার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। এ জন্য শিল্পশিক্ষার সম্প্রসারণ, শিল্পীদের আর্থিক ও নৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শিল্পচর্চা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়াসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আধুনিক শিল্পের বিপরীতে তারা একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ ও অঞ্চলের সমৃদ্ধ শিল্পকলার সমন্বয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারা গড়ে উঠে। কিন্তু পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চরিত্র ধারণ করায় এই আদর্শে আধুনিক শিল্পকলার বিকাশের পক্ষে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান ভারতীয় শিল্পকলার অনেকাংশ বাদ দিয়ে মুঘল ও পারস্য চিত্রকলাকে মূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে শিল্পচর্চা করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্পী, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীরা সেটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশবিভাগের পর থেকে শুরু হওয়া ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে।[৯] এক প্রসঙ্গে ইফতেখার দাদি *Modernism and the Art of Muslim South Asia* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—'For all the reasons, modernist art in Pakistan did not simply work out an agenda framed by nationalism, unlike perhaps Indian modern Art.[10]

পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের প্রভাবে ঢাকায় আধুনিক শিল্পের যুগান্তকারী উত্থান ঘটে তরুণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে। এই পর্যায়ের শিল্পীদের একটি অংশ ঢাকা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক শিল্পচর্চার শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্যায় থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থী এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়েছিলেন। যাঁরা শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে আধুনিক শিল্পান্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হামিদুর রহমান প্যারিস ও

---

[৯] Dadi Iftikhar, *Modernism and the Art of Muslim South Asia*, The University of North Carolina Press, USA, 2010, P. 20-31

[১০] Ibid, P. 31

লন্ডনে (১৯৫০–১৯৫৬ : চিত্রকলায়), আমিনুল ইসলাম ফ্লোরেন্স থেকে (১৯৫৩–১৯৫৬ : চিত্রকলায়, ম্যুরালে স্বল্পকালীন কোর্সসহ); দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী আবদুর রাজ্জাক যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া থেকে (১৯৫৫–১৯৫৭ : প্রিন্টমেকিংয়ে, ভাস্কর্যে স্বল্পকালীন কোর্সসহ), রশিদ চৌধুরী স্পেনের মাদ্রিদ থেকে (১৯৫৬–১৯৫৭ : ভাস্কর্যে) এবং মুর্তজা বশীর ফ্লোরেন্স থেকে (১৯৫৬–১৯৫৮ : চিত্রকলা, ফ্রেস্কোয় সংক্ষিপ্ত কোর্সসহ) উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি তাঁরা সেখানকার জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিল্পকলার প্রবণতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করেন। তাঁরা পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পধারায় বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পকর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিতও হন। দেশে ফিরে এ সকল শিল্পী পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পের অনুসরণে বিমূর্ত বা আধাবিমূর্ত চিত্রচর্চার মাধ্যমে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে এ দেশে আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান। তখনো বিদেশে যাননি এমন কয়েকজন শিল্পীও এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। যাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাজী আবদুল বাসেত অন্যতম। তাঁরা আধুনিক শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন কলকাতা বা ঢাকা থেকে অর্জিত চারুকলা বিষয়ে মৌলিক শিক্ষার উপর ভিত্তিকরে। পরবর্তীকালে বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তাঁদের আধুনিক শিল্পচর্চা আরো পরিশীলিত হয়েছিল। মোহাম্মদ কিবরিয়া ১৯৬১ সালের পরে জাপানের টোকিও জাতীয় চারুকলা ও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রকলা ও ছাপচিত্র বিষয়ে এবং কাজী আবদুল বাসেত (১৯৬২–৬৩) চিত্রকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পঞ্চাশের দশকে আধুনিক শিল্পচর্চার সাথে আরো জড়িত ছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, কাজী আবদুর রউফ, মবিনুল আজীম, শাহতাব প্রমুখ।

পঞ্চাশের দশকের আধুনিক শিল্পান্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল বিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পান্দোলনসমূহ। বিশেষ করে ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম, সুরিয়েলিজম ইত্যাদির প্রভাব। পঞ্চাশের দশকের পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতিরও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিশেষ করে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন, সামরিক স্বৈরতন্ত্রের উত্থান এবং বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন ইত্যাদি কারণে ওই সময়ের শিল্পীদের বিমূর্ততার দিকে ঝোঁকার একটি কারণ বলে শিল্প সমলোচকগণ মনে করেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ক্যালিগ্রাফিভিত্তিক এবং ভারতে ধর্মীয় কাহিনিভিত্তিক যে সমকালীন সৃজনশীল শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল এ দেশের শিল্পীরা সেদিকে না গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কেউ সেটিকে দেশীয় ঐতিহ্যের সাথে মিশিয়ে একটি দেশজ আধুনিকতায় রূপ দিয়েছিলেন, আবার কেউ সরাসরি সেটা ধারণ করে একটি বিশ্বজনীন শিল্পধারা তৈরি

করতে চেষ্টা করেছিলেন। তরুণ শিল্পীদের শিল্পচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বজনীন ছবি আঁকা। দেশীয় ঐতিহ্যের বিষয়টি তাঁদের অনেকের কাছে বিবেচ্য ছিল না। কিন্তু জয়নুল আবেদিন ও তাঁর অনুসারীরা শিল্পে জীবনবোধ, নিজ সমাজ ও ঐতিহ্যের সমন্বয় প্রত্যাশা করতেন।[১১]

পঞ্চাশের দশকের তরুণ শিল্পীদের আধুনিক ধারার চিত্র শিল্প সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়েছে। মোহাম্মদ কিবরিয়া আধুনিক ধারার তেলরং চিত্রের জন্য ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার এবং ১৯৫৯ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত তরুণ শিল্পী প্রদর্শনীতে স্টারলেম পুরস্কার লাভ করেন। কাজী আবদুল বাসেত ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের জাতীয় প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার প্রাপ্তি শিক্ষানবিশ তরুণ শিল্পীদের আধুনিক শিল্প চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

পঞ্চাশের দশকে আধুনিক শিল্পচর্চার আর একটি মাধ্যম ছিল ছাপচিত্র। আর্ট ইনস্টিটিউটে তখন ছাপচিত্রের স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা না হলেও উডকাট, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি বিষয় ইনস্টিটিউটের এলিমেন্টারি ও অ্যাডভান্সড পর্বে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ সময়ে ছাপচিত্রের অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন সফিউদ্দীন আহমেদ ও হবিবুর রহমান। পঞ্চাশের দশকে সফিউদ্দীন আহমেদ লন্ডন থেকে এবং মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান থেকে ছাপচিত্র বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফেরার পর তাঁদের মাধ্যমে এ দেশে আধুনিক ছাপচিত্র চর্চার বিকাশ ঘটে। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে আর্ট ইনস্টিটিউটে আধুনিক ছাপচিত্র শিক্ষা শুরু হয়েছিল।

ষাটের দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এই দশকের প্রথম পর্যায়ে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস পূর্ণাঙ্গ সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয় (১৯৬৩) এবং সেখানে চিত্রকলা ও ব্যবহারিক শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, প্রিন্টমেকিং ও কারুশিল্প বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজ হওয়ার পর এখানে ইংরেজি, মানবসভ্যতার ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব পাঠ্য করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিল্পকলার ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়, যা তাঁদের আধুনিক মানসিকতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

১৯৬৩ সালে আবদুর রাজ্জাককে বিভাগীয় প্রধান করে ভাস্কর্য বিভাগ খোলা হয়। নভেরা আহমেদের পরে আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে আবারও এ দেশে সৃজনশীল ভাস্কর্যের চর্চা শুরু হয়। ১৯৬৩–১৯৭০ সাল পর্যন্ত আর্ট কলেজের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ভাস্কর্য শেখানো হতো। এ সময়ে ভাস্কর্য বিষয়ে বেসিক

[১১] নজরুল ইসলাম, *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩–১১৪

শিল্পশিক্ষা প্রদান করা হলেও কিছু কিছু শিক্ষার্থী নিজস্ব উদ্যোগে আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার দিকে ঝুঁকেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনোয়ার জাহান আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং নিজ প্রচেষ্টায় ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাস্কর্যের প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯৬৭ সালে ঢাকা জাদুঘরে এবং দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয় ১৯৬৯ সালে আর্ট কলেজের গ্যালারিতে। প্রদর্শিত ভাস্কর্যগুলোর অধিকাংশ মাধ্যম ছিল কাঠ। এ সকল ভাস্কর্যে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাস্কর্যের প্রভাব স্পষ্ট। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এ দেশে ভাস্কর্যের আধুনিক চর্চা শুরু হয় ষাটের দশক থেকে।

ষাটের দশকে এসেও পঞ্চাশের দশকের শিল্পীরাই আধুনিক শিল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের প্রধান শিল্পীদের দু-একজন ছাড়া অন্য সকলেই ষাটের দশকে পরিণত হয়েছিলেন পুরোপুরি বিমূর্তধারার শিল্পীতে এবং শিল্পচর্চা পরিণত হয়েছিল চিত্রতলে শুধু একটি বিমূর্ত বিন্যাস চর্চায়। বিষয় ও বক্তব্যের চেয়ে মাধ্যমের দক্ষতা এবং বিন্যাসের চাতুর্যই শিল্পীদের কাছে অধিকতর বিবেচ্য হয়ে উঠে এই সময়ে। অবশ্য কিছু শিল্পী আধা-বিমূর্ত ধারার দেশীয় বিষয় ও প্রেক্ষাপটে এ সময় চিত্র রচনা করেছেন, কারো কারো চিত্রে দেশীয় বিভিন্ন মোটিভ সংযোজনের চেষ্টাও লক্ষ করা যায়।[১২] এই দশকে আবির্ভূত সৃজনশীল শিল্পীবৃন্দ হলেন আবু তাহের, মুস্তাফা মনোয়ার, আবদুল মুকতাদির, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, মোহাম্মদ মহসীন, মনিরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, আমিরুল ইসলাম, আনোয়ারুল হক পিয়ারু, রুমি ইসলাম, রফিকুন নবী, মিজানুর রহিম, মাহমুদুল হক, রেজাউল করিম, হামিদুজ্জামান খান, শহিদ কবির, আবুল বার্‌ক আল্‌ভী প্রমুখ।[১৩] মুস্তাফা মনোয়ার ছাড়া সকলেই ছিলেন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও শিল্পকলার ইতিহাসে কিছু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। এই দশকের শুরুতে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই দশকের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার মাধ্যমে এ দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চারুকলার উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই দশকের শেষ পর্যায়ে ঢাকার আর্ট কলেজে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পান। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার মাধ্যমে এখানে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী শিল্পশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়; যা সৃজনশীল তথা আধুনিক শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশ স্বাধীনের পর ভারত, জাপান, চীনসহ ইউরোপের দু-একটি দেশের সরকার বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তির সুযোগ করে

---

[১২] নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০–৪১

[১৩] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৫, পৃ. ৩৬

দেয়। এই সুযোগে বিদেশ থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এ সকল দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষার্থীরা বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের সান্নিধ্যে থেকে এবং আর্ট গ্যালারি, জাদুঘর ইত্যাদি পরিদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কে ধরণা লাভ করেন। এ সকল তরুণ শিল্পীর হতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প নতুন মাত্রা পায়।

১৯৪৮-১৯৬৯ সময়কালে এদেশে সর্বোচ্চ স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের পর শিল্পীরা নিজস্ব প্রচেষ্টার অথবা উচ্চতর শিক্ষার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিল্প চর্চা করতেন। ওই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আধুনিক শিল্পচর্চার উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকায় এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী চারুকলা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা থেকে ছিল বঞ্চিত।

সত্তরের দশকের শুরুতে রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলা হলে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মধ্য দিয়ে এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী শিক্ষার সূচনা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়। তিনি মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহিম এবং নাট্যকার জিয়া হায়দারকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রামে আধুনিক শিল্পশিক্ষার একটি নতুন বাতাবরণ গড়ে তোলেন। শিল্পশিক্ষাকে গবেষণাধর্মী শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে এখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পদর্শন বিষয়ে তত্ত্বীয় শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিল্পের দর্শন ও নান্দনিক বোধ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। ১৯৭০–১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকার আর্ট কলেজ থেকে বিএফএ ডিগ্রি পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখানে মাস্টার্স ডিগ্রি করতে আসেন। এ ছাড়াও স্থানীয় সাধারণ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করা শিক্ষার্থীরাও এখানে ভর্তির সুযোগ পান। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করে আসা কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী মাস্টার্স ডিগ্রি কৃতিত্বের সাথে পাস করে এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। ১৯৭৪–৭৫ শিক্ষাবর্ষে এখানে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম বিএফএ সম্মান কোর্স খোলা হয় এবং এই সম্মান কোর্সে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম শহরে একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামে দুটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী, মনসুর-উল করিম, হাসি চক্রবর্তী, চন্দ্র শেখর দে, বনিজুল হক, শাহরিয়ার তালুকদার, কে এম এ কাইয়ুম, অলক রায়, নাজলী লায়লা মনসুর, ঢালী আল মামুন প্রমুখ আধুনিক ধারার শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পে এঁদের অনেক

অবদান রয়েছে। এই দুটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে আধুনিক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দেশ স্বাধীনের পর এ দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকার আইসিসিআর বৃত্তি, জাপান সরকার মনবুশো বৃত্তি, চীন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশের সরকার উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তির ব্যবস্থা করলে এ সকল বৃত্তির সুযোগে চারুকলার অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী উল্লিখিত দেশগুলোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। আশির দশকে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন মাহমুদুল হক (প্রিন্টমেকিং), কাজী গিয়াসউদ্দিন (পেইন্টিং), জামাল উদ্দিন আহমেদ (পেইন্টিং), মোহাম্মদ ইউনুস (পেইন্টিং), মোস্তাফিজুল হক (জাপানি পেইন্টিং), শেখ আফজাল (পেইন্টিং), প্রমুখ। ভারতের বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হামিদুজ্জামান খান (ভাস্কর্য), ফরিদা জামান (পেইন্টিং), রফিক আহমেদ (পেইন্টিং), আব্দুস শাকুর শাহ (পেইন্টিং), অলক রায় (ম্যুরাল), নাইমা হক (অ্যাপলাইড আর্ট), তরুন ঘোষ (পেইন্টিং), নাসরিন বেগম (প্রিন্টমেকিং), মোমিনুর রেজা (পেইন্টিং), রণজিৎ দাস (পেইন্টিং), আলমগীর হোসেন (প্রিন্টমেকিং), শিশির ভট্টাচার্য (পেইন্টিং) প্রমুখ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। আর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করেন আব্দুস সাত্তার (প্রিন্টমেকিং), শওকাতুজ্জামান (ম্যুরাল), রোকেয়া সুলতানা (প্রিন্টমেকিং), নিসার হোসেন (পেইন্টিং) প্রমুখ।

জাপানে শিক্ষাগ্রহণকারী শিল্পীরা চিত্রকলা ও প্রিন্টমেকিংয়ে অভিনব টেকনিক এবং মাধ্যমগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এ দেশের আধুনিক শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে বিমূর্ত শিল্প রচনার প্রবণতা বেশি লক্ষণীয়। এ দেশে বিমূর্ত শিল্পের পথিকৃৎ মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপানে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরই অনুসারী ছিলেন মাহমুদুল হক। কাজী গিয়াসউদ্দিন ও মোহাম্মদ ইউনুস চিত্রতলে রং প্রয়োগের বিচিত্র কৌশল এবং বিভিন্ন টেকচার আর শক্তিশালী রেখার মাধ্যমে বিমূর্ত শিল্পের এক অভিনব ধারা সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে ভারত থেকে যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা শিল্পের ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় বিষয়ে সম্যক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতের বর্ণনাপ্রবণ শিল্পের আধুনিক ধারায় তাঁদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া কে জি সুব্রহ্মণ্যনের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কেউ কেউ। এ সময় ইউরোপে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা ইউরোপের সমকালীন শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ সময়ে ইউরোপে যাওয়া শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাহাবুদ্দিন আহমেদ; তিনি গতিময় মানব অবয়বের মাধ্যমে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ফুটিয়ে তোলেন।

দেশ স্বাধীনের পর এ দেশের আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ষাটের দশকে বিমূর্ত শিল্প যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সত্তরের দশকে তা কেটে গিয়ে চিত্রে ও ভাস্কর্যে আবার মূর্তরূপ ফিরে আসতে থাকে। বিভিন্ন উৎস ও সূত্র থেকে ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও সমসাময়িক শিল্পে তাকে প্রয়োগের একটি ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শিল্পে সামাজিক বক্তব্য ও ইঙ্গিত স্থাপনের প্রয়াস দেখা দেয়। বিশেষ করে লক্ষণীয় হচ্ছে পুরো শিল্পজগতে অনেক বেশি সংখ্যক শিল্পীর আগমন এবং শিল্পনির্মাণের মাধ্যম ও প্রকরণের ক্ষেত্রে বিপুল বৈচিত্র্যের সূচনা হয়।[১৪]

সত্তরের দশকে বাংলাদেশের শিল্পকলা অঙ্গনে যে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছিল, তা আশির দশকেও অব্যাহত ছিল। প্রচুর সংখ্যক নবীন শিল্পীর উত্থান ঘটে—যাঁরা চিত্রকলা, ছাপচিত্র ও ভাস্কর্য মাধ্যমে নতুন নতুন শৈলী ও প্রকরণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পচর্চা করেছেন। আশির দশকের শিল্পে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিক প্রয়োগ এবং বক্তব্য বা ইঙ্গিত প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যের উত্তর-আধুনিক শিল্পের নানা প্রবণতার প্রভাব—যেমন কনসেপচুয়াল আর্ট, ইনস্টলেশন আর্টের প্রভাব পড়েছিল কয়েকজন শিল্পীর কাজে। সত্তরের দশকের শেষ পর্যায় থেকে আশির দশকের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী শিল্পীর আগমন ঘটে, যাঁরা পুরুষ শিল্পীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ ছাড়া এই দশকে তরুণ শিল্পীদের গঠিত *সময়* গ্রুপের এবং *ঢাকা পেইন্টার্স* গ্রুপের শিল্পীদের বক্তব্যধর্মিতা এবং কনসেপচুয়াল আর্টের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এ সময়ের নারী শিল্পীরা মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফরিদা জামান, নাজলী লায়লা মনসুর, শামীম সিকদার, নাইমা হক, নাসরিন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, দীপা হক, আতিয়া ইসলাম এ্যানি প্রমুখ। এ সকল শিল্পী পেইন্টিং, ভাস্কর্য এবং প্রিন্টমেকিং মাধ্যমে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফরিদা জামানের চিত্রে বাংলার গ্রামীণজীবন উঠে এসেছে; মাছ ও জাল, নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে উজ্জ্বল বর্ণ ও কাব্যিক রেখার মাধ্যমে। নারী শিল্পী হিসেবে প্রথম জাতীয় পুরস্কার (জাতীয় নবীন শিল্পী পুরস্কার) ও বাংলাদেশি শিল্পী হিসেবে প্রথম দিল্লির পঞ্চম ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৯৮২) পুরস্কার লাভ করেন। নভেরা আহমেদের পর নারী ভাস্কর হিসেবে আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করেন শামীম শিকদার। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথাভিত্তিক উন্মুক্ত ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে তিনি ভাস্কর হিসেবে পরিচিতি পান। নাজলী লায়লা মনসুরের চিত্রে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও নিপীড়নের চিত্রের প্রকাশ পেয়েছে খানিকটা পরাবাস্তববাদী ধারায়। দীপা হকের কাজে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অশান্তি-অসুখী অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে বাস্তববাদী ড্রইং ও পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে। নারী ও নারীজীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে প্রাচ্য

[১৪] আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

রীতিতে আঁকা নাসরিন বেগমের চিত্রে। রোকেয়া সুলতানার কাছে আত্মোপলব্ধি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে খানিকটা শিশুদের চিত্রের আঙ্গিকে। এ সকল নারী শিল্পীর ধারাবাহিকতায় আধুনিক শিল্পাঙ্গনে পরবর্তীকালে আরো অধিক সংখ্যক নারী শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটে, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেন।

আশির দশকে আবির্ভূত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মোমিনুর রেজা, গোলাম ফারুক বেবুল, তরুন ঘোষ, শওকাতুজ্জামান, জামাল আহমেদ, মোহাম্মদ ইউনুস, রণজিৎ দাস, রুহুল আমীন কাজল, শিশির ভট্টাচার্য, নিসার হোসেন, শেখ আফজাল, সিদ্ধার্থ শংকর তালুকদার, ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা, জিএস কবীর, খালিদ মাহমুদ মিঠু, ইফতেখার আহমেদ, মোহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ। চট্টগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হলেন, কাজী রকিব, ঢালী আল মামুন, সঞ্জীব দত্ত, ওসমান পাশা প্রমুখ।

এ সকল শিল্পীর শিল্পচর্চার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ঢাকা এবং চট্টগ্রামের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে। এঁদের একটি অংশ দেশ থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অন্য একটি অংশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই দশকের গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ এবং রাজশাহী আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের তরুণ শিল্পীরা আধুনিক শিল্পের প্রাথমিক ধারণা এ সকল শিক্ষক-শিল্পীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

সত্তর ও আশির দশকের কয়েকজন শিল্পীর কাজে উত্তর আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কালিদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান ও অলক রায়ের সত্তর ও আশির দশকে করা চিত্র ও ভাস্কর্যে নির্মাণ এবং উপস্থাপনায় উত্তর-আধুনিক শিল্পের কনসেপচুয়াল আর্ট এবং ইনস্টলেশন আর্টের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আধুনিক শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে ঢাকায় দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিও সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শিল্পীর কনসেপচুয়াল আর্ট এবং ইনস্টলেশন আর্টের কাজের সাথে বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচয়ের সুযোগ হয়। ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এই প্রদর্শনী নিয়মিত আয়োজন করেছে। ১৯৮৩ সালের প্রদর্শনীতে জাপানি শিল্পী শিগিয়ো তোয়া (Shigeo Toya), ইয়াশিয়া কিতামায়া (Yoshio Kitayama) ও শিনজি সুনেকি (Shinji Suneki)-এর কনসেপচুয়াল শিল্পকর্ম, ১৯৮৬ সালের প্রদর্শনীতে কোজি এনোকুরা (Koji Enokura), ১৯৯৫ সালের প্রদর্শনীতে কেইতা ইগামি (Keita Egami) এবং তাকামাসা কুনিয়াসু (Takamasa

Kuniyasu)-এর স্থাপনা শিল্প[১৫] এ দেশের তরুণ শিল্পীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী জাপানি শিল্পীদের স্থাপনা শিল্প নির্মাণ ও উপস্থাপনায় এ দেশের তরুণ শিল্পীদের অনেকেই সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের সহায়তাকারী তরুণ শিল্পীদের মধ্যে এই নতুন শিল্পপ্রবণতার প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে আর্ট ইনস্টিটিউটের কিছু শিক্ষার্থী এই নতুন শিল্পপ্রবণতার চর্চা শুরু করেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশোক কর্মকার, অভিজিৎ চৌধুরী মাহবুবুর রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি, প্রমুখ।[১৬] এভাবে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কনসেপচুয়াল আর্ট এবং ইনস্টলেশন আর্টের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে মূলত তরুণ শিল্পীদের হাতে।

বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে পাশ্চাত্যে চারুকলার মাধ্যমভিত্তিক বিভাজন, ভিজ্যুয়াল আর্ট এবং পারফর্মিং আর্টের মধ্যকার ব্যবধান প্রায় উঠে যায়। এখানে চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, তৈরি বস্তু, শব্দ, আলো, চলচ্চিত্র, অভিনয় সব মিলেমিশে একাকার হয়ে শিল্পবিস্তারে পরিণত হচ্ছে। এ সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃজনশীল শিল্পকর্ম সৃষ্টিই হলো এ সময়ের শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য।[১৭] এ সকল অভিনব শিল্পপ্রবণতাকে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাগত জানিয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাকে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী করার ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে এ সকল আন্তর্জাতিক শৈলীতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তর-আধুনিক শিল্পের নানা মাধ্যম শিল্পশিক্ষাক্রমে যুক্ত হয়েছে। শিল্পশিক্ষা বর্তমানে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে রুটিনবদ্ধ গতানুগতিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। চারুকলা/দৃশ্যশিল্প বর্তমানে অনেক বেশি পরিমাণ Multidiciplinary ও Interactive—যার সব কিছু শিক্ষাক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রায় অসম্ভব।[১৮] তবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিল্পশিক্ষা গবেষণাধর্মী ও নিরীক্ষাধর্মী করায় এ সকল নতুন মাধ্যমে শিক্ষাদান সহজ হয়েছে। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানী ও সৃজনশীল মানসিকতা এবং মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষকের তত্ত্বাবধান আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। দেশ-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বিশ্বের সর্বাধুনিক শিল্পের বিভিন্ন প্রবণতার সন্ধান দিচ্ছেন এবং এ সকল শিল্পপ্রবণতা থেকে ধারণা নিয়ে নিজস্ব আঙ্গিকে শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করছেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের নতুন মাধ্যমের বিচিত্র শিল্পকর্ম থেকে ধারণা নিয়ে নিজের মতো করে অভিনব শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছেন। এভাবে

---

[১৫] *ক্যাটালগ*, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অষ্টম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৯৫

[১৬] নাসিমুল খবির, "সাম্প্রতিক দৃশ্যশিল্পে ধারণা প্রধান নতুন প্রবণতা", লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮–১৪৮

[১৭] আবুল মনসুর, "ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[১৮] আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ২৪

বাংলাদেশের আধুনিক তথা উত্তর-আধুনিক শিল্পচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করছে।

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটেছে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। এ অঞ্চলে যখন কোনো আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না, তখন এখানে আধুনিক শিল্পের চর্চাও ছিল না। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহরে যখন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেখানে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটেছে। ঢাকার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস তথা কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আধুনিক শিল্পের বিপ্লবাত্মক উত্থান ঘটে। এই প্রতিষ্ঠান তখন স্নাতক পর্যায়ে পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার যে ভিত গড়ে দিয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত অন্বেষায় আধুনিক শিল্পচর্চা করেছিলেন। সত্তরের দশকের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই দশকের শেষ পর্যায়ে ঢাকার আর্ট কলেজে স্নাতকোত্তর মাস্টার্স ডিগ্রি চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে গবেষণা ও নিরীক্ষাধর্মী আধুনিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় থেকে শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে নিজস্ব আঙ্গিকে শিল্পকর্ম সৃষ্টির সুযোগ পান। সত্তর ও আশির দশকে গড়ে ওঠা আর্ট কলেজগুলোও পরবর্তীকালে নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা চালু করলে সেখানেও আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প বিশ্বের শিল্পজগতে একটি সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লিখিত পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষার ওপরে ভিত্তি করে আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা হয়েছে এবং যুগের পর যুগ তা বিকশিত হয়েছে।

উপসংহার

'বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষা : ১৯৪৮–১৯৮৭' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষার উল্লেখিত চল্লিশ বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তথ্যভিত্তিকভাবে। এই ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের অবদান, শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং শিল্পশিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থা উল্লিখিত চল্লিশ বছরের মধ্যে কীভাবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এ দেশের শিল্পশিক্ষা একটি সরকারি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শুরু হয়ে কলেজ পর্যায় অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বাধুনিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক যে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল সেটি পনেরো বছর জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাদানকল্প কলেজে উন্নীত হয়। ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের শিল্পান্দোলনে একক নেতৃত্ব দিয়েছে। সত্তরের দশকের সূচনাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলার মধ্য দিয়ে এ দেশে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এখানে চারুকলা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে সম্মান ডিগ্রিও প্রথম চালু হয়। ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলা হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে। স্বাধীনতার পরে আশির দশকের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম চারুকলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীতে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিল্পশিক্ষা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করে। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা ভারতে যে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিল; দেশবিভাগের পর তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্যের শিল্পশিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায়, শিল্পশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল প্রথমে

ইউরোপে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় শিল্পবিদ্যা একটি মানবিক বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং চিত্রকলা ও মূর্তিকলার মতো উচ্চমার্গীয় শিল্পশিক্ষার জন্য এ সময় ফ্লোরেন্সে প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রেনেসাঁর সময় আবিষ্কৃত চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম-কানুন ও কলাকৌশল এখানে শিক্ষণীয় ছিল। এরপর ইতালি, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রাজকীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালি ও ফ্রান্সের কাছ থেকে ধারণা নিয়ে ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডসহ এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যে প্রথমে আর্ট স্কুল গড়ে তোলে। ততদিনে শিল্পশিক্ষার মধ্যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ছাড়াও বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক শিল্পের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমাজের বিত্তবান মানুষের জন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টির স্থলে সর্বসাধারণের উপযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। ব্রিটিশদের মাধ্যমে তার উপনিবেশগুলোতে ধীরে ধীরে শিল্পশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের উদ্যোগে এবং স্থানীয় শিল্পানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় মাদ্রাজে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে। অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শিল্পশিক্ষার সূচনা হয় দ্য ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট তথা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট, ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শিল্প সহায়ক কারিগর তৈরির উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে ভারতের সৃজনশীল শিল্পশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এখানে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল; বিশ শতকের শুরু থেকে এখানে প্রাচ্যকলা শিক্ষাও গুরুত্ব পায়। এখানে ভারতের বিখ্যাত শিল্পী-শিক্ষকদের সমাবেশ ঘটে—যাঁরা ভারতের শিল্পান্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এখানকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় আরো কয়েকটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—যার মধ্যে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবন এবং খুলনার মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস এই গবেষণার আওতাভুক্ত।

পূর্ব বাংলার শিল্পশিক্ষার পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকা একটি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর হওয়া সত্ত্বেও দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত এখানে কোনো শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। সমগ্র বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। এ কারণে সামর্থ্যবান অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিল্পশিক্ষার জন্য কলকাতায় পাড়ি জমাতেন। শিল্পশিক্ষার জন্য পূর্ব বাংলার চারুকলার শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত স্থান ছিল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুল। এ ছাড়া বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের

অনেকেই মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসে ভর্তি হতেন। শান্তিনিকেতনসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতেন কেউ কেউ। এ সময় শিল্পচর্চার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিলেন মুসলমান—যাঁরা মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে শিল্পচর্চার প্রতি ছিলেন অনাগ্রহী। এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুসলমান পরিবার থেকে কিছু কিছু শিক্ষার্থী শিল্পশিক্ষার জন্য আর্ট স্কুলে ভর্তি হতেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও কেউ কেউ চিত্রচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। এমন প্রেক্ষাপটে ত্রিশের দশক থেকে কলকাতা আর্ট স্কুলে বেশ কয়েকজন মেধাবী মুসলমান শিক্ষার্থীর আগমন ঘটে—যাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষা শেষে এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন ও সফিউদ্দীন আহমেদ সর্বভারতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন এবং উদীয়মান তরুণ শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে কলকাতা আর্ট স্কুলের এ সকল মুসলমান শিক্ষক পূর্ব বাংলায় গিয়ে একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।

দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে গিয়ে শিল্পশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় সরকার স্বীকৃত কোনো শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। খুলনায় আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে চলমান মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টস দেশবিভাগের পর স্থানীয় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় শিল্পশিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আর্ট স্কুল বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে ওঠে। এমন প্রেক্ষাপটে দেশবিভাগের পরে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের মুসলমান শিক্ষকগণ (হবিবুর রহমান জমাদার, শফিকুল আমীন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ) জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকায় এসে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নানা প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে এবং সমস্যা মোকাবেলা করে নেহাতই দেশপ্রেমিক চেতনা আর শিল্পের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এক সুদৃঢ় আশাবাদী মনোভাব নিয়ে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন।

গবেষণায় দেখা যায় জয়নুল আবেদিন তাঁর সকল মেধা ও প্রচেষ্টা দিয়ে এ দেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন; আর আনোয়ারুল হক ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর

(জয়নুল আবেদিন) অনুপস্থিতিতে তিনি সকল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জয়নুল আবেদিনের অনুপস্থিতিতে তাঁকে অফিসার-ইন-চার্জ করে ১৯৪৮ সালের মধ্য নভেম্বরে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের মাত্র দুটি কক্ষে যাত্রা শুরু করেছিল। কলকাতা আর্ট স্কুলের চাকরি ছেড়ে আসা সকল শিক্ষক এবং নতুন প্রার্থী হিসেবে কামরুল হাসান এখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে জয়নুল আবেদিন অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে নতুন উদ্দীপনায় আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয়। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন আত্মত্যাগী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতার অগ্রসরমাণ শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছেড়ে ঢাকার পশ্চাৎপদ পরিবেশে আসা, কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক বেতনের চাকরি ছেড়ে স্বল্প বেতনের প্রাদেশিক সরকারের চাকরি গ্রহণের মধ্যে তাঁর আত্মত্যাগী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের নথি থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাকালে এখানে পাঁচ বছরের কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছিল—যার মধ্যে প্রথম দুই বছর বেসিক এলিমেন্টারি কোর্স এবং পরবর্তী তিন বছর বিভাগভিত্তিক অ্যাডভান্সড কোর্স ছিল। এ সময় সাতটি বিভাগ (ফাইন আর্ট, কমার্শিয়াল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট, মডেলিং, ড্রাফটসম্যানশিপ, ড্রইং মাস্টার কোর্স ও ক্রাফটস্) অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু স্থান ও শিক্ষক সংকটের কারণে প্রথমে মাত্র দুটি বিভাগের (ফাইন আর্ট ও কমার্শিয়াল আর্ট) কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। গ্রাফিক আর্ট বিভাগের কিছু বিষয় উল্লিখিত দুটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউট পর্যায়ে এখানে প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প বিভাগ ও ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছিল। ১৯৪৮–১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ইনস্টিটিউট জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউট পূর্ব বাংলার শিল্পশিক্ষা ও সকল শিল্পান্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও শিক্ষার সময়কালের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। ঢাকায় আর্ট স্কুলের স্থলে 'আর্ট ইনস্টিটিউট' নামকরণ হয় এবং শিক্ষার সময়কাল ছয় বছরের স্থলে পাঁচ বছর করা হয়। চল্লিশের দশকে কলকাতা আর্ট স্কুলে প্রচলিত সিলেবাস এখানে কার্যকর করা হয়। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিনের শিল্পশিক্ষাসংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্য সচেতন ও মানবতাবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার চারুশিল্প শিক্ষা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবে দেশীয় ঐতিহ্যকে

ধারণ করে। এ কারণে তিনি এখানে প্রাচ্যকলা বিভাগ ও মৃৎশিল্প বিভাগ খুলেছিলেন এবং লোকশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শুধু শিল্পশিক্ষা নয় এ দেশের শিল্পচর্চাকে গতিশীল করার জন্য ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঢাকা আর্ট গ্রুপ গড়ে তোলেন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে সারা পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার শিল্পচর্চার স্বরূপ তুলে ধরেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠার আট বছরের মধ্যে শাহবাগে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় স্বনামধন্য স্থপতি মাযহারুল ইসলামের আধুনিক ও নান্দনিক নকশায়। এখানে সপ্তম ব্যাচে প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে সহশিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম পনেরো বছরে চিত্রকলা ছিল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমেও এ সময় শিক্ষাদান করা হয়েছে। পাশ্চাত্য একাডেমিক শিল্পধারা অনুসারে বাস্তবভিত্তিকভাবে সেটি অনুশীলন করা হতো। তবে জলরং ও তেলরং মাধ্যমে ছবি আকার ক্ষেত্রে ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় চিত্ররীতির ঐতিহ্য, লোকশিল্পের ও প্রাচ্যকলা ভাবাদর্শের কিছু কিছু অনুষঙ্গ, যেমন প্রাচ্যধারার সমৃদ্ধ রেখা ও জলরং আঙ্গিক, লোকশিল্পের সহজ প্রকাশভঙ্গি এখানকার শিল্পাঙ্গনে ঘুরেফিরে এলেও তার চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটেছে প্রভাবশালী পাশ্চাত্য শিল্পধারার আঙ্গিকে।

আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত পূর্ব বাংলার শিল্পশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও শিল্পসংক্রান্ত কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। প্রতিষ্ঠার প্রথম পনেরো বছরের মধ্যে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। সেই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে এ দেশের সৃজনশীল আধুনিক শিল্প বিকাশে রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক আধুনিক চিত্রের যুগান্তকারী উত্থান ঘটে। যার সূত্রপাত করেছিলেন জয়নুল আবেদিন; আর চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন দেশ-বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পীরা, যাঁরা এখানকার শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ঢাকা আধুনিক শিল্পচর্চার অপেক্ষাকৃত নতুন স্থান হওয়া সত্ত্বেও স্বল্পকালের মধ্যে সারা পাকিস্তানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার শিল্পীরা পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে শিল্পসত্তা দিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের শিল্পকর্মেও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মানবিক পরিবেশ এখানে শুরু থেকে সমুন্নত ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও আধুনিক শিল্পের উন্মেষ ও

বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য জয়নুল আবেদিনকে এ দেশের আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার পথিকৃৎ এবং এ দেশের আধুনিক শিল্পের সূচনাকারী শিল্পী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস এ দেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। চারুকলাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। এ কারণে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসকে বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে এই ভূখণ্ডে প্রথম আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পী শশিভূষণ পালের কৃতিত্ব এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্টসের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

এই পনেরো বছরে আর্ট ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। গ্রাফিক আর্ট (বর্তমান প্রিন্টমেকিং) বিভাগ খোলার মতো উপযুক্ত শিক্ষক ও টেকনিশিয়ান থাকা সত্ত্বেও এ সময় বিভাগটির কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। এ ছাড়া ১৯৫৭ সালে মডেলিং বিষয়ে শিক্ষক পদ অনুমোদিত হয়েছিল। সে সময় নভেরা আহমেদ পূর্ব বাংলায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ভাস্কর্য বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। ওই সময় বিভাগ দুটি খোলা গেলে এ দেশে প্রিন্টমেকিং ও ভাস্কর্যচর্চা সম্ভবত আরো এগিয়ে যেত। এ ছাড়া শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমে পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়েছে কিন্তু গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের প্রশাসনিক বিষয় জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হলেও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ কোনো শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়নি। কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম পনেরো বছরের মধ্যে আর্ট ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এ দেশের শিল্পশিক্ষা একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি উপাদানকল্প কলেজে পরিণত হয়ে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ নাম ধারণ করেছিল। গবেষণায় দেখা যায়, এ সময় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। পুরাতন কোর্স কারিকুলাম পরিবর্তন করে দুই বছরের প্রি-ডিগ্রি এবং তিন বছরের বিএফএ ডিগ্রিসহ পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রি-ডিগ্রিকে ইন্টারমিডিয়েট সমমর্যাদার ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল অনুমোদিত সিলেবাস প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে শিল্পকলাসংক্রান্ত তত্ত্বীয় বিষয়ও পাঠ্য করা হয়েছিল। তত্ত্বীয় শিক্ষা যুক্ত করার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পর্যায় থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নতুন করে বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষক পদ সৃষ্টি করে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পর্যায়ে কয়েকজন নারী শিক্ষকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলেজ পর্যায়ে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, বাণিজ্যিক শিল্প, প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প, ভাস্কর্য এবং প্রিন্টমেকিং বিভাগ অনুমোদন করা হয়েছিল। চলমান বিভাগগুলোর পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। আর্ট কলেজে তত্ত্বীয় কোর্সসহ বিএফএ ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহকর্মীরা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিএফএ ডিগ্রি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ ও লাহোরের ন্যাশনাল কলেজ অব আর্ট থেকেও ঢাকার আর্ট কলেজ এগিয়ে গিয়েছিল। ওই সময় পর্যন্ত এই দুটি কলেজে তত্ত্বীয় বিষয়বিহীন ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল। এই সময় থেকে কলকাতার প্রভাব অনেকাংশে কাটিয়ে এখানে স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামে আর্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিল্পসত্তা দিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধ ছবি এঁকে, কার্টুন এঁকে, মিছিল করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেছেন; সরাসরি আন্দোলন ও রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ শহিদ হয়েছেন, কেউ আহত। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্জন করে—যেখানে সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের গৌরবগাথা ও দেশপ্রেম এ দেশের শিল্পাঙ্গনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

স্বাধীনতার পরে এই আর্ট কলেজের পরিবর্তিত নাম হয় বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ বা বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। এ সময় আর্ট কলেজের উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আর্ট কলেজে পর্যায়ক্রমে ভাস্কর্য বিভাগ এবং প্রিন্টমেকিং বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এ সকল বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিরামিক ভবন, ভাস্কর্য ভবন ও কারুশিল্প ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স ডিগ্রি খোলা হয়। এ সময় মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প বিভাগ বিভক্ত করে মৃৎশিল্প এবং কারুশিল্প নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ করা এবং কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের নাম পরিবর্তন করে গ্রাফিক ডিজাইন করা হয়। বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস সংশোধন ও বর্ধিত করে পূর্বের ৯০০ নম্বরের স্থলে ১০০০ নম্বর করা হয়েছিল।

দেশ স্বাধীনের পর আশির দশকের মধ্যে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম (১৯৭৩), রাজশাহী (১৯৭৮) এবং খুলনায় (১৯৮৩) আরো তিনটি আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। দেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর শিল্পশিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য চাকরিপ্রার্থী তরুণ শিল্পী, স্থানীয় শিল্পানুরাগী সুধীজন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্যোগে আর্ট স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আর্ট কলেজগুলো পরিচালিত হয়েছে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত বা উপাদানকল্প কলেজ হিসেবে। এ সকল আর্ট কলেজে কোর্স-কারিকুলাম গড়ে উঠেছিল ঢাকার আর্ট কলেজের অনুসারে। তবে সিলেবাসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা বিভাগের সিলেবাসের সংমিশ্রণ ছিল। চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় এখানকার ডিগ্রির সিলেবাসে এই বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা বিভাগের সম্মান কোর্সের সিলেবাসের প্রভাব পড়ে। সম্মান কোর্সের সিলেবাসের মতো এখানে অধিক তত্ত্বীয় বিষয় ছিল। প্রি-ডিগ্রি ও বিএফএ ডিগ্রিতে ঢাকায় দুটি করে তত্ত্বীয় বিষয় ছিল; কিন্তু চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে সে ক্ষেত্রে যথাক্রমে তিনটি ও চারটি তত্ত্বীয় বিষয় যুক্ত করা হয়। চারুকলা শিক্ষার জন্য অপরিহার্য তত্ত্বীয় বিষয় নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পমাধ্যম ও করণ-কৌশল এখানে পাঠ্য ছিল। রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত; পরবর্তীকালে কলেজটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প কলেজে পরিণত হয়। কলেজটির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ঢাকার আর্ট কলেজ এবং চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের কারিকুলাম ও সিলেবাসের সংমিশ্রণে। খুলনা আর্ট কলেজও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। এ কারণে খুলনা ও রাজশাহী আর্ট কলেজ অভিন্ন সিলেবাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

এই আর্ট কলেজগুলোর মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীর কাছাকাছি আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুযোগ পৌঁছে গিয়েছিল। আঞ্চলিক পর্যায়ে আধুনিক শিল্পের ছোট ছোট কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিল্পকলাসংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ওই সব অঞ্চলের মানুষের মাঝে শিল্পকলা বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। প্রশিক্ষিত চারু ও কারুশিল্পী তৈরি হয়েছে—যাঁরা বাংলাদেশের সৃজনশীল, ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। চারু ও কারুকলা সংক্রান্ত আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। এ সকল কলেজ শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছে এবং শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের শিল্পীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। শিল্পীদের স্বার্থ আদায়ে বা শিল্প-সংস্কৃতির যেকোনো প্রয়োজনে পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় তথা চারুকলা ইনস্টিটিউট।

আর্ট কলেজগুলো পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে অন্যতম স্থান, আর্থিক ও শিক্ষক সংকট। প্রথম পর্যায়ে আর্ট কলেজগুলো চলেছে পরিত্যক্ত ভবনে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে অস্থায়ী ভিত্তিতে পাওয়া কক্ষে সরকার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান, চাঁদা এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া টিউশন ফির অর্থ দিয়ে। সরকারি অনুদান প্রাপ্তি ও নিজস্ব ভবন নির্মাণ করতে এ সকল কলেজের শিক্ষকদের অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের আস্থা হারিয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্বেচ্ছায় কলেজ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর্থিক সংকটের কারণে মেধাবী শিক্ষকদের অনেকেই আর্ট কলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এ সকল সমস্যার মধ্যেও আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়ে যাঁরা টিকে ছিলেন তাঁদের প্রচেষ্টায় কলেজগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলেজ পর্যায়ে এসে এ দেশের শিল্পশিক্ষা ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় শিক্ষার সমন্বয়ে আধুনিক শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মাধ্যমে এ দেশে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সূচনা হয়। বাংলাদেশে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারুকলা বিষয়ে প্রথম উচ্চশিক্ষার সূচনা হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রশিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে। তিনি সেখানে সত্তরের দশকের সূচনাতে চারুকলা বিভাগ খুলে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করেছিলেন। এই গবেষণায় দেখা যায়, চারুকলা বিভাগে তিনি এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, সেখানে ইউরোপীয় আধুনিক সৃজনশীল শিক্ষার সঙ্গে লোকজ ও কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বয় ঘটেছিল। সেখানে তাঁর ইউরোপীয় শিক্ষা, উদারনৈতিক মানসিকতা আর সহকর্মীদের অভিজ্ঞতারও সমন্বয় ঘটেছিল। এখানে তাঁর সহকর্মী হিসেবে যাঁরা এসেছিলেন (দেবদাস চক্রবর্তী, মুর্তজা বশীর, মিজানুর রহিম প্রমুখ) তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও মুক্ত মনের মানুষ। এখানকার সিলেবাসে তত্ত্বীয় বিষয়ের আধিক্য ছিল। প্রথম পর্যায়ে চিত্রকলা, প্রিন্টমেকিং অথবা ম্যুরাল বিষয় শিক্ষণীয় থাকলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাবে প্রিন্টমেকিং ও ম্যুরাল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ম্যুরাল বিষয়টি বাদ দিয়ে ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শিল্পদর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি প্রথমে এখানে পাঠ্য করা হয়েছিল। এখানকার সিলেবাসের কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের সঙ্গে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসের অধিক মিল পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয় নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল। বিষয় নির্বাচনে জার্মান বাউ হাউসের কর্মমুখী শিক্ষাক্রমের প্রভাব পড়েছিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে প্রথম চারুকলা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার মধ্য দিয়ে নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মী শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়েছিল। শিল্পশিক্ষাকে গবেষণাধর্মী শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে এখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ কারণে প্রথম পর্যায় থেকে এখানে

মাস্টার্স ডিগ্রি উত্তীর্ণ উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের চারুকলা বিষয়ে প্রথম সম্মান কোর্স চালু হয়েছিল এখানে। সম্মান কোর্সে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের জন্য চট্টগ্রাম শহরে একটি আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। এভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে শিল্পশিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছিল। এখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি উত্তীর্ণ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। চারুকলা বিভাগ ও আর্ট কলেজকে কেন্দ্র করে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর চট্টগ্রামে আগমন ঘটেছিল। এ সকল শিল্পীর কর্মতৎপরতার ফলে আশির দশকের মধ্যে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আধুনিক শিল্পকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের তরুণ শিল্পীরা অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে চারুকলা বিভাগ পরিচালিত হয়েছে। শিল্পশিক্ষার উপযোগী পরিকল্পিত শ্রেণিকক্ষের অভাব, শিল্প সহায়ক যন্ত্রপাতির ও উপকরণের অভাব, শিক্ষক সংকট—সর্বোপরি অবস্থানগত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাবে প্রথম পর্যায়ে শুধু চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একধরনের জনবিচ্ছিন্নতা ছিল। এ কারণে শিল্পকলাসংক্রান্ত যেকোনো আয়োজনে প্রত্যাশা অনুযায়ী জনসম্পৃক্ততা ঘটত না। পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত চারুকলা কলেজে শিল্পবান্ধব মনোরম পরিবেশ ছিল। আশির দশকের শেষ পর্যায়ে এখানে দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন, আধুনিক আর্ট গ্যালারি এবং প্রশাসনিক ভবন তৈরি হয়েছিল। স্বল্প দূরত্বে থাকা দুটি একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পাওয়ার বিষয়টিও বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামে শিল্পশিক্ষাকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত করার লক্ষ্যে চারুকলা কলেজকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি ইনস্টিটিউটে পরিণত করা হয়েছিল।

ঢাকার চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সূচনা হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি চারুকলা ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে এলে এখানে চারুকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল। চট্টগ্রামে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও প্রিন্টমেকিং বিষয়ে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল। কিন্তু ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর অঙ্কন ও চিত্রায়ণ, গ্রাফিক ডিজাইন, প্রাচ্যকলা, মৃৎশিল্প, প্রিন্টমেকিং, ভাস্কর্য এবং কারুশিল্প বিভাগে উচ্চশিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল; যার মধ্যে অন্যতম—স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, সারা বিশ্বের সমকালীন শিক্ষাপ্রবণতার সঙ্গে পরিচিতি এবং দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করা। এ সকল বিষয়ে হাতে-কলমে ও তত্ত্বীয় শিক্ষা দেওয়া এবং প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নান্দনিক বোধ জাগ্রত করা।

গবেষণায় দেখা যায়, চারুকলা ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষকদের জন্য চারুকলা ও ব্যবহারিক শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের বিশ্বশিল্পের আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক শিল্পের অভিনব প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত করার পাশাপাশি দেশীয় শিল্প-ঐতিহ্য ও উপকরণ অনুসন্ধান এবং তা শিল্পে প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় শিক্ষার সমন্বয়ে শিল্পশিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হয়েছিল। শিল্পের ঐতিহাসিক পরম্পরা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সমাজ সচেতন নান্দনিক বোধসম্পন্ন শিল্পী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে শিল্পকলার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি মাস্টার্স ডিগ্রিতে নন্দনতত্ত্ব ও সমকালীন শিল্পের ইতিহাসও পাঠ্য করা হয়েছিল। শিল্পশিক্ষাকে গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক করায় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ পায়। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বিভিন্ন শিল্পপ্রবণতা সম্পর্কে তাঁদের জানার পরিধি বিস্তৃত হয়। মাস্টার্স ডিগ্রিতে অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তত্ত্বীয় গবেষণার প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে। এ সময় বাস্তবভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা। পূর্বের ধারাবাহিকতায় স্নাতক পর্যায়ে একাডেমিক নিয়ম-কানুন মেনে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক সৃজনশীল শিল্পশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরা হয়েছে সর্বসাধারণের সামনে।

হাতে-কলমে শিক্ষার বিষয়ে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হলেও আশির দশকের মধ্যে এখানে উচ্চতর গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। এই সময়ের মধ্যে গবেষণা শুধু মাস্টার্স ডিগ্রিতে অভিসন্দর্ভ রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা এই সময়ের মধ্যে শুরু হয়নি। একই অবস্থা ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগেও। আশির দশকে এই দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো গবেষণাধর্মী গ্রন্থ বা জার্নাল প্রকাশিত হয়নি। তবে চারুকলার পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার পর থেকে শিল্পকলাসংক্রান্ত গবেষণাধর্মী লেখালেখি গতিশীল হয়েছিল। শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের জীবনীগ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প সমালোচকবৃন্দ। বাংলা ভাষায় রচিত এ সকল প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয়

শিক্ষা সহজবোধ্য করেছিল এবং তাঁদেরকে গবেষণায় করেছিল উদ্বুদ্ধ। দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়েছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে, যার মধ্যে অন্যতম বাংলা নববর্ষ বরণের জন্য পহেলা বৈশাখে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' আয়োজন।

ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক বিভাগগুলোতে প্রযুক্তিগত ও শিল্প সহায়ক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। কমার্শিয়াল আর্ট তথা গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ প্রযুক্তিনির্ভর বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও বিভাগের পক্ষ থেকে আশির দশকের মধ্যে কম্পিউটার বা অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। মৃৎশিল্প বিভাগ ও ভাস্কর্য বিভাগের জন্য পর্যাপ্ত চুল্লি, ফার্নেস এবং যন্ত্রপাতির ঘাটতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেশনজট এখানকার শিক্ষাকে ব্যাহত করে। পরিকল্পিত শ্রেণিকক্ষের সংকট এবং আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সামগ্রিক শিল্পশিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। এ সকল সমস্যা সত্ত্বেও আশির দশকের শেষ পর্যায়ে এসে চারুকলা ইনস্টিটিউট দেশের উচ্চতর শিল্পশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

এ দেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শিল্পকলা বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা; শিল্পশিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিল্পীর চাহিদা পূরণ করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সূচনার পর থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আর্ট কলেজ ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন; বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে (ইন্ডাস্ট্রি, প্রকাশনা সংস্থা, মিডিয়া, অ্যাড এজেন্সি, বুটিক ইত্যাদি) শিল্পী, ডিজাইনার বা শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে শিল্পসংক্রান্ত আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন। এভাবে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি রুচিশীল জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন দেশে আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটানো। ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আধুনিক শিল্পচর্চার কোনো কেন্দ্র ছিল না। ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চার সূচনা হয়েছিল। ১৯৪৮–১৯৬৯ সাল পর্যন্ত একাডেমিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব প্রচেষ্টায় অথবা শিল্পকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষর মাধ্যমে আধুনিক শিল্পচর্চা করেছিলেন। সত্তরের দশকের শুরু থেকে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক শিল্পপ্রবণতার শিক্ষা প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরবর্তীকালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হয়। পরবর্তীকালে অন্য আর্ট কলেজগুলো নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেখানেও আধুনিক শিল্পের চর্চা শুরু হয়। এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটে। আধুনিক শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করছেন। মূলত আধুনিক শিল্পীদের সাফল্যের মাধ্যমে সকল শিল্পকলার মধ্যে চারুশিল্প বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর ছয়জন সহকর্মী নিয়ে দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলায় যে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন, আশির দশকে এসে তা সারা বাংলাদেশকে আধুনিক শিল্পের আলোয় আলোকিত করেছিল। ওই সময়ে বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা বাস্তবধর্মী, নিরীক্ষাধর্মী ও গবেষণাধর্মী ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় শিক্ষার সমন্বয়ে সমকালীন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। অনুশীলনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও এ সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। চারুশিল্প বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি সৃজনশীল শিল্পী সৃষ্টির বিষয়টিও এ সময়ে গুরুত্ব পেয়েছিল। একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল ঐতিহ্য ও আধুনিতার সমন্বয়ে। পরবর্তীকালে ক্রমোন্নতির ধারায় এখানে বিশ্বের উত্তর-আধুনিক শিল্পের প্রবণতা শিক্ষণীয় হয়েছিল। ব্যবহারিক শিল্পের বিভাগগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সহশিক্ষা কার্যক্রম, যেমন প্রদর্শনী, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি এ দেশের শিল্পশিক্ষাকে করেছিল সমৃদ্ধ। বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) আর্ট কলেজ গড়ে ওঠার ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পশিক্ষার সুযোগ পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আর্ট কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গিয়ে আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পচর্চা বিকাশ লাভ করে। এ দেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সিলেবাসভুক্ত বিষয় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশীয় ঐতিহ্য সচেতনতা, জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণ করে এ দেশের শিল্পশিক্ষা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে—যা ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আরাধ্য স্বপ্ন।

তথ্যপঞ্জি

ক) বাংলা গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী । ১ম আনন্দ সং । কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৯ । [প্র. প্র. ১৯৪১]

———— । *সহজ চিত্রশিক্ষা ।* কলিকাতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪০১ । [প্র. প্র. ১৩৫৩]

অশোক ভট্টাচার্য । *বাংলার চিত্রকলা* । কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪

অশোক মিত্র । *ভারতের চিত্রকলা* । ১ম খণ্ড আনন্দ সং । কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৫–১৯৯৬ । ২য় খণ্ড । [প্র. প্র. ১৯৫৬]

আবু তাহের । *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী : জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী* । ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮

আবুল আসিফ মার্শাল (সম্পা.) । *রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় (স্মারক গ্রন্থ) ।* ঢাকা , অ্যারাসেস ২০০১

———— । *প্রতিভাস* । (শিল্পী বনিজুল হক স্মারক সংখ্যা) । ঢাকা, ২০১৮

আবুল মনসুর । *জয়নুল আবেদিন* । ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ২০১৩

———— । *শিল্পকথা শিল্পীকথা* । বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৬

আবুল হাসনাত (সম্পা.) । *অনন্য আমিনুল ইসলাম* । ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ২০১২

আব্দুল মতিন সরকার । *চারুকলা* (ঢাকার শিল্পচর্চা : বিশেষ সংখ্যা) । প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৪

আব্দুস সাত্তার । *জয়নুলের এগারজন সহকর্মী* । ঢাকা, হিমি বুকস এন্ড বুকস, ২০০৫

আমিনুল ইসলাম । *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* । ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩

উৎপল সেন (সম্পা.) । ভারতীয় শিল্পকলায় আধুনিকতা । কলকাতা, পারুল, ২০১৭

ঊনসত্তরে ছড়া । ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ, ১৯৬৯

কমল সরকার । *ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী* । কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮৪

কামরুল হাসান । *বাংলাদেশর শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা* । ঢাকা, প্রথমা, ২০১০

কৃষ্ণলাল দাস । *শিল্প ও শিল্পী* । কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২ [২য় খণ্ড]

খগেন্দ্রনাথ বসু । *মহেশ্বরপাশা পরিচয়* । কলকাতা, সারদাপ্রসাদ মণ্ডল, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

গোলাম মুরশিদ । *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* । ঢাকা, অবসর, ২০০৬

গৌতম দাস । *বাংলার শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার* । কলকাতা, পুনশ্চ, বইমেলা ২০০০

গৌরদাস হালদার । *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস : আধুনিক যুগ ।* কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯২ [প্র. প্র. ১৯৮৪]

———— । *ভারতীয় শিল্পশিক্ষার ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ ।* কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৯৩ । [প্র. প্র. ১৯৭৯]

জগমোহন মুখোপাধ্যায় । *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা* । কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯২

জালালউদ্দিন আহমেদ । "আধুনিক পাকিস্তান শিল্পকলার গতি প্রকৃতি" । *মাহেনও* । ঢাকা, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৫১

টি. এম. এম নুরুল মোদ্দাসের চৌধুরী । "রাজশাহী মহানগরীতে চারুকলা শিক্ষা" । *রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান, সেমিনার খণ্ড* । রাজশাহী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১২

টোকন ঠাকুর (পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পা.)। *ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী*। খুলনা আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও বিস্মৃতির শতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদ, ২০০৫

ডা. মোহাম্মদ আবুল কাশেম। "খুলনা জেলায় শিক্ষার অবস্থা"। *মাসিক মোহাম্মদী*। কলকাতা, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

নজরুল ইসলাম। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*। ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫

————। *বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*। ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৫

নন্দলাল বসু। *দৃষ্টি ও সৃষ্টি*। অম্লান দত্ত ও কল্লাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন (সম্পা.)। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯২

————। *শিল্পচর্চা*। কলকাতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৪। [প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৩৬]

————। *শিল্পকথা*। ১ম সং। কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭। [প্র. প্র. কার্তিক ১৩৫১]

নিসার হোসেন (সম্পা.)। *জয়নুল জন্মশতবর্ষ প্রবন্ধাবলি*। ঢাকা, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ২০১৬

নীলিমা আফরিন। *বাংলাদেশের শিল্পকলার উৎসসন্ধান*। ঢাকা, কথা প্রকাশ, ২০১৫

পাঠ্যক্রম। বি.এফ.এ (সম্মান) ও এম.এফ.এ। ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২–৯৩

ফরিদা জামান। *আধুনিক চিত্রকলায় লোকশিল্পের প্রভাব*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮

ফয়েজুল আজিম। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদি পর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি ২০০০

————। "সাম্প্রতিক শিল্পকলা : পাকিস্তান পর্ব ও বাংলাদেশে"। স্বপন ধর (সম্পা.)। *পত্রপুট*। ময়মনসিংহ, ব্রহ্মশৈলী, ২০১৪

————। "চট্টগ্রামে চারুকলা-চর্চা"। *কালি ও কলম*। ঢাকা, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৮

————। "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগ : তথ্য পুঞ্জি"। দ্র. (সম্পা.)। *সৃজন স্বজন সম্মিলন* ২০১৩ (স্মরণিকা)। চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম কারুশিল্পী সম্মিলন, ২০০৩

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। *চিত্রকথা*। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৪

বুলবন ওসমান। "বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের চারুকলা"। *শিল্পকলা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষাণ্মাসিক পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৯৭

মইনুদ্দীন খালেদ। *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*। ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০০

মতলুব আলী (সম্পা.)। *রূপবন্ধ*। ঢাকা, মানব প্রকাশন, ১৯৯৮

————। (সম্পা.)। *চারুকলা জার্নাল*। ঢাকা, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভ্যলুম-১ সংখ্যা ১ ও জুন ২০১১ ও ডিসেম্বর ২০১২

————। *মতলুব আলীর জয়নুল বিবেচন*। ঢাকা, রূপ প্রকাশন, ২০০৪

————। *বাংলাদেশের শিল্পকলা : ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রভাব*। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্মারক সেমিনার (মূল প্রবন্ধ), ঢাকা, ঘাসফুল (প্রকাশকালের উল্লেখ নেই)

————। (সম্পা.)। *বিধিমালা ও নিয়ম-কানুন*। ঢাকা, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২

————। *আমাদের জয়নুল*। ঢাকা, সুরভী প্রকাশনী, ১৯৮৫

মলয় বালা। *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

মামুন অর রশীদ । *উত্তর-আধুনিকতা* । ঢাকা, সংবেদ, ২০১৯
মুনতাসীর মামুন । *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী-১* । ঢাকা , অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৩
মুর্তজা বশীর । *আমার জীবন ও অন্যান্য* । ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ২০১৪
মৃণাল ঘোষ । *বাংলার আধুনিক চিত্রকলা : নানা দিগন্ত* । কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৪
মৃণাল ঘোষ । *বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন* । কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ২০০৫
মোহাম্মদ আকরম খাঁ । “চিত্রকলা ও এছলাম” । *মাসিক মোহাম্মদী* । কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৭
মোহাম্মদ ইউনুস (সম্পা.) । *চারুকলা ইনস্টিটিউট* । ঢাকা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪
মোহাম্মদ মালিক । “হামিদুর রহমানের সাক্ষাৎকার” । সাঈদ আহমেদ (সম্পা.) । *হামিদুর রহমান* । ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । *ছিন্নপত্রাবলী* । কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ । [প্র. প্র. ১৯৬০]
লালা রুখ সেলিম (সম্পা.) । *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ : চারু ও কারুকলা* । ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
শফিকুল আমীন । *নানা রঙের দিনগুলি* । ঢাকা, সাহানা, ২০১০
শাওন আকন্দ । “ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা” । *শিল্পরূপ*, ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৯
শারদ মাযহার । “মানুষ ও প্রকৃতির কথোপকথন” । *ময়ূখ* । ১০ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০১
শেখ সাদী ভূঁঞা (সম্পা.) । *শিল্পী শশিভূষণ পাল স্মারকগ্রন্থ* । খুলনা চারুকলা স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১
শোভন সোম । *চিত্রভবন* । ২য় সং । কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ । [প্র. প্র. ১৯৮৬]
———— । *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত* । নিউ দিল্লি, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ১৯৯৮
———— । *তিন শিল্পী* । কলকাতা, বাণীশিক্ষা, ১৯৮৫
সন্তোষ গুপ্ত । *বাংলাদেশের চিত্রকলা : শিল্পী ও শিল্পকর্ম* । ঢাকা, জোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১২
সরসীকুমার সরস্বতী । *পাল যুগের চিত্রকলা* । কলিকাতা, আনন্দ, ১৯৭৮
সুনীল রায় । *শিক্ষণ প্রসঙ্গে : শিক্ষাতত্ত্ব* । কলকাতা, সোমা বুকস্ এজেন্সি [প্র. প্র. ২০০৭]
সুশোভন অধিকারী (সম্পা.) । *মাস্টার মশাই নন্দলাল* । কলকাতা, লাল মাটি, ২০০৬
সৈয়দ আজিজুল হক । *জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র* । ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫
———— । *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম* । ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮
———— । *সফিউদ্দীন আহমেদ* । ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশনস্, ২০১৩
———— । *কাইয়ুম চৌধুরী : শিল্পীর একান্ত জীবনগাথা* । ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫
সৈয়দ আলী আহসান । *জয়নুল আবেদিন* । শিল্পী ও শিল্পকর্ম । ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬
সৌমেন কান্তি দাস, দীপক দত্ত (সম্পা.) । *স্মরণিকা : চট্টগ্রাম চারুকলার চল্লিশ বছর* । চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম চারুকলার ৪০ বছর উদ্‌যাপন পরিষদ, ২০১২
স্মরণিকা : ১ম পুনর্মিলনী ২০১৫ । গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্মরণিকা : প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছর । ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮

স্মরণিকা : প্রাচ্যকলা বিভাগের ৬০ বছর পূর্তি । প্রাচ্যকলা বিভাগ, ২২ মে ২০১৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্মরণিকা : রজত জয়ন্তী উৎসব । ঢাকা বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৩

হাশেম খান । *চারুপাঠ* । ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫

হাসান আশিক (সম্পা.) । *মিলবো সবে প্রাণোৎসবে : চারুকলার চল্লিশ বছর* । রাজশাহী, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯

হাসি চক্রবর্তী । *রেখা ও লেখায়* । ঢাকা, মুক্তধারা, গ্রন্থমেলা ২০১৩

খ) ইংরেজি গ্রন্থ

Ahmed, Jalal Uddin. *Art in Pakistan.* Karachi, Pakistan Publications

———. C*ontemporary Art in Pakistan*, January-March, 1999. Vol.5 No.3, 1999

Anisuzzaman. *Art of Bangladesh series-8: Debdas Chakraborty*. Dhaka Shilpakala Academy, June 2004

Azizul Haq, Syed. *Art of Bangladesh Series-3: Quamrul Hassan.* Dhaka Shilpakala Academy, June 2003

Bagal Jogesh Chandra, "History of The Government college of Art and Craft". See, *Centenary.* Government College of Art and Craft Calcutta, 1966

Bengal Education code. vi 136. 1931 Bagal, Jogesh Chandra

Dadi, Iftikhar. *Modernism and The Art of Muslim South Asia*. Chapel Hill, The University of North Carolina Press

Francesco, Italo L. De. *Art Education: its Means and Ends.* New York. Hamper & Brothers, 1958

Glassic Henry, Mahmud Firoz. *Cultural Survey of Bangladesh Series-II: Living Traditions*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh. 2007

Islam Nazrul. *Art of Bangladesh Series-1: Zainul Abedin*. Dhaka Shilpakala Academy, 1997

Jamal Osman. *Art of Bangladesh Series-10: Aminul Islam*. Dhaka Shilpakala Academy, 2004

Khaleed Ashraf, Kazi. *An Architect in Bangladesh conversations with Muzharul Islam.* Dhaka, Loka press, 2014

Prospectus of The East Pakistan College of C Art and Crafts. Dacca, Order No. 5254-c. dated 28-6-1965

Mitter, Partha. *Art and Nationalism in Colonia India (1850–1922).* New York, Cambridge University press, 1994

Selim, Lala Rukh (Ed.). *Art.* October-December, 1998. Vol.4. No.2

Sikder, Shamim. *Sculpture coming From Heaven: A picturesque Book on Sculpture*. Dhaka, S.S. printing & Publications, 2000

University of Dhaka. *The calendar (Part1).* Dhaka. The Dhaka University, 1990.

Edman, Irwin, *Arts and the man: A Short Introduction to Aesthetics*. New York. W.W. North & company, 1928

Zaman, Mahmud Al. *Art of Bangladesh Series-2: Safiuddin Ahmed.* Dhaka Shilpakala Academy, 2002

গ) ক্যাটালগ

আনোয়ার জাহানের প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী। ঢাকা জাদুঘর, ১১–১৮ জুন ১৯৬৭

আনোয়ার জাহানের দ্বিতীয় একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী। সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ২০–২৭ ডিসেম্বর

"চারুকলার ৭০ বছর পূর্তি (১৯৪৮–২০১৮)"। চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জয়নুল গ্যালারি, ২০১৮

"চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের চিত্র প্রদর্শনী"। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি, ১৯৯৯

"চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পঞ্চাশ দশকের নির্বাচিত শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী।" বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২৬ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮

চারুকলা প্রদর্শনী। চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১

চারুকলা প্রদর্শনী। চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৭৫

নয়জন তরুণ এর চারুকলা প্রদর্শনী। শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা আর্ট কলেজ গ্যালারি, ১৯৮২

১৬ জন শিল্পীর প্রদর্শনী-১৯৬৫। ঢাকা, ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্, ১৯৬৫

পঞ্চাশ দশকের নির্বাচিত শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৮

পাবলো পিকাসো স্মরণে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। ছাত্র সংসদ, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৩

বার্ষিক প্রদর্শনী। ঢাকা, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭২

বার্ষিক প্রদর্শনী। ঢাকা, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৮

বার্ষিক প্রদর্শনী। ঢাকা, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ১৯৮৯

বার্ষিক প্রদর্শনী। ঢাকা, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ২০৮২–৮৩

বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী। খুলনা আর্ট কলেজ, ১৯৯০

সময় এর চারুকলা প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৭৫

Abstract Painting in East Pakistan. The German Cultural Institute, 1966

All Pakistan Art Exhibition 1954. Dacca, Pakistan Arts council, 1954

Annual Exhibition, Government Institute of Arts, Dacca 1961

Asian Art Biennale Bangladesh-1981, Bangladesh Shilpakala Academy, 1981

Asian Art Biennale Bangladesh-1981, Bangladesh Shilpakala Academy, 1983

Asian Art Biennale Bangladesh-1981, Bangladesh Shilpakala Academy, 1985

Asian Art Biennale Bangladesh-1981, Bangladesh Shilpakala Academy, 1987

Asian Art Biennale Bangladesh-1981, Bangladesh Shilpakala Academy, 1989

Dhaka School of Painting. The German Cultural Institute, 1962

Exhibition of Contemporary Arts of Bangladesh. Calcutta, Delhi, Bombay, 1973

Exhibition of Painting, Rumi Islam, Dacca, Government Institute of Arts, 1953

First Annual Art Exhibition of Dacca Art Group, Lytton Hall, University of Dacca, 1951

First Annual Art Exhibition. Government Institute of Arts, 1953

National Exhibition of Paintings-64-65. Pakistan Arts Council, Dacca, 1965

Second Annual Exhibition. Dacca Art Group Museum Building: Dacca, 1952

ঘ) চিঠিপত্র, অফিস আদেশ ও দলিলপত্র

অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন প্রণীত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্তিকরণের যৌক্তিকতা ও বিভিন্ন সুবিধাবলী শীর্ষক স্মারকপত্র, তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থ বিভাগের উপসচিব এম নবীর ২৫/২/৪৮ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোট, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমিনুল ইসলামের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে যোগদান পত্র, তারিখ : ১০ নভেম্বর, আমিনুল ইসলামের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আর্ট ইনস্টিটিউটে হবিবুর রহমান জমাদারের যোগদান পত্র, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, হবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের বেতন বহি, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সাল, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকার অধ্যক্ষকে লিখিত আর্ট ইনস্টিটিউটের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হকের পত্র, তারিখ ৪ জানুয়ারি ১৯৪৯, হবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের সাবোর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের শিক্ষকদের তালিকা, ১৮.৬.১৯৬৫ তারিখে অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

একাডেমিক সাব-কমিটির ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চের সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে লেখা পূর্ব বাংলার ডিপিআইয়ের পত্র, পত্র নং ১৬২২-এ তারিখ- ০৩.৮.১৯৪৮, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের সমস্যাসংক্রান্ত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২ জুন ১৯৭৭, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগের ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল পরীক্ষার নম্বরের সনদপত্র, অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদিন স্বাক্ষরিত, নম্বরপত্রটি সমরজিৎ রায় চৌধুরীর নামে ইস্যু করা হয় ১৯৬৫ সালের ২০ নভেম্বর, উৎস : অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী

কারুশিল্প বিভাগের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস, ১৯৮২ সালে প্রণীত, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী আবদুল বাসেতের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে নিয়োগপত্র, পত্র নং ১৩৯০/৪-এ, তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী আবদুল বাসেতের শিক্ষক পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কামরুল হাসানের লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের অফিস আদেশ, অফিস আদেশ নং ৪৫৩৭/২-এ, তারিখ ৪ ডিসেম্বর ১৯৫১

কামরুল হাসানের লেকচারার ইন লাইফ ক্লাস পদে যোগদানের অবগত পত্র, ডিপিআইকে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের লেখা, পত্র নং ১০, তারিখ : ৭ জানুয়ারি, ১৯৫২, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কামরুল হাসানের আর্ট ইনস্টিটিউটের হেড ডিজাইনার পদ থেকে পদত্যাগপত্র, পত্র নং সি এস১/৫৪, তারিখে : ৬ নভেম্বর ১৯৬০, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে নিয়োগ ইচ্ছুক কলকাতা আর্ট স্কুলের সাবেক শিক্ষক এবং নতুন প্রার্থীদের তালিকা, নথি : Govt. Institute of Arts, Dacca, Opening of East pakistan, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে শিক্ষক পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে মোহাম্মদ কিবরিয়ার যোগদান পত্র, তারিখ ০৩.২.১৯৫২, ডায়েরি নং-১০৩, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের দ্বিতীয় তলার প্ল্যান, রেফারেন্স নং ১৮৪৬/১/১, তারিখ : ২৪.১২.১৯৫৩, সিঅ্যান্ডবির কনসুলেটিং আর্কিটেক্ট ম্যাক কোনেল ও সহকারী আর্কিটেক্ট মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, উৎস : মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আয়োজিত ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৫ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির ১৯৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের গভর্নিং বডির ১৯৫৬ সালের ১৭ মে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সিএএস অফিস কর্তৃক প্ল্যান, ডিজাইন নং ৫০৮০/১/১.ডি. তারিখ : ৯ জুন ১৯৫৬, উৎস : চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে আয়োজিত আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও পেইন্টিংয়ের প্রদর্শনী

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হক কর্তৃক আমিনুল ইসলামকে লিখিত পত্র, পত্র নং-৬০০/এ-২৪, তারিখ : ২১.১২.১৯৫৬, আমিনুল ইসলামের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্রদের স্টাইপেন্ড/স্কলারশিপের রেজিস্ট্রার (১৯৫৮–১৯৬৪), উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ১৯৫৯ সালের হাজিরা খাতা, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্র বেতন ফরম, তারিখ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনসংক্রান্ত রেগুলেশন ফরম, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের (বিভাগ-৪) সেকশন অফিসারকে লেখা পত্র এবং পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ২ পৃষ্ঠার প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ, তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২১ জুলাই ১৯৬৪, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২১তম সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, উৎস : মো. জসিম উদ্দিন, অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫তম সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, উৎস : মো. জসিম উদ্দিন, অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের প্রি-ডিগ্রি পরীক্ষার (১৯৭৭) সিলেবাস, শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫–৭৬, উৎস : কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পত্র, স্মারক নং ও এম-১০৬ সি-১/২০০৯/১৩২৯০/১৩, তারিখ : ০২.৮.২০০৯, উৎস : চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন শফিকুল আমীনের কাছে লেখা সলিমুল্লাহ ফাওমীর পত্র, তারিখ : ৮ মার্চ ১৯৬৫, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণের শিক্ষা, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটির ১৯৭৪ সালের ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলা অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক স্বপন কুমার শিকদারের ২২.৫.১৯৮৩ তারিখে আর্ট কলেজ থেকে ইস্যুকৃত ডিপ্লোমা ইন সিরামিকস কোর্সের নম্বরপত্র, উৎস : সিরামিকস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলা ইনস্টিটিউটের সিঅ্যান্ডডি কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ, তারিখ ৯.৫.২০০৬, পরিচালক অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান স্বাক্ষরিত, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চ্যান্সেলরের সচিব মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং ৮০৬, শিক্ষা, তারিখ : ১৪.৭.১৯৭০, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক কর্তৃক বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে প্রদত্ত পত্র, পত্র নং-৪৪৮৪/৪-সি, তারিখ : ০৯.৮.১৯৭৭, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপিআই অফিস থেকে ইস্যুকৃত হেড ডিজাইনার পদে কামরুল হাসানের নিয়োগপত্র, অফিস আদেশ নং-২৮৫(২)-এ তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপিআইয়ের কাছে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের লেখা রশিদ চৌধুরীর ছুটির অগ্রায়ণ পত্র, তারিখ : ৬ নভেম্বর ১৯৬৭, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপিআই কর্তৃক করা রশিদ চৌধুরীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দানের অফিস আদেশ নং ৩৫১১/৩-সি, তারিখ : ১৮.৪.১৯৬৮, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপিআই এস এ রশিদ কর্তৃক সিঅ্যান্ডবির অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে লেখা পত্র, পত্র নং ১৫২০/৪-পি, তারিখ : ১৭ অক্টোবর ১৯৬৯, নথি নং-সি-৩৩, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস' কোর্সের শিক্ষার্থীদের বিএফএ ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির অফিস নির্দেশনামা, বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, তারিখ : ০৭.০২.১৯৮০, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, তারিখ : ১৯৬১ সালের ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পত্রাকারে আর্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করেন ২১.১১.১৯৬১ তারিখে, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৯৬৩ সালের ১৯ জানুয়ারি, সভাটি বিকাল ৫টায় উপাচার্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের ১৯৬৩ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের সেক্রেটারি বি আহমেদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং-১২৩৯-শিক্ষা, তারিখ : ৩ অক্টোবর ১৯৬৩, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিএফএ ডিগ্রির সিলেবাস, সিলেবাসটি ১৯৬৮ সাল থেকে আর্ট কলেজে কার্যকর হয়েছিল, উৎস : প্রিন্টমেকিং বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৬৮ সালের বিএফএ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল পত্র, তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, উৎস : রেকর্ড শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কমিটির ১৯৭৪ সালের ১ জুনের সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ, পত্র নং কাউন্সিল/৩০৩৭, তারিখ : ৮ জুন ১৯৭৪, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের এমএফএ কোর্সের সিলেবাস, সিলেবাসটি ১৯৭৮–৭৯ সাল থেকে কার্যকর হয়, উৎস : প্রিন্টমেকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক লাইব্রেরি ও আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য করা দক্ষিণ শাহবাগের সাইড প্ল্যান। ম্যাক কোনেল ও মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, রেফারেন্স নং ৫০০২/১/১, তারিখ : ০৫.১২.১৯৫৫, উৎস : চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে আয়োজিত আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও পেইন্টিংয়ের প্রদর্শনী

পূর্ব বাংলার ডিপিআই ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা কর্তৃক শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবের কাছে পেশকৃত গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, পত্র নং ১২৮, তারিখ : চট্টগ্রাম, ৫ নভেম্বর ১৯৪৭, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

পূর্ব বাংলার ডিপিআইকে লেখা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিস-ইন-চার্জ আনোয়ারুল হকের পত্র, পত্র নং ১১-এফ, তারিখ : ২০ অক্টোবর ১৯৪৮, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সচিবকে লেখা ডিপিআইয়ের পত্র, পত্র নং ১১০৯, তারিখ : ৩ নভেম্বর ১৯৪৮, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

পূর্ব পাকিস্তান এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ই এম হাউয়েলের কাছে লেখা কোইচি তাকিতার পত্র, তারিখ : ২৯ আগস্ট ১৯৬১, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা পত্র, পত্র নং ১০৫২/১-শিক্ষা, তারিখ-২১ ডিসেম্বর ১৯৬২, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"প্রচার পত্র", শশিভূষণ আর্ট কলেজ, খুলনা, উৎস : সুশান্ত কুমার অধিকারী, অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইন আর্টস বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষার নম্বর পত্র। নম্বরপত্রটি ১৯.৮.১৯৬৫ তারিখে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসের অফিশিয়াল প্যাডে আমিরুল ইসলামের নামে ইস্যু করা হয়। উৎস : আমিরুল ইসলাম

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৬৪, নথি নং ও উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫, নথি নং ও উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ২৪ জুন ১৯৬৫ এবং ২৫ আগস্ট ১৯৬৬, নথি নং ও উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ১৯৬৫ সালের ২৫ জুন এবং ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের ১৯৭২ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সভায় কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রি কোর্সের অনুমোদিত সিলেবাস, ১৯৭৮ সালে প্রণীত, উৎস : প্রিন্টমেকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বুলবন ওসমানের লেকচারার ইন সোশিওলজি পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৭, তাঁর ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের Annual Report, তারিখ : ৩১.১২.১৯৭২, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের সভার কার্যবিবরণী, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রেরিত 'The Bangladesh College of Arts & Craft becoming an Institute under the direct control of the University of Dacca' শীর্ষক প্রস্তাব পত্র; পত্র নং ৬১৪, তারিখ : ১৬ মে ১৯৭৪, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে ইনস্টিটিউট হিসেবে সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার প্রস্তাব পত্র, অধ্যক্ষ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লেখা, তারিখ : ১৬ মে ১৯৭৪, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাহবুবুল আমিনের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন ফরম, তারিখ : ১৯ জুন ১৯৯১, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুস্তাফা মনোয়ারের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে শিক্ষক পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ০২.৮.১৯৬১, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৃৎশিল্প বিভাগের বিএফএ পরীক্ষা ১৯৭৭/৭৮-এর টেবুলেশন শিট, শামসুল ইসলাম নিজামী ও মীর মোস্তফা আলী স্বাক্ষরিত, তারিখ : ১৯.৩.১৯৮১, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ কিবরিয়ার আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রিন্টমেকিং বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য করা আবেদনপত্র ও জীবনবৃত্তান্ত, তারিখ : ২১.৪.১৯৮৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. গোলাম ফারুকের রাজশাহী চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ছাপচিত্র বিষয়ে এডহকভিত্তিক সার্বক্ষণিক প্রভাষক পদে যোগদান পত্র, অধ্যক্ষ বনিজুল হক কর্তৃক স্বাক্ষরিত, তারিখ : ২৮.৮.১৯৮২, উৎস : তাঁর পরিবার

মো. গোলাম ফারুকের রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে যোগদান পত্র, স্মারক নং ৫৪৭(৪), তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮, উৎস : তাঁর পরিবার

মনিরুল ইসলামের গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে শিক্ষক পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ১৫.৭.১৯৬৬; গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস থেকে পাঁচ বছরের কোর্স উত্তীর্ণের প্রত্যয়নপত্র, তারিখ : ১১.৭.১৯৬৬, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুন নবীর সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করা আবেদন ফরম ও জীবনবৃত্তান্ত, তারিখ : ১৩.৪.১৯৮৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রশিদ চৌধুরীর আর্ট কলেজে এডহক ভিত্তিতে লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে যোগদান পত্র, তারিখ : ১ মার্চ ১৯৬৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রশিদ চৌধুরীর চাকরি থেকে অব্যাহতির অফিস আদেশ, পত্র নং ৩৫/৩-সি, তারিখ : ১০.৮.১৯৬৮, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রকফেলর ফাউন্ডেশনের কাউন্সিলরকে লেখা জয়নুল আবেদিনের পত্র, তারিখ ২৫ জুলাই ১৯৫৬, উৎস : প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন

রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী, তারিখ : ৯ আগস্ট ১৯৬৭, কেস নং ২৩১/২৪/৬৭, নথি নং-এ-৭১, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার ইন ওরিয়েন্টাল আর্ট পদে নিয়োগের জন্য ডিপিআইয়ের কাছে লেখা হাশেম খানের আবেদনপত্র, তারিখ : ২৩ এপ্রিল ১৯৬৮, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শামসুল ইসলাম নিজামীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা থেকে আর্ট কলেজে বদলির Notification, তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব কর্তৃক ডিপিআইকে লেখা “Establishment of a Government Institute of Arts in East Bengal” শীর্ষক পত্র, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব খান বাহাদুর মো. ফজলুল হক স্বাক্ষরিত, Establisment of a Govt. Institute of Arts in East Bengal শীর্ষক অফিস আদেশ, অফিস আদেশ নং 1170/Edn. Dated: Dacca, the 8th April 1948, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

শিক্ষা বিভাগের সচিবকে ডিপিআইয়ের লেখা পত্র; পত্র নং ৯০৩, তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, উৎস : বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা

শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিবের ২৪/১২/১৯৪৭ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোট

শিক্ষা বিভাগের সচিবের ১৭/০২/১৯৪৮ তারিখে লেখা ফাইল নোট, Govt. Institute of Arts, Dacca Opening of East Pakistan সংক্রান্ত নথির নোট

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এ কিউ আনসারীর ০১.৭.১৯৫৫ তারিখে লেখা অফিস নোট, Transfer of the govt. Institute of Arts to the University of Dacca শীর্ষক নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা বিভাগের অফিস আদেশ, নং ৫৮৬৯-শিক্ষা, তারিখ : ১৩.৯.১৯৫৭, উৎস : ডিন অফিস, চারুকলা অনুষদ

শিক্ষা বিভাগ থেকে ইস্যুকৃত অফিস আদেশ নং ৫৯২/২-সি, সমরজিৎ রায় চৌধুরীর ব্যক্তিগত নথি, তারিখ : ২৭.৫.১৯৬৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা কর্তৃক জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে লিখিত বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ‘ডিপ্লোমা-ইন-সিরামিকস’ কোর্স প্রবর্তন সম্পর্কিত পত্র। পত্র নং-শা: ৪/২ সি-১২৫/৭৮/১৪, তারিখ : ১৩.০১.১৯৭৯, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী উপদেষ্টা এস এম সাইফুদ্দীন কর্তৃক জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে লেখা পত্র, পত্র নং-৪/২ সি-১২৫/৭৮/১-শিক্ষা, তারিখ : ২৩.০১.১৯৭৯, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিরামিকস সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাস, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

“সিলেবাস”, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, রাজশাহীর ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষ, উৎস : অধ্যাপক ড. এস এম জাহিদ হোসেন, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ থেকে ১৯৬০ সালের ৩০ জুন ইস্যুকৃত মীর মোস্তফা আলীর 'পটারি' বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভের সনদপত্র, উৎস : মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হবিবুর রহমান জমাদারের উডকাট শিক্ষক পদে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টসে যোগদান পত্র, তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, হবিবুর রহমান জমাদারের ব্যক্তিগত নথি, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হেড ডিজাইনার পদে কামরুল হাসানের যোগদান পত্র, তারিখ : ১ জানুয়ারি ১৯৫০, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Final site plan showing the walks and the boundary walls, ref, no: 4005/1/1, তারিখের অংশটি ছেঁড়া, ম্যাক কোনেল ও মাযহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত, উৎস : মাযহারুল ইসলামের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আয়োজিত ভবনের নকশা, আলোকচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী

Notice, Rules regarding internal and University examinations, by Principal, Bangladesh College of Arts And Crafts, Dacca, Date : 8.5.1975. উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Particulars Requiered in connection with the civil list শীর্ষক আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক তালিকা, ১৯৬৫, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Report of the sub-committee formed to make recommendation on academic affairs for merger of the Bangladesh college of Arts and Crafts with the University of Dhaka, Dated 9th April, 1972, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'Scheme for opening a faculty of Arts and Crafts under the University of Dacca' শীর্ষক পরিকল্পনা, তারিখ : ১০.০১.১৯৬১, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Syllabus for B.F.A Final Exam. (Since 1968), File No. C-51, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Syllabus for Pre-Degree Course (2 years), 1974, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

The list of gazatted officers of the East Pakistan College of Arts & Carfts, Dhaka, No-110, Date 08.3.1964, উৎস : চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়